প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮
ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রকাশক ঃ
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণে ঃ
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা
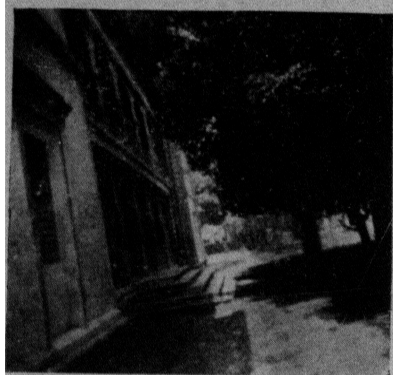
মনোমোহন ঘোষের নিবাস-সংলগ্ন
তরুবীথি
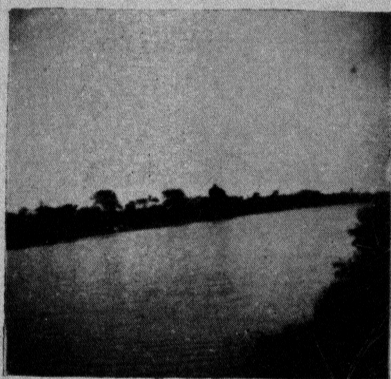
অঞ্জনা নদী
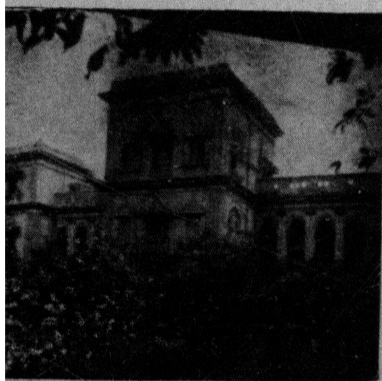
মনোমোহন ঘোষের নিবাস
বর্তমানে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশকের নিবেদন

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট গত বিশ বছর ধরে রবীন্দ্রচর্চার কাজে নিযুক্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিমণ্ডলের যাবতীয় তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করে চলেছে। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে অমিতা ভট্টাচার্যের এই গবেষণা গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে ইনস্টিটিউট গর্ব বোধ করছে। গবেষক হিসাবে অমিতা ভট্টাচার্যের তুলনা নেই। অসাধারণ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সংগে যেখানে যতটুকু সূত্র পেয়েছেন সেইটুকু ধরেই তিনি এগোতে চেষ্টা করেছেন। মুদ্রিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থ পাঠ ছাড়াও রাঁচি, পুনে, বোম্বাই গিয়েছেন, সাক্ষাৎ করেছেন বহু ব্যক্তির সংগে, দীর্ঘকালের পুরাণো সরকারী দলিল থেকে তথ্য উদ্ধার করেছেন—ছবি তুলেছেন বিভিন্ন স্থানের, প্রামাণিক করে তুলবার জন্য বহু চিঠির চিত্রলিপি সংগ্রহ করেছেন এবং সব জিনিসটাই যত্নের সংগে সাজিয়েছেন। ফলে এই গ্রন্থ পাঠ করে বাঙালীর চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রথম সিভিলিয়ান অথচ স্বদেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল অথচ অনুগ্র, ধীর এবং শান্ত, নারীমুক্তির পথপ্রদর্শক, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির শিক্ষায় শিক্ষিত সত্যেন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টিকার্যের স্থান বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে যে কতখানি সে সম্বন্ধে পাঠকদের একটি পরিষ্কার ধারণা জন্মাবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন লেখিকা। কিন্তু ডিগ্রী যখন পেলেন তখন তাঁকে আর তা কেউই পোঁছে দিতে পারে নি। কোন বৃহত্তর ডাকে সাড়া দিয়ে ডিগ্রী এবং তাঁর সংসার, তাঁর পরিজন এবং অধ্যাপনা ও গবেষণা এর সব কিছু তুচ্ছজ্ঞান করে তিনি যে চলে গেলেন তা কেই বা বলবে।

অমিতা দেবীর স্বামী শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য প্রয়াত গ্রন্থকর্ত্রীর জীবনের একটি তথ্যপঞ্জী করে দিয়েছেন। গ্রন্থশেষে সেটি মুদ্রিত হল।

ডক্টরেটের থিসিস এবং মুদ্রিত গ্রন্থ এই দুয়ের মধ্যে একটু তফাৎ থাকবেই। সেইজন্য কোনও বক্তব্য কোনও তথ্য এতটুকুও বদল না করে কেবল মুদ্রণযোগ্য করবার আর পাঠকের সুবিধার জন্য যৎসামান্য বিন্যাস পরিবর্তিত করতে হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পৃথক্ অনুচ্ছেদ তৈরি করে

উপশিরোনাম যোগ করে দিতে হয়েছে, কিংবা টীকার ক খ নম্বর গুলি তুলে ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। পুনরুচ্চারিত তথ্য বর্জন করে গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন অংশটিও ঢেলে সাজাতে হয়েছে। মূল থিসিসে কিছু বেশি চিত্রলিপি ছিল। মুদ্রণোপযোগি তার কথা ভেবে এবং কোনটি নিতান্ত দরকারী আর কোনটি তা নয় তা বিচার করে কয়েকটি বাদ দিতে হযেছে।

দু বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে বোধি প্রেসের মালিক এবং কর্মীরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ছাত্রী শ্রীমতী লেখা ভট্টাচার্য প্রথমে কিছু নির্দেশিকা তৈরি করে দিয়েছিলেন পরে শ্রীমতী মঞ্জুলা মিত্র নতুন করে বৃহত্তর নির্দেশিকা ও অশুদ্ধি তালিকা তৈরি করে দিয়েছেন। যত্ন করে প্রচ্ছদের জন্য নামটি লিখে দিয়েছেন, ইনস্টিটিউটের ছাত্র ও কর্মী শ্রীমান্ অসীম দাশ শর্মা। অধ্যাপক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর শত কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকে ও বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। প্রয়াতা গ্রন্থ-কর্ত্রী তাঁর ছাত্রী ছিলেন, আবার গবেষণা নিবন্ধের অন্যতম পরীক্ষকও ছিলেন তিনি।

গ্রন্থটির প্রকাশনপর্ব সমাপ্ত করতে পেরে আমি তৃপ্তি বোধ করছি কিন্তু চলতে ফিরতে এই দুঃখ মনে বাজবে যে যিনি তাঁর গবেষণা কার্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে দেখলে সবচেয়ে খুশি হতেন তিনি নেই, নেই গবেষণা নির্দেশক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়। যিনি এ কাজের ভার আমাকে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রচর্চাভবনের রূপকার নির্মাতা-পরিচালক সোমেন্দ্রনাথ বসুও আর নেই। প্রকাশকের পক্ষ থেকে এ সব কথা লেখার কথা ছিল তাঁরই।

প্রেসিডেন্সি কলেজ

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

ভূমিকা

"সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন ও সৃষ্টি" গ্রন্থের লেখিকা অমিতা ভট্টাচার্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে আমার ছাত্রী ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার আগরতলা থেকে পড়তে এসেছিলেন। এখানকার পড়াশোনা শেষ করে চলে গেলেও তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। দুরারোগ্য কর্কট ব্যাধি সেই সূত্রটিকে চিরকালের মতো ছিন্ন করে দিয়ে গেল। তাকে আর জোড় লাগানো যাবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর এই গবেষণা-নিবন্ধের জন্য তাঁকে পি. এইচ. ডি. উপাধি দান করেন। ফলাফল জানবার অল্প আগেই তার মর্ত্যবন্ধন ঘুচে যায়। বহু দিন-রাত্রির সাধনালব্ধ গবেষণার ফল বা মুদ্রিত রূপ তিনি দেখে যেতে পারলেন না। এই তো আমাদের জীবনের ট্রাজিডি!

এই গবেষণা-কর্মের পরিচালন ভার গ্রহণ করেছিলেন প্রমথনাথ বিশী মহাশয়। তিনিও লোকান্তরিত। রবীন্দ্রচর্চাভবনের কর্ণধার অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসু এই গবেষণা-নিবন্ধ রচনায় অক্লান্ত সহযোগিতা ও প্রাণদ অনুপ্রেরণা যুগিয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন আগরতলায় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে। ভাগ্যের কী নিদারুণ পরিহাস যে সোমেন্দ্রনাথ এই বৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রণের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও অকস্মাৎ অকাল প্রয়াণ করলেন!

এ-গ্রন্থের 'ভূমিকা' লিখতে বসে এই ঘটনাগুলি বড়ো বেদনার মতো বেজে উঠল।

মানতেই হবে বাংলা সাহিত্যে গবেষণার হিড়িকে এমন বহু বস্তু রচিত বা সম্পাদিত হচ্ছে যার মান উঁচু নয়। সেই স্তূপের মধ্যে কদাচিৎ সত্যিকারের ভালো কিছুর সন্ধান মেলে। "সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন ও সৃষ্টি" সেই ধরণের একটি উচ্চমানের গবেষণা-নিবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহুমুখী চর্চা দেশে-বিদেশে এখনো অব্যাহত। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' পর্যায়ে সংকলিত 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর'

নামক পুস্তকটি ছাড়া তাঁর সম্পর্কে কোনো গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এই প্রথম সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিচয়বহ একটি বড়ো মাপের বই লেখা হলো। রবীন্দ্রনাথের জীবনের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিপর্বে তাঁর শিক্ষায়-দীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথের দানের কথা বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য। একদিকে দেবেন্দ্রনাথ অপরদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথাই বেশি বলা হয় সেক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ভূমিকা লেখিকা নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কারো জীবন-কথা রচনা করতে গেলে স্বলিখিত ও প্রাপ্ত চিঠিপত্র, সেই ব্যক্তির ও অপরের স্মৃতিকথা, ডায়েরি, অন্যান্য ডক্যুমেণ্ট সবই দেখা দরকার। এ কথা জোরের সঙ্গেই বলতে পারি লেখিকা প্রাপ্য-দুষ্প্রাপ্য সকল উপকরণ পরীক্ষা করে দেখেছেন ও প্রয়োজন বোধে ব্যবহার করেছেন। হয়ত অনেকের জানা নেই পিতা দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অকালমৃত হেমেন্দ্রনাথের সন্তানদের জোড়াসাঁকোর বাড়ির অংশ দেন। পরে সত্যেন্দ্রনাথের অনুযোগে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে প্রচুর অর্থ দেন। সেই অর্থে সত্যেন্দ্রনাথ উনিশ নম্বর ষ্টোর রোডে বাইশ বিঘা তিনতলা বাড়ি কেনেন। সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২০ সালে দেনা মেটাতে বিড়লাদের কাছে জমি-বাড়ি বিক্রি করে দেন। এখন এর ঠিকানা ১৯-এ গুরুসদয় দত্ত রোড। এই গ্রন্থে এ ধরণের বহু তথ্য আছে। অথবা জানতে কৌতূহল হয় গান্ধীজি পরিচালিত খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্র-সত্যেন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে। 'মডারেট' সত্যেন্দ্রনাথ এ-আন্দোলনকে সমর্থন করেননি, বিরোধিতা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বৃটিশ শাসক বর্গের বিরোধী বলে নিজেকে 'হাড়ে-হাড়ে non co-operator' ঘোষণা করেছেন এবং গান্ধীজির মত ও পথের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির চারিত্রিক শক্তির প্রশংসা করলেও অসহযোগ-আন্দোলনের নঞর্থক দিকটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। লেখিকা এই সূত্রে সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করেছেন, যার এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে :

> ভাই মেজদাদা—Gourleyকে জোড়াসাঁকোয় ডেকে এনে তাঁদের এখনকার দণ্ড নীতির বিরুদ্ধে কিছু বলেছিলেম। মেছুয়াবাজারে মসজিদের মধ্যে পুলিশ প্রবেশ করে যে সব উৎপাত করেছিল তাতে সর্বসাধারণের মধ্যে

ধারণা হয়েছে যে ওরা গায়ে পড়ে খোঁচা দিয়ে N. c. o. [নন-কো অপারেশন] পক্ষের অহিংসাব্রত ভাঙবার চেষ্টা করছে। আমি ওকে বলেছি এ রকম ঘটতে আরম্ভ হলে আমাদের মত নিরপেক্ষ লোকদের দায়ে পড়ে অপর পক্ষের সংগে যোগ দিতে হবে।

ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের চারটি স্বরূপ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন তাদের মধ্যে চতুর্থ স্থলে যা বলেছেন তার তাৎপর্য কম নয়—"চতুর্থ শাস্ত্র কোনো গ্রন্থবিশেষ আবদ্ধ নহে, মানবপ্রকৃতি-মূলক সার সত্যই আমার ধর্মশাস্ত্র"।

সত্যেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার সংগে 'ব্রাহ্মসমাজ' তথা মহারাষ্ট্রের 'প্রার্থনা সমাজ' উভয়ের উন্নতি বিধানে তাঁর প্রচেষ্টা লেখিকা সুন্দর ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন।

রাজনৈতিক বা ধর্মবিষয়ক চিন্তার তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথের সমাজ-সংস্কার সম্পর্কিত চিন্তা ও কর্ম প্রয়াস অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। এই দিকটিকে লেখিকা চমৎকার ভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন, স্বল্পজ্ঞাত বহু তথ্যের উপস্থাপন করেছেন এবং সত্যেন্দ্র-নাথের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেছেন এবং বিধবাবিবাহকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন—

"আমার মতে সামাজিক অনুশাসনে বিধবা বিবাহ বন্ধকরা যুক্তিসিদ্ধ নয়; অপ্রাপ্ত বয়স্কের কথা ছেড়ে দিলে বিবাহ বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীন অধিকার সমান থাকা উচিত।"

এ ধরণের মন্তব্য পড়লে সামাজিক ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথকে দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কেশবচন্দ্র সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুগামী বলে মনে করা সংগত।

সংস্কৃত সাহিত্য মারাঠী সাহিত্য ও বংগসাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগের বিশদ ইতিহাসও লেখিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। পালি সাহিত্যে তাঁর অধিকার 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে প্রতিভাত হয়েছে। 'মেঘদূত' কাব্যের পদ্যানুবাদ, মহারাষ্ট্রের সাধক তুকারামের রচিত 'অভংগ'-এর পদ্যানুবাদের কথা এই সূত্রে স্মরণীয় তেমনি মনে রাখতে হবে তাঁর অনূদিত 'নবরত্নমালা'র

কথা। শেক্সপীয়রের 'সিম্বেলিন' নাটকের দেশীয় রূপ 'সুশীলা-বীরসিংহ' অনুবাদ-নাট্য রচনা তাঁর শেক্সপীয়র প্রীতির নিদর্শন। সত্যেন্দ্রনাথ বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ [প্রতিষ্ঠা বর্ষ ১৮৯৩] প্রতিষ্ঠানের সংগে আজীবন জড়িত ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের জন্য তিনি যে-সব কাজ করেছেন লেখিকা তার সুষম পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়-প্রতিভায় মঞ্চ নির্দেশনায় সত্যেন্দ্রনাথের নাম ছিল। সুচয়িত বিভিন্ন তথ্যের সন্নিবেশে লেখিকা এই প্রসংগটির উপর সুবিচার করেছেন।

এই ভাবে ধরে-ধরে দেখাতে গেলে 'ভূমিকা' দীর্ঘতর হবে। লেখিকা এই গ্রন্থ রচনায় যে শ্রম, অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন, যে ভাবাবেগমুক্ত দৃষ্টি ও তথ্যনিষ্ঠ মনের ছাপ ফেলেছেন তার তুলনা বেশি মেলেনা।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন

ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিষ্ক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস. এ নিয়ে অনেককে গর্ব করতে শোনা যায়, কিন্তু তাঁর দরদী অন্তঃকরণ, প্রগতিশীল চিন্তাধারা, ধর্মচেতনা ও সাহিত্য-সৃষ্টির পরিচয় অনেকের কাছেই অজানা। তাঁরই প্রচেষ্টায় ঠাকুরবাড়ির অবরোধ-প্রথার পুরানো নিয়ম ধ্বসে গিয়ে মুক্তাঙ্গনে স্ত্রী-স্বাধীনতার জোয়ার এসেছিল—যার স্পর্শে সমগ্র বঙ্গসমাজও ধীরে ধীরে প্লাবিত হয়েছে।

দূরপ্রবাসে কর্মজীবন অতিবাহিত হওয়ায় বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার তাঁর সুযোগ ছিল না। সমাজসংস্কারে আইনের চেয়েও মানসিকতা পরিবর্তনের উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মত ছিল—প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ পরিবারে পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন, তাহলেই দেশের স্থায়ী কাজ সাধিত হবে। জাতিকে পথপ্রদর্শনের জন্য নিজের জীবনে তা পালনও করেছেন। তাঁর নীরব ভূমিকায় দেশ অনুপ্রাণিত হয়েছে অথচ তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতিটুকু পুরোপুরি তাঁকে দেওয়া হয় নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়জীবনের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের এই ঘনিষ্ঠসংযোগ ও সক্রিয়ভূমিকার কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

এই গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টি দুটিদিকই আলোচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্রের অভাব দূর করার সাধ্যমতো প্রচেষ্টা করা হলো। সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাইপ্রবাস' গ্রন্থটি যত না আত্মজীবনী তার চেয়েও বেশি স্মৃতিকথা। ধারাবাহিক ভাবে নিজের কথাকে পরিবেশনের চেয়েও বিশিষ্ট ঘটনা ও ব্যক্তির পরিচয় সেখানে উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে নিজের জীবনাংশও অবশ্য কিছু কিছু ব্যক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থটিকে সামনে রেখে সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন পত্রাবলী ও ভাষণ থেকে, পরিজনদের বক্তব্য থেকে, সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও সত্যেন্দ্রনাথের সার্ভিস রিপোর্ট থেকে তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র আহরণ করা যায়। বিশেষত তাঁর শেষ জীবনের কথা বিভিন্ন সংবাদপত্রে,

ইন্দিরা দেবীর বক্তব্যে ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরিতে ছড়ানো ছিটানো ছিল। সেগুলি একত্রে গ্রথিত করে একটি ধারাবাহিক জীবনকথা রচনার চেষ্টা করা গেল, কারণ সুসংবদ্ধ ভাবে তাঁর অন্ত্যজীবনের সকল কথা কোথাও একত্রে চোখে পড়েনি। 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থটি যে যে তাঁর বাল্য ও কর্মজীবনের চিত্র তা তাঁর গ্রন্থের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। কর্মজীবন শেষ করে আরও প্রায় সিকি শতাব্দী তিনি জীবিত ছিলেন ও কর্মক্ষম ছিলেন। এই পর্বে তাঁর সেবায় বংগীয় সাহিত্যপরিষদ ও আদি ব্রাহ্মসমাজ পুষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন জনহিতকর কার্যেও তাঁর আত্মনিয়োগের নিদর্শন আছে। এ জীবনকে নিয়ে আরও অনেক কিছু লেখার আছে, কিন্তু তাঁর মননশীলতা, শিল্পীসত্তা, সাহিত্যসৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের আলোচনা দীর্ঘতর হওয়ায় জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার সামগ্রিক উল্লেখ সম্ভব হয় নি।

সমস্ত বিশিষ্ট ঘটনাবলীর কথা না বললে জীবনের ছবি পুরোপুরি আঁকা যায় না, সেই সেই ঘটনাবলীর উল্লেখমাত্র জীবনকথায় আছে কিন্তু এর বিশ্লেষণ আছে প্রাসংগিক অধ্যায়গুলিতে। যেমন 'জীবন-কথা'র প্রথম ফার্লোতে সত্যেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ সহ বিলাত যাত্রার উল্লেখ মাত্র আছে কিন্তু 'পরিজনদের মাঝে' অধ্যায়ে রবীন্দ্রসান্নিধ্য প্রসংগে দুজনের নিবিড়তার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

দ্বারকানাথের বন্ধুবর্গের কথা সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমোহনের চিঠিতে জানা গেছে। এঁদের চিঠি না ঘাঁটলে সত্যেন্দ্রনাথের বিদেশের জীবনে হিতৈষীদের কথা কিছুই জানা যেতো না। 'জীবনকথা'-প্রথম পর্বে— 'বিদেশের হিতৈষী মণ্ডল' প্রসংগে এঁদের কথা আলোচিত হয়েছে। দ্বারকা-নাথের পদাংক অনুসরণ করেই দুই বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমোহন 'কালা-পানি' অতিক্রম করেছিলেন—একথা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বহু ভাষণে ও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। দ্বারকানাথের আমলেই ঠাকুরবাড়িতে 'পাশ্চাত্যের সংগে প্রাচ্যের' যে 'মালাবদলের' কথা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'যাত্রী' গ্রন্থে (পৃ. ১) বলেছেন তা মূর্তি পরিগ্রহ করেছে সত্যেন্দ্রনাথের মাঝে। তাঁরা ব্যক্তিত্বে প্রতীচ্যের কর্মবাদের সংগে ভারতের শাস্ত্রসাম্পদ আধ্যাত্মিক ভাবসৌন্দর্যের মিলন ঘটেছে। তাঁর ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার সেজন্যই পাশাপাশি চলেছে, অথচ কোন ধর্মীয়বিরোধে নিজেকে জড়িত করেছেন, এমন ইতিহাস নেই।

এই মহৎ প্রাণের স্মৃতি জাতির জীবন থেকে বিস্মৃত হতে চলেছে। তাঁর বন্ধুমণ্ডলীর অনেকের নামেই সরণির নাম বা কিছু স্মরণ-চিহ্ন আছে কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের নামে কোন স্মরণ-চিহ্ন চোখে পড়ে নি।

মননশীল সত্যেন্দ্রনাথ অধ্যায়ে চিঠিপত্র, ভাষণ, বন্ধু ও পরিজনদের বক্তব্যের আলোকে তাঁর বহুমুখী চিন্তাধারা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

সমকালীন ও পূর্বসূরীদের দুষ্প্রাপ্য রচনার সংগে তুলনামূলক বিশ্লেষণের সাহায্যে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রায় সমস্ত বিষয়ের মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। স্বভাবতই সেজন্য সমালোচনার পরিসর দীর্ঘ হয়েছে, সময়ও লেগেছে দীর্ঘতর। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান কিছুমাত্র হেলা করার নয়। পদ্যানুবাদক হিসাবে তাঁর লেখা যে কতো মধুর তা সমকালীন অনুবাদকদের সাথে তুলনায় ধরা পড়ে। বিশেষত বাংলা গদ্যের গঠনে তাঁর দান যথার্থই স্মরণযোগ্য। যদিও 'বিষয়ানুসারে' চলিত ও সাধু উভয় ভাষারই তিনি পক্ষ সমর্থন করেছেন তথাপি উগ্র রক্ষণশীলতার আবরণে চলিত ভাষাকে দাবিয়ে রাখার কোন প্রচেষ্টা তাঁর ছিল না বরং নিজে সেটির অনুশীলনে তৎপর হয়েছেন। 'ঢাকা-রিভিয়্যু' পত্রিকায় এজন্য অনেক বিরূপ মন্তব্যও তাঁকে শুনতে হয়েছে হয়েছে। সুতরাং বাংলা চলিত ভাষা প্রতিষ্ঠায় তাঁর দান কোন ক্রমেই বিস্মৃত হবার মতো নয়। তাঁকে কাছে পেয়েই চলিত ভাষা প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহ বর্ধিত হয়েছে। সেজন্য বাংলা গদ্যসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন তাঁর প্রাপ্য। অবশ্য এটা ঠিক, 'আত্মগৌরবী' ভাবকল্পনা সমৃদ্ধ অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর মধ্যে নেই। 'বহুজনহিতায়' তিনি লেখনী ধারণ করেছেন। সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোকে ঈশ্বর চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণে, গুরুবাদ সম্পর্কে নির্ভীক ঘোষণায়, বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে সংস্কৃতির আদানপ্রদানে, বোম্বাই রায়তদের সমস্যা সমাধানে ও ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের মানসিকতা বিশ্লেষণে তাঁর সহজবোধ্য রচনা পাঠকমনকে আকর্ষণ করে। এখানেই তাঁর সৃষ্টির সজীবতা।

রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল সৃষ্টির দ্যুতিতে সত্যেন্দ্রনাথের অনেক রচনাই নিষ্প্রভ মনে হবে কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে অনেক বস্তুই আছে যার মান সাহিত্য জগতে কোনক্রমেই অপাংক্তেয় হবার মতো নয়। বিশেষ করে বাংলা ভাষার গঠন প্রচেষ্টায় তাঁর সুচিন্তিত ও ধৈর্যশীল অভিমত

সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষগণকে শান্ত রেখেছে ও রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা যুগিয়েছে। সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষা থেকে অনুজদের অনুবাদের পিছনেও তাঁর অবদান সক্রিয় ছিল। তাঁরই প্রভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। সুতরাং এই শক্তিধর পুরুষের বিবিধ সৃষ্টিকর্ম কিছুতেই ভুলে যাবার নয়। 'গৃহিণীপনার' অভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো গদ্যশিল্পী যেমন অনেকের কাছেই অজানা তেমনি গৃহিণীপনা থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ পরিণতি সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তাঁর সকল গ্রন্থই আজ অতি দুষ্প্রাপ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে। অথচ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত তাঁর ধর্মীয় ভাষণগুলি 'আচার্যের ভাষণ' রূপে পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হওয়ার যোগ্য। বহুবিধ সাহিত্যকর্মে তাঁর প্রকাশ একটি সজাগ সচল মনের পরিচয় বহন করে। বহু ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের যে শ্লোকটি আবৃত্তি করেছেন তা দিয়েই এ আলোচনা শেষ করা যায়। এ কথা বললে একটুও অতিরঞ্জন হবে না যে তাঁর সমগ্র জীবন এই মন্ত্রেরই প্রতিফলন :

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিত্যব্যং।

পরিশেষে বলি, গ্রন্থটি রচনার সময় আমার জননী, কন্যা এবং স্বামী অধ্যক্ষ শ্রীবাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যের কাছে বরাবর অনুপ্রেরণা লাভ করেছি।

অমিতা ভট্টাচার্য

প্রয়াতা গ্রন্থকর্ত্রী এঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলেন

শ্রীযুক্তা মানসী দাশগুপ্ত এবং শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের অন্যান্য কর্মীরা, ৺পুলিনবিহারী সেন, সর্বশ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পশুপতি শাসমল, মোহনলাল বাজপেয়ী, অনাথনাথ দাস, শ্রীমতী অমিতা সেন, সত্যেন্দ্রনাথের পৌত্রবধূ শ্রীমতী পূর্ণিমা ঠাকুর, পৌত্রী জয়শ্রী সেন ও তাঁর স্বামী শ্রীকুলপ্রসাদ সেন, পৌত্র প্রবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সুনৃতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজীব চৌধুরী, পূর্ণিমা ঠাকুরের ভাই সত্যেন্দ্রনাথের পৌত্রী মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ও পুত্রবধূ গৌতম ও মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথের প্রপৌত্রী সুপর্ণা চৌধুরীর স্বামী সুভাষ চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরীর দৌহিত্র সৌরকুমার চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী শ্রীযুক্তা সংজ্ঞা ঠাকুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, টেগোর রিসার্চ-ইনস্টিটিউটের প্রয়াত পরিচালক ডঃ সোমেন্দ্রনাথ বসু, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার বেকার, জাতীয় গ্রন্থাগারের সর্বশ্রী নাগরাজ, খুশালদাস ভাসানী, এম. বি. যোশী এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষের ভারপ্রাপ্ত বিভিন্ন কর্মী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, বন্দীরাম চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বালিগঞ্জ নদীয়া হাউসে মহারাজকুমার সৌরীশচন্দ্র রায়, রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দ, ইউনিয়ন ক্লাব ও লাইব্রেরীর সম্পাদক সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পত্নী শ্রীযুক্তা সরযূ চট্টোপধ্যায়, শ্রীকুমার চৌধুরী ও তাঁর পত্নী শ্রীযুক্তা আলোমা, লণ্ডন ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও রেকর্ডসের কর্তৃপক্ষ, শ্রীমতী প্রতিভা বিশ্বাস, বোম্বাই মহারাষ্ট্র স্টেট আরকাইভসের কর্তৃপক্ষ, পুণে-র শিবাজীনগরের পি. এল. দেশপাণ্ডে, বোম্বাই উইলসন কলেজের অধ্যাপক ডঃ এম. ডি. ডেভিড ও প্রয়াত অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী।

গ্রন্থকর্ত্রী তাঁর জননী ও কন্যা এবং স্বামী অধ্যক্ষ বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণা কথাও জানিয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন ও সৃষ্টি

প্রথম অধ্যায়

জন্মসাল ও জন্মপত্রিকা। জীবনকথা প্রথম পর্ব-১৮৪২-১৮৬৪ খ্রী

দ্বিতীয় পর্ব-কর্মজীবন (১৮৬৪-১৮৯৭ খ্রী)

তৃতীয় পব-অবসর জীবন (১৮৯৭-১৯২৩ খ্রী)

জন্মসাল ও জন্মপত্রিকা

সাধারণ হিন্দু পরিবারে সন্তানের জন্মসাল সুনিশ্চিত ধরে রাখার জন্য কোষ্ঠী ও ঠিকুজিপত্র রাখার রীতি আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র[১] সত্যেন্দ্রনাথেরও কোষ্ঠী ও ঠিকুজিপত্র ছিল। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বলেন্দ্রনাথের হস্তলিখিত যে পারিবারিক ঠিকুজি চক্রের খাতা[২] আছে তার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের জন্মপত্রিকা রয়েছে। তাতে তারিখহীন ইংরেজি সালের উল্লেখ আছে। তারিখ সহ শকাব্দ ও বঙ্গাব্দের উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে বলেন্দ্রনাথের লিখিত জন্মপত্রিকায় 'কোষ্ঠী ও ঠিকুজিতে সময়ের অনৈক্য'[৩] দৃষ্ট হয়। (দ্র. পরিশিষ্ট ১ : জন্মপত্রিকা।)

সত্যেন্দ্রনাথের জন্মতারিখ ও সাল নিয়ে মতানৈক্য বিশেষ নেই। তবে পরবর্তী কালে কোন কোন রচনায় জন্মসাল ঠিকুজির সঙ্গে ঠিক মিলিয়ে লেখা হয় নি, সেজন্য যদি কোন ভুলধারণার উদ্ভব হয় এই মনে করেই সত্যেন্দ্রনাথের জন্মকাল নির্ণয়ের আলোচনার অবতারণা।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অনেক দিন পরে ইন্দিরা দেবী পিতৃস্মৃতি রচনা করার সময় লিখেছেন—"১লা জুন ১৯৪৫। আজ ঠিক ১০৩ বৎসর আগে পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। এবং ৯ই জানুয়ারীতে তাঁর মৃত্যুর পর ঠিক ২২ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। মৃত্যুর সময় তাঁর ৮১ পূর্ণ হতে মাস পাঁচেক বাকি ছিল।"[৪]

বলেন্দ্রনাথের হস্তলিখিত পূর্বোক্ত খাতায় দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মসাল লেখা রয়েছে—১৭৬১ শক, ২৯শে ফাল্গুন সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের চেয়ে দুবছরের ছোট ছিলেন। মহর্ষির আত্মজীবনী থেকে একথা আরও স্পষ্ট জানা যায়। তিনি লিখছেন—১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসে তিনি যখন স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে নৌকারোহণে বেড়াতে যান, তখন 'দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স ৭ বৎসর, সত্যেন্দ্রনাথের ৫ বৎসর এবং হেমেন্দ্রনাথের ৩ বৎসর' ছিল।[৫] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সাধক চরিত-

মালায় সত্যেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে—১লা জুন ১৮৪২ (২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৪ শক) সত্যেন্দ্রনাথের জন্মতারিখ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬]

পরবর্তী কালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা নিয়মকানুনের সংগে সাল তারিখ মেলালে দেখা যায় যে ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দেই তাঁর জন্ম।

এ প্রসংগ আর বিস্তৃত করার প্রয়োজন নেই কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে এ নিয়ে বিশেষ তর্কও নেই। কেবল সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ই সত্যেন্দ্রনাথের জন্মসাল ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।[৭] দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মসালও তিনি ১৮৩৯ লিখেছেন যা বলেন্দ্রনাথের হস্তলিখিত খাতার সংগে মেলে না। ঐ খাতায় দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মসাল ১৮৪০ (মার্চ) বলে লেখা রয়েছে। সৌরীন্দ্রমোহনের গ্রন্থে, এই তারিখগুলি কোন সূত্রে প্রাপ্ত, তার উল্লেখ নেই। সুতরাং বলেন্দ্রনাথের হস্তলিখিত খাতা, মহর্ষির আত্মজীবনী ও ইন্দিরা দেবীর সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দকেই সত্যেন্দ্রনাথের জন্মসাল রূপে প্রামাণ্যভাবে ধরা যায়।

১. প্রকৃতপক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ সারদাদেবীর তৃতীয় গর্ভের সন্তান। প্রথম সন্তান কন্যা অল্পায়ু ছিলেন। সেজন্য দ্বিতীয় সন্তানরূপেই তিনি গণ্য। দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কৃত রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, পৃ ১২।

২. শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত : Mss. No. 364

৩. ত্রিপুরার প্রখ্যাতজ্যোতিষী দীনেশচন্দ্র আচার্যের মতে কোষ্ঠী ও ঠিকুজির রাশিচক্রে লগ্নের অনৈক্য দেখা যায়। কোষ্ঠী ও ঠিকুজি দুই গণকের হাতে রচিত হওয়ার ফলে গণনার তারতম্যে এই পার্থক্য ঘটে থাকতে পারে। সম্ভবত বলেন্দ্রনাথ লগ্নের অনৈক্য দেখেই সময়ের অনৈক্যের উল্লেখ করেছেন। যেহেতু জন্মলগ্ন জন্মসময় অনুসারেই নিরূপিত হয়।

৪. ইন্দিরা দেবী-সত্যেন্দ্রস্মৃতি : বিশ্বভারতী পত্রিকা ৩য় বর্ষ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২।

৫. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী : সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। ৪র্থ সং চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : পৃ. ৬৮

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত সাহিত্যসাধক চরিতমালা : ৬৭নং। অপিচ—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—বিশ্বভারতী পত্রিকা : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২।

৭. '১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর একটি কন্যা হয়—কন্যাটি অতি শিশু বয়সেই মারা যান। তারপর ১৮৩৯ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ, ১৮৪১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ এবং ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে হেমেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।' 'জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ী'—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃ. ২২।

জীবনকথা

প্রথম পর্ব ১৮৪২-১৮৬৪

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছিলেন অবিভক্ত ঠাকুরবাড়িতে। বৃহৎ পরিবারের একই কর্তা ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ। সকল ভাই তখন একান্নবর্তী ছিলেন। নীলমণি ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহের প্রাত্যহিক পূজার্চনা, দুর্গোৎসব, যাত্রার আসর যেমন বজায় ছিল, তেমনি 'বেলগাছিয়া ভিলায়' দ্বারকানাথের আমন্ত্রণে সাহেব মেমদের সমারোহপূর্ণ ভোজের ও বিরাম ছিল না।[১]

দ্বারকানাথের মধ্যমপুত্র গিরীন্দ্রনাথের স্ত্রী যোগমায়া দেবীকে সত্যেন্দ্রনাথেরা 'মেজকাকীমা' বলে ডাকতেন। মায়ের চাইতেও তাঁদের বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল এঁরই সঙ্গে। সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—একমাত্র অসুখের সময় মায়ের কাছে থাকতেন। অন্য সময় মাতৃস্থানীয়া মেজকাকীমার ঘরেই ছিল এঁদের 'আসল আড্ডা'। সেই ঘরটি একদিকে যেমন 'শিক্ষালয়' তেমনি ছিল 'বিশ্রাম-স্থান'। ছেলেদের সব আবদার তিনি রক্ষা করতেন।[২]

সত্যেন্দ্রনাথের শৈশবস্মৃতির মধ্যে দুই বিপরীত ঘটনার নিখুঁত চিত্র 'আমার-বাল্যকথা' গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। একটি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর নিদারুণ সংবাদের স্মৃতি—তার অনেকটাই শ্রুতি। অন্যটি পলতার বাগানে সমবেত উপাসনা ও বনভোজনের মাধ্যমে ব্রাহ্ম সম্মিলনের স্মৃতি।[৩] দুটি ঘটনার সঙ্গেই নৌযাত্রার স্মৃতি বিজড়িত।

অমিতব্যক্তিত্বশালী, দূরদর্শী, প্রখর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন দ্বারকানাথের মৃত্যুতে সুবৃহৎ ঠাকুর পরিবারে যে ভীষণ বিপর্যয়ের ছায়া নেমে এসেছিল, সততার পথে থেকে শক্ত হাতে হাল ধরে তাকে ঠিক রেখেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। ঝড়-ঝাপটার প্রবল দাপট বিশেষভাবে দেবেন্দ্রনাথের উপর দিয়েই গেছে। তাঁর পুত্রেরা তখনও শিশু।[৪] সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতির পটে দ্বারকানাথের ছবি ছিল অস্পষ্ট। তাঁর নিজের কথায়—"মনে পড়ে, তবে ঝাপসা ঝাপসা।"[৫] অতি শৈশবে তাঁর ঘরে একদিন ডেকে নিয়ে তিন ভাইকে কিছু দিয়েছিলেন—সে কথা বার্ধক্যেও 'আমার বাল্যকথা' লেখার সময় স্মরণ করেছেন।[৬]

বৈষয়িক বিপর্যয়

কারঠাকুর কোম্পানীর পতন, ইউনিয়ন ব্যাংক ফেল, উত্তমর্ণদের ঋণ পরিশোধের জন্য দেবেন্দ্রনাথের ব্যয় সংকোচ ইত্যাদি ঘটনাগুলি সত্যেন্দ্রনাথের শৈশবেই ঘটেছে।[৭] তবে পুত্রদের জীবন বিকাশে দেবেন্দ্রনাথের প্রখর দৃষ্টি ছিল বলেই প্রতিকূল কোন আবহাওয়াতেই তাঁরা বিপর্যস্ত হন নি। বাইরের বিলাসিতাকে তুচ্ছ করে আত্মিক শক্তিতে বড় হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মহর্ষির কাছ থেকে তাঁরা লাভ করেছিলেন।

জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দুরকম শিক্ষাই তাঁরা পিতার নির্দেশে লাভ করেছিলেন। একদিকে প্রাচীন সংস্কৃত ও মাতৃভাষার চর্চা, অন্যদিকে বিদেশীভাষার চর্চা, সেই সংগে পারিবারিক উপাসনার মাধ্যমে পুত্রদের চিত্তভূমি প্রসারণের পরিবেশ ও তিনি রচনা করেছিলেন।

বাড়ির দালানে গুরুমশায়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার পর বাগেশ্বর বিদ্যালংকারের[৮] কাছে সত্যেন্দ্রনাথের সংস্কৃতশিক্ষার পাঠ শুরু হয়। এঁর পাণ্ডিত্যের উপযুক্ত সার্টিফিকেট সত্যেন্দ্রনাথ দিতে না পারলেও গুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত উচ্চারণ-শুদ্ধির কথা সগৌরবে তিনি প্রচার করেছেন। দুই গুরুর মধ্যবর্তী 'ভবানীবাবু' নামে আর একজন গৃহশিক্ষকের উল্লেখও 'ছেলেবেলার কথা'য় পাওয়া যায়।[৯]

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর হেডমাস্টার ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের ইংরেজি শিক্ষক।[১০] তাঁর যত্নে ও উৎসাহে অতি কৈশোরেই সত্যেন্দ্রনাথের ইংরেজি শিক্ষার দৃঢ় বনিয়াদ রচিত হয়েছিল। ধীর শান্ত প্রকৃতির এই গৃহশিক্ষকের ঋণ সত্যেন্দ্রনাথ বারে বারে স্বীকার করেছেন। তাঁর মধ্যে এক 'মোহিনীশক্তি' ছিল, যা বালক সত্যেন্দ্রনাথকে সহজেই কাছে টানতো। স্কুলের পাঠ্য বই ছাড়াও আরও অনেক বই তিনি পড়তে দিতেন। ফলে কোনদিনই তাঁর অধ্যাপনা নীরস হয় নি। বাড়ির ছেলেদের ও অন্যান্যদের নিয়ে তিনি যে বক্তৃতাসভার[১১] আয়োজন করতেন—তাতে সত্যেন্দ্রনাথের ইংরেজি বলা কওয়ার জড়তা কেটে গিয়েছিল। তাঁর প্রেরণাতেই প্রেসিডেন্সি কলেজের এক সভায় সত্যেন্দ্রনাথ Heroism of Ancient India প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনও ঐ সভায় প্রধান বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন

একথা 'আমার বাল্যকথা' (পৃ. ৭২) গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। 'ছেলেবেলার কথা'য় ঐ সভাটিকে 'কেশববাবুদের সভা'ই বলেছেন।

সাত বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এখান থেকে মেধাবী ছাত্র হিসাবে পর পর দু বছর প্রাইজ পেয়েছিলেন। 'রবিনসন ক্রুসো' বইটি প্রাইজ পেয়ে বালক সত্যেন্দ্রনাথ যে উল্লসিত হয়েছিলেন তা নিজেই লিখে গেছেন।[১২] এখানে মেধাবী ছাত্র হিসাবে কেশবচন্দ্র সেনও পুরস্কৃত হয়েছেন, তবে তিনি তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন না।[১৩] এখানে দুবছর পড়ার পর কিছুদিনের জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ সেণ্ট পল্‌স স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। সে সময় হিন্দু কলেজের পরিচালন ব্যবস্থার গোলযোগও[১৪] এর কারণ হতে পারে সেণ্ট পল্‌স স্কুলে সহাধ্যায়ী ইংরেজ ফিরিঙ্গী আরমানী ছেলেদের সঙ্গে এক আধবার হাতাহাতি হলেও সত্যেন্দ্রনাথের পকেটে রাখা মশলা পাওয়ার লোভে অনেকেই তাঁর সঙ্গে ভাব রাখতো। এখানে শিক্ষক Pridham সাহেবের স্নেহ ও অনুগ্রহের কথা সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে ভাল ফলের জন্যে এখানেও তিনি Goldsmith-এর এক সেট বই প্রাইজ পেয়েছিলেন। চিরন্তন হিন্দু-প্রথা অনুসারে নয় বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়। সেণ্ট পল্‌স স্কুলে কিছুদিন থাকার পরে পুনরায় নবগঠিত হিন্দু স্কুলে[১৫] ফিরে আসেন। এখানেও ভাল ফল করায় এক বছর বর্ধমানরাজ প্রদত্ত সিনিয়র স্কলারশিপ (মাসিক ১০৲) পেয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষায় হিন্দু স্কুলের ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ঐ বছর এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের নাম উল্লেখ্য। উচ্চশিক্ষালাভের জন্য এর পর সত্যেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে রক্ষিত, ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পুরানো Attendance Register-এর ফটো কপিতে এখনও সত্যেন্দ্রনাথের নাম রয়েছে।[১৬]

১৮৫৬ সালে বিষয়সম্পত্তির নানা ঝঞ্ঝাটে দেবেন্দ্রনাথের মন জোড়াসাঁকো বাড়ি থেকে দূরে নির্জনে অধ্যয়ন ও উপাসনায় থাকতে আকুল হয়ে ওঠে। দূরে যাবার আগে কিছুদিন পদ্মানদীতেও তিনি চার পুত্রকে নিয়ে কাটিয়েছিলেন।[১৭] সুতরাং ঐ সময় কয়েকটা দিন সত্যেন্দ্রনাথেরা পিতার সান্নিধ্য-

লাভ করেছিলেন। পিতাও পুত্রদের বিদায়ের ক্ষণটিতে মহর্ষির স্নেহসিক্ত অন্তরের চিত্র সৌদামিনী দেবীর বর্ণনায় প্রকট হয়ে ওঠে।[১৮]

অমৃততীর্থের সন্ধানে প্রথমে[১৯] নদীপথে কাশী তারপর উত্তর ভারত হয়ে অমৃতসর ও বর্ষাধিক সিমলা শৈল যাপনের অপার্থিব আনন্দ ধারায় মহর্ষির হৃদয় সিঞ্চিত হয়েছিল তা লোকালয়ে পরিবেশনের আত্মিক তাগিদ অনুভব করেই তিনি আবার গৃহাভিমুখী হন। তাঁর ঘরে ফেরার কিছুদিন আগেই নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে।[২০] সত্যেন্দ্রনাথের ছোটকাকা নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে নিবিড়তা ছিল, তা 'আমার বাল্যকথা' গ্রন্থ থেকেই জানা যায়। একটি অধ্যায়ে শুধু তাঁর কথাই বলেছেন। বিশেষত নগেন্দ্রনাথের অসুস্থ অবস্থায় এড়েদহের বাগানে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন সেকথারও উল্লেখ করেছেন। ইতোমধ্যে দেবেন্দ্রনাথের অবর্তমানেই ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে কেশবচন্দ্র সেনের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হওয়া আদি ব্রাহ্ম-সমাজের একটি বিশিষ্ট ঘটনা।[২১] 'সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায়- "কেশবের আগমনে আমাদের সমাজে নবজীবনের সঞ্চার হল।"[২২] কেশবচন্দ্রের নিজ ভবনে প্রতিষ্ঠিত 'সংগত সভা'র[২৩] সংগে সত্যেন্দ্রনাথ-বীরেন্দ্রনাথ প্রমুখদের বিশেষ যোগ ছিল। এমনকি সত্যেন্দ্রনাথ একদিন দেবেন্দ্রনাথকেও 'সংগত সভা'র সভাপতিত্ব করতে নিয়ে[২৪] যান। কুলগুরুর কাছে মন্ত্রগ্রহণে কেশবচন্দ্রের মনের সংশয় ও ঠাকুর পরিবারে কিছুদিন তার সস্ত্রীক অবস্থানে, সম্পর্ক নিবিড়তর হয়ে ওঠে। তখন দেবেন্দ্রনাথের দুই বলিষ্ঠ বাহু—এই দুই উৎসাহী তরুণ—ব্রাহ্মসমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। একদিকে সমাজে দেবেন্দ্র-নাথের 'হৃদয়ভেদী প্রার্থনা', ব্রহ্মবিদ্যালয় পরিচালনায় কেশবচন্দ্রের উদ্যোগ, সেই সংগে নব নব ব্রহ্মসংগীতে ব্রাহ্মসমাজে নূতন জোয়ার এলো। বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে সংগীত পরিবেশনের জন্য বিষ্ণু সহ সত্যেন্দ্রনাথকে সংগে নিয়ে যেতে দেবেন্দ্রনাথের প্রবল ইচ্ছা জাগতো।[২৫]

সিংহল ভ্রমণ

১৮৫৯ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর সত্যেন্দ্রনাথকে সংগে নিয়েই দেবেন্দ্রনাথ সিংহল ভ্রমণে যান। সেই যাত্রায় বাড়ি থেকে লুকিয়ে কেশবচন্দ্রও এঁদের সহযাত্রী হয়েছিলেন। তাছাড়া এঁদের সংগে ছিলেন বাগবাজারের 'আমুদে

মজলিসী লোক' কালীকমল গাঙ্গুলী। ১৭৮১ শকের ১২ আশ্বিন যাত্রাশুরু হয় ও ২০শে কার্তিক শনিবার যাত্রা শেষ হয় [২৬] সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর দিনলিপিতে এই ভ্রমণকে 'প্রায় ৪০ দিনের কঠোর ব্রত' বলেছেন। কেশবচন্দ্র সেনও সিংহল ভ্রমণের দিনলিপি রেখেছিলেন তবে তিনি লিখেছিলেন ইংরেজিতে। (গদ্যরীতি অধ্যায় দ্র.)।

ব্রাহ্মসমাজে তরুণ প্রচারক

সিংহল থেকে ফিরে আসার পর, ১৮৫৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন। কেশবচন্দ্র সমাজের যুগ্ম সম্পাদক ও সত্যেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।[২৭] এই সময় সমাজের বেদী থেকে দেওয়া মহর্ষি'র উপদেশ অন্যান্যদের সাহায্যে লিখে রাখার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। 'ব্রাহ্মধর্মে'র ব্যাখ্যান' অনুলিখনে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভূত অবদান রয়েছে।[২৮] তাছাড়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ে মহর্ষি' যে দশ উপদেশে দিয়েছিলেন তা সত্যেন্দ্রনাথে প্রযত্নেই 'ব্রাহ্মধর্মে'র মত ও বিশ্বাস' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[২৯] এই সময় দুটি বিশিষ্ট ঘটনা সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে ঘটে। একটি বিবাহ অন্যটি মনোমোহন ঘোষ-এর ঠাকুরবাড়িতে আগমন। প্রথমটি তাঁর জীবনের ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে তাঁর জীবনের মোড় ফিরে গেছে।

বিবাহ

পরিবারিক প্রথামতো যশোর থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের পাত্রী মনোনীত হয়। জ্ঞানদানন্দিনীর পিতা অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কৃষ্ণনগরের কুলীন ব্রাহ্মণকুলে হলেও ঘটনাচক্রে যশোরের দক্ষিণদিহির পিরালী ঘরের কন্যা নিস্তারিণী দেবীর সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শ্বশুর গৃহ ছেড়ে অভয়াচরণের যশোরের নরেন্দ্রপুরে বসতি স্থাপন ও কলকাতায় এক জমিদারগৃহিনীর অনুগ্রহ লাভ, ভবিষ্যতে জ্ঞানদানন্দিনীকে পুত্রবধূ করার জন্য সারদাদেবীর নিকট সেই জমিদারগৃহিনীর প্রস্তাব ইত্যাদি কথা জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা (পৃ. ৮) থেকে জানা যায়। পরে অবশ্য ঠাকুরবাড়ির প্রথামত দাসী পাঠিয়ে পাত্রী মনোনীত করা হয়।

মহর্ষি'র পত্রাবলী থেকে জানা যায়, ১৭৮১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৩০] তারিখবিহীন এই সালটিকে ধরে ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সন্ধান করে সাহিত্য-সাধক-চরিতকার ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বিবাহ হয়েছিল—এই ধারণা করেছেন।[৩১] ইন্দিরা দেবীর বক্তব্যেও পিতামাতার বিবাহের শুধু সালের উল্লেখ আছে।[৩২] সত্যেন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৭ বৎসর পূর্ণ হয়ে কয়েক মাস হয়েছে অর্থাৎ আঠারো। আর অষ্টম বর্ষে গৌরীদানের প্রশস্ততর প্রচলিত[৩৩] সময়েই জ্ঞানদানন্দিনীর বিবাহ হয়েছি। কন্যাকে গৌরীদানের যে ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা অভয়াচরণের মনে ছিল, তার পুণ্যফল জাগতিক জীবনেই অভয়াচরণ ভোগ করে গেছেন ; কন্যা-জামাতার কাছে যতটুকু প্রাপ্য, তার চেয়ে তিনি অনেক বেশিই পেয়েছেন। (দ্র. পরিজন পরিবেশে অধ্যায়)।

মনোমোহন ঘোষ

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বন্ধু রামলোচন ঘোষ-এর পুত্র মনোমোহন ঘোষ ১৮৫৯ সালে কৃষ্ণনগর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে আসেন। পৈতৃক বন্ধুত্বসূত্রে খুব সম্ভবত ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঠাকুর বাড়িতে থাকতে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তিনি ঠাকুর বাড়িতে এমনি আসর জমিয়ে ছিলেন যে তিনি চলে যাওয়ার পরও অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর ঘরটিকে 'মনোমোহনের ঘর'[৩৪] বলা হতো।

১৮৬১ সালের গ্রীষ্মাবকাশে কৃষ্ণনগরে মনোমোহনের পৈতৃক বাড়িতে সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বেড়াতে আসেন। তাঁর স্নেহময় পিতা রামলোচন ঘোষ-এর সরল ব্যবহার ও তাঁর গৃহে ঐ সময়ের সুখময় আতিথেয়তার স্মৃতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে স্মরণ করেছেন। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে নৈশভোজনে ও 'শ্রীবন'[৩৫] অভিযান সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃত আনন্দ পেলেও বন্ধুগৃহে শুধুমাত্র সুখের অবকাশ যাপন করেই তিনি কালক্ষেপ করেন নি। তিনি ও কেশবচন্দ্র যে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের কার্যভার নিয়ে এসেছিলেন সেকথা বিস্মৃত হন নি। কৃষ্ণনগরের অধিবাসীদের মধ্যে কুসংস্কার দূর করে ব্রাহ্মধর্মের উদার ভাব প্রজ্বলিত করতে তাঁরা কিছুটা সফল-

কামও হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের জ্বালাময়ী বক্তৃতার[৩৬] কথাও সত্যেন্দ্রনাথের পত্র থেকে জানা যায়। পাদ্রী ডাইসনের মত খণ্ডনের জন্য তাঁরা যে নদীয়ার পণ্ডিতদের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন তা মহর্ষিকে লেখা কেশবচন্দ্রের পত্রেও জানা যায়।[৩৭]

সত্যেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে জীবন আত্মোৎসর্গ করবেন, সেসময় মনে মনে এটিই ভেবেছেন। 'জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথায়'ও এর সমর্থন রয়েছে।[৩৮]

কিন্তু মনোমোহন ঘোষ-এর পরিকল্পনা সব কিছু উল্টে দিল। বিলাতে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার কথা তিনি ভাবছিলেন। এ-বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথকেও তিনি উৎসাহিত করেন। কৃষ্ণনগর থেকেই এ বিষয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন। মনোমোহন ঘোষ-এর বাড়িতে যে 'দীর্ঘ তরুবীথির[৩৯] ছায়ায় দুজনে পায়চারি' করতে করতে বিলাতে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন— কালের পৃষ্ঠায় অনেক পরিবর্তন হলেও সে 'তরুবীথি' এখনও অক্ষত রয়েছে।[৪০] দুই তরুণের বিদেশ যাত্রায় মহর্ষি প্রথমে নিমরাজি ছিলেন। অবশেষে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল ইচ্ছা দেখে তিনি মত দিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে একদিন কলকাতায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে দুজনের নৌকাডুবির ঘটনায় তিনি আরও শঙ্কিত হয়ে পড়েন। যাই হোক্ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকরুণার উপর নির্ভর করেই যে তিনি যাত্রা করিয়ে দেন তা সত্যেন্দ্রনাথের বিলাতে গমনের পূর্ব রাত্রিতে দেওয়া মহর্ষির উপদেশ থেকে জানা যায়। (তত্ত্ববোধিনী, ১৮৪৭ শক আশ্বিনে প্রকাশিত।) মনোমোহন ঘোষের আগমনে, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকের পথ থেকে এই মোড় ফেরার কাহিনী সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্যকথা' গ্রন্থে বলেছেন 'যেন একটা বোমা আকাশ থেকে পড়ে সব ভেঙে চুরে দিয়ে গেল'। (পৃ. ৮৫) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসী বাঙ্গালী'তে[৪১] এবিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের ইংরেজিতে লেখা Auto-biographical Notes and Reminiscences— থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর লেখায়—"১৮৬০ অব্দে মনোমোহন ঘোষ কলকাতায় আসিয়া ইঁহাদের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে বাস করেন। উভয়ের সাক্ষাতে পরিচয় এবং পরিচয়ে বন্ধুত্ব ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই সাক্ষাতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। ...একথা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন।—'I was

শ্রীবন
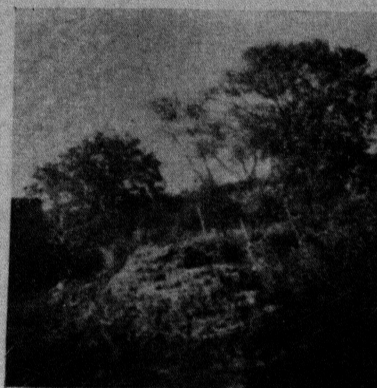
অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ

শরণার্থীদের নতুন আবাদ

carried away by a degree of zeal and enthusiasm which makes me think that I should have turned a Brahmo Missionary if circumstances had not conspired to divert the current to other channels. The event that brought about the change was my meeting the late Monomohan Ghose.'—p. 2. *Autobiographical Notes and Reminiscences.* Calcutta 1st August, 1897".

সমুদ্রযাত্রা ও পথের স্মৃতি

১৮৬২ সালের ২৩শে মার্চ 'পি এ্যাণ্ড ও' কোম্পানীর কলম্বো' জাহাজে চড়ে 'গার্ডেনরীচ' থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমোহন ঘোষ বিলাত যাত্রা করেন। যাত্রাপথে লেখা দুই বন্ধুর পত্র, এই তারিখটি প্রমাণিত করে।[৪২] জাহাজঘাটে যাঁরা বিদায় জানাতে এসেছিলেন, এঁদের মধ্যে দুজনেরই একান্ত সুহৃদ গণেন্দ্রনাথ ছিলেন। গণেন্দ্রনাথ কিছু দূর পর্যন্ত তাঁদের এগিয়ে দিয়ে আবার ফিরে যেতে পারতেন। স্যার বার্টল ফ্রেমর[৪৩] তাই করেছেন। এ নিয়ম আগে জানতে না পারায় মনোমোহন খুবই আক্ষেপ করেছেন।[৪৪] সত্যেন্দ্রনাথের মনে সমুদ্রপীড়ার আশঙ্কা আগেই ছিল। কারণ কিছুদিন আগেই সিংহল ভ্রমণে গিয়ে সমুদ্রপীড়ার মুখোমুখি হয়েছিলেন। বাইরে সূর্যকিরণের ঝিকিমিকি ও সাগরজলে নানা রঙের খেলা, এ সব কিছুই দেখা হলো না, লেখা হলো না একটা সুন্দর চিঠি দ্বিজেন্দ্রনাথকে। মাদ্রাজ পেঁছে কোনোরকমে দ্বিজেন্দ্রনাথকে 'সমুদ্র-পীড়া-দানবে'র হাতে নিজেদের অসহায় অবস্থার বিবরণ দিয়ে চিঠি দিয়েছেন।[৪৫] কলকাতা থেকে 'গাল' এ পৌঁছতে ৮ দিন লেগেছে। জাহাজের একঘেয়ে কেবিন ছেড়ে 'গাল' এর 'সি-ভিউ' হোটেলে নেমে মাটির স্পর্শ পেয়ে এঁদের হৃদয় পুলকিত হয়েছে। সভ্যতার চাপে পড়ে রামায়ণের স্বর্ণলঙ্কার কোথাও কিছু অবশিষ্ট নেই— একথা মনোমোহন সকৌতুকে গণেন্দ্রনাথকে লিখেছেন।

গাল থেকে এডেন দশ দিনের একটানা ক্লান্তিকর পথ সমুদ্রপীড়ার প্রকোপ কমে যাওয়ায় ডেকে দাঁড়িয়ে দূরের দ্বীপপুঞ্জের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ পিতাকে চিঠি লিখেছেন কখনও বা মনে হয়েছে ঐ নির্জন দ্বীপে যদি একা গিয়ে উপস্থিত হন, তবে রবিনসন ক্রুসোর মতোই তাঁর অবস্থা হবে।[৪৬]

আরব সাগরের বুকে যে কলম্বো জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধু প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্যসুধায় নিমগ্ন থেকেছেন—কে জানতো মাত্র কয়েক মাস পরেই এই আরব সাগরেরই বুকে মিনিকয় দ্বীপের সংগে সংঘর্ষে 'কলম্বো' জাহাজ তলিয়ে যাবে। (পত্র : মনোমোহন ঘোষ ; ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৬২।)

এডেন থেকে সুয়েজ পাঁচ দিনের পথ। সুয়েজ পর্যন্তই কলম্বো জাহাজের সীমা। সুয়েজ বন্দর চারদিকে শুধু বালির পাহাড় আর জীর্ণ প্রাসাদ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পড়ার মতো কিছু নেই, মনে রাখার মতো শুধু একটা জিনিসই ছিল— সেটি খুব মিষ্টি রসালো কমলালেবু। যে রেস্তোরাঁয় দুই বন্ধু ঢুকেছিলেন তার সাজসজ্জা সতেন্দ্রনাথের খুবই ভালো লেগে ছিল।[৪৭] সুয়েজে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েই কায়রো যাবার ট্রেনে চাপতে হয়েছে। বাংলা দেশের শ্যামলমৃত্তিকায় বর্ধিত এই দুই তরুণের চোখে কায়রোগামী রেলভ্রমণ চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিলো।[৪৮] বালুকা-সমুদ্রের উত্তপ্ত আবহাওয়া দুজনকে শ্রান্ত অবসন্ন করে তোলে। সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিতে মরুযাত্রার এই ছবি প্রত্যক্ষ হয়ে ধরা দেয়।

কায়রোতে নেমে সেপার্ড'স হোটেলে অন্যের জন্য রাখা একটা ঘর বিশ্রামের জন্য যাও বা মিললো— জিনিসপত্র গুছিয়ে বসার পরেই ঘরের দাবিদার এসে উপস্থিত। অগত্যা হোটেলের বারান্দার কোনে আশ্রয় নিতে হলো। দুজনেই ধনী পরিবারের সন্তান। কষ্টে অসুবিধায় অভ্যস্ত নন। আজন্ম সুখে লালিত হলেও, অবস্থার সংগে মানিয়ে চলার অসাধারণ গুণ সত্যেন্দ্রনাথের ছিল। বাইরে রাত কাটানো ছাড়া যখন গত্যন্তর নেই তখন ভ্রূকুটিওয়ালা পাহারাদারকে সামনে রেখেই চুপচাপ রাতটা কাটিয়ে দেওয়া তিনি শ্রেয় মনে করলেন। মনোমোহন সতেন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। ঐ বয়সেই মনোমোহন Indian Mirror পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার নিয়েছিলেন বলে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রচুর প্রশস্তি করেছেন,[৪৯] তথাপি সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি থেকেই মনে হয় মনোমোহন কিছুটা অস্থির ও খুঁতখুঁতে ছিলেন সেজন্য ঐ সময় পথে চলতে পথের দুর্ভোগের মাত্রা মনোমোহনকেই বেশি পোহাতে হয়েছে। 'সেপার্ড'স হোটেলে' পরামানিকের জন্য অস্থিরতা ও অবশেষে নাজেহাল হওয়া ইত্যাদি ঘটনায় তা বোঝা যায়। (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র : ১০ই জুন।)

আলেকজান্দ্রিয়া স্টেশনে নেমে কোন যানবাহন না পাওয়াতে গর্দভচালক-

দেরই আশ্রয় নিতে হয়েছে। এই জন্তুটির পিঠে চড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা যে এমন মর্মান্তিক হবে তা তাঁরা ভাবতে পারেন নি। প্রবল অনিচ্ছা নিয়ে মনোমোহনকেও চড়তে হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে চিঠিতে দুই বন্ধুর দুর্দশার কথা লিখেছেন। জন গিলপিনের মতো মনোমোহনের কাহিল অবস্থা পাঠকের হাস্যোদ্রেক না করে পারে না।[৫০]

আলেকজান্দ্রিয়া হোটেলে ফরাসী রীতিতে খাদ্য পরিবেশনের সংগে দুজনের পরিচয় ঘটে। প্রতিবারে নূতন খাদ্য পরিবেশনের সংগে নূতন ডিস। এতে খাদ্য পরিবেশনে যতটুকু দেরী হচ্ছিল—ততটুকু সহ্য করার মতো অবস্থা তাঁদের ছিল না।

পরদিন ভোরে উঠে ইউরোপগামী জাহাজে চড়বার আগে একবার আলেকজান্দ্রিয়া শহরটাকে দেখে নিলেন। যেখানে ইউরোপীয়দের বসতি তা খুবই সাজানো গোছানো।

ইতিহাস-প্রিয় সত্যেন্দ্রনাথ ধর্মান্ধতার ফলে জগদ্বিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া পুস্তকালয় ধ্বংসের জন্য চিঠিতে ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারেন নি।[৫১]

বেলা দুটোয় আলেকজান্দ্রিয়াকে বিদায় জানিয়ে—ইউরোপগামী 'পেরা' জাহাজে উঠলেন। এটি 'কলম্বো' জাহাজ থেকে অনেক বড়। খেলাধুলা—অপর্যাপ্ত খাদ্যের সমারোহ ও বুদ্ধোন্মাদনাপূর্ণ যন্ত্রসংগীতে যাত্রীদের মন ভরিয়ে রাখবার প্রচুর উপকরণ ছিল। সাহেবদের সংগে "মাংকি ইন দি স্লিং" খেলায় সত্যেন্দ্রনাথের বারেবারে ভাইদের মধ্যে কুস্তিতে সেরা হেমেন্দ্রনাথকে মনে হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দুর্বল থাকায় তাঁর প্রতিপক্ষকে হার মানানো তাঁর পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হতো না।

এত সমারোহের মধ্যেও স্নানের কষ্টে সত্যেন্দ্রনাথ পীড়িত বোধ করেছেন। বিশেষত এ ব্যাপারে সহযাত্রীদের অসহিষ্ণু আচরণ কোন কোন সময় তাঁর কাছে অমার্জিত বলে মনে হয়েছে।[৫২]

ভূমধ্যসাগরীয় মনোরম আবহাওয়ায় এ জাহাজে তাঁরা ভালই ছিলেন। মাল্টায় জাহাজ প্রথম ইয়োরোপের মাটি স্পর্শ করলো। এরপর জিব্রাল্টার হয়ে বিস্কে উপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে দিয়ে 'পেরা জাহাজ এগিয়ে চললো। ১লা মে ১৮৬২তে 'পেরা' জাহাজে থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছেন তাতে ২রা মে, ভোরে সাউদাম্‌-টন পৌঁছাচ্ছেন একথার উল্লেখ

আছে। আবার ঐ চিঠিতেই পুনশ্চ দিয়ে লেখা আছে কুয়াশার জন্য জাহাজের পৌঁছতে দেরী হবে[৫৩] জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগে আগেই পত্রে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি সাউদাম্‌টনে যথাসময়ে উপস্থিত ছিলেন। অজানা পরিবেশে পরিচিত মুখ দেখে মনে নূতন উদ্যম এল—নব উৎসাহে দুই তরুণ বিদেশের মৃত্তিকায় প্রথম পদক্ষেপ করলেন। সাউদাম্‌টন থেকে থেকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর এঁদের লণ্ডনে নিয়ে এলেন। প্রাক্‌-সুয়েজ খাল যাত্রা পথে বিলাতে পৌঁছতে এঁদের ১ মাস ১০ দিন লেগেছিল—মনোমোহনের ১৭ই মে'তে (১৮৬২) লেখা পত্র থেকে জানা যায়[৫৪] ২৩শে মার্চ যাত্রা শুরু হয়েছিল। সুতরাং ২রা মে'তে ১ মাস ১০ দিন পূর্ণ হবার কথা।

বিদেশের মাটিতে

পশ্চিম লণ্ডনে, ৩৮নং কেনসিংটন পার্ক গার্ডেন্‌সে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে ও‍ঁরা প্রথম উঠলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের স্ত্রী কমলা ও দুই কন্যা এঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। একদিন এখানে বিশ্রাম নিয়ে পরদিন ৯নং নাটিং হিল টেরেস-এর লজিং হাউসে দুই বন্ধু উঠে যান।[৫৫] এখানে গুছিয়ে বসবার একদিন পরেই হজ্‌সন প্র্যাট তাঁর ব্রাইটনের বাড়িতে দুজনকে বেড়াতে নিয়ে যান। ব্রাইটনের সমুদ্র উপকূলে ও বর্জেস পল্লীতে মনের[৫৬] আনন্দে তিন দিন কাটিয়ে ৮ই মে বিকেলে আবার তাঁরা ৯নং হিল টেরেসেই যে ফিরে আসেন, তা সত্যেন্দ্রনাথের (৯ই মে ১৮৬২ তারিখের) পত্র থেকে জানা যায়।[৫৭] ঐ সময় স্থায়ী ভাবে কোন্‌ ছাত্রাবাসে থাকা এঁদের পক্ষে উপযোগী হবে সে সম্পর্কে হজ্‌সন প্র্যাট, রাখালদাস হালদার প্রমুখেরা চিন্তা করেছেন। কারণ ইয়োরোপীয়ান ছাত্রাবাসে গ্রীক লাটিন পড়ানো হতো। এঁদের প্রয়োজন ছিল এমন ছাত্রাবাসের যেখানে আরবী ও সংস্কৃত পড়ানো হয়। এদিকে কোন প্রাইভেট পরিবারে থাকাও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মনঃপূত ছিল না। সকলে মিলে বিভিন্ন দিকে খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। কোন ছাত্রাবাসে স্থায়ীভাবে ঢোকার আগে দুজনকে দ্রষ্টব্য স্থানগুলো একবার দেখিয়ে নেবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন উদ্যোগী হন ও বৃটিশ মিউজিয়ম, ক্রীস্‌ট্যাল্‌ প্যালেস প্রভৃতি দেখাতে নিয়ে যান। ক্রীস্‌ট্যাল প্যালেস-এ স্পেন-এর আল্‌হামরা

কোর্টের মডেল, গরম জলের ফোয়ারা, কৃত্রিম ট্রপিক্যাল অঞ্চল ও মুকুলিত আম্রবৃক্ষ দেখে দুজনে বিস্মিত হয়েছেন।[৫৮]

১৮৬২র মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যেদিন 'কেনসাল গ্রীণ' সমাধিক্ষেত্রে দ্বারকানাথের সমাধি দেখতে যান, সেদিন দলের সঙ্গে হজসন্ প্র্যাটও ছিলেন। বিদেশের নয়নাভিরাম সুউচ্চ প্রাসাদ ও উদ্যান দেখে এঁরা আশা করেছিলেন, দ্বারকানাথের সমাধিও সুন্দর উদ্যানে শুভ্র মর্মর ফলকে সজ্জিত থাকবে। কারণ দেবেন্দ্রনাথ পিতার সমাধি বেদী নির্মাণের জন্য বিদেশে প্রচুর অর্থ পাঠিয়েছিলেন।[৫৯] কিন্তু সমাধি-বেদীমূলে এসে দুজনেই মর্মাহত হলেন। যে পুরুষসিংহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এঁদের বিদেশে আগমন—তাঁরই সমাধির দৈন্যদশা দেখে দুজনেই ক্ষুব্ধ হলেন। এঁদের কল্পনার সুন্দর সমাধি বেদী কোথায়? দেশে থাকতে নবীনবাবু[৬০] যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার সঙ্গেও অন্তত মিল থাকা উচিত ছিল। রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনে দেখলেন অতি সাধারণ একটি তিন কিউবিট লম্বা প্রস্তর ফলক—তাতে লেখা—

D. T. Dwarakanath Tagore of Calcutta
Absit lst August 1846

প্রস্তর ফলকটি শেকল দিয়ে ঘেরা। চারকোনে চারটি সাইপ্রেস গাছ—যার মধ্যে দুটো গাছ তখনই অযত্নে মরো মরো হয়েছে। তবুও সেই পুণ্যভূমির সাইপ্রেস পত্রগুচ্ছ তাঁরা পরম শ্রদ্ধায় তুলে নিয়ে এলেন।

১৭ই মে ১৮৬২ তে গণেন্দ্রনাথকে লেখা মনোমোহনের চিঠিতে দেখা যাচ্ছে চিঠির ভাঁজে করে তা তাঁরা কলকাতায়ও পাঠিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রেরিত অর্থের উপযুক্ত তদন্তের আবশ্যক—এবিষয়ে হজসন প্র্যাট ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বিশেষ জোর দিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে বাংলায় স্মৃতি ফলকের উপযুক্ত কোন রচনা, ও কিছু অর্থ পেলে নূতন করে ঐ সমাধি বেদীর সংস্কার সাধন করে, দ্বারকানাথের পঞ্চদশ মৃত্যু তিথিতে নূতন স্মৃতিফলক স্থাপনে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। লণ্ডন নগরে অবস্থিত দ্বারকানাথের গুণগ্রাহীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানিক ভাবে স্মৃতি-ফলক স্থাপনে জ্ঞানেন্দ্রমোহনও উৎসাহী ছিলেন। এ ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথকে অবহিত করার

জন্য দুজনে গণেন্দ্রনাথের উপর নির্ভর করে ছিলেন।[৬১] শেষ পর্যন্ত এ বিষয় কতদূর অগ্রসর হল সে সম্পর্কে কোন চিঠি আমাদের চোখে পড়ে নি।

প্রসংগত শ্রীঅমিতাভ গুপ্ত কেনসাল গ্রীণ সমাধির সরকারী নথিপত্র থেকে দ্বারকানাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে প্রতিলিপি পরিবেশন করেছেন—তাতেও অতি সাধারণ 'ইঁটের কবর ও গ্র্যানাইটের স্মৃতি-ফলক'-এর নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে।[৬২]

পরবর্তী কালে যে এর দৈন্যদশা কিছুটা ঘুচেছে তা সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন।[৬৩]

১৮৬২ সালের আগস্টেই দ্বারকানাথের স্মৃতিবিজড়িত Worthing এ সত্যেন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন। সমুদ্রসৈকতের এই স্থানটিতে দ্বারকানাথ জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলেন। পরে অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে লণ্ডনে স্থানান্তরিত করা হয়।[৬৪] সেজন্যই Worthing বন্দর সত্যেন্দ্রনাথের কাছে 'তীর্থস্থানের' মতো মনে হয়েছে। (আমার বাল্যকথা পৃ. ১০) ডা. মার্টিনের নির্দেশ হাওয়াবদল করতে ২৭শে জুন (১৮৪৬ খ্রী.) দ্বারকানাথ এখানে এসেছিলেন ও Marine Hotel-এ উঠেছিলেন। এই হোটেলে এসে খোঁজ খবর নিয়ে দ্বারকানাথের বিষয়ে অনেক কথা জেনেছেন। ১৭ জন অনুচর নিয়ে দ্বারকানাথের সমারোহপূর্ণ জীবনযাত্রা—তার মধ্যে পঞ্চ সহচরের অনুক্ষণ সান্নিধ্য, বিভিন্ন ভোজসভার আয়োজন, সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্যকথা'য় যে ভাবে বর্ণনা করেছেন—তার সংগে ১৮৬২ সালের ২৫শে আগস্ট Worthing থেকে গণেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর পত্রের সম্পূর্ণ মিল আছে। শুধু মাত্র এক স্থানে সামান্য পরিবর্তন চোখে পড়ে। 'আমার বাল্যকথা'র বর্ণনায় জানা যাচ্ছে হোটেলের মালিক একজন 'সাহেব'।[৬৫] কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের পত্রে দেখা যাচ্ছে হোটেলের মালিক একজন ভদ্রমহিলা। ঐ পত্রে আরও জানা যায় এই প্রোপ্রাইট্রেস-এর ভগিনী Mrs. Browne ছিলেন তখন হোটেলের মালিক। অসুস্থ দ্বারকানাথ প্রতিদিন তাঁরই সংগে এক গ্লাস পানীয় গ্রহণ করে কিছুক্ষণের জন্যও শান্তি পেতেন।[৬৬]

ওয়ারদিং থেকে বিদায়

২রা সেপ্টেম্বর ওয়ারদিং-কে বিদায় জানিয়ে দুই বন্ধু নূতন ছাত্রাবাসের

উদ্দেশে রওয়ানা হন।[৬৭] ১৮৬২'র ১লা সেপ্টেম্বর থেকেই 'Windsor' এর নিকটবর্তী হারমণ্ডস্‌ওয়ার্থের ছাত্রাবাসে এঁদের সীট বুক করা হয়।

ছাত্রাবাস

সম্ভ্রান্ত বংশীয় Dr. Giles (Gibs ?) তাঁর নিজ গৃহেই এই ছাত্রাবাস খুলেছিলেন। তিনি নিজেই ইংরেজি পড়াতেন, এছাড়া সংস্কৃত আরবী ও ও ফরাসী ভাষার জন্য অন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। 'Dr. G' র মেজাজ কিছু রুক্ষ ছিল। প্রায়ই স্ত্রীর সংগে কথা কাটাকাটি হতো। তবে গৃহের শ্রীস্বরূপা ছিলেন 'Dr. G' র কুমারীকন্যা। সমস্ত অশান্তির তিনিই প্রতিবিধান করতেন। পড়াশুনার ফাঁকে যা একটু সময় পাওয়া যেতো, এই শান্তস্বভাবা কন্যার সংসর্গে আনন্দেই তাঁদের দিন কেটেছে।[৬৮]

শহরের কোলাহল থেকে দূরে পল্লীপ্রকৃতির নিস্তব্ধ ক্রোড়ে এই ছাত্রাবাসে থেকে সত্যেন্দ্রনাথ পড়াশুনার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছিলেন। ভোরে উঠেই স্নান, প্রাতঃভ্রমণ, দুগ্ধপান ইত্যাদি অভ্যাসগুলি এখানে বজায় রেখেছিলেন। তার ফলে অধিক পরিশ্রমেও সত্যেন্দ্রনাথের শরীর ভেংগে পড়েনি বরং আরও ভাল হয়েছিল। সে তুলনায় মনোমোহন কিছুটা গৃহের জন্য আকুল হয়ে পড়েছিলেন।[৬৯] বিদেশের খাদ্য ভাল না লাগলেও ওদেশের পক্ষে উপযোগী বলেই সত্যেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছেন—"এখানে আমাকে কেহ কারি ভাত করিয়া দিলেও আমি তাহা খাইতে ভালবাসি না।" (১১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৩)। প্রথম দিকে মনোমোহনের চিঠিতে এর বিপরীত সুর শোনা যাচ্ছে।[৭০] দেশের জন্য তীব্র আকুলতা সত্যেন্দ্রনাথও অনুভব করেছেন, তথাপি সংকল্প সাদ্ধর কথা আগে ভেবে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। ইংলণ্ডের পল্লী প্রকৃতির কোন কোন স্থানে স্বদেশের অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখে পুলকিত হয়েছেন। ক্ষেতের কাজে কৃষকদের অশ্বচালনা ও মাথার টুপি ইত্যাদিতেই যা একটু বিদেশ মনে হয়—দূর থেকে দেখলে কখনো তা স্বদেশের প্রতিরূপ বলেই তাঁর মনে হয়েছে। দেশে ফেরার আনন্দময় মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষা করেই যেমন চিঠিতে লিখেছেন—"সোনার ভারতবর্ষ, আবার কবে সেখানে গিয়া তোমাদের সকলকে দেখিব" (১১ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৩) তেমনি ইংরেজজাতির

স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন স্পৃহার প্রশস্তি না করে পারেন নি।[৭১] প্রথমে অসুবিধে হলেও সেগুলি সানন্দেই অনুসরণ করেছেন। মনোমোহনের ও ধীরে ধীরে অভ্যস্ত না হয়ে উপায় ছিল না। ১৮৬২'র সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ১৮৬৩'র জুনের প্রথম পরীক্ষা পর্যন্ত একটানা এই ছাত্রাবাসেই ছিলেন। ১৮৬২তে শুধু ডিসেম্বরের বড় দিনের সময় থেকে একপক্ষ কাল মতো এঁদের বাইরে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এ সময় বড়দিনের উৎসবে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের বাড়িতে,[৭২] সপ্তাহখানেক আবার ব্রাইটনে[৭৩], দিন তিনেক হার্সেল ভবনে ও অন্যান্য স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তাঁরা ছাত্রাবাসে ফিরেছেন তা মনোমোহনের ১৯শে জানুয়ারীর (১৮৬৩) পত্রে জানা যায়। প্রথম পরীক্ষার পর দুই বন্ধু ইয়োরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। প্যারিসে থাকার সময় সত্যেন্দ্রনাথের পাশের খবর ও মনোমোহনের ব্যর্থতার খবর আসে।[৭৪] সত্যেন্দ্রনাথের কাছে তা 'হরিষে বিষাদ' মনে হলো। এমন অবস্থায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্ফূর্তি আনতে ভ্রমণপর্ব শেষ করার দিকেই মনোনিবেশ করা সত্যেন্দ্রনাথের শ্রেয় বলে মনে হলো। তাঁর নিজের কথায়— 'তখন আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি—আমাদের ব্রত উদ্‌যাপন করা প্রথম কাজ'।[৭৫]

প্যারিস থেকে জেনেভা; লজেন, যেখানে গিবন তাঁর রোম সম্রাজ্যের ইতিহাস লিখেছেন; চিলন দুর্গ—বায়রণের কবিতায় যা বর্ণিত; রিগির পাহাড় থেকে নয়নাভিরাম উদয়াস্তের শোভা; সুইজাল্যাণ্ডের ধবলগিরি মঁ ব্লাঁ (Mont Blanc) র অধিত্যকা প্রদেশের পল্লীভূমিতে অবস্থান, অবশেষে লুসার্ন সরোবরের উপর স্টীমার পরিভ্রমণের বিচিত্র চিত্র 'আমার বাল্যকথা' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই এঁকেছেন (পৃ. ৯০-৯১)।

ভ্রমণ শেষে এবারে দ্বিতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য লণ্ডনের গর্ডন স্কোয়ারে 'য়ুনিভার্সিটি হল'এর ছাত্রাবাসে উঠলেন। এই ছাত্রাবাসে এসে সত্যেন্দ্রনাথ পারিবারিক শৃঙ্খলার অভাব অনুভব করেছেন। বারে বারে পল্লীর প্রথম ছাত্রাবাসের কথা তাঁর মনে হয়েছে। প্রিন্সিপালের সংগে খাওয়ার টেবিলে ছাড়া আর দেখা হতো না। ১৮৬০-এর জুলাইয়ের দ্বিতীয় পরীক্ষা পর্যন্ত এই ছাত্রাবাসেই ছিলেন।

১৮৬৪ সালের শেষভাগে সত্যেন্দ্রনাথ দেশে ফিরেছিলেন—একথা নিজেই লিখেছেন।[৭৬] স্পষ্ট তারিখ তিনি উল্লেখ না করলেও বিভিন্ন পত্রাবলী

থেকে ১৮৬৪-র অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় নিরূপণ করা যায়।

দ্বিতীয় পরীক্ষা দিয়ে ১৮৬৪'র ২রা জুলাই জ্ঞানদানন্দিনীকে সত্যেন্দ্রনাথ যে পত্র লিখেছেন তাতে ১৮৬৪'র সেপ্টেম্বরে সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশাভিমুখী জাহাজে থাকবেন একথা স্পষ্ট জানা যায়।[৭৭]

১৮৬৪'র ১৮ই অক্টোবরে লণ্ডন থেকে সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত মনোমোহনের পত্রে অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে সত্যেন্দ্রনাথের জাহাজ বঙ্গোপসাগরে পৌঁছবার সম্ভাব্য সময়ের উল্লেখ আছে। দু এক দিনের মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথ ঘরে ফিরবেন—মনোমোহন তা আশা করেছেন[৭৮] মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছে ভার্সাইতে পরম আনন্দে কাটিয়ে লণ্ডনে ফিরে এসেই মনোমোহন সত্যেন্দ্রনাথকে এই পত্র লিখেছেন। ভার্সাইতে মাইকেল মধুসূদন ও মনোমোহনের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের কথা আলোচনা হয় ও তাঁরা দুজনে যেখানে বেড়াতে গেছেন সে স্থান সত্যেন্দ্রনাথেরও পরিচিত ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখও এই পত্রে আছে[৭৯]

ভার্সাই থেকে বিদ্যাসাগরকে লেখা মধুসূদনেরও ১৮ই সেপ্টেম্বরের (১৮৬৪) পত্রে তাঁর চিঠি পৌঁছবার কয়েকদিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর সত্যেন্দ্রনাথকে স্বদেশে দেখতে পাবেন একথার উল্লেখ আছে[৮০] তাঁর সম্পর্কে মধুসূদনের একটি সনেট :

সুরপুরে সশরীরে শূর-কুল-পতি
অর্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে
ফিরিলা কানন-বাসে ; তুমি হে তেমতি,
যাও সুখে ফিরে এবে ভারত-মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশালতা তব ফলবতী !—
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভবতলে !

* *যাও দ্রুতে, তরি
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে !
অদৃশ্য রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গলক্ষ্মী ! যাও, কবি আশীর্বাদ করে ![৮১]

মধুসূদনের পত্রে বারে বারে সত্যেন্দ্রনাথের উল্লেখ থেকে তাঁর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর জয়ের পথে মধুসূদনের অজস্র শুভকামনা উৎসারিত হয়েছে এই সনেটে।

প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ানের সম্বর্ধনা ঃ সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথের স্থান ঃ পরীক্ষার নিয়ম পরিবর্তন।

সত্যেন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য (১৮৬৪ সালের নভেম্বরে) বেলগাছিয়া উদ্যানে দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল তাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও উপস্থিত ছিলেন। সাহিত্যসাধক-চরিতমালায় পরিবেশিত তথ্যে জানা যায় সেখানে বিদ্যাসুন্দর ও রামপ্রসাদী গানেরও ব্যবস্থা হয়েছিল।[৮২] ঐতিহ্যপূর্ণ বেলগাছিয়া বাগান হস্তান্তরিত হওয়ায় 'আমার বোম্বাই প্রবাস' লেখার সময়ও সত্যেন্দ্রনাথ খেদ প্রকাশ করেছেন।[৮৩]

সেবারে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১৮৯ জন। সাহিত্যসাধক চরিতকার—পরিবেশিত তথ্যে জানা যায় ৫০ জন মনোনীত হয়েছিলেন[৮৪] প্যারিস থেকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের ১৮ই আগস্ট ১৮৬৩'র পত্রে 'ষাট জন… পরিগৃহীত হইয়াছে' একথার উল্লেখ আছে। সত্যেন্দ্রনাথের স্থান ৪৩ হলেও অবস্থা বিবেচনায় তিনি অখুশী হন নি তা প্যারিস থেকে গণেন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর পত্রে জানা যায় [দ্র. ৭৪নং পাদটীকা]। আরবী ও সংস্কৃত এই দুই ভাষায় তিনি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিলেন। সংস্কৃতে ৫০০ নম্বরের মধ্যে পণ্ডিত ম্যাক্সমুল্যারের হাতে ৩৫০ নম্বর পেয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর শ্রমের যথার্থ পুরস্কারই পেয়েছিলেন। কারণ 'Dr. G' ছাত্রাবাসে থাকার সময় তিনি যে কঠোর পরিশ্রমে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তা গণেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রে জানা যায়। (পত্র, ১৭ই মে, ১৮৬৩ হারমণ্ডসওয়ার্থ)। তবু তাঁর স্বভাবজ বিনয় ও সৌজন্যবোধে 'আমার বাল্যকথা'য় লিখেছেন—"বোধ করি (ভট্ট মোক্ষমূলর) আমার লেখা পরীক্ষা করবার সময় আমার কাগজটার উপর একটু সদয়ভাবে চোখে বুলিয়েছিলেন, নইলে অত উচ্চসংখ্যা পাবার আশা ছিল না।" (পৃ. ৭০-৭১) ঠিক তেমনি

মিথ্যা অহমিকা বা বড়াই না করে অকুণ্ঠিত ভাবে বলতে পেরেছেন—"ওদের ল্যাটিন গ্রীক ভাষায় যদি আমাকে পরীক্ষা দিত হত, আর আমাদের ক্লাসিকদ্বয় তালবেতাল রূপে যদি আমরা সহায় না থাকত তাহলে ঐ পরীক্ষায় আমার জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকত না।" (পৃ. ৭১, ঐ, বৈতানিক প্রকাশনী)

সিভিল সার্ভিসে নির্বাচিত প্রথম ৩৫ জনের ভাগ্যে বাংলা প্রেসিডেন্সি নির্ধারিত হয়। এর পরে যাদের স্থান, তাঁদের ভাগ্যে বোম্বাই অথবা মাদ্রাজ। বোম্বাই কলকাতার কিছুটা কাছে বলে সত্যেন্দ্রনাথের বোম্বাই অধিকতর পছন্দসই ছিল। এদিকে বাঙালী বলেই সত্যেন্দ্রনাথকে দূরে পাঠিয়ে অবিচার করা হলো এই মর্মে তৎকালীন খবরের কাগজে কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক লেখালেখি হয়েছিল তা মনোমোহনের পত্র থেকে জানা যায়।[৮৫] মনোমোহন এই আন্দোলনকে নির্বুদ্ধিতা ও সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে ক্ষতিকর বলেই মন্তব্য করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু খোলা মনে তাঁর নিজের 'পজিসন' ও কমিটির নিয়ম গণেন্দ্রনাথকে স্পষ্ট ভাষার প্রথম পরীক্ষার পরেই জানিয়েছেন। (পত্র, প্যারিস থেকে ; ১৮ই আগস্ট, ১৮৬৩)। দ্বারকানাথের বংশধর এই অজুহাতে সত্যেন্দ্র-নাথের সাফল্যের গৌরবকে আচ্ছন্ন করার মন্তব্যও পাওয়া গেছে।[৮৬]

অথচ একজন ভারতীয় ছাত্র হিসাবেই আত্মপরিচয় দানে সত্যেন্দ্রনাথ গর্ববোধ করতেন। বংশমর্যাদার বড়াই করে আত্মপ্রচারের কোন মোহ তাঁর ছিল না। এমনকি মনোমোহনের পত্র থেকে জানা যায়—স্যার জন হার্সেল নিজে থেকে দ্বারকানাথের প্রসংগ তোলার পর জানতে পেরেছেন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পৌত্র। (দ্র. বিদেশের হিতৈষীমণ্ডল)।

সংস্কৃত ও আরবী এই দুই ক্লাসিকসে সত্যেন্দ্রনাথের অসামান্য দক্ষতা সিভিল সার্ভিস কমিটিকে যে বিচলিত করেছিল তা Home Ward Mail পত্রিকায় লেখা মনোমোহনের আবেদনপত্র থেকে আভাস পাওয়া যায়। পরবর্তী পরীক্ষা থেকেই সিভিল সার্ভিস কমিটি আরবী ও সংস্কৃতের মূল্যমান কমিয়ে দিয়েছিলেন ও কম মূল্যমান বিষয়ের ক্ষেত্রে ১২৫ নম্বর বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যর্থকাম মনোমোহন ঘোষের পত্রে সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হতে পারে বলে হজসন প্র্যাট Home Ward Mail-এ যে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন—তাতে

আরবী ও সংস্কৃত গ্রহণেচ্ছু ভারতীয় ছাত্রদের দুর্ভোগের মাত্রাকেই প্রকট করেছে।

তাঁর মতে—"Mr Ghose condemns this proceeding as 'unfair' and 'arbitrary' in the highest degree and appears to think that it has taken in connection with the reduced value assigned to Sanskrit and Arabic—caused his failure at the recent exmination. However that may be, this rule is not,...specially unfavourable to Indian candidates—except in so far as it tells more heavily on low-marked subjects, like Sanskrit and Arabic, than on highmarked subjects, like Latin, Greek, English and Mathematics."[৮৭]

পূর্বের নিয়মানুসারে ভারতীয় ছাত্রদের অনুকূলে লাটিন ও গ্রীকের পরিবর্তে সংস্কৃত ও আরবী নেওয়ার পক্ষে মনোমোহন ঐ পত্রে যে আবেদন রেখেছিলেন তা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মৌলিকনীতি বহির্ভূত বলেই হজ্সন প্র্যাট মন্তব্য করেছেন ও আরবী ও সংস্কৃতকে গ্রীক ভাষার সমপর্যায়-ভুক্ত করার বিরুদ্ধে তাঁর স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন।—

'I do not see how we can entertain a proposal which is so completely at variance with the fundamental principle of these examinations...

'As to any comparison between the value of the European and the Eastern classics, as regards the intellectual advantage to the student, Mr Ghose may rest assured that no one who is acquainted with human progress will allow that there is room even for discussion. If he had studied the Greek Language and literature, he himself would never have proposed to put it on a level with Arabic and Sanskrit.' (Ibid)

প্রসংগত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও বহুগুণের অধিকারী সত্যেন্দ্রনাথের যথার্থ মনোনয়নে হজসন প্র্যাট ঐ পত্রে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন—

'I rejoice most heartily that a man of such excellent

disposition, and of such fine abilities as Mr. Tagore, should have succeeded in becoming a member of the service.' (Ibid)

সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্যের পথে তাঁর যোগ্যতা ও কঠোর শ্রম সম্পর্কে প্রামাণ্য বিবরণের অভাব নেই।

বিদেশের হিতৈষী মণ্ডল

বিদেশে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয়েছে, এঁদের কথা সামান্য না বললে ছাত্রাবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথের বিদেশের স্মৃতি অসম্পূর্ণ থাকে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন :

মিঃ হজ্‌সন প্র্যাট
স্যার এডওয়ার্ড র্যায়ান
স্যার চার্লস এডওয়ার্ড ট্রাভেলিয়ান
স্যার জেমস ফ্রেডারিক হালিডে
স্যার হেনরী হোলাণ্ড
স্যার জন ফ্রেডারিক উইলিয়াম হার্সেল ও
মিস্ মেরী কার্পেণ্টার

এঁদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বিদেশে যোগাযোগ হয়েছে। এঁদের কারো কারো পরিবারের সঙ্গে এঁদের হৃদ্যতার সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। এঁরা আমাদের পরিচিত সমাজের বাইরের লোক বলেই এঁদের সম্পর্কে সামান্য পরিচিতি দেওয়া গেল।

হজ্‌সন প্র্যাট (১৮২৪-১৯০৭)

বিদেশে যাওয়া ঠিক হওয়ার পরেই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে হজ্‌সন প্র্যাট-এর চিঠিতে যোগাযোগ হয়েছে। উপযুক্ত ছাত্রাবাস ঠিক করে দেওয়া, অধ্যয়নের সুব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে হজ্‌সন প্র্যাট-এর কাছে এঁরা প্রচুর সাহায্য পেয়েছেন। মনোমোহন তো প্রথমাবস্থায় হজ্‌সন প্র্যাটএর ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। গণেন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছেন—'We are agreeably surprised to see the degree of interest Mr. Pratt takes for us' (17th May, 1862)।

সত্যেন্দ্রনাথও 'আমার বাল্যকথায়' হজ্সন প্র্যাটকে[৮৮] ভারত-হিতৈষী বলেছেন। (আমার বাল্যকথা, পৃ. ৮৮) সমুদ্রসৈকতে ব্রাইটন-এ তাঁর ৭নং রেজিনি স্কোয়ার-এর বাড়িতে মিসেস প্র্যাট-এর স্নেহে ও যত্নে দুই বন্ধুর ছুটির দিনগুলি আনন্দমুখর হয়েছে।

স্যার এডওয়ার্ড র‍্যায়ান (১৭৯৩-১৮৭৫)

সিভিল সার্ভিস কমিটির প্রধান কমিশনার এডওয়ার্ড র‍্যায়ানের কাছে উপদেশ নিতে সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমোহনকে প্রায়ই আসতে হোত। ইনি হিতৈষীর মতোই দুজনকে বুদ্ধি পরামর্শ দিতেন—একথা মনোমোহনের চিঠিতে জানা যায়, তবে তাঁর গৃহে যাবার কোন উল্লেখ এঁদের চিঠিতে নেই। দ্বারকানাথের বিলাত বাসকালে এডওয়ার্ড র‍্যায়ান ছিলেন নগেন্দ্রনাথের অভিভাবক[৮৯] তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি ভারতে থাকাকালীন সুনাম অর্জন করেছিলেন।[৯০]

চার্লস এডওয়ার্ড ট্র্যাভেলিয়ান (১৮০৭-১৮৮৬)

ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ট্র্যাভেলিয়ানের গভীর আগ্রহ এদেশ-বাসীর সংগে তাঁর সম্পর্ককে নিকটতর করেছে। বিলাতে ট্র্যাভেলিয়ানকে সত্যেন্দ্রনাথেরা খুব বেশি দিন পান নি। কারণ সত্যেন্দ্রনাথ বিলাতে যাবার কিছুদিন পরেই পুনরায় তাঁর ভারতে যাবার আহ্বান আসে[৯১] [দ্র. পরিচিতি] মনোমোহনের পত্রেও দেখা যাচ্ছে ট্র্যাভেলিয়ান সস্নেহে এঁদের খোঁজখবর নিয়েছেন ও অনেক স্থানে নিয়ে গেছেন। রানীর চিকিৎসক স্যার হেনরী হোলাণ্ডের সংগে ট্র্যাভেলিয়ানই এঁদের পরিচয় করিয়ে দেন।

স্যার ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে (১৮০৬-১৯০১)

লণ্ডনে হ্যালিডে[৯২] সাহেব ছাতা হাতে নিয়ে, হেঁটে সামান্য লোকের মতো সত্যেন্দ্রনাথের খোঁজ খবর নিতে এসেছেন—এই দেখে দুই বন্ধুর বিস্ময়ের সীমা থাকে নি। মনমোহনের ভাষায়—প্রথমে তাঁরা চিনতেই পারেন নি।[৯৩]

ইংরেজদের স্বদেশে ও ভারতবর্ষে পৃথক্ চালচলন—জীবনযাত্রাও পৃথক্ এই ভাব তাঁদের মনে জেগেছে। তবু দূর বিদেশে হিতৈষীকে পেয়ে তাঁরা খুশি না হয়ে পারেন নি। তাঁর বাড়িতেও এঁরা গেছেন।

স্যার হেনরী হোলাণ্ড (১৭৮৮-১৮৭৩)

ট্র্যাভেলিয়ানের[৯৪] মাধ্যমে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিশেষ চিকিৎসক হেনরী হোলাণ্ডের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথদের পরিচয়ের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। হেনরী হোলাণ্ডের গৃহে দুই বন্ধুর অনেক আনন্দময় মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে। মিসেস হোলাণ্ডের সৌজন্যপূর্ণ আচরণে তাঁরা অভিভূত হয়েছেন। হেনরী হোলাণ্ডের দুই কন্যার সঙ্গে ও এঁদের পরিচয় হয়েছে। হোলাণ্ডগৃহে একদিনের প্রাতরাশের সময়কালীন স্মৃতি মনোমোহনের চিঠিতে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে। তাঁরা সকলে মিলে যে ঘরটায়[৯৫] বসেছিলেন সেই ঘরটিতে প্রায় আঠারো[৯৬] বছর আগে একদিন নৈশভোজের নিমন্ত্রণে দ্বারকানাথ এসেছিলেন, হেনরী হোলাণ্ড তা সগর্বে বলেছিলেন।

স্যার জন ফ্রেডারিক উইলিয়ম হার্সেল (১৭৯২-১৮৭১)

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী[৯৭] স্যার জন হার্সেলকে ৭০ বছর বয়সেও সারাদিন টেলিস্কোপ নিয়ে মেতে থাকতে দেখে দুই বন্ধু বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের বিদেশের জীবনে হিতৈষীদের মধ্যে এঁর কথা বিশেষরূপে উল্লেখ্য।

ভারতে অবস্থানরত তাঁর এক পুত্রের সঙ্গে কৃষ্ণনগরে মনোমোহনের পরিচয় থাকার ফলেই 'হার্সেল-ভবনে' দুই বন্ধুর যোগাযোগ নিবিড়তর হয়েছিল। লণ্ডন ব্রিজ ষ্টেশন থেকে তাঁর বাড়ি আড়াই ঘণ্টার পথ। তাঁর সুরম্য গৃহে তিন দিন আতিথ্যের সুখস্মৃতি ও পরিজনদের মধুর আচরণের কথা এঁরা স্মরণে রেখেছেন। মমতাময়ী মিসেস হার্সেলের মাতৃস্নেহে ভরা আচরণের কথা মনোমোহন চিঠিতে না লিখে পারেন নি। ভারতীয় পরিবার সম্পর্কে তাঁর জানার আগ্রহ ছিল প্রবল। হার্সেলের মেয়েরাও ভারতবর্ষ ও হিন্দু মহিলাদের সম্পর্কে, এঁদের কাছে অনেক কিছু জানতে চেয়েছেন। এঁদের সান্নিধ্যে দুই বন্ধুর ছুটির দিনগুলি আনন্দমুখর হয়েছিল। ধারণা করা যায়—'বিলাতে গার্হস্থ্য জীবনে মেয়েদের মোহন সুন্দর প্রভাব' সত্যেন্দ্রনাথ প্রধানত এই গৃহে ক'দিন থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। বিদায় কালে সত্যেন্দ্রনাথ কন্যাদের খাতায় যে অটোগ্রাফ লিখেছিলেন তা এই গৃহের

কন্যাদের খাতায় লেখা খুবই সম্ভব। সবশুদ্ধ হার্সেলের ন'জন মেয়ে ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্যকথা'য় যে সম্ভ্রান্ত উচ্চ পরিবারে আতিথ্যের কথা লিখেছেন—সেখানেও 'অনেকগুলি কুমারী কন্যার উল্লেখ আছে।[৯৮] একদিন কথা প্রসঙ্গে স্যার জন হার্সেল দুজনকে জিজ্ঞেস করেন—ভারত খ্যাতনামা পুরুষ দ্বারকানাথকে এঁরা জানেন কিনা। যখন হার্সেল জানতে পারলেন—ভারতবর্ষীয় এই দুই তরুণের মধ্যে একজন দ্বারকানাথের পৌত্র, তখন তাঁর বিস্ময় ও আনন্দের আর সীমা থাকে নি।[৯৯]

মিস্ মেরী কার্পেন্টার (১৮০৭-১৮৭৭)

এই মহীয়সী নারীর সঙ্গে দুই বন্ধুর যোগাযোগের ফলে ভারতের স্ত্রী শিক্ষাও স্ত্রী-জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ততর হয়েছিল। দেশে ফেরার পর রাজা রামমোহনের শেষজীবনের বিবরণ ও পত্রসহ একটি পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিঅর্ঘ্য সংকলন করতে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখেরা উৎসাহী ছিলেন। হার্সেলের কাছ থেকে রামমোহনের চিঠিও সেজন্য তাঁরা নকল করে এনেছিলেন। বিদেশে রামমোহনের শেষ দিনগুলির সঙ্গে মিস মেরী কার্পেন্টার বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন বলেই তাঁর কাছে সকল কথা শুনতে ও তাঁকে একবার ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানাতে সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমোহন তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রমোহন দত্তও মিস মেরী কার্পেন্টারের কাছে গিয়েছিলেন—প্রকৃতপক্ষে এই চারজনের প্রেরণাতেই রাজা রামমোহনের শেষদিনগুলির কথা মেরী কার্পেন্টার লিখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১০০] সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমোহন ব্রিস্টলে মেরী কার্পেন্টারকে সঙ্গে নিয়েই যে রামমোহনের সমাধি দর্শনে গিয়েছিলেন 'আরনোসভেল' সমাধি ক্ষেত্রের ভিজিটার বুকে তার নিদর্শন আজও রয়েছে।[১০১] স্টেপল-টন' গ্রোভ-এর কাছের উদ্যানবাটিকা থেকে' 'আরনোস ভেল-এ রামমোহনের নূতন সমাধিমন্দির দ্বারকানাথই নির্মাণ করিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথও মনোমোহনের বিশেষ অনুরোধে মিস মেরি কার্পেন্টার কয়েকবারই ভারতে এসেছেন ও আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতেও থেকেছেন।

মনীষী ম্যাক্‌সমূলার

বিদেশে পরীক্ষান্তে ম্যাক্‌সমূলারের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের যোগাযোগের কথা 'আমার বাল্যকথা'য় তিনি নিজেই বলেছেন— (পৃ. ১৩। বৈতানিক প্রকাশনী) সেখানে ম্যাক্‌সমূলারের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের চিত্র প্রধানতঃ দ্বারকানাথের স্মৃতি কথায় ভরা। ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ জানতে ম্যাক্‌সমূলার উৎসুক ছিলেন। সেজন্য সত্যেন্দ্রনাথ সময় নিয়ে পরে আমেদাবাদ থেকে তা পাঠিয়ে ছিলেন।[১০২] দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত ম্যাক্‌স-মূলারের চিঠিতেও সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্নেহসূচক মন্তব্য আছে।[১০৩] ম্যাক্‌স-মূলারের কথা দিয়েই সত্যেন্দ্রনাথের জীবনীর প্রথম পর্বের ছেদ টানা যায়।

বিদেশের হিতৈষীদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাখালদাস হালদারের নাম উল্লেখ্য। কিন্তু এঁরা কুটুম্ব বলেই 'বন্ধু ও পরিজন পরিবেশ' অধ্যায়ে এঁদের কথা আলোচিত হবে। বিদেশের ছাত্রবন্ধু হাংগেরিয়ান্ পুলজকীর সংগে গভীর হৃদ্যতার কথা অন্যত্র উল্লিখিত হবে। (দ্র. শিল্পীসত্তা অধ্যায়)। তাছাড়া আরও দুজন ছাত্রবন্ধুর সংগে সত্যেন্দ্রনাথের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। এঁদের নাম Willes[১০৪] ও Schwanne।[১০৫] শেষের জন পরবর্তীকালে পার্লমেণ্টের মেম্বার হয়েছিলেন বলে 'আমার বাল্যকথায়' সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন।

১. দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে পাশ্চাত্যের সংগে প্রাচ্যের মালাবদল ঘটে গিয়েছিলো জোড়াসাঁকো বাড়ীর প্রাংগনে'। যাত্রী—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ২। ('বেলগাছিয়া ভিলা' ছিল তখনকার কলকাতার একটি প্রধান আকর্ষণ। এই ভিলায় সাহেবরা দ্বারকানাথের নিমন্ত্রণের জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন। দ্র. পৃ. ২৮৬ প্রসংগকথা—কল্যাণ-কুমার দাশগুপ্ত। দ্বারকানাথ ঠাকুর—কিশোরীচাঁদ মিত্র। অনুবাদ—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ।

এখানে মিস্ উডেন-এর সম্মানার্থে ভোজ দ্র. মহর্ষির আত্মজীবন : অন্টম পরিচ্ছেদ (পৃ. ৩৯। ৪র্থ সং)। বেলগাছিয়া ভিলা পরবর্তী কালে পাইকপাড়ার রাজাদের হাতে আসে।

২. আমার বাল্যকথা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ২১। বৈতানিক প্রকাশনী।

৩. ১৮৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে তাঁহার গোরিটির বাগানে ব্রাহ্মদিগের একটি সম্মিলন হয়'।—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষির আত্মজীবনী (৪র্থ সং)। পরিশিষ্ট-৫০। পৃ. ৩৯৯। আত্মজীবনীর 'গোরিটি,' 'মহর্ষি'র পত্রাবলীতে এবং রাখালদাস হালদারের দৈনন্দিন লিপিতে 'পলতা' বলিয়া লিখিত আছে'।··· 'গোরিটির বাগান যাহাকে বলে পলতার বাগানও তাহাকেই বলে'। পৃ. ৪০৯, মহর্ষি'র আত্মজীবনী—পরিশিষ্ট-৫৩।

৪. ১৭৬৮ শকের শ্রাবণ···গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম—তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স ৭ বৎসর, সত্যেন্দ্রনাথের ৫ বৎসর এবং হেমেন্দ্রনাথের ৩ বৎসর'। পৃ. ৬৮, আত্মজীবনী। চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

৫. আমার বাল্যকথা—বৈতানিক প্রকাশনী, পৃ. ৮।

৬. ঐ।

৭. ১৮৪৮ সনের জানুয়ারি মাসে বিখ্যাত ইউনিয়ন ব্যাংক দেউলিয়া হয় এবং প্রায় সেই সময়েই কার-ঠাকুর কোম্পানিও কারবার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। পৃ. ৪৫০—মহর্ষি'র আত্মজীবনী ৪র্থ সং।

৪ঠা এপ্রিল ১৮৮৪, কার-ঠাকুর কোম্পানীর উত্তমর্ণ গণের সভা হয়; তাহাতে কোম্পানীর হিসাব প্রদর্শন করা হয়। দ্বারকানাথের বিষয়-সম্পত্তির অবস্থা সহৃদয়তার সহিত বিবেচিত হয়। পৃ. ৩৩। মহর্ষি'র আত্মজীবনী: সময়সূচী ৪র্থ সং।

৮. পিতৃদেব যে চারজন পণ্ডিতকে বেদশিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠান—বাণেশ্বর বিদ্যালংকার তার মধ্যে একজন।—তাঁর নিকট শিক্ষায় আমার একটা লাভ হয়েছিল স্বীকার করতেই হবে।—সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ এক প্রকার আয়ত্ত করে নিয়েছিলুম। আমার বাল্যকথা—সত্যেন্দ্রনাথ। পৃ. ৬৮।

অপিচ—'যজুর্বেদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর ভট্টাচার্য''—মহর্ষি'র আত্ম-জীবনী: বিংশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১১০ ৪র্থ সং।

৯. দ্র. পরিশিষ্ট ৯, পারিবারিক খাতা, ছেলেবেলার কথা।

১০. আমার বাল্যকথা : পৃ. ১২, বৈতানিক প্রকাশনী।

১১. 'ও বাড়ীর মেজদাদা বড়দাদা আমি এই সব বক্তা, আর দে'তো কেদার দত্ত প্রভৃতি বাইরের লোকও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকত।'—পারিবারিক খাতা : ছেলেবেলার কথা অধ্যায়।

১২. আমার বাল্যকথা—পৃ. ১৩ ; বৈতানিক প্রকাশনী।

১৩. ১৮৪৯-৫০ সনের শিক্ষা বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—
Hindu College···In accordance with the recommendation of the examiners, prizes in books as usual have been awarded to the meritorious students of the junior school.
Ist Class Arithmetic—Keshubchunder Sen
4th Class Arithmetic—Satyendranath Tagore.
কেহ কেহ লিখিয়াছেন···সহপাঠী ছিলেন ইহা যে ঠিক নহে উপরের অংশই তাহার প্রমাণ' (সাহিত্যসাধক চরিতমালা—৬৭)

১৪. ১৮৫২ সালে 'হিন্দু কলেজে' বিবাদ উপস্থিত হয়···রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী পৃ. ২৩৮ (নিউ এজ সং)। অপিচ—দ্র. 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত' : রাজনারায়ণ বসু—দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত পৃ. ১২।

১৫. '১৮৫৪ সনের ১৫ই জুন হিন্দু কলেজ উঠিয়া গিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল এই দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।' (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—৬৭)।

১৬. 'This is a photograph on a reduced scale of the first page of the oldest Surviving Attendance Register of Presidency College, dated 1858-59, and now exhibited in a glass case in the Arts-Library ..' Centenary Volume 1955, Presidency College, Calcutta : A page from the past : token of Attendance Register, p. 13 (Photostat).

১৭. মহর্ষির আত্মজীবনী, ৪র্থ সং ; পৃ. ৪০০-৪০১। পরিশিষ্ট-৫০।

১৮. পিতৃস্মৃতি : সৌদামিনী দেবী। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ পত্রিকা : বৈশাখ ১৩৭০।

১৯. '১৭৭৮ শকের ১৯শে আশ্বিন' আত্মজীবনী, একত্রিংশ পরিচ্ছেদ। (৩রা অক্টোবর, ১৮৫৬)।

২০. নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু ২৪শে অক্টোবর ১৮৫৮ (আত্মজীবনী পৃ. ২৪০) ৪র্থ সং।

মহর্ষি'র প্রত্যাবর্তন ১৫ই নভেম্বর ১৮৫৮ ; (ঐ পৃ. ২৪২) ঐ।

২১. দ্র. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃ. ২৩৯ (নিউ এজ সং ১৯৬২)। অপিচ—'১৮৫৭ সনে কেশবচন্দ্র ব্রহ্ম-সমাজে প্রবিষ্ট হইবার জন্য গোপন প্রতিজ্ঞা লিখিয়া পাঠান'।—আচার্য কেশবচন্দ্র (আদি বিবরণ) : গৌরগোবিন্দ রায়। পৃ. ৫১।

২২. আমার বাল্যকথা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৮৪।

২৩. Good Will Fraternity—সঙ্গত সভা।

২৪. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃ. ২৩৯। অপিচ—প্রধানাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্র হিন্দু কলেজে একত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার সঙ্গে ইঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ইনি সময়ে সময়ে আলাপ প্রসঙ্গ করিতেন এবং এই উপায়ে প্রধানাচার্যের নিকটেও যাহা কিছু বলিবার বলিয়া পাঠাইতেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল এবং এই পরিচয় পরস্পরের প্রতি গাঢ় অনুরাগে পরিণত হইল। গুডউইল ফ্রেটারনিটী সভায় প্রধানা-চার্যের আগমন এই পরিচয় হইতেই হইয়াছিল' আচার্য কেশবচন্দ্র (আদি বিবরণ)—গৌর গোবিন্দ রায়।—পৃ. ৫১।

(এই বিবরণে 'একত্র অধ্যয়নের' কথা লিখিত রয়েছে। তাছাড়া শিবনাথও রামতনু লাহিড়ী তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থে (পৃ. ২৩৯) এ 'সমাধ্যায়ী' বলেছেন। তাঁরা যে 'সমাধ্যায়ী' ছিলেন না, এ প্রসঙ্গে সাহিত্যসাধক চরিতকার প্রামাণ্য তথ্য প্রদান করেছেন। দ্র. ১৩নং পাদটীকা।)

২৫. 'মনে হইল আমি সত্যেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া হারমোনিয়মের সহিত বিষ্ণুর সহিত···এখনই যাই।' মহর্ষি'র পত্রাবলী : ২৪নং পত্র।

২৬. সিংহল উপদ্বীপে ভ্রমণ বৃত্তান্ত—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী

১৭৮১ শক পৌষ। বোম্বাই চিত্র গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত। (পৃ. ৪৮৯-৫৪১) সিংহলে ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

২৭. সাহিত্যসাধক চরিতমালা-৬৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান :
১৭৮২ শকের ১১ শ্রাবণ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ষড়্‌বিংশ ব্যাখ্যানে তাহার প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত হয়। পরে ঐ শকের ৬ আষাঢ় হইতে ১০ মাঘ পর্যন্ত একাদশ ব্যাখ্যানে তাহার দ্বিতীয় প্রকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে।—দেবেন্দ্রবাবুর উপদেশ ও দীক্ষা পদ্ধতি—রাজনারায়ণ বসু (প্রবাসী—মাঘ ১৩০৪। পৃ. ৪৬১-২) সাহিত্যসাধক চরিতমালা—৩য় খণ্ডে প্রাপ্ত।

২৮. "The Sermons were taken down in writing by myself and others, and eventually published in a book entitled *The Brahma Dharma Vyakhpan* or Exposition of the Brahma Dharma."—Satyendranath. Tagore : Introductory Chapter : *The Autobiography of Maharshi Devendranath Tagore* : Translated by Satyendranath Tagore & Indira Devi. p. 11.

২৯. 'কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আমার পরম পূজনীয় পিতা মহাশয় যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সাধারণের উপকারের জন্য গ্রন্থবদ্ধ করিয়া আমি প্রকাশ করিতেছি।' ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস : উপক্রমণিকা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা ৭ই চৈত্র ১৭৮৩ শকাব্দ।

৩০. 'গত অগ্রহায়ণ মাসে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।'—মহর্ষির পত্রাবলী : ৫৪নং পত্র (১৭৮১ শকের ৮ই পৌষে লিখিত।)

৩১. ১৭৮১ শকের অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৫৯) মাসে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র (১৭৮১, ফাল্গুন) প্রকাশিত ১৭৮১ শকের পৌষ মাসের দানপ্রাপ্তির বিবরণে "শুভকর্মের দান। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৲" দেখিতেছি। সাহিত্যসাধক চরিতমালা—৬৭।

৩২. 'সুরেন্দ্রনাথ যখন একুশ বর্ষ পূর্ণ হলেন, তখন যে সব সরকারী কাগজ-পত্র এল, তাতে যেন লেখা ছিল মা বাবার বিয়ের সাল ১৮৫৯।'— 'জ্ঞানদানন্দিনী দেবী'— ইন্দিরা দেবী : প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৮।

৩৩. 'একবার আমাদের গুরুঠাকুর এসেছিলেন, তাঁকে বাবামশায় জিজ্ঞেস করেছিলেন—কিরকম কন্যাদানে বেশি পুণ্য হয়। তিনি বললেন—সাত বছর বয়সে—অর্থাৎ গৌরীদানে। ঠিক সেই বয়সেই আমার বিয়ে হয়'।—জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা—পুরাতনী : পৃ. ১৯। অপিচ—'আমার দাদামশায় মায়ের আট বৎসর বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন। সে হিসেবেও ১৮৫২ সালে জন্মালে ১৮৫৯এ সাত পূর্ণ হয় আটে পড়ে।' 'জ্ঞানদানন্দিনী দেবী'—ইন্দিরা দেবী। প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৮।
মায়ের জন্ম তারিখ সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী আরও স্পষ্ট করে বলেছেন—"মা বলতেন তাঁর একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক বৎসর আর তাঁর নিজের একুশ বৎসর বয়স একসঙ্গে আরম্ভ হয়, কারণ দুজনের জন্মদিন একই দিনে পড়ে।'
(ইন্দিরা দেবী—পূর্বোক্ত প্রবন্ধ) সুরেন্দ্রনাথের জন্ম : ১৮৭২-এর ২৬শে জুলাই। কাজেই বিবাহের সময় জ্ঞানদানন্দিনীর বয়স সাত বছর পূর্ণ হয়ে কয়েক মাস হয়েছে, অর্থাৎ আটে পড়েছে।

৩৪. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি-বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত, ভারতী, শ্রাবণ ১৩২১। পৃ. ৩৬৬।

৩৫.

Krishnagar
29th May, 1861

My dear Cousin

...We made an excursion to শ্রীবন on the back of elephant. শ্রীবন is a pleasure ground of the Rajahs....(Satyendranath's letter to Ganendranath)

মূলপত্র ও ইন্দিরাদেবীর হস্তলিখিত কপি শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

দ্র. Calcutta Review, Sept. 1924

(বর্তমানে 'শ্রী-বন'-এর আশে পাশে কুষ্ঠিয়া আগত শরণার্থীদের

নূতন বসতি গড়ে উঠেছে। একটি অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ ও অনেক সেগুন গাছ চোখে পড়েছে। সেগুন গাছগুলি বনবিভাগের সংরক্ষিত নার্সারী বলেই মনে হয়। 'শ্রী-বন'-এর পাশ দিয়ে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য নিয়ে অঞ্জনা নদী শুধু প্রবহমান।—দ্র. আলোকচিত্র, বর্তমান শ্রীবন)

৩৬. We are trying our best to promote the cause of Brahmoism. ব্রহ্মানন্দজি's stirring lectures have set Krishnanagar all in a flame.…we had to fight hard with the missionaries here…one of the orthodox pundits of Nuddea complimented us on our having disconsolated our common foe !

(Satyendranath's letter to Ganendranath. Krishnanagar, 26th May 1861)

৩৭. কৃষ্ণনগর, ৩১ বৈশাখ, ১৭৮৩ শক

অগণ্য নমস্কারপূর্বক নিবেদনমিদং… ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য আমরা কি করিতেছি তাহা জানিতে আপনার কৌতূহল হইয়াছে সন্দেহ নাই।…পাদ্রী ডাইসন সাহেব বক্তৃতার পরে আমারদিগের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলেন।…একজন নবদ্বীপের পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন—আপনারা আমাদের শত্রু বটেন, কিন্তু আমাদের সাধারণ শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছেন, অতএব এখন আপনারা বন্ধু…

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

[তত্ত্ববোধিনী, ১৭৮৩ শক শ্রাবণ-এ প্রকাশিত]

৩৮. 'ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের দিকে ওঁর খুব ঝোঁক ছিল, এবং বোধহয় সেইটেই জীবনের ব্রত করবার ইচ্ছে করেছিলেন। মনে আছে একবার বলেছিলেন—আমি যখন প্রচার করতে বেরব তখন, রাত জাগতে হবে, বৃষ্টিতে ভিজতে হবে, অবশ্য, বিলেতে যাওয়াতে সে সাধ পূর্ণ হল না,' [জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : ইন্দিরা দেবী সংকলিত পৃ. ২৬]

৩৯. 'একদিন তাঁহাদের বাড়ীর সংলগ্ন দীর্ঘ তরুবীথির মধ্যে মনোমোহনবাবু

ও সত্যেন্দ্রবাবু দুই জনে পায়চারি করিতে করিতে বিলাত যাইবার মৎলব আঁটিতেছিলেন'। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যসাধক চরিতমালা-৬৭ ; পৃ. ১০-এ উদ্ধৃত।

৪০. দ্র. আলোকচিত্র—মনোমোহন ঘোষ-এর নিবাস ও তৎসংলগ্ন তরু-বীথি। (নদীয়ার পুরাকীর্তি'-সংকলক মোহিত রায়-এর সংগে কৃষ্ণনগরে এক সাক্ষাৎকারে জানা গেছে—এই পৈতৃক বাসভূমিতেই মনোমোহন ঘোষ ১৮৯১-৯৩ সালের মধ্যে আবার নতুন করে গৃহনির্মাণ করেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে মনোমোহন ঘোষের কন্যা সরলতা দাস বাড়িটি পিতৃস্মৃতি রক্ষায় দান করেন। বর্তমানে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট হাইস্কুল।) ভবনটির প্রবেশদ্বারের স্তম্ভে শ্বেত প্রস্তরে উৎকীর্ণলিপি চোখে পড়ে—'বঙ্গের গৌরব দেশপূজ্য মনোমোহন ঘোষের নিবাস। জন্ম সন ১২৫০ : মৃত্যু সন ১৩০২'

৪১. য়ুরোপ প্রবাসী বাঙ্গালী—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। প্রবাসী, ১৩১১ কার্তিক ৭ম সংখ্যা, পৃ. ৩৭৯

৪২.

Madras
on Board the 'Colombo'
27th March, 1862

My dear brother
We are four days away from home...

I remain
Yours affectionately
S. N. Tagore

ইন্দিরা দেবীর মন্তব্য : 'Probably his elder brother Dwijen-dranath—

(মূলপত্র শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত। ইন্দিরা দেবীর স্বহস্ত-লিখিত প্রতিলিপিও সেখানে আছে। Calcutta Review পত্রিকায় Sep. 1924-এ প্রকাশিত।)

Extracts from the letter of Monomohan Ghose.

...

Galle
Seaview Hotel
31st March, 1862

My dear Mejdada,

We have now come to Ceylon, the famous and fabulous লংকা। The parting between Sir Bartle and his wife reminded me forcibly of our parting scene of the morning of the 23rd March.

[To Ganendranath Tagore, 1924 Oct. Calcutta Review. মূলপত্র শান্তিনিকেতনে—রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত]

৪৩. দ্র. কর্মজীবন অধ্যায় : ইনি বোম্বের গভর্ণর থাকাকালীন সত্যেন্দ্রনাথ এঁর স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন।

৪৪.

Galle
Seaview Hotel
31st March, 1862

My dear Mejdada,

...you might have accompanied us a little further than the Garden Reach, and then might have returned by the after packet-steamer 'Celerity' as did Sir Bartle Prere, leaving his wife to proceed to England-

(Monomohan's letter to Ganendranath)

৪৫.

Madras
On Board the 'Colombo'
27th March, 1862

My dear brother,

...That monster sea-sickness has devoured us, we are here cribbled in our cabin. The great Ocean expands everywhere around us,...The Golden sun rises and sinks

again into the watery horizon, but all these have no charms for us—nothing can get us out of our dungeon.…

I remain

Yours affectionately

S. N. Tagore.

৪৬. আরব সাগর থেকে মহর্ষি'কে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র—'আমরা ভারত মহাসাগর হইতে আরব সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছি। ৮ আপ্রিল তারিখে দ্বীপের এক পার্শ্ব…বৃক্ষলতাশূন্য উচ্চ পাহাড়ময় ভূমি দৃষ্টিগোচর হইল। মনে হইল যদি রবিনসন ক্রুসোর মত আমরা একাকী এই দ্বীপে আসিয়া পড়ি তবে কি করিয়া জীবনধারণ করি। পরে শুনিলাম ভিতরে চাষবাস ও লোকজনের বসতি আছে।—সেবক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিঠির উপরের পাঠ ছেঁড়া হলেও চিঠির নিম্নপাঠ 'সেবক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর' দেখে ও ভিতরের বিষয় বস্তুতে, চিঠিটি যে মহর্ষি'কে লেখা, সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না)। রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শ-শালায় প্রাপ্ত।

৪৭. 'A Grand building it is, and the inside was ornamented somewhat in the oriental fashion'. (London 10th June, 1862. Satyendranath's letter to Ganendranath).

৪৮. 'Our path lay through a barren and dreary desert, which is certainly an eye-sore to a Bengalee'.

—Ibid., 10th June, 1862

৪৯. আমার বাল্যকথা--মনোমোহন ঘোষ ; পৃ. ৮৬। বৈতানিক প্রকাশনী।

৫০. 'We could hardly prevent ourselves from falling one's 'jubba' rolling to one side, one's cap falling off in the street, and what not. Mon's donkey was quite unmanageable and he was like John Gilpin utterly confounded. Imagine us, my dear Mezdada, to be on the back of two unmanageable donkeys.'

Satyendranath's Letter, 10th June 1862

Cowper জন্ গিলপিনের দুর্দশার চিত্র যে ভাবে এঁকেছেন তা ছোট বড় সকলেরই হাসির খোরাক জোগায়। প্রসংগত তার বর্ণনাটি এখানে তুলে ধরা যায়। এতে প্রমাণিত হবে সত্যেন্দ্রনাথের মন্তব্য একটুও অতিরঞ্জিত হয়নি।

Away went Gilpin, neck or nought ;
Away went hat and wig ;
He little dreamt, when he set out,
Of running such a rig.

The Diverting History of John Gilpin by William Cowper.

৫১. 'You no doubt remember fa.e of the Alexandrian library which was destroyed by order of Omar, who replied, when some one interceded with that Sovereign for its preservation,—'If they contain what is agreeable with the Book of God, then the Book of God is sufficient without them, and if they contain what is contrary to the Book of God, there is no need of them, so give orders for their destruction.

10th June, 1862.

Satyendranath's Letter to Ganedranath.

৫২. We had always to fight with other passengers for access to the bath. Sometimes when we went before Saheb, and were waiting for a bath half an hour, the men would come and enter it as soon as it was empty, regardless of our claims. But if we were to be in the bath for 10 minutes, one would remark…. "Don't fall asleep in your bath" and a third would tauntingly ask পুজা করতা ?

Of course these men are Sahebs, and we are poor Bengalee.'

London, 10th June, 1862

Satyendranath's letter to Ganendranath.

৫৩.

1st May/62

on board the 'Pera'

My dear Sir,

We expect to reach Southampton early to-morrow morning & intend to proceed to London at once...

P. S. Since writing the above we learn that owing to the thick fog that lies in our way, it is not certain at what time to-morrow the Pera will reach the Southamption docks.

সত্যেন্দ্রনাথের এই পত্রটি রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালায় রক্ষিত। চিঠিতে নামের উল্লেখ না থাকলেও ১৮৯২-র ১৬ই ও ১১ই মার্চ রাখালদাস হালদারকে লেখা দুইটি পত্রেরই সম্বোধন—My dear Sir ও শেষ পাঠ "I remain yours sincerely-এর সঙ্গে মিল আছে। উক্ত পত্রদুটি তত্ত্ববোধিনী ১৮৪৯ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত। অনুমান বোধহয় অসংগত নয় যে এ পত্রও রাখালদাস হালদার মহাশয়কে লেখা।

৫৪.

9. Notting Hill Terrace

Saturday, 10th May 1862

My dear Gonoo Babu

...One month and ten days have brought us to a distance of 13,000 miles from you all ...

It is just a fortnight we have arrived in London.

Monmohan Ghose

৫৫. 9, Notting Hill Terrace
London, W
18th August 1862

My dear Gonoo Baboo

...the first day we arrived in London, we spent at the house of Mr G. M. Tagore, but the very next day, we removed to No 9. Notting Hill Terrace where we have been living since...

Monomohan Ghose

৫৬. ১৭৮৪ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় 'ব্রাইটনপুরী' ও বক্জেস পল্লী'র বর্ণনা 'ইংলণ্ড হইতে কলিকাতানিবাসী একজন ব্রহ্মের পত্র' নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'ব্রাইটনপুরী সমুদ্রের ধারে, এক মাসের অধিক কাল সমুদ্রের উপর থাকিয়া সমুদ্র পুরাতন হইয়া গিয়াছিল...কিন্তু তীর হইতে সমুদ্রের শোভায় আর এক নূতন ভাব...(ব্রাইটনপুরী)। 'ব্রাইটন হইতে অনতিদূরে এক পল্লীতে গিয়া এখানকার পল্লীর ভাব দর্শন করিলাম।' (বক্জেস পল্লী)

৫৭. We came back from Brighton yesterday at about 4 p. m. (9th may, 1862), Notting Hill Terrace, London.
Letter S. N. Tagore/Rabindra Bharati Museum.

No. $\frac{\text{Accn}}{6928}$ REM.

এই চিঠিতেও প্রথম পাঠ ও শেষপাঠ ৪৬নং পাদটীকায় ব্যক্ত চিঠির মতো।

৫৮. M. G's Letter to Ganendranath. 17 May, 1862.

৫৯. 'I have been told that your uncle had to pay thousand of rupees for that tomb but... it was the most ugly tomb we saw in the whole cemetary. Now the question comes

what has been done with all that money? ...will you relate all this to your uncle.'

Ibid.

৬০. 'We had heard that there was a handsome tomb with an inscription in Bengalee, but we found that all this was utter and sheer fabrication. ...you can ask Nobin Baboo for an explanation, can you not?'—Ibid.

(নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারকনাথের খুড়তুতো বোন বিনোদিনীর মধ্যম পুত্র। কেন্‌সাল গ্রীণ সমাধিক্ষেত্রে দ্বারকনাথের শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন।)

৬১. দ্র. পত্র মনোমোহন ঘোষ, ১৮১২ : পত্র সত্যেন্দ্রনাথ, ১০ই জুন ১৮৬২।

৬২. নাম : দ্বারকানাথ ঠাকুর, জমিদার

বাসস্থান : সেণ্ট জর্জে'স হোটেল

কবর দেওয়ার তারিখ : ৫ই আগস্ট, ১৮৪৬

বয়স : ৫১

কবরের ধরন : ইঁটের কবর

স্মৃতিফলক : গ্রানাইটের স্মৃতি ফলক।

অমিতাভ গুপ্ত লিখিত 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমাধি'—সাহিত্য সংখ্যা দেশ ১৩৬৪ ; পৃ. ৯৪।

৬৩. আমি প্রথম যখন সেই সমাধি মন্দির দেখি তখন তার নিতান্ত ভগ্নাবস্থা, পরে তার জীর্ণ-সংস্কার হয়েছে।' আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃ. ৯, বৈতানিক প্রকাশনী।

৬৪. 'লণ্ডনের প্রসিদ্ধ পিকাডিলী সার্কাসের কাছে Albamarle Street-এর ওপর অবস্থিত St George's Hotel-এ একটি কামরায় দ্বারকানাথ দেহত্যাগ করেন—১লা আগস্ট, ১৮৪৬, শনিবার'। অমিতাভ গুপ্ত : প্রাগুক্ত প্রবন্ধ। Worthing থেকে গণেন্দ্রনাথকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের ১৮৬২র ২৫শে আগস্টে পত্রে সেণ্ট জর্জে'স হোটেলে দ্বারকানাথের মৃত্যু

তারিখ ১লা আগস্ট ১৮৪৭ বলে উল্লিখিত। প্রকৃতপক্ষে ১৮৬২ সালের ১৭ই মে গণেন্দ্রনাথকে লিখিত মনোমোহনের পূর্বোক্ত পত্রে উল্লিখিত দ্বারকানাথের সমাধি ফলকে উৎকীর্ণ মৃত্যু তারিখ ১লা আগস্ট ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দই প্রামাণ্য। অমিতাভ গুপ্তের প্রবন্ধেও এই তারিখটি স্পষ্ট।

৬৫. 'তিনি যে হোটেলে গিয়ে উঠেছিলেন আমি সেই হোটেলের মালিকের সঙ্গে দেখা করিয়া সাহেবটির নিকট হতে দাদামশায়ের অনেক খবর শুনতে পাই'—আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈতানিক প্রকাশনী, পৃ. ১০।

৬৬. 'I called the other day on the proprietress of this Hotel, who was present at the time. She kindly gave some particulars connected with his sojourn in this place.'... 'Mrs. Browne, the sister of my informant, was then the proprietress of this hotel, and he used to take a a glass of claret with her religiously every day, what the meaning of this was could only be guessed. It might be it was his desire to enjoy peace under her roof.'

Satyendrananth's letter to Ganendranath
25th August, 1862
Worthing, Sussex.

৬৭. Vide Satyendranth's letter. Worthing, Sussex—2nd Sept., 1862.

৬৮. আমার বাল্যকথা—বৈতানিক প্রকাশনী ; পৃ. ৮৯।

৬৯. 'I shall never be happy until I return home and see you all.' (2nd Dec., 1862 : M. G's Letter to Ganendranath)

৭০. 'We have got tired of cold beef and ham. I wish we

could get মাছের ঝোল & ভাত ॥ 18th August 1862. M. G's letter to Ganedranath.

৭১. 'রৌদ্রে বাহির হইলে একজন ছাতা লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয় না। এই সকল সামান্য বিষয়ে ভৃত্যের সাহায্যে চাওয়া ইংরাজ লোকদিগের অতিশয় নীচ বলিয়া মনে হয়। এদেশ স্বাধীনতা ও কর্ম্মের দেশ'। (১১ই ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৬৩ গণেন্দ্রনাথকে সত্যেন্দ্রনাথের পত্র)।

৭২. 'মেরী খ্রীস্টমাস চলিয়া গিয়াছে, আমরা এক সপ্তাহের ছুটি লইয়াছি। এক সপ্তাহ কাল ব্রাইটন-এ যাপন করিব'। (গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র। ৩৮ কেনসিংটন পার্ক গার্ডেন্স, লণ্ডন থেকে। ২৬ ডিসেম্বর ১৮৬২)।

৭৩. The Sea is before us foaming and dashing in and perhaps expressing a wish to take us back to our country.'
গণেন্দ্রনাথকে লিখিত মনোমোহন ঘোষ-এর পত্র। ব্রাইটন ৭ রেজিনি স্কোয়ার, ২৮ ডিসেম্বর ১৮৬২।

৭৪.

Paris
Hotel du Louvre
18th August/63

মেজদাদা,
আমাদের পরীক্ষা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে এবং যাহা কখনো আশা করি নাই—আমি তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। ষাট জন এ বৎসরের পরীক্ষায় পরিগৃহীত হইয়াছে—তাহার মধ্যে আমার সংখ্যা ৪৩, নিতান্ত নীচে নয়। প্রথম ৩৫ জনের বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। ...আমাদের পরিবারের নিশানে যে তিনটি মহার্ঘ সূচক পদ আছে Works Will Win তাহা অনেক যত্নে সফল করিতে সক্ষম হইয়াছি। মনোমোহন এবারে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই—আমরা দুজনে একসঙ্গে জয়ী হইয়া ফিরিয়া যাইতে পারলে কি সুখের বিষয়ই হইত।...শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭৫. আমার বাল্যকথা ; পৃ. ৮৯।

৭৬. আমার বোম্বাইপ্রবাস : পৃ. ৬৯।

৭৭. ভাই বঙ্কিম, ...এই পত্র লিখিবে তাহাতে যেন ব্রজ মামা নিম্নলিখিত ঠিকানা লিখিয়া দেন— S. N. Tagore, Aden Passenger on board P. & O Comp. or Mess Imp Steamer. (To await arrival) 2nd July, 1864, Gordon Square. জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র।

৭৮. My dear Satyendra,

...I can very well fancy that you are now somewhere in the Bay of Bengal... your mind is no doubt occupied with thoughts about the grand reception that awaits you in a day or two...

Yours Monmohan : 18th October 1864,
London

৭৯. 'I spent nearly a moth at Verseilles and I was very comfortable there. Dutta and myself use to walk every day through the Pare and Palane which I hope you remember and we always talked about you.'

Yours Monmohon : Ibid

৮০. My dear friend,

You will see Satyendra a day or two after the receipt of this. Monomohan is spending a few days with us and goes back to London next month...'

18th Sept. 1864, Versailles, France
12. Rue-des-Chantiers

Madhusudan's letter to Vidyasagar, 18th Sept. 1864. Versailles, France. 12. Rue-des-chantiers.

মধুস্মৃতি : নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃ. ৬৫১

৮১. দ্র. মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী।
'আমার বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কবির আশীর্বাদ সহকারে ভারত অভিমুখে যাত্রা করলুম'। আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৯১। বৈতানিক প্রকাশনী।

৮২. ১৮৬৪ নবেম্বর মাসের পক্ষিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় এই সংবাদটি মুদ্রিত হয়—'বঙ্গের প্রথম সিবিল, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সে দিবস তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অন্যূন ৩৫০ জন সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেবেরেণ্ড শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়…প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিমাত্রেই তথাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই আমোদ উপলক্ষে বিদ্যাসুন্দর ও রামপ্রসাদী গানেরও হতাদর করা হয় নাই। এই কার্য্যটি বেলগাছির উদ্যানেই সমাধা হয়।' সাহিত্যসাধক চরিতমালা—৬৭ নং।

৮৩. 'হায়, সে বাগান আর আমাদের নাই'।
আমার বোম্বই প্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৬৯।

৮৪. In that year there were a hundred and eighty-nine competitors. Mr. Tagore offered himself for examination in six subjects— English Literature and History, English composition, French, Moral Science, Sanskrit and Arabic —got the highest marks...in Sanskrit and Arabic ; and came out forty-third of the selected fifty. Prof. Henry Moreley : All the year Round. 18th Sept. 1869.

৮৫. How is it that although we so fully explained the reasons of Satyendra's appointment to Bombay the Indian people have been attacking Govt. & Sir C. Wood. They say that Satyendra is appointed to Bombay because he is a Bengalee ! who gave them this information ? This must be a piece of Bazar Gup and I am sorry that

this has put Satyendra in a false position. ...Even the Indian Mirror writes on this subject.'—M. G's letter to Ganendranath, London, 26 November, 1863.

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যসাধক চরিতমালা : ৬৭নং । পৃ. ১৩

৮৬. ইন্দিরাদেবী সংকলিত : পুরাতনী। ২৮ নং পত্র আহমদনগর ২১শে জুন ১৮৬৮। জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য।

৮৭. Home ward Mail-এ Hodgson Pratt-লিখিত এই প্রতিবাদটি Hindoo Patriot পত্রিকায় জানুয়ারী ১৫, ১৮৬৬-তে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

৮৮. কলকাতায় ভার্নাকুলার লিটারেচার স্থাপনে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা, বংগদেশের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতিতে উৎসাহ প্রদান ও ইংরেজদের জীবন ও চিন্তাধারার সংগে বাঙালিদের নিকট সম্পর্ক স্থাপনে তাঁর প্রচেষ্টা এদেশে তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ১৮৪৭ সালে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কলকাতায় চাকরী নিয়ে এসে নিজের যোগ্যতায় বাংলা গবর্ণমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারীর পদ ও পরবর্তী কালে শিক্ষাবিভাগের ইনস্পেক্টারের পদ লাভ করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে 'ইকনমিস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধে ভারতের নানা সমস্যা আলোচিত হয়েছে। ১৮৬১তে স্বদেশে ফিরে গিয়ে বহু জনহিতকর কাজের সংগে যুক্ত থাকেন। (Dictionary of National Biography Second Supplement—Vol. III p. 122, Hodgson Pratt.)

৮৯. দ্র. দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমাধি অমিতাভ গুপ্ত। দেশ—সাহিত্যসংখ্যা ১৩৬৪, পৃ. ৯৪।

৯০. ১৮১৭ সালে বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ 'লিঙ্কনস ইন' থেকে ব্যারিস্টারী পাস করে ১৮২৬-এ কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে পিউনিজাজ হয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য দক্ষতায় কিছুদিন পরেই বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রধান বিচারপতির পদ পেয়েয়েছিলেন। ১৮৪৩-এ স্বদেশে ফিরে যান। Dictionary of Nationary Biography Vol XVII, p. 523.

১১. ১৮২৬-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটার, ১৮২৭-এ দিল্লীতে চার্লস মেটকাফের সহযোগী ; দিল্লীর উপকণ্ঠে 'ট্রাভিলিয়ান-পুর' নববসতি পরিকল্পনা। ১৮৩১ এ কলকাতায় রাজনৈতিক বিভাগের উপসচিব : ১৮৫৭তে মাদ্রাজের গবর্ণর পদে যোগদান। আপন মত প্রকাশে নির্ভীক ছিলেন বলেই কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে মাদ্রাজের গবর্ণর পদ ত্যাগ করে করে তাঁকে স্বদেশে ফিরে যেতে হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায়, ভারতের অর্থমন্ত্রীর পদে যোগদানের জন্য তাঁর আদেশ হয়। (দ্র. ৮৪ নং পাদটীকা)

Dictionary of National Biography Edited by Sidney Lee-Vol. XIX Trevelyan P. 1135

১২. হ্যালিডে ছিলেন বঙ্গের প্রথম লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর। ১৮২৫-এ বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগদান, ২৭ বছর কাজের পর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য স্বদেশে গমন ; ১৮৫৩ সালে পুনরায় গবর্ণর-এর কার্যভার গ্রহণ করেন। শিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, প্রেসিডেন্সি কলেজের উন্নতি ইত্যাদি বহুমুখী কাজের সঙ্গে ফ্রেডারিক জড়িত ছিলেন।

Ibid. Vol II.

১৩. Sometime ago when we were in London we were honoured by an unexpected visit from Sir Frederic Halliday whom we at first failed to recognise, but who introduced himself to us. ...We returned his visit a few days after his call.'

M. G's Latter to S. T. 2nd Dec., 1862

১৪. Sir Charles Trevelyan who is going to Calcutta by next mail, he introduced us to the eminent Sir Henry Holland Physician to the Queen.'

—M. G's Letter to Ganedranath ; 2nd Dec., 1862

১৫. We were invited by Sir Henry one morning to break-fast and were introduced to his wife Lady Holland...and the

two misses Holland. Sir Henry Holland showed us the room (where we were sitting) where your grandfather dined with him some eighteen years ago. Ibid.

৯৬. ১৮৪৫, ৮ই মার্চ দ্বারকানাথের দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা। মহর্ষি'র আত্মজীবনী : সময়সূচী।

৯৭. D. N. Bio. Vol IX-p. 715

৯৮. 'আমি একবার একটি সম্ভ্রান্ত উচ্চ পরিবার মধ্যে অতিথি রূপে কতিপয় দিবস যাপন করেছিলুম। গৃহে অনেকগুলি কন্যা কুমারী ছিলেন—সমস্ত গৃহকার্যে তাঁহাদেরই অধিপত্য। বিদায় নেবার সময় তাঁহাদের খাতায় স্মরণচিহ্নস্বরূপ আমি লিখেছিলুম—স্ত্রিয়ং শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই-প্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ৮

৯৯. One day Sir John in casual conversation asked us if we knew the eminent Dwarakanath Tagore who was in England some 18 years ago ; and he was very glad to learn that one of us was the grandson of the very man whom he knew.'

—M. Ghose's letter to Ganendranath 19th January, 1863

১০০. Mary Carpenter : The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy ; Preface. উক্ত গ্রন্থের Appendix C-তে। পৃ. ২৫২)।

১০১. আর্নোস ডেল এর 'ভিজিটার বুক'-এ স্বাক্ষরিত পৃষ্ঠা।

১০২. Ahmedabad, Guzrat, May 13, 1865

My dear Sir,

I promised when I had the pleasure of seeing you at Oxford, to send you some information on the tenets and working of the Brahma Samaj, I am afraid that the materials which I can lay before you are too scanty to be useful or satisfactory...' (Letter from Satyendranath

Tagore : The life and letters of Friedrich Max Muller : Vol. II. Appx. A., p. 443.

১০৩. 7 Norham Gardens Oxford

12 Oct., '84

My dear Sir,

...I had also the pleasure of knowing your son... If you write to your son Satyendranath, please remember me kindly to him....'

Yours faithfully,

F. Max Muller

দ্র. মহর্ষির পত্রাবলী, পৃ. ২২৬।

১০৪. 'Willes has left the Hall as you know, but he is now in London and comes to see me often and we talk about the claretluncheons and muffin-toasting of good old days.'

Monomohan's letter to Satyendranath.

18th Oct. 1864

University Hall, Gordon Sq.

১০৫. দু একটি ছাত্রের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা হয়েছিল। তাদের মধ্যে এখন কেবল একটির নাম (Schwanne) দেখতে পাই ; এক্ষণে পার্লা মেন্টের মেম্বর—আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৯১। বৈতানিক প্রকাশনী।

কর্মজীবন

(দ্বিতীয় পর্ব ১৮৬৪-১৮৯৭)

সত্যেন্দ্রনাথের নিজের কথায় জানা যাচ্ছে, ১৮৬৪ সালের নবেম্বর মাসে, সস্ত্রীক-কর্মক্ষেত্র বোম্বাইতে রওয়ানা হয়েছিলেন।[১] ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর জাহাজে চড়েই যাত্রা করেছিলেন, কারণ 'সে সময়ে বোম্বাই ও কলিকাতার বন্ধনী রেলগাড়ী ছিল না, 'প্রধানতঃ সমুদ্রের উপর দিয়েই গতিবিধি'[২] ছিল। নানা স্থানে থেমে থেমে জাহাজ চলতে 'প্রায় একমাস অতীত' হয়েছিলো। স্ত্রীকে জাহাজে ওঠানো নিয়ে যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়েছেন তা 'সমাজচিন্তা' অধ্যায়ে আলোচি ্ হবে।

মাদ্রাজে নেমে নিষ্ঠাবান নিরামিষাশী মুদলিয়ারের গৃহে দু-তিন দিন থেকেছেন। ইনিও কিছুদিন বিলাতে ছিলেন।[৩] ইতোমধ্যে ঝড়ের জন্য জাহাজ মাঝ-সমুদ্রে নিয়ে যেতে হয়েছিলো। যাত্রীদের দুর্ভোগের শেষ ছিল না। কিন্তু মুদলিয়ারের গৃহে আতিথ্য নেওয়ায় তাঁরা কিছুই জানতে পারেন নি। আর কোন বিঘ্ন হয় নি। বোম্বাইতে পেঁছলে এক সজ্জন পারসী 'মানক-জী কর্‌সদ-জী' তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এঁর গৃহে অতিথি হয়ে ছিলেন। এঁর সংগে পত্রে যোগাযোগ হয়েছিল।

বোম্বাইপ্রবাসে এই গৃহে অবস্থান—সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর জীবনে সর্বদিকেই সুফলপ্রসূ হয়েছে। জোড়াসাঁকোবাড়ির অবরোধপ্রথা থেকে মুক্ত হয়ে বোম্বাই সহরের উন্মুক্ত আবহাওয়ায় জ্ঞানদানন্দিনী প্রথমদিকে কিছুটা অসুবিধা বোধ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায়— 'পিঞ্জরের পাখীকে মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাসে ছাড়িয়া দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ কতকটা থতমত খাইয়া গিয়াছেন'।[৪]

মানকজী কর্‌সদ্‌জীর সুশিক্ষিতা দুই কন্যার সাহচর্যে জ্ঞানদানন্দিনী নূতন পরিবেশে ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন—তা তাঁর আত্মকথা ও সত্যেন্দ্রনাথের উক্তি থেকে বোঝা যায়।[৫] সত্যেন্দ্রনাথও

এই দুই কন্যার গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের মানকজীর গৃহের প্রদীপ বলেছেন। মানকজী 'আমোদপ্রিয়' ও কিছুটা 'আত্মশ্লাঘায় পরিপূর্ণ'। অবশ্য তার সংগত কারণও ছিল।[৬] ইংরেজিয়ানা চালচলনের পক্ষপাতী হয়েও নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ইনি রক্ষা করতেন। প্রভাতে 'জেন্দাবেস্তা'র মন্ত্র আবৃত্তি কোনদিন বাদ দিতেন না। 'পারসীমণ্ডলীর বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ করসদজী কামা'র সংগে বড় কন্যার যোগাযোগ ঘটে। সত্যেন্দ্রনাথ গৃহে থাকার সময়েই মানকজী এক সাহেবী ভোজ দিয়ে কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করেন। 'যুবরাজ পত্নী আলেক্সান্দ্রার নামে' মানকজী পারসী মেয়েদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় 'এটি তাঁর বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন'।[৭] ছোটো কন্যা অবিবাহিত থেকে এই স্কুলের কাজে ও পিতৃ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৮৬৫'র ৫ই জানুয়ারী থেকে ১৮৬৫'র ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে যতগুলি চিঠি লিখেছেন সবগুলির উপরেই VILLABYCULLA লেখা। এই তিন মাস মানকজীর গৃহে ছিলেন।

১৮৬৪ সালের ৩০শে জুলাই সত্যেন্দ্রনাথ সিভিলসার্ভিসভুক্ত হয়ে ১৮০৪'এর ১২ই ডিসেম্বর কর্মস্থল বোম্বাইতে উপনীত হন। তখনও তাঁর কোন নির্দিষ্ট পদে নিযুক্তির আদেশ হয়নি। কোন নির্দিষ্ট পদ পাওয়ার পূর্বে স্থানীয় ভাষায় পরীক্ষা পাশের বিধান ছিল। মাত্র এক পক্ষ কালের প্রস্তুতি নিয়ে জানুয়ারীর প্রথমেই তিনি হিন্দুস্থানী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এত অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে পরীক্ষায় পাশ করা তাঁর সম্ভব হয় নি। ১৮৬৪'র ৫ই জানুয়ারীর পত্রে গণেন্দ্রনাথকে লিখেছেন— ঐ দলের কেউই পাশ করতে পারেনি, এটাই যা সান্ত্বনা। সুতরাং পরের পরীক্ষা দেবার জন্য আরও তিন মাস মানকজীর গৃহে থাকতে হয়। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তিনি ৫ই জানুয়ারীর পত্রে (১৮৬৫) গণেন্দ্রনাথকে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড'এর হিন্দুস্থানী অনুবাদ পাঠাতে লিখেছেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৫'র চিঠিতেই গণেন্দ্রনাথের পাঠানো হিন্দুস্থানী পেনাল কোড পেয়ে খুসি হয়েছেন ও গুজরাটী ভাষা শিখতে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছেন একথা গণেন্দ্রনাথকে লিখেছেন। ৫ই এপ্রিলে (১৮৬৫) গণেন্দ্রনাথের চিঠিতে হিন্দুস্থানী ও গুজরাটীতে তাঁর ভালভাবে পাশের খবর আছে। স্যার বার্টল ফ্রেয়র[৮] সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রীর প্রতি 'যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়েছেন'।[৯] যাতে তাঁর 'প্রথম কর্মভূমির পথ পরিষ্কৃত

ও সুগম হয় তিনি সর্বতোভাবে তার ব্যবস্থা করেছিলেন'।[১০] এসময় নতুন পদে যোগদেবার আদেশের অপেক্ষায় দুজনেই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনীরও দেশ দেখার আকাঙ্ক্ষা তখন প্রবল হয়েছিল।

প্রথম কর্মস্থল—আমেদাবাদ

১৮৬৫ সালের ২৭শে এপ্রিল সত্যেন্দ্রনাথ আমেদাবাদে অতিরিক্ত সহকারী কলেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগ দেন। আমেদাবাদে প্রথম যাত্রাপথে সত্যেন্দ্রনাথের অন্যমনস্কতায় একটু মনোরম অ্যাডভেঞ্চার হয়েছিল তা জ্ঞানদা নন্দিনীর আত্মকথা থেকে জানা যায়। (পুরাতনী; পৃ. ৩১)। গন্তব্য স্টেশন ছেড়ে ট্রেন অনেকদূর চলে গিয়েছিল— সত্যেন্দ্রনাথ তা খেয়ালই করেন নি। সংগের সহযাত্রী ছিলেন সুরাটের নবাব। তিনি তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন ও সমারোহপূর্ণ আতিথ্যের আয়োজন করলেন। জ্ঞানদানন্দিনীর চোখে সবই নতুন ঠেকছিল। পরদিন নবাব আমেদাবাদ যাবার গাড়িতে তুলে দিলেন।

আমেদাবাদে কাজে যোগ দিয়েই সত্যেন্দ্রনাথকে ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার জন্য আবার প্রস্তুত হতে হয়েছে। বোম্বাইতে যেমন নানা জাতির বৈচিত্র্য—আমেদাবাদে তা নেই। সত্যেন্দ্রনাথের কথায়—'এখানে একই জাতির প্রাধান্য— একই জাতীয় ভাব'। মাঝে মাঝে আমেদাবাদের বৃষ্টিহীন রুক্ষ প্রকৃতি সত্যেন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে। সত্যেন্দ্রনাথ এই সময় পিতামহ দ্বারকানাথ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সমন্বিত একটি 'পামপ্লেট' বের করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেজন্য গণেন্দ্রনাথের বিলাতে যাত্রার পূর্বে টাউন-হলে সম্বর্ধনার বিবরণটি পাঠাতে অনুরোধ করেছেন।[১১]

তাছাড়া স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে আমেদাবাদে একটি 'লিটারারি ক্লাব' স্থাপন করতেও তিনি উৎসাহিত হন।[১২]

ইতোমধ্যে আমেদাবাদে নতুনসংসারে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও আসবাবের অভাব হওয়াতে বাধ্য হয়েই সত্যেন্দ্রনাথ সেগুলি বোম্বাই থেকে কিনে আনেন ও বিলটি অনুমোদনের জন্য মহর্ষির কাছে পাঠান। টাকার অংকটা একটু বেশি হওয়ায় পাছে মহর্ষি বিরক্ত হন, সেজন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন।[১৩]

'জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা'য় এ ব্যাপারে একটিন বিস্কুট সামনে নিয়ে—

নতুন সংসারী দুশ্চিন্তার চিত্র উপভোগ্য রূপে বর্ণিত হয়েছে।[১৪] পুত্রকে একটু সচেতন করার উদ্দেশ্যেই মহর্ষি প্রথমে গররাজি হয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকাটা পাঠিয়েছিলেন তা সংজ্ঞা দেবীর বক্তব্য থেকেও জানা যায়।[১৫]

অনেক দুশ্চিন্তার পর মহর্ষির কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন আশ্বস্ত হয়েছেন তেমনি পাছে মহর্ষি তাঁকে ভুল না বোঝেন সেজন্য বিনীত ভাবে গণেন্দ্রনাথকে লিখেছেন— It is not the extravagant propensities of the Tagores that urged me to spend so much money.

—Satyendranath's letter : Camp Dholiera, 27th May, 1866

১৮৬৬ সালের মে মাসে, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে জনগণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য কালেকটরের আদেশে সত্যেন্দ্রনাথকে ধলেরা, 'ধংধুকা' ইত্যাদি স্থানে ক্যাম্প করে থাকতে হয়। প্রথমে জ্ঞানদানন্দিনীও সঙ্গে গিয়েছিলেন। ২৭শে মে (১৮৬৬) 'ধলেরা' ক্যাম্প থেকে গণেন্দ্রনাথকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্রে জানা যায়— ক্যাম্পে অত্যধিক গরমে পাছে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন— এই ভয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে আমেদাবাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ১৯৬৬'র ৩১শে মে সত্যেন্দ্রনাথ ধংধুকা ক্যাম্প থেকে জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখেছেন—'ধোলেরায় জল আনিবার পয়সার জন্য এখানকার লোকদিগকেও উত্তেজনা দিবার জন্য 'কলেক্‌টর সাহেব' আমাকে লিখিয়াছেন। আমি নিশ্চয় জানি এক পাইও এ লোকদের নিকট হইতে আদায় হইবার নয়, কি করি, বড়সাহেবের অনুজ্ঞা... ।[১৬]

গরীব রায়তদের কাছে অর্থের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যে বৃথা তা সত্যেন্দ্রনাথ যেমন অনুভব করেছেন—তাঁর উপরওয়ালা বিদেশী কালেকটরের পক্ষে তা অসম্ভব ছিল—সত্যেন্দ্রনাথের এই পত্রে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

প্রথম ছুটিতে জোড়াসাঁকোয় আগমন : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসগঠনে উদ্‌যোগ।

ক্যাম্প থেকে আমেদাবাদে ফিরে গিয়ে মাস চারেক পরেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য পাঁচ মাস দশ দিনের ছুটি নিয়ে (১৮৬৬'র ২৮শে অক্টোবর থেকে ১৮৬৭'র ৭ই এপ্রিল) সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন। প্রায় দু'বছর পর আবার সস্ত্রীক পৈতৃকভবনে এলেন। ঘরের বধূকে মেমের মতো গাড়ি থেকে নামতে দেখে বাড়িতে শোকাভিনয় হলেও সত্যেন্দ্রনাথ তাতে বিচলিত

হলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় মেজদাদা গণেন্দ্রনাথ সব সময়েই তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন। জ্ঞানদানন্দিনীর বোম্বাই ফ্যাসনে শাড়ী পরা, স্বামীর সঙ্গে এক টেবিলে খাওয়া-দাওয়া, মেয়েমহলকে হতবাক করে দিল। এসময় ভয়ে ভয়ে বাড়ির মেয়েরা দূরেই থেকেছেন। তাছাড়া মনোমোহন ঘোষ ব্যারিস্টারী পাশ করে বিলাত থেকে আসায় এই ছুটির সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ কিছুদিন তাঁর সঙ্গে কাশীপুরের বাগানবাড়িতে ছিলেন। মনোমোহন ঘোষের কাছে ফরাসী ভাষা শিখতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন। মেজবৌঠাকুরাণী জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে বোম্বাই-এর গল্প, সমুদ্রের বর্ণনা শুনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বোম্বাই যেতে খুবই আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ. পরীক্ষা না দিয়েই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেদাবাদে চলে যান। গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের অনেকগুলি পত্রেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সেতার শিক্ষা, ড্রইং শিক্ষা ও ফরাসী শিক্ষার জন্য তিনি যে বিশেষ ভাবে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন তা জানা যায়।[১৭]

দ্বিতীয় বার অসুখে ছুটি

১৮৬৭'র ৪ঠা সেপ্টেম্বরে গণেন্দ্রনাথকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিতে জানা যায় যে সত্যেন্দ্রনাথেরও দুবার জ্বর হয়েছিল—আমেদাবাদের জলবায়ু ঐ সময় তাঁদের সহ্য হচ্ছিল না—ইত্যাদি কারণে সত্যেন্দ্রনাথ বদলির আবেদন করেন। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের পায়ে দীর্ঘস্থায়ী বাতের যন্ত্রণাও আবার শুরু হয়, সেজন্য দীর্ঘ আট মাসের ছুটি নিয়ে (১৮৬৭'র ১৬ই অক্টোবর—১৮৬৮'র ১৫ই জুন) আবার কলকাতায় আসেন। ঐ সময় চলাফেরা করতে তাঁর কষ্ট হোত, তাই এবারেও গণেন্দ্রনাথ ওবাড়ি থেকে[১৮] প্রতিদিন এসে আদরযত্নে গল্পেসল্পে তাঁকে ভুলিয়ে রাখতেন। সত্যেন্দ্রনাথের আরামচৌকির চারপাশে বন্ধুবান্ধবেরা ঘিরে বসতেন। সত্যেন্দ্রনাথের কথায়—'ঠিক যেন একটি দরবার বসেছে।' (আমার বাল্যকথা ; পৃ. ৫৪।) যন্ত্রণার মধ্যেও এই ছিল তাঁর আনন্দ। সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণনায়—"O pain! where is thy sting?[১৯]

সুশীলা বীরসিংহ নাটক'প্রকাশ : হিন্দুমেলায় অংশগ্রহণ।

এই ছুটির সময়েই সত্যেন্দ্রনাথের সুশীলা বীরসিংহ নাটক প্রকাশিত হয়। হিন্দুমেলার জন্য এসময় দ্বিজেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথ সকলেই স্বদেশী গান লিখছেন। হিন্দুমেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকেও মেলা উপলক্ষে একটি গান লিখতে বলেন। সকলকে স্বদেশীগান লিখতে দেখে সত্যেন্দ্র-নাথেরও ইচ্ছা জাগে। একটু সুস্থ হয়ে তিনি তা কার্যে পরিণত করেছিলেন।[২০]

স্থলপথে বোম্বাই

কলকাতায় ছুটিতে আসার আগেই সত্যেন্দ্রনাথ যে বদলির আবেদন করে এসেছিলেন, তার ফলে ১৮৬৭ সালের ২৪শে ডিসেম্বরেই তাঁর আহম্মদনগরে বদলির আদেশ হয়। ১৮৬৮ সালের ১৫ জুন পর্যন্ত তাঁর দ্বিতীয় অসুখের ছুটি ছিল সেকথা পূর্বে বলা হয়েছে। ১৮৬৮ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহেই তিনি একা স্থলপথে রওয়ানা হন। জ্ঞানদানন্দিনী সে সময় সন্তানসম্ভবা ছিলেন, সেজন্য তাঁকে নিরাপদে থাকার জন্য জোড়াসাঁকোয় রেখে যান। এই সময় স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষাল জ্ঞানদানন্দিনীকে দেখাশোনা করেছেন। সৌদামিনী দেবীর স্নেহমধুর আচরণও জ্ঞানদানন্দিনী স্মরণে রেখেছেন। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের দিদিমা (সারদাদেবীর খুড়িমা) তাঁকে বরাবর দেখাশোনা করতেন।

স্থলপথে এলাহাবাদ, জব্বলপুর ও নাগপুর হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই পেঁছান। বোম্বাইতে 'হোপ হল হোটেলে' সংলগ্ন বাংলাতে বন্ধু 'গোবিন্দ কড়কড়ে'র সংগে সপ্তাহখানেক ছিলেন। ১লা জুন (১৮৬৮) 'হোপ্ হল হোটেল' থেকে সত্যেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে স্পষ্টই লিখেছেন—ইচ্ছে করলে কলকাতা থেকে বোম্বাই পাঁচ দিনেই আসা যায়। তিনি পথে বিশ্রাম নিয়েছেন বলেই তাঁর বোম্বাই পেঁছতে সাত দিন লেগেছে। সত্যেন্দ্রনাথ এলাহাবাদে রামেশ্বরের[২১] ফলবাগানে চারু ও নীলকমল মিত্রের[২২] সংগে বনভোজনের মধুর কথা যেমন জ্ঞানদানন্দিনীকে চিঠিতে লিখেছেন, তেমনি পথের কষ্টের কথাও তাঁকে লিখেছেন। জব্বলপুরে সেই হোটেলে উঠেছিলেন যেখানে গত যাত্রায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্য টাকা

ঠাকুরবাড়ীর প্রতীকচিহ্ন

জমা দিয়েও ঘর পাওয়া যায় নি। জব্বলপুর থেকে নাগপুর পর্যন্ত ডাকবাহী ঘোড়ার গাড়িতে ক্লান্তিকর যাত্রা, অসহ্য গরমে অস্থির হয়ে নাগপুর থেকে বোম্বাই পর্যন্ত ট্রেনযাত্রার সকল কথাই পত্নীকে লেখা তাঁর অনেকগুলি চিঠিতে উল্লিখিত।[২৩] 'হোপ্ হল হোটেল' থেকে ১লা জুনে গণেন্দ্রনাথকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিতেই জানা যায়—ঐ সময় পিতার সংগে সাক্ষাতের জন্যও সত্যেন্দ্রনাথ অধীর ছিলেন। সেসময় দেবেন্দ্রনাথ পার্বতা প্রদেশে আবার ভ্রমণে বেরিয়েছেন। যদি তিনি হঠাৎ এসে তাঁকে চমকে দেন সে শুভ মুহূর্তের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করেছিলেন।[২৪]

আহম্মদনগরের কথা : সহকারী জজের পদ প্রাপ্তি

কলকাতা থেকে যাতায়াতে ও বোম্বাই অবস্থানে সত্যেন্দ্রনাথের অসুখের ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে আসে। পুণা হয়ে তিনি আহম্মদনগর যাত্রা করেন। পুণায় পার্বতী মন্দির ও খিড়কীর রণক্ষেত্র দেখে যান। আহম্মদনগরে প্রথমে ছোট আদালতের জজ্ ভাস্কর দামোদরের বাড়িতে উঠেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের জন্য যে বাড়িটা পাওয়া গেল তার আকৃতি মুসলমানের গোরমন্দিরের মতো—আগে গোরস্থানই ছিল—বর্তমানে বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। 'উপরে একটি ঘর, নীচে দুই ঘর'। তবে বাড়িতে কোন ভৌতিক উপদ্রব হয় নি একথা মজা করে জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখেছেন।[২৫] ১৮৬৮'র ১৬ই জুন সত্যেন্দ্রনাথ আহম্মদনগরে সেকেণ্ড অ্যাসিসটেণ্ট কলেক্টরের পদে যোগদান করেন। তখনও ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা আসে নি।[২৬] আহম্মদনগরে এতদিন অন্যায়ভাবে 'ওয়ারডেন'কে অ্যাসিসটেণ্ট জজের পদে বহাল করা হয়েছিল। এবিষয়ে আগেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সত্যেন্দ্রনাথের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে, কারণ—তিনি আহম্মদনগরে পৌঁছানোর কয়েক দিন পরেই 'ওয়ারডেন' এর বদলির আদেশ হয় ও ঐ পদে সত্যেন্দ্রনাথ অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। অস্থায়ী ভাবে অ্যাসিসটেণ্ট জজের কার্যভার নিয়েও সত্যেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখেছেন—"পক্কা না হইলে সন্তুষ্ট হইতেছি না।"[২৭]

তখনকার দিনে জজের পদে মর্যাদা বেশি আছে বলেই অনেক লোকের ধারণা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের ভগ্নীপতি 'যদু' এ-খবরটা শুনলে খুশী হবেন

সেজন্য সত্যেন্দ্রনাথ এই খবরটি তাঁকে বলার জন্য গণেন্দ্রনাথকে চিঠিতে অনুরোধ করেছেন।[২৮]

জোড়াসাঁকোয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ

এই সময় জ্ঞানদানন্দিনীর চিঠিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাব জেনে সত্যেন্দ্রনাথ একটুও খুশী হতে পারেন নি। প্রথমত তাঁর মতে কন্যার বিবাহের বয়স হয় নি।[২৯] দ্বিতীয়ত পাত্রেরও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আরও শিক্ষার প্রয়োজন। সেজন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ উৎসবে যে টাকাটা ব্যয় হবে তা দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বিলাত পাঠিয়ে সুশিক্ষিত করে আনার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ মহর্ষির নিকট আবেদন করবেন বলে জ্ঞানদা-নন্দিনীকে লিখেছেন।[৩০] সত্যেন্দ্রনাথের আপত্তির উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন বিলাত না গিয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এদেশে থেকেই উন্নতি করতে পারবেন।[৩১] সত্যেন্দ্রনাথের আবেদন গৃহীত না হওয়ায় তিনি যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তা গণেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠিতে স্পষ্ট জানা যায়।[৩২] কিন্তু তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে, ঐ বিবাহ[৩৩] হওয়ায় মহর্ষি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ও সত্যেন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে সব কথা লিখেছিলেন।[৩৪]

যাই হোক শেষ পর্যন্ত বিবাহ যখন হয়েই গেল তখন নিজের মতের চেয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনস্তুষ্টির কথাই বড় মনে করেছেন। তিনি সুখী হলেই সত্যেন্দ্রনাথ আনন্দিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহে জ্ঞানদানন্দিনীর যোগ দেওয়ার সাধ ছিল—সেটা পূর্ণ হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ প্রীত হয়েছেন—অনুজ সম্পর্কে গভীর আগ্রহে জানতে চেয়েছেন—'নতুন বৌকে কি তাহার বেশ মনে ধরিয়াছে?'[৩৫] নববধূর প্রাপ্য আদর-মর্যাদাদানে সত্যেন্দ্রনাথ বিরত থাকেন নি। যথারীতি তাঁর কর্মস্থলে নববধূকে আমন্ত্রণ জানিছেন :

আহম্মদনগরে জীবনযাত্রা

জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রাবলী থেকে (পুরাতনী) আহম্মদনগরে সত্যেন্দ্রনাথের একক জীবনযাত্রার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। পরিবেশের পরিবর্তনে কিছুটা এদিক সেদিক হলেও মোটামুটি ভাবে একই ধরণের জীবনযাত্রা পরবর্তী সময়েও অনুসৃত হয়েছে বলে মনে

করা যেতে পারে। সিভিলিয়ান হিসাবে 'ভারতবর্ষীয়-ইংরাজদের' সমাজে তাঁকে মিশতে হয়েছে। কিন্তু এদিকে তাঁর কোন আন্তরিক আকর্ষণ ছিল না।[৩৬] ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের পার্টি, নাচ, ঘোড়দৌড় ও croquet খেলার চেয়ে ছুটির দিনগুলো 'সলাবত খাঁ'র পাহাড়, 'চাঁদবিবি'র পাহাড় ও 'মঞ্জর সুম্বা'র পাহাড়ে কাটিয়ে অনেক বেশি তৃপ্তি পেতেন। হৈ হুল্লোড় ছাড়া নির্জনপ্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝে মগ্ন থেকে বেশি আনন্দ পেতেন। এ সকল যাত্রায়, কোন বিশিষ্ট বন্ধু ও পরিজনদের কাউকে সংগে নিতেন। ঘোড়ায় চড়ে যেতেই তিনি ভালবাসতেন। আহম্মদনগরে পূর্বোক্ত পায়ের ব্যথায় কয়েকদিন ঘোড়ায় চড়তে না পেরে মানসিক কষ্ট ভোগ করেছেন। তাছাড়া তাঁর পশুপালন প্রীতিও কম ছিল না। এদিকেও তাঁর কিছুটা সময় আনন্দে কাটতো। সবৎসা গাভী, দুই 'টাইনি' কুকুর, ফিটনের দুই টাট্টু—'সন্তী' ও 'মন্তী'র প্রশংসা পত্নীকে লেখা তাঁর অনেক চিঠিতেই আছে।[৩৭] এর উপর জ্ঞানদানন্দিনীর পছন্দসই আরও একটি 'ছোট ঘোড়া' তিনি কিনতে চেয়েছেন।[৩৮] সন্ধ্যায় একা হেঁটে বেড়ানো, রাতে খাওয়ার পর অধ্যয়ন ইত্যাদি নিয়ে আপন মনে থাকতেই তিনি ভালবাসতেন।

ইংরেজসমাজের রীতি অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি 'কল' করে বেড়ানো অনেক সময়েই তাঁর ভালো লাগে নি: অথচ ঐ সমাজে তাঁকে তা পালন করতে হয়েছে। ইংরেজ মহিলাদের চালচলন অনেক সময়েই তাঁর চোখ কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে—কিন্তু যথাসম্ভব ইংরাজ সমাজে সদ্ভাব রক্ষা করে চলেছেন—মাসে মাসে নিজের গৃহেও ওদের নিয়ে পার্টি দিয়েছেন। প্রথম যৌবনে লণ্ডনে নাচের মজলিস—যেমন নতুন ও আমোদপ্রদ লেগেছে—কর্মজীবনে আর তা ভালো লাগেনি। ভারতীয় ভাবধারার সংগে ঐ বলনাচ বেমানান হলেও, এর মধ্যে দূষ্য কিছু তিনি পান নি।[৩৯] ঐ সময় জোড়াসাঁকো বাড়ি থেকে অন্যত্র কোন স্থানে বা বাগান বাড়িতে জ্ঞানদানন্দিনী পৃথক ভাবে কিছুদিন থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন। মহর্ষি ভ্রমণশেষে জোড়াসাঁকোয় ফিরে এল তাঁর থাকার অসুবিধা হবে, মেয়েমহলে এধরণের কথা উঠেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করে চিঠিতে লিখেছেন—এ ধারণা অমূলক। তেতলা দোতলা যেখানে খুশি জ্ঞানদানন্দিনী থাকতে পারবেন। মহর্ষির তাতে কোন অসুবিধা বা আপত্তি হবে না। সত্যেন্দ্রনাথ তার হাতখরচ বাবদ যে ১০০৲ টাকা

মহর্ষিকে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন সেটাও প্রথমে একটু আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত তিনি অনুমোদনই করেছেন ও সেই টাকা কাছারী থেকে জ্ঞানদানন্দিনীর হাতে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। বিশেষত জ্ঞানদানন্দিনীর শরীরের ঐ অবস্থায় তাঁর অন্যত্র থাকা ঠিক হবে না বলেই সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন।

এত যত্নে ও সাবধানে থাকার পরেও দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। জ্ঞানদানন্দিনীর একটি পুত্রসন্তান নির্বিঘ্নে হওয়ার দিন দুই পরেই শিশুটির মৃত্যু হয়। ১১ই অক্টোবর (১৮৬৮) জানকীনাথ ঘোষাল পুত্রসন্তান হওয়ার এই সুখবর তাঁকে দিয়েছেন। ১৩ই অক্টোবরে মর্মাহত জ্ঞানদানন্দিনী এই নিদারুণ সংবাদ তাঁকে দেন। এতদিনের আশা একনিমেষেই বিলীন হতে যাওয়াতে বেদনার মধ্যেও স্থির থেকে পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন —'জন্মমৃত্যুর উপর আমাদের ত হাত নাই।' এখন সুস্থ হয়ে জ্ঞানদানন্দিনী ফিরে আসবেন এই প্রতীক্ষায় দিন গুণেছেন।

স্থায়ী সহকারী জজ ও সেসন জজ

১৮৬৮ সালের ১৯শে অক্টোবর ধারওয়ারের স্থায়ী সহকারী জজ ও সেসন জজের পদে তিনি নিযুক্ত হন। তবে ধারওয়ারে না গিয়েও আহম্মদনগরেই কাজ করতে থাকেন তা পত্নীকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে স্পষ্ট জানা যায়। বিশেষত ধারওয়ারের ভাষা কানাড়ী, সেই ভাষা শিক্ষার দিকেও মন দিতে হবে—চিঠিতে একথাও রয়েছে।[৪০]

মারাঠীতে আরও বড় পরীক্ষা দেবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ঐ সময় মারাঠী পণ্ডিতের কাছেও পড়াশুনা করেছিলেন। সংস্কৃতেও একটি পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা তাঁর মনে ছিল: সেজন্য জ্ঞানদানন্দিনীকে রঘুবংশ, কাব্যসংগ্রহ হিতোপদেশ (Johnson's) শকুন্তলা ও মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্‌-এর সংস্কৃত গ্রামার সংগে নিয়ে আসতে লিখেছেন।[৪১] তাছাড়া ঐ সময় Annals of Rural Bengal ও A Brief History of Tagore Family গভীর আগ্রহের সংগে করেছেন। প্রথম গ্রন্থটি থেকে বাংলাদেশে মনুলিখিত[৪২] জাতিভেদ নাই, একথা জেনে খুব অবাক হয়েছেন আর দ্বিতীয় গ্রন্থ থেকে ঠাকুরবংশের পূর্ব-পুরুষদের কথা বিশেষ ভাবে জানতে উৎসুক হয়েছেন—কারণ ভট্টনারায়ণ, জগন্নাথ হলায়ুধ—ওদেশেও বিশেষ পরিচিত।

১৮৬৮'র খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে সত্যেন্দ্রনাথ 'ব্রোচ' এর প্রদর্শনী দেখতে যান। সেই সংগে বোম্বাই ও আমেদাবাদেও ঘুরে আসেন। ছুটি থেকে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বদলির আদেশ পান। ২৮শে জানুয়ারী (১৮৬৯) জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখছেন—"আহম্মদনগর দেখা তোমার ভাগ্যে ঘটিল না, সেতারায় আমার কর্ম হইয়াছে।"[৪৩]

জ্ঞানদানন্দিনী ২রা ফেব্রুয়ারি নাগাদ বোম্বাই পৌঁছাবেন একথা তারযোগে জানান। তিনি যাতে বোম্বাইতে কয়েকদিন পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে আসতে পারেন, তার সব রকম সুব্যবস্থার দিকে সত্যেন্দ্রনাথের প্রখর দৃষ্টি ছিল। ৮ই ফেব্রুয়ারি (১৮৬৯) সাতারায় সহকারী জজের স্থায়ী পদে তিনি যোগদান করেন।

সাতারা

সাতারা 'শিবাজী ও তাঁর বংশধর রাজগণের বাসস্থান'। বংশধরদের মধ্যে অতীত গৌরবের ছিটে-ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই দেখে সত্যেন্দ্রনাথ হতাশ হয়েছেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে রাজবাড়িতে শিবাজীর বাঘনখটি দেখেছেন। সাতারাকে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন "ঐতিহাসিক শোভনপুরী"। এখানে দুবার এসেছেন। দূরের পাহাড় মনোরম আবহাওয়া সব মিলে সাতারা তাঁর ভালো লেগেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ কর্মজীবনে বিদায় নিয়েছেন এই সাতারা থেকেই। সুতরাং সাতরার কথা যথাস্থানে পুনরায় আলোচিত হবে।

ধুলিয়ায় জনপ্রিয়তা : ন্যায়নিষ্ঠ বিচার : বিদায় সম্বর্ধনা

সাতারায় যোগদান করার মাস দুয়েক পরেই ১৮৬৯ খ্রী. ৭ই এপ্রিল ধুলিয়ার সেকেণ্ড গ্রেড জজ ও সেসন জজ-এর স্থায়ী পদে সত্যেন্দ্রনাথের বদলির আদেশ হয়। এই পদে ধুলিয়াতে ছিলেন প্রায় দুই বছর। এখানে একটি বিশেষ ঘটনা সত্যেন্দ্রনাথের প্রশাসনিক দক্ষতার নজির হিসেবে উল্লেখ্য।

'নিরীহ প্রকৃতির 'ভালোমানুষ[৪৪] সত্যেন্দ্রনাথ বিচারাসনে বসলে ন্যায়ের সত্যপথ রক্ষায় কঠিন ও নির্ভীক হয়ে যেতেন—এই ঘটনায় তা প্রমাণিত হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে সাহেবদের সংগে মিলে মিশে চলতেন বলেই বিচারকরূপে সাহেবদের অন্যায়কে সমর্থন করবেন, এ চিন্তাও সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ঘৃণ্য

ছিল। কাজেই তাঁর অকুণ্ঠিত রায়প্রদানে তখন ইংরেজ সমাজের টনক নড়েছিলো—প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে তুমুল হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হয়েছিল তা সত্যেন্দ্রনাথের কথায় জানা যায়।[৪৫] তাঁর বিরুদ্ধে ঝড়ঝাপটার কালো মেঘ ঘনিয়ে এলে ও তিনি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি, স্থির বিশ্বাসে অটল ছিলেন। মনে মনে জানতেন যদি আইনানুগ পথে খুঁটিয়ে দেখা হয়, তবে সাদা আদমীদেরই শিক্ষা হবে।

সতেন্দ্রনাথের এই নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গী ও অনমনীয় মনোভাবই ধুলিয়ায় সত্যেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি করেছে।[৪৬] ধুলিয়া থেকে তাঁর বদলির সময়ে জনগণের তরফ থেকে যে বিদায়সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছিল, তাতে পাঁচশত জনতার সমাবেশ হয়েছিল। এতে ইংরেজসমাজে আরও গাত্রদাহের সৃষ্টি হয়। সরকারের 'অনুমতি' ভিন্ন এ ধরণের অ্যাড্রেস নেওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথকে কৈফিয়ৎ তলব করা হয় ও সেই থেকে এই নিয়ম কড়াকড়িভাবে জারী হয় যে সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন সরকারী কর্মচারী এ ধরণের অ্যাড্রেস নিতে পারবেন না।[৪৭] ঐ সভায় ধুলিয়া হাই স্কুলের হেডমাষ্টার মিষ্টার জি. এ মানকর 'অভিনন্দন বাণী' পাঠ করেন—সেখানে ন্যায়নিষ্ঠ ভারতীয় জনগণের একান্ত নিকটজন বলা হয়েছে।[৪৮] তৎকালীন 'নেটিভ ওপিনিয়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বিদায়ী ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে জনতার উচ্ছ্বাসময়[৪৯] অভিব্যক্তি থেকেই সভাটি কেমন প্রাণবন্ত হয়েছিল তা বোঝা যায়। জনতার ভালবাসায় সত্যেন্দ্রনাথ যেমন অভিভূত হয়েছেন, তেমনি এখানেও সত্যপথের আলোকদানে নির্ভীক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। জনতার মধ্যে প্রাচীনপন্থীরাও ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিনয়ের সঙ্গে অথচ অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁদের প্রতি পুরানো সংস্কার ঝেড়ে ফেলে নবযুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হতে আহ্বান জানিয়েছেন। সংকীর্ণতার প্রাচীর মানুষের অগ্রগতির পথ যে ব্যাহত করে সে সম্পর্কে নিজের বংশের ইতিহাস দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ঠাকুরবংশের আদিপুরুষ প্রখ্যাত ভট্টনারায়ণকে নিয়ে যেমন তাঁর গর্বের সীমা নেই, তেমনি যবনস্পৃষ্টতার অভিযোগে যাঁরা একদিন পিরালীশাখার সৃষ্টি করেছিলেন, এঁদের প্রতি ও সত্যেন্দ্রনাথের অনুকম্পার শেষ নেই। ব্রাহ্মণত্বের গৌরবের সুউচ্চ ভূমি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এই পিরালী শাখায় সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছে বলেই কালাপানি অতিক্রম করা

তাঁর সহজ হয়েছে। কারণ তাঁর পূর্বপুরুষ সংস্কার বর্জিত স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন মনোভাব নিয়েই এসেছিলেন।[৫০]

পুণা ও কালাদগির স্মৃতি : পুত্রকন্যার জন্ম

১৮৭১ সালের ২৮শে মার্চ সহকারী জজের পদে সত্যেন্দ্রনাথ পুণায় যোগদান করেন। এখানে সহকারী জজের কাজের অতিরিক্ত, দক্ষিণ সর্দারদের Political Agent এর কাজও তাঁকে করতে হয়েছে। এই কাজ করতে সত্যেন্দ্রনাথ একটুও ক্লান্ত বোধ করেন নি—বরং সর্দারদের খোঁজ খবর নেওয়া, বৎসরান্তে একবার দরবার আহ্বান করা ইত্যাদিতে তিনি আনন্দই পেয়েছেন।

পুণায় মুলা ও মুঠা—দুই নদীর সংগমের সন্নিকটে সত্যেন্দ্রনাথের বাংলো ছিল বলে সরলা দেবী উল্লেখ করেছেন।[৫১] জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথায় এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[৫২] সত্যেন্দ্রনাথের কথায়—"এই পুণ্য সংগমে পুণার বিশেষ মাহাত্ম্য"। পুণার 'বাঁধ-উদ্যানে' সান্ধ্য সমীরণ উপভোগের কথা দীর্ঘদিন তাঁর স্মরণে ছিল। পুণা প্রার্থনা সমাজে মারাঠী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি অনেকেরই হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

একটি বিশেষ ঘটনার জন্য পুণার স্মৃতি এঁদের মনে কিছুতেই মলিন হয় নি। দীর্ঘদিনের আকাংক্ষা পূরণ করে—১৮৭২ এর ২৬শে জুলাই এখানে পুত্র সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। সেজন্যই বড় হয়ে সুরেন্দ্রনাথ মজা করে বলতেন ইংরেজদের দু-চোখের বিষ—'বেংগলি বাবু' ও 'পুণা-ব্রাহ্মণ'—তিনি একাধারে তাই।

সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'পুণায় বদলী হইয়া অবধি জজীয়তি কার্য্যে আমার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল'।[৫৩] এ সময় তাঁর কর্মজীবনে দ্রুত পরিবর্তন থেকে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।[৫৪]

পুণায় প্রায় এক বছর কয়েক মাস মতো কাজ করার পরেই ঠানায় জয়েণ্ট জজের পদে ন'মাস মতো কাজ করেছিলেন, তারপর, মাস তিনেক আহম্মদ-নগরে থাকার পরেই ১৮৭৩-এ কালাদ্গিতে সিনিয়র অ্যাসিট্যাণ্ট জজের কর্মভার গ্রহণ করেন। দুবছরের উপর কালাদ্গিতে ছিলেন। তাঁর জীবনে কালাদ্গি পর্ব বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ১৮৭৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর এখানেই কন্যা ইন্দিরার জন্ম হয়। প্রসংগত জ্ঞানদানন্দিনী এসময় একটু

অসুস্থ থাকায় সাময়িক কন্যাপালনের ভার যাকে ধাত্রী আমিনার উপর। পশ্চিমের হিন্দুস্থানী দাসীদের মুখে মুখে শিশুকালেই কন্যা ইন্দিরার 'বিবি' নাম প্রচলিত হয়।[৫৫] এখান থেকেই প্রমোশন পেয়ে ১৮৭৫ এর ৩০শে আগস্ট সিন্ধু—হাইদ্রাবাদে জেলা জজের কর্মভার গ্রহণ করেন সিন্ধুদেশ শুকনো মরুভূমির দেশ হলেও এখানে সন্ধ্যায় সিন্ধু নদীর তীরে বেড়ানো ও নৌভ্রমণ তাঁর কাছে পরম রমণীয় বলে মনে হোত। একজন শিখ যুবক এঁদের সংগী হতেন। তাঁর কণ্ঠের শিখ-ভজনের ধবনির সংগে সিন্ধুর কল্লোলিত তান মিশে প্রদোষের মুহূর্তগুলিকে অনন্তসুধায় ভরে দিতো—জ্ঞানদানন্দিনীর আত্ম-কথায়ও এর উল্লেখ আছে।[৫৬]

১৮৭৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সিন্ধু-হাইদ্রাবাদে ব্রাহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে সত্যেন্দ্রনাথ উৎসাহের সংগে ভাষণ দিয়েছেন। সেখানকার ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী নেতা 'নবল-রাও-আড়বাণ'কে[৫৭] পেয়ে সামাজিক সংস্কার সাধনেও সত্যেন্দ্রনাথ ব্রতী হয়েছিলেন।

আমেদাবাদ : প্রথম ফার্লো

সিন্ধু হায়দ্রাবাদে প্রায় সাত মাস থাকার পরেই সত্যেন্দ্রনাথ আমেদাবাদে অস্থায়ী ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ-এর কার্যভার গ্রহন করেন। এখানে 'শাহিবাগে জজের বাসা' ও বালুকা-শয্যায় উপর সবরমতী নদীর বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে অংকিত।

১৮৭৮এ এখান থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ফার্লো ছুটিতে বিলাতে যাওয়া স্থির করেন। সেপ্টেম্বরে ফার্লো পাওয়ার আগেই জ্ঞানদানন্দিনীকে পুত্র-কন্যাসহ এক ইংরেজ দম্পতির সংগে বিলাতে পাঠিয়ে দেন। সংগে সুরাটী চাকর 'রামা'-ও গিয়েছিল। তাছাড়া একজন মুসলমান চাকর বিলাত পর্যন্ত তাঁকে পেঁছে দিয়ে আসে। জাহাজে সমুদ্র-পীড়ার সময় জ্ঞানদানন্দিনী এর কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছেন। এই ব্যবস্থায়—স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা একটু বেশি দিন বিলাতে থাকবার সুযোগ পাবেন, ও পথে ইংরাজ দম্পতির সান্নিধ্যে বিদেশের ভাষা ও রীতিনীতি সহজেই রপ্ত হবে, একথাই তিনি প্রধানত ভেবেছেন।[৫৮] রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যাও বলেন—গরমের সময় গেলে শিশুরা লণ্ডনের শীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের আগে

পাঠিয়ে ছিলেন।[৫৯] জ্ঞানদানন্দিনী বলেছেন '১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ আন্দাজ বিলেত যাই, যতদূর মনে আছে।[৬০] মায়ের কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ইন্দিরা দেবীও পরবর্তীকালে লিখেছেন—"আমার মায়ের সঙ্গে অনুমান ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গিয়ে পেঁছিই, পরে বাবা ও রবিকাকা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আসেন।[৬১]

ইতোমধ্যে এদেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নিয়মশাসনে যখন রবীন্দ্রনাথের মনকে আটকানো গেল না, তখন পরিজনদের হতাশা দূর করতে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে বিলাত নিয়ে গিয়ে ব্যারিস্টার করে আনার প্রস্তাব করেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁকে কয়েকমাস নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজিতে পাকা করার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ সজাগ দৃষ্টি দিয়েছিলেন ও ইংরেজিতে কথা বলতে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য কিছুদিন বোম্বাইতেও রেখেছিলেন।

১৮৭৮-এর ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৮০ সালের ১০ই মে পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের ফার্লো-ছুটি ছিল। ১৮৭৮-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ ছুটি নেন। সত্যেন্দ্রনাথ ফার্লো ছুটিতে বিলাতে যাওয়ার পূর্বরাত্রিতে, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৮এ মেয়র (নগর শেঠ) প্রেমাভাই-এর বাংলাতে স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জনমণ্ডলী কর্তৃক তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর উদ্দেশে আমেদাবাদের প্রখ্যাত কবি দল্‌পত্‌রাম্‌ একটি প্রশস্তিসূচক কবিতা লেখেন।[৬২]

জ্ঞানদানন্দিনীকে লণ্ডনে একা পাঠালেও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর থাকার সুব্যবস্থার জন্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লিখেছিলেন। তিনি সাউদাম্পটন্‌ থেকে জ্ঞানদানন্দিনীকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। প্রথমে জ্ঞানদানন্দিনী কিছুদিন জ্ঞানেন্দ্রমোহনের বাড়িতেই ছিলেন। পরে তিনি অন্যত্র ভাড়াটে বাড়ি ঠিক করে দেন। বিদেশে মেবল্‌ দত্ত, অ্যানি চক্রবর্তীর সঙ্গে এঁদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়।[৬৩] তাছাড়া মিস শার্প ও মিস ডন্‌কিনের সঙ্গেও জ্ঞানদানন্দিনীর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। মিস্‌ ডনকিন্‌ অসুখবিসুখে সব সময় ছুটে আসতেন। এ সময় জ্ঞানদানন্দিনীর সন্তানসম্ভবা ছিলেন, সেজন্য তাঁর সেবাযত্নের জন্য নার্স রাখার ব্যবস্থাও হয়েছিলো।

কিন্তু সমস্ত সতর্কতাই ব্যর্থ হলো। দুঃখের হাত থেকে এবারেও তিনি ত্রাণ পেলেন না। একটি দুর্বল অপুষ্ট পুত্রসন্তানের অসময়ে জন্ম হলো ও কিছু দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। 'কেনসাল গ্রীন'-এ দ্বারকানাথ ঠাকুরের

সমাধির পাশেই তাকে 'গোর দেওয়া' হয়।[৬৪] বিদেশে আরও একটি মর্মান্তিক দুঃখ জ্ঞানদানন্দিনীর জন্য লেখা ছিল। সুন্দর কোঁকড়া চুলের মিষ্টি ছেলে 'চোবি'কেও[৬৫] হারাতে হলো বিদেশেই। সঙ্গের সুরাটী চাকর রামা 'চোবি'কে জোর করে অনেকদূর হাঁটাতো। এত পরিশ্রম শিশুর দেহে সহ্য হয় নি—বিষাদ-ক্লিষ্ট হৃদয়ে জ্ঞানদানন্দিনী একথা মনে করেছেন। পূর্বোক্ত বিদেশিনীদের ভালবাসা ও যত্নের কথা জ্ঞানদানন্দিনী বহুদিন স্মরণে রেখেছেন। মিস্ শার্প'এর সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী ব্রাইটন-এ গিয়েছিলেন—একথা আত্মকথায় লিখেছেন। পরে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিলাতে পেঁছলে পর—তাঁকে নিয়ে দুই শিশুর কলরবে বাড়িতে কিছুটা প্রাণের স্পর্শ ফিরে আসে। কন্যা ইন্দিরা, সত্যেন্দ্রনাথ ফর্সা নন বলে 'That's not my papa' এই বলে প্রথমে এড়িয়ে চললেও শেষটায় পিতার সঙ্গে তাঁর খুবই জমে ওঠে।

ব্রাইটনে সমুদ্রতীরে বালির বাড়ি তৈরির খেলা ও Torquay—তে-ওদেশের প্রিয় Strawberries & Cream খাওয়ার কথা ইন্দিরা দেবী ভুলে যান নি।[৬৬] তাছাড়া টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স্‌-এও তাঁরা গিয়েছিলেন, একথা জ্ঞানদানন্দিনী লিখেছেন।[৬৭] ঐ ছুটিতে ফ্রান্সের নিস্ সহরের হোটেলে থাকা ও ফরাসী ভাষাচর্চার কথা জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর আত্মকথায় বিশেষ ভাবে বলেছেন।[৬৮]

সত্যেন্দ্রনাথ 'ফ্রান্স' প্রসঙ্গে 'নিস্' এর সঙ্গে প্যারিসে যাবার কথাও লিখেছেন।[৬৯] এভাবে নানা স্থানে কয়েকদিন থেকে ঘুরে ফিরে ফ্রান্সের দিনগুলো কাটিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসেন। ছাত্রাবস্থার পুরানো দিনগুলি তিনি আর ফিরে পান নি। সত্যেন্দ্রনাথের নিজের কথায়—"দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড গিয়া দেখি সে যেন এক নূতন দেশ, দুএকজন ছাড়া আমার পূর্ব পরিচিত বাল্যবন্ধু কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে,···বৈতালিক মোহ আর আমাকে আচ্ছন্ন করে না, ইংলণ্ড আর 'হোম' বলিয়া বোধ হইল না।"[৭০]

আসার সময় সত্যেন্দ্রনাথের সপরিবারে আসাই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের কথায় এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মে—'মেজদাদার দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিতে হইবে।'[৭১]

শিকারপুর

ফার্লো শেষে সত্যেন্দ্রনাথ সুরাটে যোগদান করেন। এখানে মাস সাতের থাকার পরেই সিন্ধুদেশের শিকারপুরে যান। শিকারপুরে পাঁচ মাস ছিলেন। শিকারপুরের জমি অপেক্ষাকৃত উর্বর। শিকারপুরে 'মাটির নিচু নিচু ঘর', লতানো আঙুর গাছ'। দুম্বা' 'ভ্যাড়া' পোষার কথা, ইন্দিরা দেবী তাঁর শৈশব স্মৃতিতে যেমন উল্লেখ করেছেন :[৭২] তেমনি যত্নে বর্ধিত 'দ্রাক্ষালতায়' ফল পাকার আগেই যে সত্যেন্দ্রনাথের বদলির আদেশ হয়েছিল—একথা তিনি সখেদে উল্লেখ করেছেন।[৭৩] এখানের আমীরেরা খুবই শিকার প্রিয়। ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধু মীর সাহেবের সংগে এখানে প্রায়ই সত্যেন্দ্রনাথ শিকারে যেতেন 'তবে মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' শ্লোকের সংগে এমনি সংস্কার গড়ে উঠেছিল যে চখাচখির ঝাঁকে এসেও শিকার করা হযে উঠতো না।[৭৪]

সিমলায় পুত্রকন্থার শিক্ষা

একটা জায়গায় গুছিয়ে বসতে না বসতেই এভাবে ঘন ঘন বদলির আদেশ হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ কোনো কোনো ও সময় বিরক্তি বোধ করেছেন। এদিকে পুত্রকন্যারও বিদ্যালয়ে যাবার বয়স হয়েছে। এ সময তাঁর সংগে ঘন ঘন ঘুরে বেড়ালে এদের পড়াশুনায় বিঘ্ন হবে, সেজন্য শিকারপুর ছেড়ে যাবার পথেই সত্যেন্দ্রনাথ ঝটিতি সিমলায় এসে বাড়ি ভাড়া করেন ও ছেলেমেয়ের স্কুল ঠিক করে দিয়ে, জ্ঞানদানন্দিনীর রক্ষণায় এদের রেখে যনে।[৭৫] সিমলায় ইন্দিরাদেবীকে Auckland House-এ এবং সুরেন্দ্রনাথকে Bishop cotton-এ ভর্তি করা হয়। বছরখানেক সিমলায় থাকার পর ছেলেমেয়েকে নিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী জোড়াসাঁকো বাড়িতে আসেন ও সুরেন্দ্রনাথকে সেণ্ট জেভিয়াসে ও ইন্দিরাদেবীকে লরেটোতে ভর্তি করেন। জোড়াসাঁকোয় কিছুদিন থাকার পর ছেলেদের স্কুল যাতায়াতের সুবিধার জন্য তাঁকে 'দক্ষিণ অঞ্চলে' বাড়িভাড়া করে থাকতে হয়।[৭৬]

কারোয়ার স্মৃতি

শিকারপুর থেকে সুরাটে আসার ২৬ দিন পরেই তাঁর 'কর্ণাটকের প্রধান নগর কারোয়ার'-এ যাবার আদেশ হয়। সত্যেন্দ্রনাথের কথায়—'কর্ণাটক আমার

কর্মক্ষেত্রের দক্ষিণ সীমা, উত্তর সীমা সিন্ধুদেশ'।[৭৭] কর্মক্ষেত্রে যে সমস্ত জায়গায় ঘুরেছেন—এর মধ্যে এটি তাঁর সবচেয়ে সুন্দর লেগেছে। কারোয়ার বন্দরে জজসাহেবের কাঠের বাংলোর কাছেই সমুদ্রের অশ্রান্ত গর্জন, মর্মরিত ঝাউগাছ, কালা নদীতে নৌকাবিহার, 'গুঢেন্সী' পাহাড়ে সদলবলে বনভোজন; চন্দনতরুর দেশ মলয় উপকূলে 'ট্যুরে' যাওয়া, সব কিছু মিলে তাঁর কারোয়ারের দিনগুলি আনন্দমুখর হয়েছে। ছেলেমেয়েদের স্কুলের ছুটি হওয়ায় 'সদর স্ট্রীটের দলবলসহ'[৭৮] জ্ঞানদানন্দিনীর আগমনে বাড়ি ভরে ওঠে। সাঁতার প্রিয় সত্যেন্দ্রনাথ এখানে সমুদ্র স্নানেও আনন্দ পেতেন। পুত্রকন্যাকে নিজ হাতে সাঁতার শেখাতে চেষ্টা করেছেন। ইন্দিরা দেবীর তা শেখা না হলেও, ভোরে উঠেই সুরেন্দ্রনাথের সংগে সরু নৌকা 'হোরি'তে করে হোরিওয়ালার সাথে এক পাক সমুদ্রে ঘুরে আসার কথা তিনি 'কারোয়ার-স্মৃতি'তে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন।[৭৯] এখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবি আঁকার বিরাম ছিল না। রবীন্দ্রনাথেরও কানাড়ী[৮০] গান ভাংগার কথা ইন্দিরা দেবী বলেছেন সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন—'এখানে কর্ণাটী নর্ত্তকীর মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে গীতগোবিন্দের কাব্যগীতি শুনে তিনি মোহিত হয়েছিলেন।[৮১]

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ (১৮৮৩, ৯ ডিসেম্বর)

কারোয়ারএ আসার আগেই জ্ঞানদানন্দিনী সদলবলে[৮২] রবীন্দ্রনাথের জন্য পাত্রী খুঁজতে যশোর নরেন্দ্রপুরে গিয়েছিলেন। চেংগুটিয়া দক্ষিণডিহি সব স্থানে খোঁজ করেও মনোমত পাত্রী না পাওয়ায় ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্য পাত্রী মনোনীত হয় ও জোড়াসাঁকো থেকে রবীন্দ্রনাথের বিয়ের জন্য ডাক আসে। ১২৯০ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ (১৮৮৩, ৯ই ডিসেম্বর) রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথের বিবাহে ইন্দিরাদেবীরা উপস্থিত হতে পারেন নি। বিবাহের পরদিন জমিদারী থেকে মহর্ষি'র বড় জামাতা সারদাপ্রসাদ গংগোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর আসে। বিবাহবাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রকৃত খবর না দিয়ে অবস্থা সংকটাপন্ন জানিয়ে কারোয়ারে তার করেছিলেন। তাই পেয়ে অবসন্না

সৌদামিনী দেবীকে নিয়ে জ্ঞানদানন্দিনীরা শোকমগ্ন জোড়াসাঁকো বাড়িতে এসে পেঁৗছেন।[৮৩] সৌদামিনী দেবী তখন কারোয়ারে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের প্রায় মাসখানের পর সত্যেন্দ্রনাথ ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন। (১৮৮৩ জানুয়ারী)। তাঁর আগমনে ১৪নং সার্কুলার রোডের বাড়িতে সাহিত্যচর্চা, পার্টি, গানের মজলিস্ জমজমাট হয়ে উঠে।[৮৪]

এই সময় রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে প্রিয়নাথ সেন-এর সংগে সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়।[৮৫] তিনি রবীন্দ্রনাথকে গতিএর লেখা Mademoiselle De Maupin-বইটি পড়তে দিয়েছিলেন। সেটি পড়ে সত্যেন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগে এবং ছুটির শেষে কর্মস্থল থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানান। 'যদি তাঁর (প্রিয়নাথ সেনএর) আপত্তি না থাকে তবে কোন সুপাঠ্য ফরাসী গ্রন্থ' সত্যেন্দ্রনাথকে পাঠালে 'তিনি বাধিত হবেন'—একথাও রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে জানিয়েছেন।[৮৬]

সোলাপুর

কারোয়ারে প্রায় পৌনে তিন বছর কাটিয়ে এখান থেকে ফার্স্ট গ্রেড জজ্-এর পদে কনফারম্ড্ হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সোলাপুরে যান। সে সময় বিজাপুর ও সোলাপুর দু জেলাই একই জজের অধীনে ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ 'কোর্টের সকল কর্মচারী নিযুক্ত' করে তাদের কাজে শৃংখলা স্থাপন করেন।[৮৭]

সোলাপুর জেলায় ভীমা নদীর তীরে পণ্ডরপুর তীর্থে বিঠোবোজীর গহনাপত্র নিয়ে মন্দিরের দুই পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ থেকে প্রায় দাংগার উপক্রম হয়। সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় ঐ বিবাদ বন্ধ হয় ও বিঠোবাজীর অলংকারের তালিকা করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়।

সোলাপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তি 'আপ্পাসাহেব বারদ' প্রমুখের সাহায্যে সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে বহু জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লর্ড রিপণের স্মৃতি সমন্বিত সোলাপুরের 'টাউন-হল' প্রতিষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথের যে প্রভৃত রয়েছে তা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসও তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৮৮] তাছাড়া ডাফরিন হাসপাতাল স্থাপন, গরীব ছাত্রদের জন্য ফাণ্ড, সাহিত্য সভা স্থাপন ইত্যাদি মহৎ কাজের সংগেও তিনি যুক্ত ছিলেন তাঁর কর্মজীবনের তালিকায় সোলাপুর পর্বই সবচেয়ে দীর্ঘ। দুবার মিলিয়ে প্রায় ন'বছরের ও

বেশি : অবশ্য এর মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ফার্লো ও অন্যান্য ছুটিও ভোগ করেছেন।

হোলকার মহারাজার গোচারণের দাবির সালিসি

প্রথমবার সোলাপুরে (১৮৮৪ জানু) কার্যভার গ্রহণ করার কিছুদিন পরেই একটি বিশেষ কাজের ভার তাঁর উপরে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথের নিজের কথায়—"মহারাজা হোলকর ও ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে গোচারণের অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাতে আমাকে উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া বিচার করিতে হয়।[৮৯] দেড়মাস মতো সত্যেন্দ্রনাথ এই বিশেষ কাজ ব্যাপৃত ছিলেন। এই কাজ হাতে নেওয়ার পূর্বে শরৎকালে সত্যেন্দ্রনাথ প্রবাস সঙ্গীরূপে রবীন্দ্র-নাথকে পেয়েছেন। আর রবীন্দ্রনাথও ঐ সময়' (১২৯২) সোলাপুরে বাস পর্বটিকে অন্তরের সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন।'[৯০]

মহর্ষিভবনে ব্রহ্মসম্মিলন (৯ই মাঘ, ১৮০৭) শক)

পূর্বোক্ত সালিসী কাজ শেষ হওয়া মাত্রই মাঘোৎসবে যোগদেবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন। ঐ সময় প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিতেও[৯১] 'মেজদাদার' আগমনের সুখবর আছে। ঐ মাঘোৎসবে জোড়াসাঁকো বাড়িতে 'তিন সমাজের' সম্মিলিত 'উপাসনা'য় সত্যেন্দ্রনাথ বেদীর আসন গ্রহণ করেন।[৯২]

নাসিকে বন্ধুলাভ

সোলাপুর থেকে মাস কয়েক মতো 'নাসিক'-এ অস্থায়ী ডিস্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন্স জজের পদে কাজ করেছেন, তারপর আবার তাঁর পূর্ব পদে সোলাপুরের ফার্স্ট গ্রেড জজ্ ও সেসন্স জজের পদে ফিরে গেছেন।

গোদাবরী তীরে নাসিক 'দাক্ষিণাত্যের বারাণসী'। রামসীতার বনবাসের রঙ্গভূমি। 'নদীর এপারে পঞ্চবটী, পরপারে ত্র্যম্বক তীর্থ।' 'নাসিক' নামের উৎপত্তি ও অন্যান্য স্থান সম্পর্কে পাণ্ডাদের ব্যাখ্যাকে সত্যেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারেন নি।[৯৩] নাসিক-এ একজনের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব হয়েছিল তা পরবর্তী কালে আরও নিবিড়তর হয়েছে ও পরিজনেরাও এর

ফলভোগ করেছেন। আবদুল হক্ নামে যে উদ্যমশীল যুবকের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের নাসিক-এ পরিচয় হয় তিনি পরবর্তী কালে বোম্বাইএর ওয়াট্‌সন হোটেলের মালিক হয়েও পূর্বের পাতানো ভাই—বোনকে ভুলে যান নি। সপরিবারে 'ভাইসাহেব' সত্যেন্দ্রনাথ ও 'ভান-সাহেব' জ্ঞানদানন্দিনীর জন্য তাঁর ওয়াট্‌সন হোটেলের দ্বার উন্মুক্ত থাকতো।[৯৪] এজন্য তিনি কোন বিল তো পাঠাতেনই না বরং আতিথ্যের আয়োজন করতেন। সরলা দেবীর কথায়ও একই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।[৯৫]

আবার সোলাপুরে

'নাসিক' থেকে সোলাপুরে ফিরে এসে ১৮৮৭ সালে দেড়মাস মতো ও ১৮৮৯ সালে দুমাস কয়েক দিন ছুটি নিয়েছিলেন। ১৮৮৯ সালে কলকাতায় এসে তাঁর বির্জিতলার বাসা বাড়িতে ছিলেন। ঐ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর অনেক মূল্যবান লেখা 'পারিবারিক খাতা'য় রয়েছে। ঐ বছরেই মে মাসে তাঁর বোম্বাইচিত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ১৮৮৯ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহনের ত্রি-পঞ্চাশত্তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা সিটি কলেজ হলে আহূত সভায়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। রামমোহনের ধর্মচিন্তা, সমাজসংস্কার ও বাংলা গদ্যের গঠনে তাঁর অবদান সম্পর্কে ঐ সভায় তিনি এক সুচিন্তিত ভাষণ দেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ম'—ঈশ্বর তত্ত্বের প্রচারে অজস্র নিন্দাবাদ ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আপন বিশ্বাসে তিনি যে অটল ছিলেন তা রামমোহনের উক্তির[৯৬]মাধ্যমেই সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন।

বিশেষ ছুটিতে বিলাত যাত্রা

সোলাপুরে আত্মীয় পরিজনদের সান্নিধ্যে তাঁর প্রবাসের দিনগুলি ভালই কেটেছে। সোলাপুরের 'অবাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি' রবীন্দ্রনাথকেও আবার টেনেছে। ১২৯৭, বঙ্গাব্দের শ্রাবণের শেষদিকে তিনি আবার সোলাপুরে এসেছিলেন।[৯৭] এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ ছুটি নিয়ে বিলাত যান। রবীন্দ্রনাথ ও লোকেন পালিতও তাঁর সংগে গিয়েছিলেন। (১৮৯০, ২২শে আগস্ট) বোম্বাই থেকে শ্যাম (Siam) জাহাজে চড়ে রওয়ানা হয়েছিলেন।[৯৮] প্রসংগত পূর্বপরিচিত বন্ধুবান্ধব না পেয়ে সেবার রবীন্দ্র-

নাথেরও বিলাত ভালো লাগে নি। ৯ই অক্টোবর (১৮৯০) রবীন্দ্রনাথ একাই রওয়ানা হয়ে ৩রা নভেম্বর বোম্বাই পৌঁছান ও পরদিন কলকাতা রওয়ানা হন।[৯৯]

শান্তিনিকেতন মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন

বিলেত থেকে ফিরে আসার পর ১৮১২ শকের ২২শে অগ্রাহয়ণ (১৮৯০ ডিসেম্বর) শান্তিনিকেতন আশ্রমের ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীত গেয়েছিলেন ও সত্যেন্দ্রনাথ আবেগপূর্ণ ভাষণে সমবেত উপাসনার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। ভিত্তিমূলের তাম্রফলকটি[১০০] প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথ সর্বসমক্ষে পাঠ করেন পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ কতৃর্ক ভিত্তিস্থাপন কার্য সমাধা হলে পর সত্যেন্দ্র-নাথ শুভকাজের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

মেঘদূত পদ্যানুবাদ

এই উৎসবের শেষে তাঁর বিশেষ ছুটি ফুরোবারও সময় হয়ে আসে। তাই সোলাপুরের কর্মজগতে আবার ফিরে আসেন। দ্বিতীয় ফার্লোতে যাওয়ার আগে এখানে একটানা দু'বছরের উপর কাজ করেছেন। এই সময়েই ভারতীতে তাঁর মেঘদূত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয় (১২৯৮ বঙ্গাব্দ ১৮৯১ খ্রী.)।

১৮৯২ সালের অক্টোবর নাগাদ সত্যেন্দ্রনাথের কলকাতার বাড়িতে গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপাসনা করার বিবরণ পাওয়া যায়।[১০১] ঐ অনুষ্ঠানে দেবেন্দ্রনাথের পরেই দ্বিজেন্দ্রনাথও গৃহের সকলের মংগলের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন : তবে সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের উপস্থিতির কোন বিবরণ তত্ত্ববোধিনীতে চোখে পড়েনি বা তাঁর সার্ভিস রিপোর্টেও ঐসময় ছুটির কোন উল্লেখ নেই। খুব সম্ভবত ঐ অনুষ্ঠান সত্যেন্দ্রনাথের ৫০ নম্বর পার্ক স্ট্রীটের কেনা বাড়িতে হয়। পরে অবশ্য এই বাড়িটি বিক্রি করে দেওয়া হয়। ৫২।২নং পার্ক স্ট্রীটে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সৌদামিনী সহ মহর্ষির অবস্থানে দুই বাড়ির মধ্যে প্রতিদিন আনাগোনার কথা ইন্দিরা দেবী বিশেষ ভাবে বলেছেন। তাঁরা ঐ বাড়ি ছেড়ে দেবার পর সেখানে স্যানিটারিয়ম স্থাপিত হয় একথা তিনি বলেছেন।[১০২]

সিমলায় দ্বিতীয় ফার্লো

১৮৯৩ সালে সোলাপুর থেকেই দ্বিতীয় ফার্লো কাটাতে সত্যেন্দ্রনাথ সিমলায় যান। সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণনা থেকে ভ্রমণসূচীর একটা স্পষ্টচিত্র পাওয়া যায়—তিনি রাজপুতানা লাইন দিয়ে আগ্রায় এসে পরিজনদের সংগে মিলেছিলেন।[১০৩]

সিমলায় যে বাড়িটি নিয়েছিলেন তার নাম 'Wood-Field'।[১০৪] এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সিমলায় ছিলেন। Hydrangea ফুলের রং বদলানো ও রাডেড্রেন্‌ডনের রক্তিমছটা সিমলার স্মৃতির অনুষংগরূপে তাঁর মনে জেগেছিল। প্রসংগত ঐ সময় 'Wood-Field' থেকে জোড়াসাঁকোর ৫নং বাড়িতে হেঁয়ালিছবির সাহায্যে যে চিঠিবিনিময় হতো তা পরিবারের সকলকেই আনন্দ দিয়েছে। ঐ খেয়ালখুসির নিদর্শন শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে সযত্নে রক্ষিত আছে।[১০৫] সিমলা থেকে আসার আগে শেষ সপ্তাহটি 'কপুরতলার কুমার ও রানীসাহেবের' আতিথেয়তায় মধুময় হয়েছে।

শেষ কর্মস্থল : সাতারা

ফার্লো শেষ হবার সংগে সংগেই সত্যেন্দ্রনাথের সাতারা যাবার আদেশ হয়। সোলাপুর থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় বিভিন্ন জনের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে যে 'পানসুপারি'র[১০৬] আয়োজন চলেছিল তা তাঁর জনপ্রিয়তার অকাট্য প্রমাণ। সময় সংকীর্ণ বলে অনেকের কাছে তিনি যেতে পারেন নি। কয়েকজন তবুও ছাড়েন নি—বাড়িতে এসেও আপ্যায়ন করে গেছেন। 'মতিবাগে' উকিলদের আয়োজিত, বনভোজনের মাধ্যমে 'পানসুপারির সমারোহপূর্ণ' আয়োজন ও 'ভারতের জয়' গীত হওয়ার কথা ইন্দিরা দেবী দীর্ঘ দিন মনে রেখেছেন।

শেষ কর্মস্থল—সাতারায় ব্রাহ্মসমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করে তিনি যে আনন্দ লাভ করেছিলেন তা ধর্মচিন্তা অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।

সাতারার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ধর্মীয়পরিবেশ তাঁর প্রবাসজীবনকে যেমন মধুর করেছিল, তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তাঁর স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণের মধ্যে একটি আন্তরিক ক্ষোভও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্যবোধে মার্জিত ভাবে যতটুকু বলেছেন তার মধ্যে বেদনার সুর স্পষ্ট

নিহিত—"শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ঐ দেশে কাটাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভগবানের মর্জী অন্যরূপ। নানা কারণে কর্ম্মত্যাগ করে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হলেম।"[১০৭]

শৈশবে 'সরস্বতী-প্রতিমা'র মুকুট ভাঙার পরিণাম প্রসঙ্গে কৌতুকের সুরে যা বলেছেন, তাতেও তাঁর কর্মজীবনের শেষ অধ্যায়ের বেদনার ইঙ্গিত রয়েছে—"সরস্বতী প্রসন্ন থাকলে হাইকোর্টের আসন অধিকার করে পদত্যাগ করতে পারতুম—আমার ভাগ্যে আর তা হল না।"[১০৮] এ প্রসঙ্গে অন্যান্যদের মুখ থেকেও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী বলেছেন—"তিনি (সত্যেন্দ্রনাথ) কূটনীতি অবলম্বনে বিবেকের বিপক্ষে কাজ করিতে পারিতেন না বলিয়াই বোধ হয় ভবিষ্যতে হাইকোর্টের বিচারকের পদলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্বভাব ছিল শিশুসুলভ সরল। তাঁহার রাজভক্তি ছিল এত আন্তরিক যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দেশের লোকদিগের উপর ইচ্ছা করিয়া অন্যায় অবিচার করেন একথা কেহ বলিলে তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।"[১০৯] বোম্বাই প্রদেশে সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগী দ্বারকা গোবিন্দ বৈদ্য সত্যেন্দ্রনাথের কর্মজীবনে জনপ্রিয়তা ও তাঁর অসময়ে অবসর গ্রহণ সম্পর্কে বলেন,—"তিনি সরকারের চাকুরী খুব ভালরকমই করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকে বলে, সরকার, তিনি প্রথম হিন্দু সিভিলিয়ান—এই দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহার সরলতা, তাঁহার শীলতা, তাঁহার ন্যায়প্রীতি একেবারে আমলে আনেন নাই, তাঁহাকে হাইকোর্টের জজিয়তি পদে মনোনীত করেন নাই। কালা গোরার মধ্যে এই পার্থক্যবুদ্ধি ভাল না লাগায় তিনি ১৮৯৭ অব্দে পেন্সান লইয়াছিলেন, আমরা এইরূপ শুনিয়াছি।'[১১০] ১৮৯৭ সালেই যে তিনি অবসর নিয়েছিলেন তা তিনি নিজেও স্পষ্ট করেই বলেছেন—"এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে আমার সার্ব্বিসের শেষ তিন বৎসর অতিবাহিত হয়। সেখানেই আমি কার্য শেষ করে ১৮৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করি।"[১১১]

সবশুদ্ধ ৩২ বছরের উপর কাজ করেছেন। এর মধ্যে ৩০ বৎসরের উপর শুধু 'জুডিস্যাল' কাজই করেছেন। তাঁর সেসন জজ পদপ্রাপ্তিতে ইংরাজ মহলে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল এ সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও মন্তব্য করেছেন—"ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম সেসন জজ হইয়াছিলেন... ইংরাজ মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল"।[১১২] অভিজ্ঞ মহল থেকে জানা

গেছে সেসময় ডিস্ট্রিক্ট সেসন জজরাই ফাঁসির আদেশ দিতে পারতেন। ন্যায়দণ্ড হাতে নিয়ে চরম রায় প্রদান করলেও মানবিক অনুভূতিতে তাঁর হৃদয় বিদ্ধ হতো, এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের পুত্রবধূর মুখ থেকেই সংবাদ পাওয়া গেছে। "ফাঁসীর রায় দেবার পর কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি ঘুমুতে পারতেন না"[১১৩] সংজ্ঞা দেবীর 'স্মৃতিকথা'য়ও অনুরূপ কথা লিখিত রয়েছে—" তিনি যখন জজীয়তি করতেন, খুনি আসামীর দোষ প্রমাণিত হলে ফাঁসির হুকুম দিতে বাধ্য হতেন। শুনেছি ফাঁসির হুকুম দেবার পর কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি খেতে পারতেন না এবং কয়েকরাত বিনিদ্র ভাবে কাটাতেন'। [স্মৃতিকথা : সংজ্ঞাদেবী (সন্ন্যাসিনী স্বরূপানন্দ সরস্বতী) শারদীয় সংগঠন, আশ্বিন ১৩৭৩। পৃ. ২৩।]

১. 'আমি সিবিল সার্বিস পকেটে করে ১৮৬৪ সালের শেষভাগে ইংলণ্ড হতে দেশে ফিরলুম'। আমরা বোম্বাই প্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৬৯।

২. আবার বোম্বাই প্রবাস ; পৃ. ৭০।

৩. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'য়ুরোপপ্রবাসী গ্রন্থে' বিলাতে মুদলিয়ারের নিষ্ঠার উল্লেখ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথও 'আমার বোম্বাইপ্রবাস'-এর ৭০ পৃষ্ঠায় বিলাতে মুদলিয়ার 'দুধ ফলারের উপর নির্ভর করতেন' লিখেছেন।

৪. আমার বোম্বাইপ্রবাস—পৃ. ৭২।

৫. তিনি (মানকজী) তাঁর দুই মেয়েকে এখানে লেখাপড়া শিখিয়ে পরে বিলেত ঘুরিয়ে এনেছিলেন। তাঁদের নাম আই মাই ও সিরীণ বাই।…টেবিলে বসে কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে তাঁদের কাছেই শিখলুম।'—জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : পুরাতনী। পৃ. ২৯-৩০।
অপিচ—My wife finds excellent companions in two of Mr. Manockjee's daughter who had been to England... Satyendranath Tagore's letter to Ganendranath : 5 Janu., 1865.

৬. (মানকজী) তিনি ছোট আদালতে জজ থাকার সময় তাঁর বিরুদ্ধে যে রিপোর্ট দেওয়া হয় সেজন্য বিলাতে গিয়ে House of Lords-এর মাধ্যমে মামলা চালিয়ে ক্ষতিপূরণ ও এদেশের কোর্টের উচ্চ আসন লাভ করেছিলেন।—আমার বোম্বাইপ্রবাস ; পৃ. ৭১-৭২।

৭. আমার বোম্বাইপ্রবাস—পৃ. ৭২।

৮. বোম্বাইয়ের গভর্নর।

৯. Sir Bartle Frere is very kind to us. He has invited me and my wife several times to his parties, and the other day we went to a Ball at Government House, where as you may imagine my wife was very much amused to see ladies and gentlemen dancing, ... She has not yet completely broken her 'Vow of Silence',—Satyendranath Tagore's letter to Ganendranath, 13th Feb., 1865.

১০. আমার বোম্বাই প্রবাস—পৃ. ১০৬।

১১. গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র—১লা মে, ১৮৬৫।

১২. I am trying to get up a sort of a literary club among the civilized here'... Satyendranath Tagore's letter to Ganendranath—28th July, 1865.

১৩. গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র— ১৪ই এপ্রিল ১৮৬৬।

১৪. 'একবার মনে আছে কানাড়ী ভাষায় পরীক্ষা দিলে উনি ১০০০৲ টাকা পুরস্কার পাবেন, সেই ভরসায় উনি বম্বে গিয়ে ৩০০০৲ টাকার আসবাবের ফরমাশ দিয়ে এলেন : অথচ পরীক্ষায় পাশ হলেন না। অগত্যা বাবামশায়কে তার করলেন ৩,৪ হাজার টাকা পাঠাতে। কি উত্তর আসে সেই ভাবনায় আমরা দুজনে বসে বসে Huntley Palmers-এর এক টিন বিস্কুট সামনে রেখে এক একটা করে খাচ্ছি। তারপর তার এল যে টাকা দিতে পারবেন না। সারাদিন আমরা মুখ শুকিয়ে বসে রইলুম পরে সন্ধ্যায় টাকা এল।'—জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : পুরাতনী ; পৃ. ৩২।

১৫. পুত্রকে শিক্ষা দেবার জন্যই বোধহয় প্রথমটা টাকা দিতে অস্বীকার

করেছিলেন, পরে পুত্র স্নেহ জয়লাভ করলো।' স্মৃতিকথা : সজ্ঞাদেবী শারদীয়া সংগঠন—আশ্বিন ১৩৭৩

১৬. ইন্দিরা দেবী সংকলিত পুরাতনী গ্রন্থের ১০নং পত্র।

১৭. 'He (Joti) has began French with me. I have also got a drawing-master for him'.... (11 May, 1867).
'Joti is learning Siter ...(2nd June 1167)
Joti is learning 'Sitar', this is the only amusement I can provide for him here. I do some French with him and he works himself a good deal (4th Sept., 1867) Satyennath Tagore's letter to Ganendranath : Preserved in Rabindra Bhavan, Santiniketan.

১৮. ৫নং দ্বারকানাথের গলি। গণেন্দ্রনাথদের অংশ।

১৯. আমার বাল্যকথা—বৈতানিক প্রকাশনী, পৃ. ৫৪।

২০. স্বদেশচেতনা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২১. 'রামেশ্বর একজন সামান্য কর্মচারী ছিলেন—মিউটিনির সময়··· পুরস্কার পাইয়া ধনী হইয়াছেন।' পুরাতনী—১২নং পত্র।

২২. 'আমার চির-সুহৃৎ নীলকমল মিত্র'—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনী পৃ. ২৩৯। নীলকমল মিত্র উত্তরকালের এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ জননায়ক ও রাজনৈতিক কর্মী অনারেবল চারুচন্দ্র মিত্রের পিতা। ঐ পরিশিষ্ট—পৃ. ৫৯।
মহর্ষির পত্রাবলী ৬৬নং পত্র রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত। 'এলাহাবাদে···যাইয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজের ও নীলকমলবাবুর পুত্রের ও তাঁহার বন্ধুগণের অনেক পরিমাণে উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে।—চারুচন্দ্রের যেমন নাম তার তেমনি গুণ ও তেমনি রূপ। ···৪ ভাদ্র ১৭৯০ শক। অপিচ রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত-পৃ. ১২৬, ১২৭ (তৃতীয় সং) দ্র.।

২৩. পুরাতনী ১১, ১২, ১৩, ১২৬নং ও ১৪ নং পত্র। ১২৬নং পত্রটি ইন্দিরা দেবী সংকলিত 'পুরাতনী গ্রন্থের একদম শেষের দিকে স্থান

পেয়েছে। চিঠিটির মুদ্রিত সালতারিখ 1st June 1869. মূল পত্রটি অভিনিবেশ সহকারে দেখলে ধারণা হয় পত্রটি 1st June 1868-এই লেখা হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে মূল চিঠিতে '68' এর '8' এর উপর একটি কালির দাগ এমন ভাবে পড়েছে যাতে সেটিকে আপাতদৃষ্টিতে '9' বলে মনে হয়। কিন্তু ঐ চিঠির বয়ান থেকে এবং পুরাতনী ১৪নং চিঠির বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে ১২৬নং চিঠিটি ১৮৬৮'র ৩১শে মে-তে লেখা। এই চিঠিতে জব্বলপুর-নাগপুর হয়ে স্থলপথে বোম্বাইযাত্রার কষ্টের উল্লেখ আছে এবং চিঠিটি বোম্বাই পৌঁছে 'হোপ হল হোটেল' থেকে লেখা। কলকাতায় ছুটিতে এসে অসুস্থ জ্ঞানদানন্দিনীকে জোড়াসাঁকোয় রেখে গিয়ে সেই চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"এখন আরও বুঝিতে পারিতেছি তোমার এই অবস্থায় এত কষ্ট বোধকরি কোন মতেই সহ্য হইত না।" ১৪নং চিঠিটিও 1st June 1868-এ হোপ হল হোটেল থেকে লেখা এতে সত্যেন্দ্রনাথ স্পষ্ট লিখেছেন—"১৮৬৯-এর ১লা জুনে লিখিত হয়ে থাকে, তাহলে ১৮৬৮'র ১লা জুন তারিখ দেওয়া ১৪নং চিঠি ছাড়া আরও একটি চিঠি থাকা উচিত ছিল—যেটি ১৮৬৮'র ৩১ মে লিখিত অথচ যেটির তারিখ দেওয়া ছিল ১লা জুন। উল্লিখিত 'কল্যকার' পত্রটি সংকলনে নেই। বক্তব্য থেকে স্পষ্টই মনে হয়—১২৬নং-টিই উক্ত পত্র।

উপরন্তু ১৮৬৯এর ৭ই ফেব্রুআরি সাতারা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে লিখেছেন—'My wife and party arrived in Bombay on the 1st inst…'শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত) অর্থাৎ জ্ঞানদানন্দিনী সুস্থ দেহে ১৮৬৯ এর ১লা ফেব্রুয়ারী বোম্বাইতে পৌঁছেছেন। এর পরে ১৮৬৯-এর ফেব্রুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে জ্ঞানদানন্দিনী ও সত্যেন্দ্রনাথের কলকাতা আসার কোন প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১২৬নং চিঠিটি ১৮৬৯-এর ১লা জুন লেখা হয়েছিল বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। ঐ পত্রের তারিখটি ১৮৬৮'-র ১লা জুন (৩১শে মে) হওয়া স্বাভাবিক। [ফটো কপি দ্র.]

২৪. গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত।

Any more news from my father ? I wish he would pay me a flying visit. I am so anxious to see him.

(Hope Hall Hotel. Bombay, 1st June 1868)

২৫. পুরাতনী—৩১নং পত্র।

২৬. „ —২৪নং পত্র, ১৬ই জুন ৬৮।

২৭. „ —৩৩নং পত্র—২৬শে জুন ১৮৬৮।

২৮. Jadoo has an idea that the post of a judge carries more prestige with it than that of a collector.'

—Letter : S. T. to Ganendranath, 28th June 1868

২৯. শ্যাম গাঙ্গুলীর ৮ বৎসরের মেয়ে—আমি যদি নতুন হইতাম, তবে কখনই এ বিবাহে সম্মত হইতাম না ...৮ই জুন ১৮৬৮, পুরাতনী ২০নং পত্র।

৩০. আমি বাবামহাশয়কে লিখিব জ্যোতির বিবাহ দিতে যত ব্যয় হইবে—সেই ব্যয়ে যদি শিক্ষার জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠান হয়, তাহা হইলে জ্যোতির যথার্থ উপকার করা হয়। একবার বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইলে আর যে তাহার নড়িবার পথ থাকিবে এমন বোধ হয় না।

৩১. —জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র। ১লা জুন ১৮৬৮ পুরাতনী ১৪নং পত্র।

'...নতুনের বিলাত যাওয়া এই পর্যন্ত—বাবা মহাশয় লিখিয়াছেন 'সকলেরই কি তোমার মত বিলাতে যাওয়া ঘটে—জ্যোতি কোন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলে এখানেই তাহার পদের উন্নতি করিতে হইবে।'

—মহর্ষির বক্তব্য জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রে উদ্ধৃত। পুরাতনী ৪৮নং পত্র।

৩২. 'I can't conceive why Jotee was in such a hurry'—30th July 1868. Satyendranath's letter to Ganendranath.

৩৩. ১৭৯০ শকের শ্রাবণ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত—ব্রাহ্মবিবাহ,

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথের) ২৩শে আষাঢ় সম্পন্ন হয়। [১৮৬৮, ৫ই জুলাই]

৩৪. 'জ্যোতির বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়া গিয়াছে এইই ভাগ্য। একে ত পিরালী বলিয়া ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের সংগে বিবাহেতে যোগ দিতে চাহে না, তাহাতে আবার ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান জন্য পিরালীরা আমারদিগকে ভয় করে। ভবিষ্যৎ তোমাদের হস্তে'— সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত মহর্ষির পত্রের অংশ জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রে উদ্ধৃত। পুরাতনী ৬৪নং পত্র; ১৬ই আগস্ট, ১৮৬৮।

৩৫. পুরাতনী—৪৮নং পত্র।

৩৬. ঐ ৬০ নং পত্র।

৩৭. পুরাতনী—৪৬নং, ৪৪নং, ৬৭নং, ৭৬নং, ৫৭নং পত্র।

৩৮. ঐ ৯০ নং পত্র।

৩৯. ঐ ৬৪নং পত্র।

৪০. পুরাতনী—৯৬নং পত্র, ২২শে অক্টোবর। ৯৯নং পত্র ৬ই নভেম্বর ১৮৬৮।

৪১. পুরাতনী—১০৭নং পত্র; ২২শে নভেম্বর, ১৮৬৮।

৪২. In all this there is nothing of the rigid four fold classification described by Manu. W. W. Hunter: The Annals of Rural Bengal, p. 62, ch. III.

৪৩. পুরাতনী—১২৪নং পত্র।

৪৪. দ্র. সত্যেন্দ্রস্মৃতি: ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী লিখিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা: শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২।

৪৫. আমি যখন ধুলিয়ায় আসিসটেণ্ট জজ হইয়া কর্ম্ম করি তখন সেখানকার মাজিস্ট্রেট প্রিচার্ড সাহেব আমার কোর্টে চারিজন আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যের মকদ্দমা আনিয়া উপস্থিত করেন। সেই মকদ্দমায় তিনি ফরিয়াদী, নিজেই সাক্ষী, তাঁহার একতরফা সাক্ষ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে এই বলিয়া আসামীদিগকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিয়া খালাস দিয়াছিলাম। এ বিচারে প্রিচার্ড সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্টে অভিযোগ করেন, গবর্ণমেণ্টে আমার রায়ের

বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল আনিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ জারি করিলেন। ভাগ্যে হাইকোর্ট আমার পক্ষ লইয়া আমরা রায় বাহাল করিলেন, তাই আমাকে আর বিশেষ কিছু শাস্তি ভোগ করিতে হইল না, কেবল···স্থানান্তরিত হওয়াই আমার শাস্তি, সেও আবার অনেক লেখালেখির পর·· ভাল স্থানেই হইল'—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার বোম্বাইপ্রবাস : পৃ. ১০৬।

৪৬. আমার বিদায় উপলক্ষে সেখানকার লোকেরা আমাকে এক মানপত্র, সহজ ভাষায় Address দেয়।—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার বোম্বাই প্রবাস। পৃ. ১০৭।

৪৭. আমার বোম্বাই প্রবাস : পৃ. ১০৭।

৪৮. Copy of a News Item from the Bombay Weekly 'Native Opinion' dated 2nd April, 1871.

সলিল ঘোষ লিখিত 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর বোম্বাইপ্রবাস' প্রবন্ধে প্রাপ্ত। জানুয়ারী 'বোম্বাই বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত।

Mr. Tagore Leaving Dhoolia,...About 500 persons were present. Such a gathering of the people of Dhoolia never, it is said, witnessed before, to do a honour to a parting Government Official. The following address read by Mr. G. A. Mankar....'As the first native of India admitted into the ranks of the Civil Service, your career, Sir, has been an object of unceasing interest and solicitude for the whole native community of India... Yor have always held the scales of justice evenly between all parties, and have always shown patience and firmness in the discharge of your duties.'

৪৯. Satyendranath's reply—

'...I trace my descent from Bhutta Narayan. 'O 'How

fallen !' you will naturally exclaim—The descendent of such a noble ancestor : (No No)...

৫০. Tagore family have been obliged to form themselves into separate community. I am not sorry for this result 'If my parents had been as orthodox as I see some of you here, it is next to impossible that I should have been allowed to cross the 'Kalapani.'

—Satyendranath's reply. Ibid.

৫১. এই সংগমের একটি বাংলোতে যখন মেজমামা থাকতেন প্রায় পাঁচশ বৎসর পূর্বে', তখন আমার দাদা জ্যোৎস্নানাথের জন্ম হয়' ।—জীবনের ঝরাপাতা : সরলাদেবী । পৃ. ১৮০ [জ্যোৎস্নানাথের জন্ম, ১৮৭১ পুণা]

৫২. যে বাড়ীতে আমরা ছিলুম সেটা উঁচু একতলা, একজন ধনী পার্সী'র বাড়ী, খুব জাঁকাল রকম সাজানো ও নদীর ধারে··জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : পুরাতনী ; পৃ. ৩৫ ।

৫৩. আমার বোম্বাইপ্রবাস পৃ. ১০৭ ।

৫৪. দ্রষ্টব্য—পরিশিষ্ট ২ সার্ভিস রিপোর্ট' ।

৫৫. জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : ঐ পৃ. ৩৬ ।

৫৬. আর সংগে একটি শিখ ছেলে যেত, সন্ধ্যায় সে গান করত—'গগন মে থাল রবিচন্দ দীপক বনে'—পৃ. ৩৭ পুরাতনী ।

৫৭. আমার বোম্বাইপ্রবাস : পৃ. ২৬০—এ বিষয়ে সমাজচিন্তা অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা থাকবে ।

৫৮. 'সেই সময় এক ইংরেজ দম্পতী বিলেত যাচ্ছিল । তাদের সংগে উনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, বোধ হয় ওদের ভাষা কায়দাকানুন শেখবার জন্য' । জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : পুরাতনী । পৃ. ৩৮ ।

৫৯. 'শীতের মুখে বিলাতে পৌঁছাইলে শিশুরা অনভ্যস্ত শীতে কষ্ট পাইতে পারে ভাবিয়া তিনি পত্নী ও শিশুদের গ্রীষ্মের মুখেই বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন' । রবীন্দ্রজীবনী ; ১ম খণ্ড । পৃ. ৮০ ।

৬০. পুরাতনী—পৃ. ৩৮ ।

৬১. রবীন্দ্রস্মৃতি—ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। পৃ. :৩। অপিচ 'মনে হয় সে সালটি ছিল ১৮৭৭, এবং তখন সুরেনের বয়স আন্দাজ পাঁচ, আমার আন্দাজ সাড়ে তিন এবং পিঠাপিঠি ছোট ভাইটির বয়স আন্দাজ দু বছর'। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন। পৃ. ৪।

৬২. বোম্বাই-এর সিদ্ধার্থ কলেজের গুজরাটী ভাষায় অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক টি. পি. ভাট্ দল্পত্রামের উল্লিখিত প্রশস্তিসূচক কবিতাটি শান্তিনিকেতনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধানের নিকট ১৯৭৯ সালের ২১শে মার্চ পাঠিয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'দল্পত্রাম'। সেজন্যই তিনি কবিতাটি প্রেরণে উৎসাহিত হন। বর্তমানে দল্পত্রামের কবিতাটি অধ্যাপক ভাট্-এর ইংরেজি অনুবাদ ও তাঁর পত্র সহ শান্তিনিকে ়ন-রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

৬৩. মেব্ল্ দত্ত—ক্ষেত্রমোহন দত্তের কন্যা, পরবর্তী কালে লোকেন পালিতের সংগে এঁর বিবাহ হয়। অ্যানি চক্রবর্তী-ডঃ (সূর্যকুমার) গুডীভ চক্রবর্তীর কন্যা। দ্বারকানাথ যে চারজন বাংগালীকে শিক্ষার্থে বিলাত পাঠান তার মধ্যে একজন ছিলেন এই গুডীভ চক্রবর্তী। এদেশে এসে অ্যানি চক্রবর্তীর বিবাহ হয় ব্যারিস্টার প্যারীলাল রায়ের সংগে।

দ্র. সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন। পৃ. ৫।

৬৪. 'শুনেছি এখনো লণ্ডনে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাশে তার ছোট গোর দেখা যায়'।—ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর শ্রুতি ও স্মৃতি পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত। শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত। 'তাকে বলেছিলুম দ্বারকানাথ ঠাকুরের গোরের কাছে গোর দিতে। গত বৎসরও হেমলতা বউমারা গিয়ে সেটা দেখে এসেছেন।'—জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : পুরাতনী। পৃ. ৪০।

৬৫. 'তার নাম ছিল কবীন্দ্র (ডাকনাম চোবি) এবং সে বিলেতেই মারা যায়। সে শোক মা বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি'। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর লেখা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন পৃ. ৪।

অপিচ 'আমার আর একটি পুত্রসন্তান বোধহয় সিন্ধুদেশেই হয়। তার নাম রেখেছিলুম কবীন্দ্র, ডাকনাম চোবি'।—
জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : পুরাতনী—পৃ. ৩৮।

৬৬. শ্রুতি ও স্মৃতি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। পৃ. ৫।

৬৭. পুরাতনী ; পৃ. ৪২।

৬৮. ঐ পৃ. ৪১।

৬৯. আমার বোম্বাইপ্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ১০৮।

৭০. ঐ পৃ. ১০৮।

৭১. জীবনস্মৃতি (বিলাত) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ১০১।

৭২. 'শ্রুতি ও স্মৃতি' পাণ্ডুলিপি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

৭৩. 'দুঃখের বিষয় যে তাহার ফল ভক্ষণ করিতে পারিলাম না, আংগুর পাকিবার আগেই আমার অন্যত্রে বদলি হইল।' বোম্বাই চিত্র : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৭২।

৭৪. 'সে বেচারীদের মধ্যে গুলি চালাতে গিয়ে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং' আকাশবাণী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়ে আমার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করতে লাগল, আমিও শিকারে ক্ষান্ত দিলাম।'—আমার বোম্বাইপ্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ১৩২। বোম্বাইচিত্র, পৃ. ৬৮।

৭৫. 'সিমলায় ৩.৪ দিনের অধিক থাকিতে পারি নাই—সেখানে সপরিবারে গিয়াছি—পরিবার রাখিয়া নিজস্থানে একাকী গমন করিতে হইবে। হাতে ঐ সময়—উহার মধ্যে বাড়ী ঠিক করা—দুইটি স্কুল ঠিক করা—একটা ছেলেদের স্কুল একটা বালিকা বিদ্যালয়—সব গুছাইয়া দিয়া যাইতে হইবে'।—বোম্বাই চিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৭৪।

৭৬. শ্রুতি ও স্মৃতি পাণ্ডুলিপি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। পৃ. ৪২।

৭৭. আমার বোম্বাইপ্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ১১৫।

৭৮. জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ পৃ. ১৩৮।

৭৯. শ্রুতি ও স্মৃতি।—পৃ. ৪৯।

৮৯. রবিকা···একজন মাদ্রাজী নর্ত্তকীর দল যখন কানাড়ী গান গাইতে এসেছিল তখন বড় আশা করে, আজি শুভদিনে, সকাতরে ওই, সম্ভবতঃ ওখানেই ভেংগে থাকবেন। —তদেব। পৃ. ৪৯।

৮১. আমার বোম্বাইপ্রবাস : পৃ. ১১৬।

৮২. পূর্বপ্রথানুসারে রবিকাকার কনে খুঁজতেও তাঁর বউঠাকুরানীরা, তার মানে মা আর নতুন কাকিমা, জ্যোতিকাকামশায় আর রবিকাকাকে সংগে বেঁধে নিয়ে যশোর যাত্রা করলেন। বলা বাহুল্য আমরা দুই ভাইবোনেও সে যাত্রায় বাদ পড়ি নি। রবীন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। পৃ. ৫৪।

৮৩. রবীন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। পৃ. ৫৫. সৌদামিনী দেবী তখন কারোয়ারে ছিলেন।

৮৪. 'দার্জিলিং হইতে ফিরিবার পর তাঁহারা চৌদ্দ নম্বর সার্কুলার রোডে বাসাবাটিতে আছেন। সাহিত্যচর্চার জন্য 'জন্য 'সমালোচনী সভা' স্থাপন করিয়াছেন—বিহারীলাল, প্রিয়নাথ প্রভৃতি অনেকে আসেন। পৌষ মাসের শেষাশেষি (১৮৮০ জানুয়ারী) সত্যেন্দ্রনাথ ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন; বাড়িতে পার্টি গানের মজলিস্ প্রায়ই চলিতেছে, মহা-আনন্দে আছেন সকলেই। রবীন্দ্রজীবনী :—প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়। ১ম খণ্ড; পৃ. ১৩২-১৩৫০।

৮৫. চিঠিপত্র অষ্টম খণ্ড, প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ৮নং পত্র ১৮৮৩ সাল।

৮৬. চিঠিপত্র অষ্টম খণ্ড, প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ২৫নং পত্র ১৮৮৪ সাল।

৮৭. আমার বোম্বাই প্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ১৩৯।

৮৮. 'শোলাপুর টাউন হল—লর্ড রিপণের বিদায়কালীন তাঁহার স্মৃতি মন্দির স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত যে টাউন হল এক্ষণে সোলাপুরের অলংকার-স্বরূপ শোভা পাইতেছে, তাহার প্রতিষ্ঠামূলে প্রধানত: এই প্রবাসী সিভিলিয়ানেরই উৎসাহ, যত্ন ও সাহায্য বর্তমান ছিল'

যথায় তিনি (সত্যেন্দ্রনাথ) তাঁহার কর্মজীবনের অধিকাংশ কাল ক্ষেপন করেন, সেই সোলাপুর জেলায় মুল্লাপপাবারদ প্রমুখ স্বদেশহিতৈষী জনগণ তাঁহার সহযোগে ডফরীণ হসপিটাল, দরিদ্র ছাত্রদিগের সাহায্য ভাণ্ডার, সাহিত্যসভা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করেন।' বংগের বাহিরে বাঙালী : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। পৃ. ২৩৩।

৮৯. আমার বোম্বাইপ্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ১২৭।

৯০. রবীন্দ্রজীবনী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথম খণ্ড ; পৃ. ১৬৭।

৯১. চিঠিপত্র অষ্টম খণ্ড। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র। (১৮৮৬ জানুয়ারি)।

৯২. ঐ পত্রধৃত প্রসঙ্গ—ব্রাহ্মসম্মিলন—গত ৯ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃ-কালে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রাঙ্গণে "শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কয়েকজন বেদীর আসন গ্রহণ করেন।' দ্র. তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন, ১৮০৭ শক।

৯৩. কেহ কেহ বলে সুর্পনখার নাসিকাচ্ছেদের প্রবাদ হইতে নাসিক নামের বুৎপত্তি। এই কি সত্যই সেই রামায়ণের পঞ্চবটী? ইহা নিসন্দেহস্থির করা যায় না। পাণ্ডারা যাহা বলে···তাহা মানিয়া লওয়া যায় না'। আমার বোম্বাই প্রবাস, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ১১০।

৯৪. আমার বোম্বাইপ্রবাস : পৃ. ১১০।

৯৫. একবার মেজমার সঙ্গে বম্বের Watson Hotelএ গিয়ে যখন হপ্তা খানেক থাকি। তার স্বত্বাধিকারী মেজমামার একজন মুসলমান বন্ধু হোটেলে প্রায়ই একবার করে আসতেন, আমাদের তদারক করতে···। জীবনের ঝরাপাতা : সরলা দেবী। পৃ. ৭৫।

৯৬. 'At any rate, whatever men may say, I cannot be deprived of this consolation—My motives are acceptable to that being who beholds in secret and compensates openly'—(Ram Mohan), quoted by Satyendranath in his address...deliverd at the city college Hall, Calcutta on 27th September 1889, the fifty-third anniversary of the death of Raja Ram Mohan Roy.

৯৭. রবীন্দ্রজীবনী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২ (পরিবর্তিত সং ১৩৫৩)

৯৮. ঐ।

৯৯. ৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা আমার সংগীরা বিলাতে রয়ে গেলেন।

৩ নভেম্বর। অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পেঁছিল।

৪ নভেম্বর। রাত্রে কলিকাতামুখী গাড়িতে চড়ে বসা গেল। দ্র. য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।

১০০. ভিত্তিমূলে যে খোদিত তাম্রফলক প্রোথিত করা হয় সত্যেন্দ্রবাবু সর্ব সমক্ষে তাহা পাঠ করিলেন। ওঁ তৎসৎ ঠকুরবংশাবতংসেন পরমর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণা ধর্ম্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিত-মিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কল্যব্দ অগ্রহায়ণ ২২ রবিবাসর। পরে সকলে মন্দিরের ভিত্তিমূলে গমন করিলে তাম্রফলক, পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা এবং উক্ত ২২শে অগ্রহায়ণের Statesmen পত্রিকা. ঐ অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একটি আধারে আবদ্ধ করিয়া মন্দিরের ঈশান কোণে প্রোথিত করা হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত দ্রব্যগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া স্বহস্তে কর্ণিক দ্বারা ভিত্তি প্রস্তর গাঁথিয়া দিলেন।

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা— পৌষ ১৮১২ শক]

১০১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা— ১৮১৪ শক, কার্তিক।

১০২. '৫০ নং পার্ক স্ট্রীট কেনা হয়, কিন্তু পরে আবার বিক্রি করে দেওয়া হয়। মহর্ষির কিছু দিন পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে থাকতে আসা, এবং সেই উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন বিশেষ বড়পিসিমার রোজ আসার আগেই বলেছি। এ বাড়ী আমরা ছাড়লে পর এখানে স্যানিটারিয়ম স্থাপিত হয় মনে আছে। শ্রুতি ও স্মৃতি: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। পৃ. ৪৫—৪৬।

অপিচ— দার্জিলিং হতে ফিরে এসে তিনি (দেবেন্দ্রনাথ) আর চুঁচুড়ায় যান নি।...পার্ক স্ট্রীটের ৫২।২নং বাড়ী ভাড়া করে সেখানে তিনি বাস করতে আরম্ভ করেন।...এইখানে তাঁর আশী বৎসর বয়সে বিভিন্ন ব্রাহ্ম ভক্তগণ তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন (মানপত্র)। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহর্ষি পৈত্রিকগৃহে ফিরে এলেন। ঠাকুর-বাড়ীর কথা: শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ. ১৮।

১০৩. আমার বোম্বাই প্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃ. ১০৮।

১০৪. বাড়ির নাম Wood Field। রবীন্দ্রনাথ তার বাংলা নামকরণ করলেন 'বনক্ষেত্র'। সেই বনক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কিছু কবিতাও রচনা করেছিলেন।' হেঁয়ালি-চিত্র : শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। পৃ. ১৩২ সুরেন্দ্রনাথ শতবার্ষিক সংকলন, (১৯৭২)।

১০৫. সব সময় এঁরা একটা খেয়াল নিয়েই থাকেন। বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।...এবার তাঁর খেয়াল-খেলার সঙ্গী হলেন ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ। খুড়ো-ভাইপো এক নতুন কায়দায় চিঠি লেখা শুরু করলেন জোড়াসাঁকো ৫নং বাড়িতে—গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র-সত্যপ্রসাদের সঙ্গে। সোজাসুজি সাধারণ চিঠি নয়—আগাগোড়া ছবি এঁকে ঐ ছবি ও সামান্য কিছু লেখা দিয়েই মনের কথা ফুটিয়ে তুলতেন।... ঠিক সেই রকম ভাবেই উত্তর যেত জোড়াসাঁকো থেকে সিমলা পাহাড়ে'।—তদেব, পৃ. ১৩২।

উক্ত সংকলন গ্রন্থে প্রবন্ধটির সঙ্গে হেঁয়ালিচিত্রের কয়েকটি ফটো-কপিও মুদ্রিত হয়েছে।

১০৬. 'যে সব দেশে নিজেদের রাজদরবার ছিল তাদেরই মধ্যে এই সব আনুষ্ঠানিক কায়দাকানুনের চল বেশি দেখা যায়। যেমন মহারাষ্ট্রে পেশওয়াদের আমল, ওদের মধ্যে 'পানসুপারি' কথাটার মানেই হয়ে গেছে বিদায় আমন্ত্রণ।

রাজসভার সভাসদদের বিদায় নেবার সময় হয়েছে সে কথা ভদ্রভাবে জানিয়ে দেবার জন্য এই প্রথার প্রচলন হয়েছে। বাবা অবসর গ্রহণ করবার মুখে যখন সোলাপুর ছেড়ে চলে আসেন, তখন কত পানসুপারি নিমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে গিয়েছি, তার ঠিক নেই।' শ্রুতি ও স্মৃতি—পাণ্ডুলিপি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। পৃ. ৫৭ক।

এবিষয়ে আরও উপভোগ্য বর্ণনা তিনি অন্যত্র দিয়েছেন—'আমরা ঢুকে দেখতুম ঘর পূর্ণলোক, চতুর্দিক ঝাড় লণ্ঠন আলোকাকীর্ণ। কেউ রঙ্গীন কাগজের মালা, কেউ ফুল পাতা দিয়ে ঘর সাজিয়েছে।... গান চ'লত চ'লত একটার পর একটা·· জজ সাহেবের নামে একটা গুণগান থাকতই থাক্‌ত। সভাভঙ্গের চিহ্ন স্বরূপ পানসুপারি, আতর, ফুলের

মালা আসত, গোলাপজল বা ল্যাভেণ্ডারের ছিটে·· অনেক সময় আতস বাজি দেখাতে হ'ত। একটা বাক্সের মধ্যে আলো রেখে বাইরে জজসাহেবের নাম ফুটে উঠত···সব হয়ে গেলে·· Good night—মারাহাটী পানসুপারি : ইন্দিরাদেবী। ভারতী, ১৩০৬ বৈশাখ।

১০৭. আমার বোম্বাইপ্রবাস—পৃ. ১৯২।

১০৮. আমার বাল্যকথা—পৃ. ৬৪। বৈতানিক প্রকাশনী।

১০৯. স্বর্ণকুমারীদেবী : শোক নৈবেদ্য : সাহিত্যস্রোত—১ম ভাগ।

১১০. দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট—৩।

১১২. আমার বোম্বাই প্রবাস—পৃ. ১৯২।

১১২. তত্ত্ববোধিনী : মাঘ ১৮৪৪ শক।

১১৩. রামচন্দ্রপুরের সংজ্ঞা দেবী (স্বরূপানন্দ সরস্বতীর) সঙ্গে ১৯৭৭-এ এক সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত।

অবসর জীবন

(তৃতীয় পর্ব : ১৮৯৭-১৯২৩)

কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার কিছুদিন পরেই ১৮৯৭ সালে (১০-১২ জুন নাটোরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে ১০ম অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সভায় তাঁর ভাষণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 'রাজনৈতিক' অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হবে। ১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসে সত্যেন্দ্রনাথ কয়েকদিনের জন্য বহরমপুরে গিয়েছিলেন।[১] প্রসঙ্গত বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন-এর আগ্রহাতিশয্যে ১৮৯৫ সালে (মফস্বলে) সর্বপ্রথম সেখানে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হয়। তাঁর মহানুভবতার কথা সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৯৭-এর নাটোর সম্মেলনেও বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে ঐ সম্মেলনের সময়—ভূমিকম্পে ত্রস্ত ভীত ভালমানুষ বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে মনে করেছেন। সুতরাং বৈকুণ্ঠনাথ যদি সেসময় বহরমপুরে থেকে থাকেন তবে তাঁর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যোগাযোগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। নাটোর কংগ্রেসের পর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সত্যেন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ না করলেও দেশের শাসন ব্যবস্থায় তাঁর সুচিন্তিত অভিমতের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর আসনও যে সুনির্দিষ্ট ছিল তা হেমলতা দেবীকে[২] লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র থেকে জানা যায়। রাঁচি যাওয়ার পরেও Reformed council[৩]—এর ভোট দেবার জন্য তাঁকে কলকাতায় আহ্বান জানানো হয়েছিল।

কন্যা ইন্দিরার বিবাহ

১৮৯৮ সালে সুসাহিত্যিক ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। প্রসঙ্গত সরলা দেবীর কথায় প্রমথ চৌধুরী এবিষয়ে অগ্রসর হন।[৪] প্রমথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবীর বিবাহ হওয়ার পর থেকেই দুই পরিবারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। ১৮৯৩ সালে, সিমলা থাকার সময়েই

ইন্দিরা দেবী বিলেত যাওয়ার পথে প্রমথ চৌধুরীকে একবার সিমলায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন।[৫] বিবাহের বেলায় পাত্রপাত্রীর স্বাধীন ইচ্ছার উপর সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সুতরাং আপন কন্যার ক্ষেত্রে তিনি সানন্দেই সম্মতি দিয়েছেন।[৬] ১৮৯৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি (১৩০৫, ১৭ই ফাল্গুন) বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঐ সময় ১নং রেনী পার্কের ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। বিবাহ উৎসব জোড়াসাঁকো বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা ইন্দিরা দেবীর কথায় জানা যায়।

বিবিধ কর্মোদ্যম

১৩০৬এর ৭ই পৌষ (১৮৯৬) শান্তিনিকেতনের নবম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মোৎসবের দিনে বলেন্দ্রনাথ পরিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয় গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করেন সত্যেন্দ্রনাথ। 'ব্রহ্মবিদ্যাঅর্জনের অনুকূল পরিবেশে' ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়—এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য রাখেন। সেদিন সন্ধ্যাকালে মন্দিরের উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ভাষণ পাঠ করেন। এর ইংরেজি অনুবাদ The God of the Upanishads ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮২৩ শক পৌষ থেকে ১৮২৪ শক মাঘ) প্রকাশিত হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ইংরেজি অনুবাদটি সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত বলে অনুমান করেন।[৭]

অবসর জীবনে আদি ব্রাহ্মসমাজের কাজে, কলকাতায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজে ও সাহিত্য সাধনায় তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন।

চার খণ্ড সংকলন

কর্মজীবন থেকে মুক্ত হয়ে এসময় একনিষ্ঠভাবে গ্রন্থপাঠে তিনি যে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছেন—তার নিদর্শন রয়েছে তাঁরই নিজ হাতে টাইপ করা সুবৃহৎ চারখণ্ড সংকলনে। সংকলন কত গোছানো ও আকর্ষণীয় হতে পারে তা ঐ সুবৃহৎ সংকলনগুলিকে দেখেই বোঝা যায়। গবেষণার পূর্ব প্রস্তুতির মতো তিনি ঐগুলি সাজিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন। এগুলি থেকে উপকরণ নিয়ে বেশ কিছু কাজও তিনি করেছেন (বৌদ্ধধর্ম, গীতার উপক্রমণিকা, নবরত্নমালা ইত্যাদি)। ভবিষ্যতে হয়তো আরও কিছু লেখার তাঁর পরিকল্পনা ছিল। চারটি সুবৃহৎ সংকলনের বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈদিক ধর্ম

ও সাহিত্য, ষড়্দর্শন, বৌদ্ধধর্ম, পুরাণ, গীতা ও হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়, সংস্কৃত সাহিত্য, মারাঠা গাথা ও কবিতা, তুকারাম ও ইংরেজি কাব্য—নাটক প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য মনীষীদের সুললিত অনুবাদ ও সুচিন্তিত আলোচনা একত্রে সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে তুকারামের অধ্যায়টি পৃথক ভাবে বাঁধিয়ে তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে দান করেছেন।[৮] এই সংকলনে রিস্‌ডেভিড্‌স্‌ এর রচনার যে অংশগুলি তোলা হয়েছে তার ছায়া পড়েছে সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে (দ্র. বৌদ্ধধর্ম অধ্যায়)। ভগবদ্‌গীতা সম্পর্কে কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং 'সেক্রেড বুক অব দি ইস্ট' এর ভূমিকায় যা বলেছেন তা সত্যেন্দ্রনাথ সযত্নে এই সংকলনে তুলে রেখেছেন।

পণ্ডিত তেলাং-এর সঙ্গে তিনি যে পুরোপুরি একমত হতে পারেন নি তা তাঁর গীতা অনুবাদে স্পষ্ট করেই বলেছেন। (দ্র. উপক্রমণিকা ও গীতার অনুবাদ)। প্রাচীন ভারতে যে জাতিভেদের কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না—এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ দৃঢ় ধারণা পোষণ করতেন। এই সংকলনেও দেখা যাচ্ছে তিনি সযত্নে No distinction of caste তুলেছেন। অকওয়ার্থ সাহেবের 'মারাঠা ব্যালাড্‌স্‌'-থেকেও তিনি এই সংকলনে অনেক কাহিনী সাজিয়েছেন। তাঁর বোম্বাই চিত্র গ্রন্থে পরিবেশিত অনেক মারাঠা কাহিনীর সঙ্গে এগুলির মিল রয়েছে। এই সংকলনে সাজানো কয়েকটি ইংরেজি কবিতার বঙ্গানুবাদও তিনি করেছেন।[৯] সংকলনের মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ্য অংশ—ইংরেজি সাহিত্যের 'Nature-animat and inanimate'—অংশটি। এগুলি সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা না হলেও গ্রন্থনার গুণে আকর্ষণীয় হয়েছে।[১০]

সত্যেন্দ্রনাথ রেনী পার্কের বাড়িতে থাকার সময়েই মহর্ষি উইল করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৭এ সংজ্ঞা দেবীর (স্বরূপানন্দ সরস্বতী) কাছে রামচন্দ্রপুরে দিন তিনেক থেকে তাঁর কাছ থেকে যতটুকু বিবরণ আমরা পেয়েছি ও তাঁর 'স্মৃতিকথা' রচনা থেকে যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে—তাতে জানা যায়—মহর্ষির উইলে জোড়াসাঁকো বাড়ির অংশ থেকে সত্যেন্দ্রনাথকে প্রথমে বঞ্চিত করা হলেও পরে জোড়াসাঁকো বাড়ির পরিবর্তে উপযুক্ত অর্থ তাঁকে দেওয়া হয়। সেই টাকায় ১৯ নম্বর স্টোর রোডের বাড়ি কেনা হয়।[১১]

১৩০৭ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্যতালিকায় সত্যেন্দ্রনাথের

No. 301

Sattara
7th Feby/69

My dear Gunudada

You will see from the address that I have joined my new appointment at Sattara. My wife & family arrived in Bombay on the 1st Inst. They were received by friends on their arrival & put up at a friend's house where I met them on the 2nd. The children all right & are well. The sea voyage did my wife a great deal of good & [illegible]

১৮৬৯-এর ৭ই ফেব্রুয়ারী সাতারা থেকে গণেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা

১৯ নং প্টোর রোড (বর্তমানে গুরু-সদয় রোড)-এর বাড়ি। এখন বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়াম

নদীয়া হাউস (১ নং ব্রাইট স্ট্রীট) এই বাড়ীতে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী থাকতেন

ঠিকানা—১৯নং স্টোর রোড পাওয়া যায়। সুতরাং ১৩০৭ সালে (১৯০০ খৃ.) সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে ১৯নং স্টোর রোডের বাড়িতে থাকাই সম্ভব।

১৯নং স্টোর রোডের বাড়ির যে সুন্দর বর্ণনা ইন্দিরা দেবীর লেখায় ও অন্যান্য পরিজনদের মুখে শোনা গেছে—কালের স্রোতে তা আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। 'বাইশ বিঘে জমি,' 'তিনটে পুকুর'—যেখানে জ্ঞানদানন্দিনীর 'শখের দুটি হাঁস নল-দময়ন্তী ভেসে বেড়াতো,'[১২] শখের বাগান—আজ তার কিছুই নেই। ১৯৭৮-এ সাক্ষাৎ অনুসন্ধানে দেখা গেছে—নিত্য নূতন ইমারত গড়ার কাজে রাতদিন এখানে লোক খাটছে। মডার্ণ হাইস্কুল কম্পাউণ্ডের ভিতরে একটি জীর্ণ 'বাঁধানো বকুলতলা' চোখে পড়েছিল আর ইন্দিরা দেবীর বর্ণিত বাড়ির শেষ চিহ্নটুকু 'কলস' ডিজাইনের সামনের প্রাচীর[১৩]—বিড়লা মিউজিয়ামের ফটকের পাশে সে-সময়ও ছিল।

অমৃতবাজার পত্রিকার (১৯৫৯, ২রা মে) প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাড়িটি বিড়লাদের কাছে বিক্রি হয়ে যায়।[১৪] কালক্রমে এখানে বিড়লা ইণ্ড্রাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়াম, রাণী বিড়লা গার্লস কলেজ, মডার্ণ হাই স্কুল ইত্যাদি গড়ে ওঠে।

প্রসংগত সুরেন্দ্রনাথ যে নিতান্ত বাধ্য হয়েই বাড়িটি বিক্রি করেছিলেন তা 'পরিচয়'[১৫] পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদে ও ইন্দিরা দেবী,[১৬] সংজ্ঞা দেবীর[১৭] বক্তব্য থেকে স্পষ্ট জানা যায়। পরিচয় পত্রিকায় বাড়ি বিক্রির সাল অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশিত তথ্যের একবছর পরে ও সংজ্ঞাদেবী এক বছর আগে বলেছেন। যাই হোক ১৯১৮ থেকেই বাড়ি বিক্রির কথা পাকাপাকি হয় এটি ধরে নেওয়া যায়।

১৯নং স্টোর রোডের বাড়ি কেনার সমসাময়িক কালে ১নং ব্রাইট স্ট্রীটের[১৮] বাড়িটিও কেনা হয়। ইন্দিরা দেবীর বিবাহের পর—কন্যাকে কাছাকাছি পাওয়ার জন্য, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তাঁর জন্য বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল, ১নং ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়িটি কন্যার জন্যই কেনা হয় ও তাঁরা সেখানে উঠে আসেন। পরে পিতা ও পুত্রের যৌথ উদ্‌যোগে দানপত্র হয়েছিল তা মহারাজকুমার সৌরীশচন্দ্র রায়ের কাছে জানা যায়।[১৯] ইন্দিরা দেবী যে দীর্ঘদিন বাড়িটি ভোগ করেছেন সেকথা তিনি নিজেও বলেছেন।[২০]

সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ

১নং ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়িতে একদিন ভ্রাতার উপনয়নে আমন্ত্রণ জানাতে প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা সংজ্ঞা দেবী[২১] এসেছিলেন। ডা. সুহৃৎ চৌধুরী প্রমুখেরা এঁর সংগে সুরেন্দ্রনাথের বিবাহের জন্য জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে প্রস্তাব দেন।[২২] নির্বিকার সুরেন্দ্রনাথ কন্যাকে একবার দেখাতেও চান নি। পাত্র পাত্রীর বয়সের[২৩] ব্যবধান অনেক বেশি—তাছাড়া পুত্র সুরেন্দ্রনাথ কন্যাকে একবার দেখলেনই না, এটি প্রগতিশীল সত্যেন্দ্রনাথের মনঃপুত হয় নি। জ্ঞানদানন্দিনী কিন্তু পুত্রের বিবাহের বেলায় মহর্ষির ইচ্ছার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ইতোপূর্বে মহর্ষির মতবিরুদ্ধ হবে বলেই কয়েকটি ভালো আলাপও বাতিল হয়েছিল। একমাত্র পুত্রের বিবাহে মহর্ষির আশীর্বাদ থাকবে না—জ্ঞানদানন্দিনী একথা ভাবতে পারেন নি।[২৪]

মহর্ষি এ বিবাহের কথা শুনে পরম প্রীত হয়ে কন্যাপক্ষের সমস্ত ব্যয়ভার সানন্দে বহন করেছিলেন; সেদিকে যেন কোন কার্পণ্য না হয় সেজন্য যদু চাটুয্যেকে 'ঢালাও হুকুম' দিয়েছিলেন।[২৫] ১৩১০ সালের (১৯০৩) আষাঢ় মাসে কালীসিংহের বাড়িতে[২৬] বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। বিবাহের পর একমাস ১৯নং স্টোর রোডে না গিয়ে পুত্রবধূকে সকলের সংগে পরিচিত করবার জন্য তাঁকে নিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী জোড়াসাঁকোতেই ছিলেন।[২৭]

১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর (১৩০৮, ৭ই পৌষ) আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ আবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। ঐ দিন একাদশ সাম্বৎসরিক উপাসনার পর পূর্বোক্ত ব্রহ্মবিদ্যালয় গৃহে আনুষ্ঠানিক-ভাবে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত নববিদ্যালয়ে কার্য আরম্ভ হয়। তত্ত্ববোধিনী (১৮২৩ শক মাঘ) প্রকাশিত—'ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত বিনীত উপবিষ্ট বালকদের' বর্ণনায় তপোবনের ছবি ফুটে ওঠে। সেখানে সবপ্রথম সত্যেন্দ্রনাথ বিদ্যালয় সম্পর্কে ভাষণ দেন।

১৩০৭, ১৩০৮, ১৩১০ ও ১৩১১ (১৯০০-১৯০৪) এই কয় বছর সত্যেন্দ্র-নাথ সাহিত্য পরিষদের সভাপতি রূপে বংগভাষার গঠন কল্পে যে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন তা' 'বংগীয় সাহিত্য পরিষদে অবদান' অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে। ১৯০৪এ আর একটি বিশেষ কাজ ইনি সম্পন্ন করেন। মহর্ষির আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদ কন্যার সহযোগিতায় এই সময় রচিত

হয়। সে বছর মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি কন্যা জামাতার গৃহে দার্জিলিং-এ ছিলেন। [শ্রুতি ও স্মৃতি—২য় খণ্ড। পৃ. ৯৯

১৮২৭ শকের ২রা ফাল্গুন থেকে (১৯০৬) আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য ও ১লা শ্রাবণ ১৮২৯ শক থেকে (১৯০৭) বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সংগে তিনি আচার্য ও সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২৮]

১৯০৭-এ সুরাটে থিইষ্টিক কনফারেন্সে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যালয়ে মুক্তহস্তে দানের জন্য তিনি সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন রেখেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী জানবার জন্য সহসম্পাদক হেমচন্দ্র সরকারের সংগে যোগাযোগ করতেও তিনি সকলকে অনুরোধ করেছেন।[২৯]

১৯০৮এ আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার কার্যেও তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। সমাজগৃহের জীর্ণদশা ঘুচিয়ে বিজলী বাতি ও পাখা আনার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ যে বিশেষ উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন তা ১৯০৮-এ ঝরিয়া মহারাজকে লিখিত তাঁর আবেদনপত্র থেকে জানা যায়।[৩০] সমাজের কাজ চালানোর জন্য ১৯০৮এর ২১শে জানুয়ারি হরিশবাবুর কাছ থেকে যে লাইট কেনা হয়েছিল তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁর দিনলিপিতে উল্লেখ করেছেন।[৩১]

১৯০৮এ বরানগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একতলার ঘর 'দেবালয়' নাম দিয়ে সাধারণকে দান করেন। সেজন্য সত্যেন্দ্রনাথকে সভাপতি করতে।

তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনা

প্রথম যৌবনে (১৮৫৯-৬১) সত্যেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনা করেছিলেন। দীর্ঘ দিন পরে ১৯০৯ থেকে আবার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। ঐ সময় বাৎসরাধিক কাল ইনি সম্পাদনা কার্যে লিপ্ত ছিলেন। পুনরায় ১৯২২ পর্যন্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগে যুগ্ম সম্পাদনা করেছেন।[৩৩]

রাঁচি পর্ব

১৯০৮এর ১৭ই জানুয়ারি প্রমথনাথ-ইন্দিরাদেবী ও সুরেন্দ্রনাথ-সংজ্ঞাদেবী একই সংগে বায়ুপরিবর্তনের জন্য রাঁচিতে যান। ৮ই ফেব্রুয়ারি জ্ঞানদা-

নন্দিনীও এঁদের কাছে যান। সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দু ভাই তখন স্টোর রোডের বাড়িতেই ছিলেন।

রাঁচি বেড়াতে গিয়ে সকলেরই জায়গাটা খুব ভাল লাগে ও তাঁরা দু ভাইকে সেখানে যেতে লিখেন। ১৯০৮এর ১৬ই মার্চ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে যান ও তার একমাস পরেই সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে পৌঁছান।

বায়ু পরিবর্তনের জন্য সত্যেন্দ্রনাথের স্থানত্যাগে সাময়িক ভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার ভার রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন একথা ১৮৩০ শকের আষাঢ় সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়ও উল্লিখিত হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে গিয়েই পুরোনো বাড়ি কেনা অথবা জমি কিনে নতুন বাড়ি করার কথা চিন্তা করেন: সেজন্য রাঁচির বিশিষ্ট ব্যক্তি—জয়কালীবাবু, বসন্তবাবু ও কৃষ্ণবাবুর সঙ্গে যোগাযোগও করেন।[৩৪]

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথকে কাছে পেলে রাঁচিতে বাকী জীবনটা ভালই কাটবে—এই ভেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়ে উঠেন। বলাবাহুল্য রাঁচি ভাল লাগায়, জ্ঞানদানন্দিনীও অন্যান্যদেরও এবিষয়ে উৎসাহ কম ছিল না।

ঐ বছর (১৯০৮) ১লা জুন পারিবারিক উৎসবের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের জন্মদিন রাঁচিতেই প্রতিপালিত হয়। ১৯০৮এর ২৯শে জুন সকলে কলকাতায় ফিরে এলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রাঁচিবাসের উদ্‌যোগ থেমে যায় নি। ইতোমধ্যে রাঁচি থেকে কয়েকটি বাড়ি ও জমির খোঁজ আসে। ১লা অক্টোবরেই (১৯০৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্টোর রোড়ের সকলকে নিয়ে আবার রাঁচি যাত্রা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ দলের সঙ্গে যান নি। সেখানে বাড়ি ভাড়া করে থেকে কয়েকটি জমি ও বাড়ি দেখার পর মোরাবাদী পাহাড়ের জমি নেওয়াই স্থির হয়। '২৩শে অক্টোবর পাহাড়ের জমিটা registered হয়'।[৩৫] ঠিক তার একদিন পরেই ১৯০৮ সালে ২৪শে অক্টোবর, সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে পৌঁছান। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে পাহাড়ের উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাড়ি করা স্থির হয়।[৩৬] এঞ্জিনিয়ার মহেন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে পাহাড়ের[৩৭] রাস্তা তৈরি ও 'শান্তি ধাম' নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যায়। কোলাহল থেকে দূরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই 'শান্তিধাম' এ সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

কিছুদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর বিশেষ ইচ্ছায় মোরাবাদী

← টেগোর হিলস্
মোরাবাদী, রাঁচি
১। শান্তিধাম
২। সত্যধাম
৩। সত্যধামের
রান্না বাড়ী
দুষ্প্রাপ্য আলোক
চিত্রটি শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা
ঠাকুরের সৌজন্যে
প্রাপ্ত
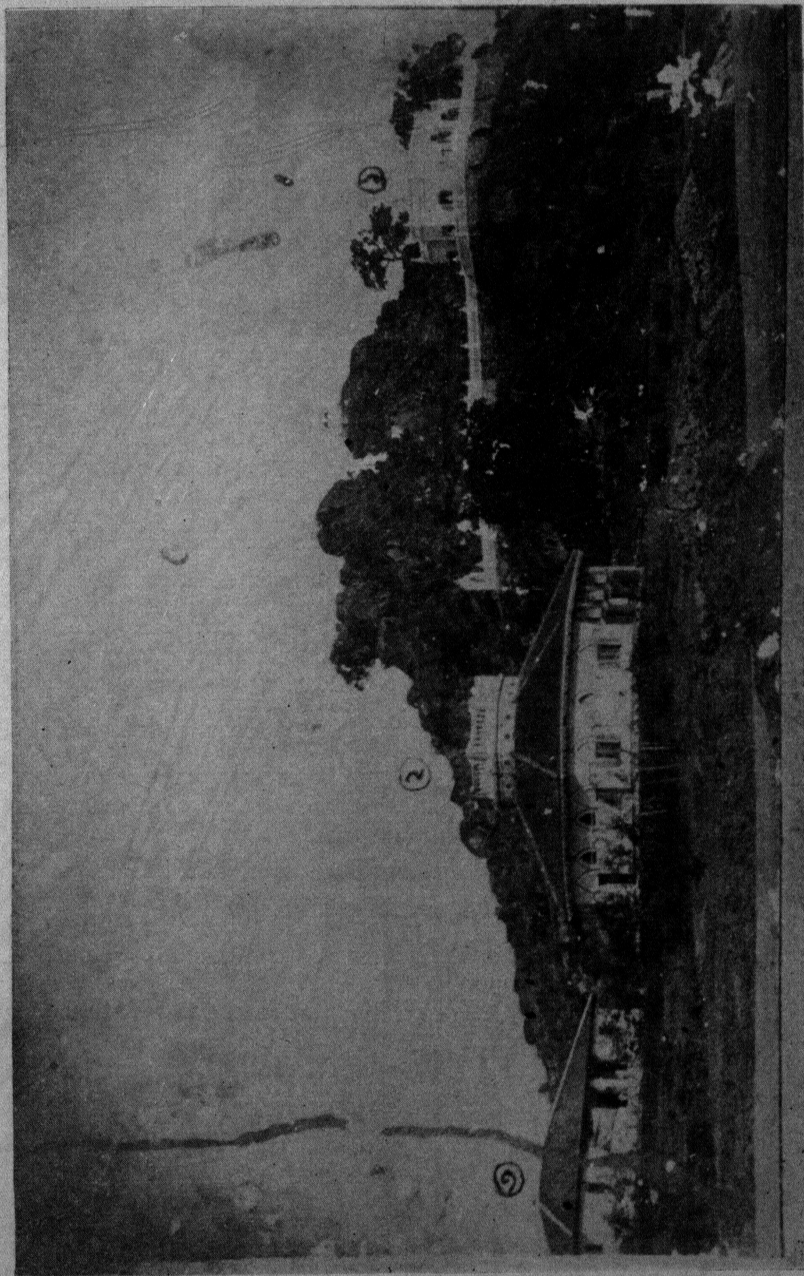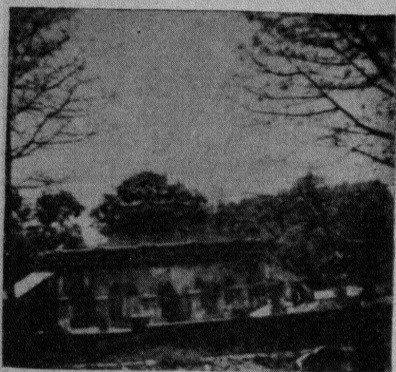
সত্যধাম
সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া নাম
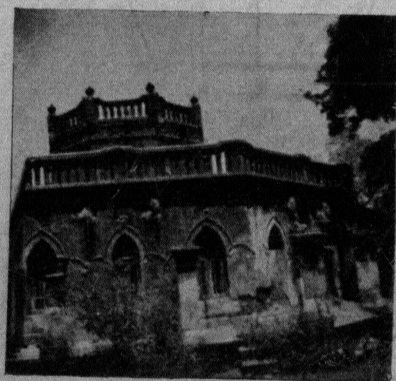
ছাতুর হাঁড়ির মতো অলঙ্করণ
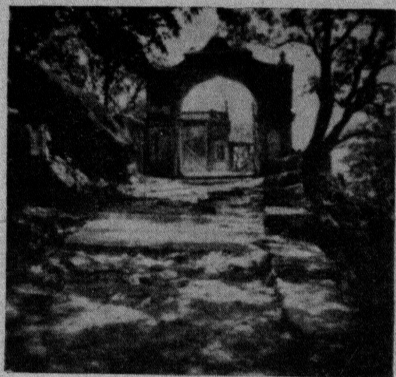
শান্তিধামের প্রবেশ তোরণ
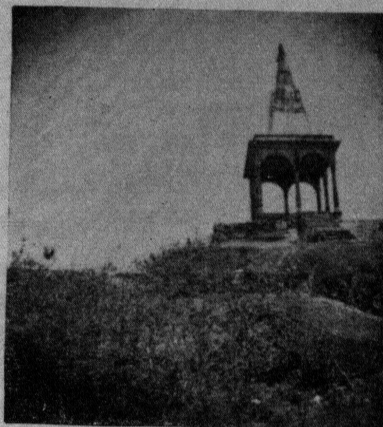
ব্রাহ্ম মন্দির
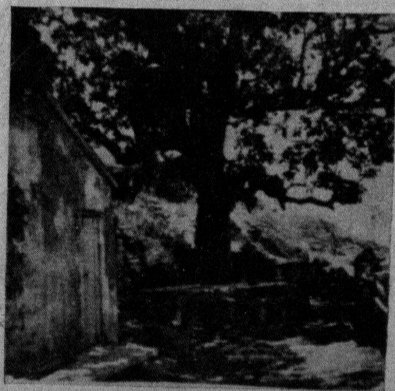
কুসুমতলা
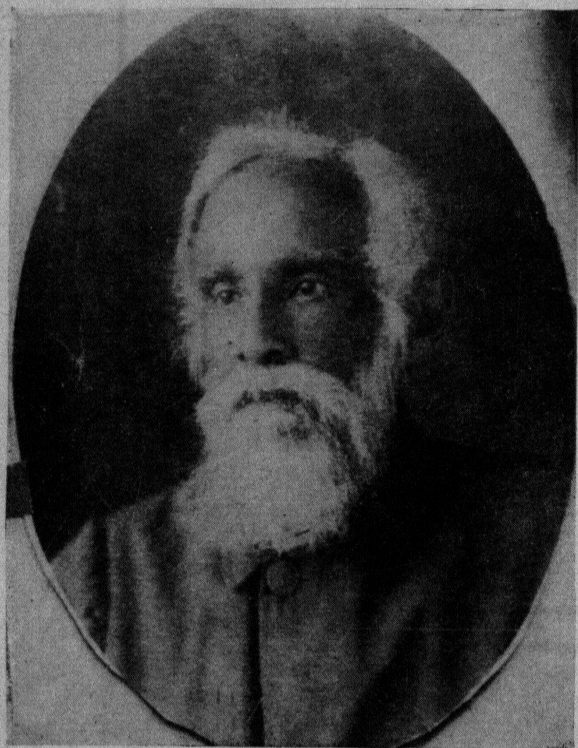
বার্ধক্যে সত্যেন্দ্রনাথ
শ্রীযুক্ত কুলপ্রসাদ সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত

পাহাড়ের নিম্নভূমিতে আর একটি বাড়ি তৈরির পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছায় বাড়িটির নাম দেওয়া হয় 'সত্যধাম'। এই সত্যধামেই জ্ঞানদানন্দিনী পৌত্রপৌত্রীদের দেখাশোনা ও সমাগত অতিথিদের আপ্যায়নে সদাই ব্যস্ত থাকতেন। প্রভাতে পাহাড়ের উপরের বাড়ি—'শান্তিধাম' থেকে ঘণ্টাধ্বনি শুনলেই ছোটোদের নিয়ে যেতেন—সেখানে কুসুমতলার বেদীতে উপাসনা হতো। তাছাড়া নববর্ষের উৎসব, মাঘোৎসব ইত্যাদি 'শান্তিধামেই' সকলের সহযোগিতায় জ্ঞানদানন্দিনী সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন।

'সত্যধাম বাড়িটি প্রথমে খুব অল্প খরচে করার পরিকল্পনা থাকলেও শেষে জ্ঞানদানন্দিনীর ইচ্ছাপূরণার্থে বিস্তর অর্থ এর জন্য খরচ হয়। 'অকটাগোনাল প্যাটার্নে' নির্মিত এই ভবনটিকে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী 'প্রস্ফুটিত অরণ্যপুষ্পের মতো' বলেছেন। তাছাড়া 'পদ্মের মতো গড়ন'[৩৮] 'ছাতুর হাঁড়ি'[৩৯] ইত্যাদি নানা কথাও 'সত্যধাম' প্রসঙ্গে পরিজনদের কাছ থেকে শোনা গেছে।

বর্তমানে অতি অযত্নে রক্ষিত, প্রায় ভগ্নদশার মধ্যেও এই গৃহ নির্মাণে যে সুরুচি ও অভিনবত্বের পরিচয় আমরা দেখছি, তাতে পরিজনদের বক্তব্যের সত্যতা আরও স্পষ্ট হয়েছে।[৪০]

শান্তিকামী ভ্রাতৃযুগলের ঐকান্তিক ইচ্ছায় মোরাবাদী পাহাড়ে যে একেশ্বরচেতনা সমৃদ্ধ উদার আশ্রমিক পরিবেশ রচিত হয়েছিল তার যথাযথ চিত্র প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকে আহরণ করা যায়।[৪১]

১৯১০ সালে মোরাবাদী পাহাড়ের চূড়ায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত—ব্রহ্মমন্দিরে যে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোককেই ইষ্টদেবতার উপাসনার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল তা মন্দিরের উৎসর্গ ফলক[৪২] থেকে জানা যায়। তাছাড়া মোরাবাদী রাস্তার ওপাশে 'সত্যধাম' এর বিপরীত দিকে 'কুয়ো খোঁড়াবার' জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর একটি জমি কিনেছিলেন। সেখানে গরীবদের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণের জন্য একটি বাড়িও শুরু করেছিলেন। পরবর্তী কালে 'জ্যোতিরিন্দ্র সেবাধাম' নাম দিয়ে তা ইন্দিরা দেবী রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেন।[৪৩] প্রসঙ্গত রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করায় আদি ব্রাহ্মসমাজের কেউ কেউ সেসময় ক্ষুব্ধ[৪৪] হয়েছিলেন। রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান সম্পাদক স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দের সঙ্গে স সাক্ষাতে ও

পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগের দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মহৎ ইচ্ছা এখনও রক্ষিত হচ্ছে তা জানা যায়।[৪৫] দ্বাবিংশ বিহাররাজ্যবঙ্গভাষী সম্মেলনের স্মারকপত্র—'স্মরণীতে'—'১৯২৭ সালে' ইন্দিরা দেবীর এই দানের কথা সগৌরবে প্রচারিত হয়েছে। (পৃ. ১২)। সেবাধামের জমিতেই স্বামী বিশুদ্ধানন্দের কর্মতৎপরতায় রাঁচিতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়।

স্বর্ণকুমারী[৪৬] দেবী বলেছেন ১৯১০ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ রাঁচিতে ছিলেন। ১৯১০ সালে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথকে বিদায় নিতে দেখা যাচ্ছে।[৪৭]

রাঁচির জীবনযাত্রার যতদূর পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে নির্জনবাস দুভাইএর কাম্য হলেও সংসার ও সামাজিকতা সম্পর্কে এঁরা মোটেই উদাসীন ছিলেন না। তৎকালীন রাঁচির বিখ্যাত বিপণী দেরাজদৌল্লার দোকান ও অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার থেকে নিজের ও পাড়ার সকলের সওদা করতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন প্রতিদিন সকালে ছুটতেন তেমনি সত্যেন্দ্রনাথও রোজ সন্ধ্যায় হেঁটে বরিয়াতুর দিকে চলে যেতেন—পথ হারালেও এ থেকে বিরাম ছিল না। পারিবারিক উৎসব, জন্মদিন ইত্যাদি বিশিষ্ট দিনে যেমন পাহাড়ে আলো দেওয়া হতো, তেমনি 'কোলদের নাচ' হতো। তাছাড়া 'হরির লোট' 'বিজয়ার আশীর্বাদ,' 'কোজাগরী পূর্ণিমায় চিঁড়ে-নারকেল বিতরণ' ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সংগে জ্ঞানদানন্দিনীর শৈশবে নরেন্দ্রপুরের অনুষ্ঠানগুলির কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। রাঁচির ক্লাবে—বিলিয়ার্ড খেলায় ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দু ভাই যেমন উপস্থিত থেকেছেন, তেমনি বন্ধুদের গৃহে প্রায়ই দুজনকে একসাথে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে।[৪৮]

জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কেও সত্যেন্দ্রনাথ কতটা আগ্রহী ছিলেন তা রসায়নাচার্য ডাঃ চুনীলাল বসুর—'শারীর স্বাস্থ্য বিধান' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায়।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বেই তাঁর স্বাস্থ্যপালন সম্পর্কীয় লেখাগুলো রাঁচি শহরে কিছু কিছু পঠিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ তাতে সভাপতিত্ব করেন ও পুস্তকটির নামকরণও তিনি করেন।

অবসরজীবনে শান্তিধামের নির্জনতায় তিনি গভীর প্রশান্তি লাভ করেছেন —তথাপি ইন্দিরা দেবী পিতাকে একান্তভাবে 'রাঁচি-ভক্ত' বলতে পারেন নি।

কলকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চল তাঁর ভালই লাগতো। ছেলেমেয়েকে কাছে পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে প্রায়ই তাঁকে কলকাতায় আসতে দেখা যাচ্ছে।

কন্যা জামাতার সান্নিধ্যে অধ্যয়ন ও গ্রন্থ পরিশোধনের কাজে তিনি আনন্দ পেতেন। জীবনসায়াহ্নে তাঁর তিনটি গ্রন্থেরই বৌদ্ধধর্ম্ম, গীতা, নবরত্নমালা) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার কাজে এঁদের নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, সেকথা গ্রন্থ আলোচনার সময় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হবে। কলকাতায় এলেই বিভিন্ন সভাসমিতিতে তাঁর ডাক পড়তো। এ সম্পর্কে অনেকের কাছে থেকেই বিবরণ পাওয়া গেছে। সুরেন্দ্রমোহন বসু তাঁর রচিত 'ভারত গৌরব' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন ১৭ই জানুয়ারি ১৯১২ কলকাতার টাউন হলে 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কল্পে' এক সভা হয়েছিল। বিকানীরের মহারাজ বাহাদুর সে সভায় সভাপতিত্ব করেন। 'তৎকালে সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ফণ্ডে দশ সহস্র টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন.' বলে তিনি উল্লেখ করেছেন (পৃ. ২৯)। আমাদের 'সামাজিক ব্যাধির' একমাত্র মহৌষধ যে শিক্ষাবিস্তার এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ দৃঢ় মত পোষণ করতেন—সেজন্যই হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে তাঁর যে ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল সেকথা 'আমার বোম্বাইপ্রবাস' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। সেই সংগে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীর প্রতিও সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি।[৪৯] সম্মিলিত ভাবে (১০০০০) দশ হাজার টাকা তোলার প্রস্তাব তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি সভায় উত্থাপন করেছেন।[৫০] সুরেন্দ্রমোহন বসু পূর্বোক্ত গ্রন্থে আরও বলেছেন—'১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের দ্বিতীয় বাৎসরিক মৃত্যুর স্মৃতি সভার অধিবেশনে' সত্যেন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। (পৃ. ২৯)

১৩২০ সালের ৯ই শ্রাবণ (১৯১৩) কলকাতার টাউন হলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতি সভার অধিবেশনে—দ্বিজেন্দ্রলালের মর্ম্মর মূর্তি বা তৈলচিত্র স্থাপনের চেয়ে বাংলা সাহিত্যসাধক দ্বিজেন্দ্রলালের নামে পুরস্কারাদির মাধ্যমে বাংলাভাষা চর্চায় তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রস্তাব করেছেন। প্রসংগত মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন—আকস্মিক জলের ঝাপ্‌টায় তার সম্বোধন ছাড়া আর কিছুই পাঠোদ্ধার করা

না গেলেও—ঐ পত্রই সম্ভবত 'দুই কবির মধ্যে বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনের চেষ্টা'—'বিগ্রহের পর সন্ধি পত্র' বলে তিনি ঐ সভায় ব্যক্ত করেছেন।

১৯২০ সালে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী সহ কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে অতিথি হয়ে ছিলেন তা ১৩২৬ ফাল্গুন সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়।

অন্তিম পর্ব

ইন্দিরা দেবীর কথায় জানা যাচ্ছে ১৯২২ এ সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে কলকাতায় আসেন ও ২০নং মে ফেয়ার রোডে ইন্দিরা দেবীর নতুন বাড়ি 'কমলালয়'[৫১] এ থাকেন। তাঁর স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য ১৯২২ এর গ্রীষ্মকালে ইন্দিরা দেবী তাঁকে নিয়ে পুরী গিয়েছিলেন। সমুদ্রস্নান তাঁর চিরকালের প্রিয়। পুরীতে সাঁতার কেটে অনেকদূর পর্যন্ত যেতেন ও সেখানে বেশ ভালই ছিলেন। ঐসময়ে পুরীতে এঁদের কাছে স্টেলা ক্রামরিশকেও পাঠাবার প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। স্টেলা ক্রামরিশকে সত্যেন্দ্রনাথের ভালই লাগবে ও আর্টের সমালোচনায় ইন্দিরা দেবীদের সময় ভাল কেটে যাবে এজন্য রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রস্তাব করেছিলেন।[৫২]

অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে এসে বৌদ্ধধর্ম্ম ও গীতার পদ্যানুবাদ এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার কাজে তিনি মনোনিবেশ করেন। নবরত্নমালা দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশের কাজ প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। নবরত্নমালা অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে তা আলোচিত হবে। পিতার পড়াশুনার কাজে সহায়তা করতে ইন্দিরা দেবী যেমন তৎপর ছিলেন, তেমনি তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে ও ইন্দিরা দেবীর প্রখর দৃষ্টি ছিল। ইন্দিরা দেবীর কথায় জানা যাচ্ছে অর্শরোগ এঁদের বংশগত।[৫৩] সত্যেন্দ্রনাথকে বাইরে থেকে দেখতে সুস্থ দেখলেও ভিতরে ভিতরে তাঁর এই রোগের প্রবণতা বেড়েই গিয়েছিল। সেটা ঠিক বুঝে ওঠা যায় নি। আর শিশুসরল সত্যেন্দ্রনাথ ত সদাই প্রসন্ন। ছোটোদের নিয়ে হাসিখুশিতে মেতে থাকতেন। খুব সম্ভবত ঐ বছরেরই (১৯২২) ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতন যাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে তাঁর প্রিয় বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেখবার জন্য আকুলতা অনুভব করেন। শরীরের ঐ অবস্থায় তাঁকে যেতে দেওয়া

প্রমথ চৌধুরীর একদম মত ছিল না। কিন্তু তিনি একপ্রকার জোর করেই গেলেন। শান্তিনিকেতনে গিয়ে যথারীতি মন্দিরের উপাসনা করেছেন ও ভাষণ দিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী'র[৫৪] মুখ থেকে শোনা গেছে ভাষণটি দীর্ঘ হয়েছিল। শান্তিনিকেতন মন্দিরে ঐ তাঁর শেষ ভাষণ।

কলকাতায় ফিরে আসার সংগে সংগেই যাতায়াতের পরিশ্রমে তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলো। কিন্তু মুখ ফুটে একথা স্বীকার করতেই তিনি ছিলেন নারাজ। শরীরের ঐ অবস্থায় তাঁর প্রিয় বোন স্বর্ণকুমারী দেবীর নাতনী কল্যাণীর পাকা দেখা উপলক্ষে সেখানে গিয়ে উপাসনা করেছেন। শরীরের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য এত জোরে মন্ত্র আবৃত্তি করেছেন যে তা ইন্দিরা দেবীর কানে অস্বাভাবিক লেগেছে।[৫৫]

এতদিন চৌধুরী পরিবারের আত্মীয় ডাক্তাররাই তাঁর দেখাশোনা করেছেন। এবার ডাঃ নীলরতন সরকারকে ডাকা হলো। অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাওয়ায় রাঁচি থেকে জ্ঞানদানন্দিনীকে আসতে খবর দেওয়া হলো। শেষ পর্যন্ত অক্সিজেন দেখে নিজেই বলেছেন —'আমায় অক্সিজেন দিতে হবে?[৫৬]

সুরেন্দ্রনাথ তখন সংজ্ঞাদেবী সহ জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা'য়[৫৭] ছিলেন। সেখান থেকেই রোজ পিতার দেখাশোনা করতে আসতেন। ১৯২৩-এর ৯ই জানুয়ারি রাত্রে (২৪শে পৌষ ১৩২১) এই মহান জীবনের দীপ নির্বাপিত হলো।

পরদিন সকালে জ্ঞানদানন্দিনী যখন এসে পেঁছলেন তখন ২০নং মে ফেয়ার রোডের বাড়ি কমলালয় লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। গুণমুগ্ধজনেরা শোকাহত হৃদয়ে প্রয়াতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন। পদস্থ হয়েও এমন নিরভিমানী লোক খুব কম চোখ পড়ে।

সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বংগীয় সাহিত্য পরিষদের সকল কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় ও এক বিশেষ শোকসভার আয়োজন করা হয়। তত্ত্ববোধিনীর সূত্রে জানা যায় গিরিডি অঞ্চলেও স্ত্রী-স্বাধীনতার অগ্রদূত সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গিরিডি বালিকা বিদ্যালয়ে সকল কাজ একদিন বন্ধ থাকে। বালিগঞ্জ অঞ্চলে শোকের ছায়া নেমে আসে। শোকমগ্ন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বহু পত্রপত্রিকায় উদারচেতা কর্মযোগী এই মহান পুরুষের জীবনাবসনে শোকপ্রশস্তি প্রকাশিত হয়।[৫৮]

১. রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালায় রক্ষিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র (ক্ষিতীন্দ্রনাথকে লিখিত)।

২. স্নেহের হেমলতা, শান্তিধাম. রবিবার ২১এ...

এই নূতন Council-এ প্রবেশার্থ জনকতকএ ভোট দেবার জন্য হয়ত আমাকে শীঘ্র কলকাতায় যেতে হবে। ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ।

... তোমার মেজকাকা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় প্রাপ্ত)

৩. Mont-ford Reforms.

৪. দ্র. সুভাষ চৌধুরী সংকলিত প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরাদেবীর পত্রগুচ্ছ। সাহিত্য সংখ্যা—দেশ

৫. দ্র. সুভাষ চৌধুরী সংকলিত প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর পত্রগুচ্ছ। সাহিত্য সংখ্যা দেশ—

৬. প্রমথর প্রস্তাবে বিবি যে সম্মতি দিয়েচে সে ভালোই হয়েচে। এদের বিবাহে আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন... আমি মনের সহিত আশীর্বাদ করচি' (জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রাংশ ইন্দিরা দেবীর পত্রে উদ্ধৃত) সুভাষ চৌধুরীকে সংকলিত— পূর্বোক্ত পত্রগুচ্ছ— দেশ সাহিত্য সংখ্যা,

৭. ৬ ভাদ্র ১৩০৬ বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে। অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের গৃহ নির্মিত হইয়া গেলে ঐ বৎসর শান্তিনিকেতনের নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবের দিনে উহার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করা হয়। সেইদিন সন্ধ্যাকালে... রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদ ব্রহ্ম ভাষণ পাঠ করেন। অনুবাদ— ...The God of the Upanishads by Rabindranath Tagore (Translated from Bengali) অনুবাদকের নাম নেই অনুমান হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্রজীবনী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪র্থ খণ্ড ; সংযোজন ও সংশোধন— পৃ. ৩১৩-১৪।

৮. Tukaram, the Sudra poet of Maharastra—Satyendranath type script.

(ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত) ভূমিকায় লিখিত তারিখ ৮ জুলাই, ১৯০১ ; বালিগঞ্জ।

৯. দ্র. পরিশিষ্ট।

১০. Compiled Works of Satyendranath Tagore. (Preserved in Rabindra-Bhavan, Santiniketan,

১১. উইলে তিনি জোড়াসাঁকো বাড়ী ভাগ করেন ও দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও মৃতপুত্র হেমেন্দ্রনাথের পুত্রদের দিয়ে যান। বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ আগেই মারা গিয়েছেন ও বীরেন্দ্রনাথ নিজে উন্মাদ ছিলেন, সুতরাং তাঁকে জীবদ্দশায় বাড়ীতে থাকার অধিকার দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অপুত্রক ও সোমেন্দ্রনাথ অবিবাহিত সুতরাং তাঁদেরও সেই ব্যবস্থা হয়েছিল। ...শোনা যায় অন্যান্য আত্মীয়েরা মহর্ষিকে বুঝিয়ে দেন—যেহেতু সত্যেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় থাকেন না সেইজন্য তাঁকে জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক বাড়ীর অংশ দেবার প্রয়োজন নেই।... সত্যেন্দ্রনাথ তখন মহর্ষির সঙ্গে দেখা করে তাঁর দুঃখ নিবেদন করলেন এবং মহর্ষি তখনই তাঁর প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা করেন। সত্যেন্দ্রনাথকে জোড়াসাঁকো বাড়ির অংশের পরিবর্তে উপযুক্ত অর্থ দিলেন, তাই দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ উনিশ নম্বর স্টোর রোডে বাইশ বিঘা জমি সহ অট্টালিকা ক্রয় করেন'।—স্মৃতিকথা : সংজ্ঞা দেবী (স্বরূপানন্দ সরস্বতী)—শারদীয় সংগঠন আশ্বিন, ১৩৭৩।

১২. দ্র. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : ইন্দিরা দেবী। প্রবাসী ; ফাল্গুন, ১৩৪৯।

১৩. ঐ : শ্রুতি ও স্মৃতি—পৃ. ৯৪।

১৪. The total area of Birla Park is about 20 Bighas with an imposing three storied building, having its plinth area of 19,7000 Sq. ft. It is surrounded by a lovely park is an artistic setting. It was purchased by the Birlas from some members of the famous Tagore family on Nov. 26, 1919. After the purchase, the old structures were demolished and the present imposing new buildings were

demolished and the present imposing new buildings were constructed...

Amrit Bazar Patrika May 2, 1959 : Fascinating Story of Birla House. (found in Birla Industrial Museum Office.)

১৫. আমীর আলি এভেন্যু থেকে গুরুসদয় রোড়ে ঢুকতেই ডান দিকে ১১।এ নম্বর...স্বাদেশিকতার পীঠস্থান ঠাকুর পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি ছিল এখানে। আজ তারই নতুন ঠিকানা ১৯-এ গুরুসদয় রোড। এই বাড়ির কাছেই ছিলেন প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী...১৯২০ সালে নিদারুণ অর্থসংকটে পড়েন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিছু টাকা তাঁর চাই-ই...বিড়লাদের কাছে বাড়িটি বিক্রির কথা হয় এবং সহকর্মী নলিনীরঞ্জন সরকার বাড়িটি নামমাত্র দামে বিড়লাদের পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন।—'পরিচয়' পত্রিকা অগ্রহায়ণ : টাকায় কেনা নাম বিড়লা মিউজিয়াম। (ইন্দিরা দেবীর বক্তব্য [শ্রুতি ও স্মৃতি পৃ. ১৩৯]-চার লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়)।

১৬. 'সুরেনের দেনার দায়ে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে মামীদের জন্য ভাড়াবাড়িতে চলে যেতে হয়।' শ্রুতি ও স্মৃতি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী পৃ. ১৪।

১৭. '১৯১৮ সালে আমার স্বামী সুরেন্দ্রনাথ সে বাড়ি ও জমি বিড়লাদের বিক্রী করে দেন'। (সংজ্ঞা দেবী) স্বরূপানন্দ সরস্বতী : স্মৃতিকথা : শারদীয় সংগঠন। পৃ. ৩০।

১৮. বর্তমান ২নং ব্রাইট স্ট্রীট 'নদীয়া হাউস'।

১৯. নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়ের পুত্র কুমার সৌরীশচন্দ্র রায় নদীয়াহাউস-এ -এ এক সাক্ষাতকারে পুরোনো দলিল ঘেঁটে এই তথ্য প্রদান করেছেন—১৯০০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর টমাস মেলকমের কাছ থেকে ১নং ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়িটি সত্যেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ক্রয় করেন। তাঁরা উভয়ে ১৯০৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর যথারীতি দানপত্র করে বাড়িটি ইন্দিরা দেবীকে দিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের ৯ই

অক্টোবর মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছ থেকে বাড়িটি আবার ক্রয় করেন। সৌরীশচন্দ্রের ভাষায়—"আমার জন্মের আগে বাড়ি কেনা হয়। আমার পিতা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় ইন্দিরা দেবীদের বিশেষ পরিচিত ছিলেন।" ইন্দিরা দেবী শ্রুতি ও স্মৃতিতে (পৃ. ১৪০) এই বাড়ি বিক্রির তারিখ ১৯২০ সালের ১৫ই মে বলেছেন। কিন্তু সৌরীশচন্দ্র রায় কাগজপত্র দেখে বাড়ি বিক্রির উপরোক্ত তারিখ আমাদের দিয়েছেন। বাড়ির বর্তমান নম্বর ও পুরোনো নম্বর-এ যে মিল নেই এ সম্পর্কেও তিনি আমাদের সংশয় দূর করে বলেছেন—'১নং ব্রাইট স্ট্রীটের জমি Scheme No 8, 1921-22-তে রাস্তায় চলে গেছে'।

২০. প্রথমে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছিলেন, তার পরে ১নং ব্রাইট স্ট্রীটের সুন্দর দেড়তলা বাড়ি কিনে দিয়েছিলেন যা এখন পরহস্তগত হলেও আমরা অনেকদিন ভোগ করেছি।—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। শতবার্ষিক সংকলন-পৃ. ১৩।

২১. সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। সুরেন্দ্রনাথ শতবার্ষিক সংকলন—পৃ. ১৩।

২২. ঐ সংকলন—পৃ. ১৩। ইন্দিরা দেবী সুহৃৎ চৌধুরীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—'আমার দেওর, মায়ের নাতজামাই'—পৃ. ১৩ ঐ। আশুতোষ চৌধুরীর অনুজ সুহৃৎ চৌধুরী পূর্ণিমা ঠাকুরের পিতা। [পূর্ণিমা ঠাকুর ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের পুত্র সুবীরেন্দ্রনাথের পত্নী। আবার আশুতোষ চৌধুরীর অন্য অনুজই হলেন প্রমথ চৌধুরী যাঁর সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর বিবাহ হয়।—প্রকাশক দ্বিপেন্দ্রনাথের প্রথম পক্ষের কন্যা 'নলিনী'র সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। এই সূত্রে তিনি জ্ঞানদানন্দিনীকে 'মেজদিদি' বলতেন।

২৩. সময়টা ১৩১০ সালের আষাঢ় মাস—"সুরেন্দ্রনাথের বয়স একত্রিশ আর আমার বারো বছর'। ওঁকে যেমন দেখছি : সংজ্ঞাদেবী পৃ. ২০। পূর্বোক্ত সংকলন।

২৪. পুরুলিয়া জেলায় রামচন্দ্রপুর আশ্রমে (৫ই আগষ্ট ১৯৭৭এ) সংজ্ঞাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত। (ঐ সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত বিবরণ

অনুসারে 'সংজ্ঞাদেবী' সম্পর্কে এই লেখিকার রচনা, ১৯৭৮' এর এপ্রিল 'রবীন্দ্র-ভাবনা' পত্রিকা দ্রষ্টব্য।)

২৫. ঐ সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত।

২৬. 'কন্যাপক্ষ কালী সিংহের বাড়িতে বিয়ে দিলেন। এখনো মনে আছে ···।'—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-শতবার্ষিক সংকলন—পৃ. ১৪।

২৭. স্মৃতিকথা : সংজ্ঞাদেবী (স্বরূপানন্দ সরস্বতী)। শারদীয়া সংগঠন, আশ্বিন ১৩৭৩।

২৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যসাধক চরিতমালা—৬৭নং।

২৯. Before I sit down I should like to draw your attention to an event... It may aptly be called the event of the in the history of the Brahmo Samaj. I mean opening of the Brahma Vidyalaya or Theological College for all India in Calcutta. For rules and regulations and other particulars connected with the Institution, I would refer to the Assistant Secratary Babu Hemchandra Sarkar. The Maharajadhiraj of Burdwan generously Contributes Rs. 300/-a month towards its maintenance and the maharaja of Maurbhunj has kindly promised a monthly subscription of Rs. 50 to the college Funds. I therefore appeal to the generosity of Rajas, Maharajas and Shethias to open their purse.'

.. S. N. Tagore. Presidential Address, Theistic Conference.—Surat. (p. 17)

৩০. An Appeal To Maharaja Bahadur of Jherria
The present lighting arrangements in the Adi Brahmo Samaj are very inadequate, the fittings being more than half a century old. The Gas jets do not sufficiently

light the Hall. It is therefore proposed to replace them with Electric lights....

All contributions will be thankfully received by the undersigned.

Satyendranath Tagore

55 Upper Chitpur Rd., 24th August 1908

(Preserved in Rabindra Bharati Museum).

৩১. 'সমাজের জন্য একটি লাইট আপাতত নেওয়া ঠিক হল'। ২১ জানুয়ারী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরী। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

৩২. ঐ, ডায়েরী : ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৮, সোমবার।

অপিচ— 'The last work of Banerji for the Service of humanity is the Devalaya. It was founded on the 1st of January 1908 at Calcuta' Leaders of the Brahmo Samaj Natesan & Co. p. 207. 1st ed.

৩৩. রবীন্দ্রজীবনী. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪র্থ খণ্ড : সংযোজন ও সংশোধন—পৃ. ৩২২-২৩।

অপিচ—সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৬৭নং : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃ. ২৬।

৩৪. রাঁচির বান্ধব সমাজ প্রসংগে এঁদের কথা আলোচিত হবে। দ্র. বান্ধব সান্নিধ্যে।

৩৫. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরিতে লিখিত— আজ পাহাড়ের জায়গাটা registered হল। ২৩শে অকটোবর, শুক্রবার, ১৯০৮।

৩৬. 'পাহাড়ের উপরেই বাড়ী হওয়া স্থির হল'। ২১ ডিসেম্বর, সোমবার ১৯০৮। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরী।

৩৭. 'বৈকালে মহেন্দ্রবাবুর সংগে পাহাড়ে গেলুম— নূতন রাস্তা তৈরি হচ্ছে— আজ পাঁজার দরুণ ২০০ মুনশিকে দিলুম'। —৩১শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯০৮, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরী।

৩৮. রাঁচির পাহাড়ের বাড়ি যেমন জ্যোতি কাকা মশায়ের খেয়ালপ্রসূত

পাহাড়ের তলায় মায়ের জন্য তৈরি বাড়ি তেমনি মা-পোয়ের মিলিত খেয়ালের ফল। অর্থাৎ মায়ের ইচ্ছে হল তাঁর বাড়ি পদ্মের মতো গড়ন হবে, তার উপর সুরেন টিপ্পনি কেটে পাপড়িগুলোর ডগা ছেটে দিলেন। বাবার ইচ্ছায় এই বাড়ির নাম দেওয়া হয় 'সত্যধাম'। (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ইন্দিরা দেবী। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন ; পৃ. ১৮।)

৩৯. 'তিনি (জ্ঞানদানন্দিনী) উপহাস করে বলেছিলেন, বাড়ীর নাম দেওয়া হবে 'ছাতুর হাঁড়ি'। (ছাতুওয়ালার রাজকন্যালাভের স্বপ্নের মতো বাড়িটি ভাড়া দিয়ে বিস্তর আয়ের কল্পনা জ্ঞানদানন্দিনীর ছিল কিন্তু এতই সুন্দর হল যে সত্যেন্দ্রনাথ তা ভাড়া দিতে দিলেন না।)... মাঝের ঘরে ছাদে অষ্টভুজের এক একটি ভুজের উপর একটি করে হাঁড়ি অলংকার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল।' —স্মৃতিকথা : (জামাতা কুলপ্রসাদ সেন অনুলিখিত) শারদীয় সংগঠন : আশ্বিন ১৩৭৩ পৃ. ৩৩।

৪০. দ্রষ্টব্য পৃ. ১০৯। গত ৫।৫।৭৮-এ গৃহীত 'সত্যধাম' বাড়ির আলোক-চিত্র ও নকশা। বাড়িটির বর্তমান মালিক লক্ষ্মীনারায়ণ জয়শওয়াল। হাজারিবাগ রোড, রাঁচি।

৪১. কর্ম্মশেষজীবনে জন-কোলাহল পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিলাভের ইচ্ছায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রথিতযশঃ দ্বিতীয় ও পঞ্চম পুত্র ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পর্বত খণ্ডকেই আপনাদের বাসোপযোগী স্থির করিয়া এখানে আশ্রম নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। পর্ব্বতের শিরোদেশে মহেশের মুক্ত মহিমার মধ্যে দেবমন্দির তন্নিম্নে পর্ব্বতগাত্রে ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্জ্জন নিকেতন এবং ইহার সানুপ্রদেশে আশ্রমমাতা ও বালকগণের আবাসস্থান। এই স্থানে আগমন করিলে প্রথমেই সানুপ্রদেশের আশ্রমটিকে একটি প্রস্ফুটিত অরণ্য পুষ্পের ন্যায় বোধ হয়। স্বামী অচ্যুতানন্দ মিশ্র শান্তিনিকেতন হইতে আসিয়া এই মন্দিরের আচার্য্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য ১৮৩২ শকের ৪ঠা বৈশাখ। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন। ...ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা কল্পে একটি হৃদয়

মনোহর বক্তৃতা করিলেন।··· রাঁচির গিরিগৃহে ব্রহ্মোৎসব : শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী তত্ত্ববোধিনী— জ্যৈষ্ঠ ১৮৩২ শক।

৪২. ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই গিরিশিখরস্থ ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকই নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার আরাধনা ও ধ্যান ধারণা করিতে পারিবেন। বিগত ৫।৫।৭৮এ আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শান্তিধামে 'গান্ধী পিস ফাউণ্ডেশনের' —"তরুণ শান্তি সেনা" ছাত্রাবাস হয়েছে দেখে এসেছি। 'উৎসর্গ ফলকটি' স্থানচ্যুত হলেও শান্তিধামের এক কোণে দেখা গেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর একান্ত স্নেহভাজন পৌত্র সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (সুরেন্দ্রনাথের পুত্র) শান্তিধাম দিয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে নানা অসুবিধার জন্য সুবীরেন্দ্রনাথের পত্নী পূর্ণিমা ঠাকুর এটি বিক্রয় করেন।

৪৩. 'তিনি (জ্যোতিকামশায়) যে জমিটুকু মোরাবাদী রাস্তার উপরে কুয়ো খোঁড়াবার জন্য কিনেছিলেন ও বাড়ী তৈরি করেছিলেন তার শেষ ইচ্ছাপত্র অনুসারে তাঁরই ব্যাঙ্কে জমাটাকা দিয়ে সে বাড়ী শেষ করে তাঁরই নির্দেশমত ঐ অঞ্চলের গরীব আদিবাসীদের হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণার্থে 'সেবাধাম' নাম দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।' —শ্রুতি ও স্মৃতি : ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী পৃ. ১৫৬।

৪৪. তত্ত্ববোধিনী ১৮৪৯ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দান।'

৪৫. 'এই বাড়ীটি ১ বিঘা জমির উপর ছিল। ···বাড়ীটি দানের সর্তের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনকেও হোমিওপ্যাথি-ডিসপেন্সারী চালাইতে হইবে বলিয়া উল্লেখ করা ছিল। সেই সর্ত অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশন অদ্যাপি সেই হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারী চালাইতেছে'। এই লেখিকার কাছে লিখিত—স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দের পত্র ১১.৫.৭৮। (বর্তমানে মিশন সম্প্রসারণের জন্য 'জ্যোতিরিন্দ্র-সেবাধাম' পূর্বভূমি থেকে কাছেই স্থানান্তরিত অবস্থায় আমরা দেখেছি। কুয়ো কিন্তু পূর্বনির্দিষ্ট স্থানেই আছে।)

৪৬. স্বর্ণকুমারী : সাহিত্যস্রোতঃ শোকনৈবেদ্য।

৪৭. "আজ আমার বিদায়ের দিন। ...এক্ষণে আমার জীবনসন্ধ্যা সমাগত, রাত্রি আসিবার বড় বিলম্ব নাই। আমার শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছে...নির্জ্জনবাসে সংসার হইতে কিছু কালের জন্য দূরে থাকিতে চাই।" আদি ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের উপদেশ : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : তত্ত্ববোধিনী বৈশাখ ১৮৩২ শক।

৪৮. দ্র. বান্ধব সান্নিধ্যে : রাঁচির বান্ধব সমাজ।

৪৯. 'আমার মনে হয় আমাদের সকল প্রকার সামাজিক রোগের মহৌষধ—নরনারীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার... এই কারণেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি। তবে এইখানে বলিয়া রাখি যে, এই হিন্দু য়ুনিবার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষেরা যেন সব দিক দেখিয়া উদারভাবে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহারা যদি কালস্রোতের প্রতিকূলে উজান বহিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, যে সকল কুসংস্কার হইতে আমরা বহু তপস্যায় মুক্তি লাভ করিয়াছি, সে সকলকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করেন... তাহা হইলে এই য়ুনিবার্সিটি স্থাপনের ফল হিতে বিপরীত হইবে'। —আমার বোম্বাই প্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ২৬১।

৫০. তাঁর স্মৃতিরক্ষার কি উপায় ? তা ঠিক করবার আগে কত টাকা ওঠে, তা জানা আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ের ভুক্তভোগী।...ধরে নিতে হবে, আমাদের পুঁজি অল্পই, বড় জোর ১০,০০০, তার বেশী প্রত্যাশা করা যায় না।'—১৩২০, সালের ৯ই শ্রাবণ কলিকাতার টাউন হলে দ্বিজেন্দ্রস্মৃতি সভায় সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণ। ১৩২০ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'স্মৃতিপূজা' নামে মুদ্রিত।

৫১. জ্ঞানদানন্দিনীর ইচ্ছানুসারে ইন্দিরা দেবীর বাড়ির এরূপ নামকরণ হয়। পূর্বের বাড়ির নামও কমলালয় ছিল। দ্র: সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-শত বার্ষিক সংকলন ; পৃ. ১৪।

৫২. মেজদাদার শরীর ভালর দিকে যাচ্ছে শুনে নিরুদ্বিগ্ন হলুম। পুরীতে যাচ্ছিস কিন্তু সকলেইত বলে পুরীতে হজমের ব্যাঘাত হয়। দুর্ব্বল শরীরে খাওয়া হজমটা একটা দরকারী জিনিস। ...যদি তোরা পুরীতে

এঁকে (স্টেলা ক্রামরিশ) তোদের সঙ্গিনীরূপে কিছুদিন রাখতে রাজি হোস তাহলে সমস্যার সমাধান হয়।

—২রা বৈশাখ ১৩২৯, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত।

৫৩. শ্রুতি ও স্মৃতি (পাণ্ডুলিপি) : ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী ; পৃ. ১৪৪।

৫৪. শান্তিনিকেতনে কুলপ্রসাদ সেনের সংগে এক সাক্ষাতকারে প্রাপ্ত। তিনি ছোটবেলায় ঐ ভাষণ নিজেই শুনেছেন।

৫৫. শ্রুতি ও স্মৃতি (পাণ্ডুলিপি) ; ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ; পৃ. ১৪৪।

৫৬. ঐ।

৫৭. পুরুলিয়ার রামচন্দ্রপুর সংজ্ঞা দেবী (স্বরূপানন্দ সরস্বতী)-র সংগে ৫।৭।৭৮ তারিখে এক সাক্ষাতকারে প্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় সুরেন্দ্রনাথ ও সংজ্ঞা দেবী তখন 'বিচিত্রা'য় ছিলেন। [কারণ ১৯নং স্টোর রোডে বিক্রি হয়ে যাবার পর সুরেন্দ্রনাথের (১নং পার্ক প্লেসের) 'লাল-বাংলা' তখনও নির্মিত হয় নি। বিচিত্রা থেকেই পরে তাঁরা লাল বাংলায় যান।] ভোর রাত্রে বিচিত্রায় এসে সঞ্জীব চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ সংজ্ঞাদেবীকে দেন ও জ্ঞানদানন্দিনীকে স্টেশন থেকে কমলালয়ে নিয়ে আসতে বলেন।

৫৮. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৪ শক ফাল্গুন।

প্রবাসী—১৩২৯ বংগাব্দ মাঘ।

ভারতী—১৩২৯ মাঘ।

ভারতবর্ষ—১৩২৯ ফাল্গুন।

মাসিক বসুমতী—১৩২৯ পৌষ।

Modern Review 1923 Feb.

The Bengalee 1923 January 10 Wednesday প্রভৃতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মননশীল সত্যেন্দ্রনাথ

ধর্মচিন্তা সমাজচিন্তা অর্থনৈতিকচিন্তা রাজনৈতিকচিন্তা স্বদেশচিন্তা ইতিহাসচিন্তা

সত্যেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা

ভূমিকা

সত্যেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা নিরাকার ঈশ্বরবাদে সমুজ্জ্বল। ঈশ্বর অন্বেষণে তিনি তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। প্রথমত বিশ্বপ্রকৃতি থেকে লব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, দ্বিতিয়ত সদ্গ্রন্থে পরিবেশিত, অন্যের অনুভূতিজাত পরোক্ষ অভিজ্ঞতা। তৃতীয়ত আপন অন্তরের উপলব্ধি।

এর বিপরীত নাস্তিক্যবাদী ও সংশয়বাদীরা প্রকৃতির জড় উপাদানের বিশ্লেষণের মধ্যেই বিশ্বজিজ্ঞাসার সমাধান করেছেন। আস্তিক্যবাদী ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ এতেই শুধু তৃপ্ত থাকেন নি। প্রত্যক্ষের অতীত যে অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে তার স্বরূপ অন্বেষণেই নিমগ্ন থেকেছেন। এই দৃশ্যমান জগতের উর্ধ্বে যে অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগত রয়েছে তার অন্বেষণেই যে ব্রাহ্মধর্মেরও জয়যাত্রা রচিত হয়েছে তা সত্যেন্দ্রনাথের 'দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগৎ' প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে—"এই দৃশ্যমান জগৎ, এ রাজ্যের রাজা কে? ইহা যাঁহারা নিয়মে নিয়মিত হইতেছে তিনি কোথায়?...তাঁহাকে দেখিতে হইলে এই ভৌতিক জগত ছাড়িয়া আধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ করিতে হয়।[১] 'অদৃশ্যমগ্রাহ্যং'—ভাষণে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সত্য আরও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে যা চোখে দেখা যায় না তাকেই নেই বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ, যাহা আমাদের দৃষ্টির অগোচর—যেমন তড়িত-মাধ্যাকর্ষণ-ইথার তাহাদের অস্তিত্ব কি আমরা বিশ্বাস করি না?[২]

বৈজ্ঞানিক অনুধাবনের পর যেমন অনেক সত্য প্রতিভাত হয় তেমনি ঈশ্বরলাভে ও মনশ্চক্ষুরুন্মীলনের প্রয়োজন। 'অদৃশ্য চর্ম্মচক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় না—জ্ঞানচক্ষে তাঁহাকে দেখা চাই'। জড়বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষা ও যন্ত্রের সাহায্যে যেমন অনেক অদৃশ্য বস্তু দৃষ্ট হয় আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি বিশেষ শিক্ষা ও সাধনার সাহায্যে সর্বব্যাপী বিশ্বনিয়ন্ত্রাকে উপলব্ধি করা যায়। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংযম। 'দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগত' এ তিনি

আরও স্পষ্ট করে বলেছেন—মনুষ্য যতদূর শরীরি জীব…যতদূর তিনি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি ও পশুপ্রকৃতির অধীন ততদূর তিনি জড় জগতের নিয়মাধীন, …আপনার কর্ত্তৃত্বের উপর যত চলিতে পারেন, তাহাতেই তিনি পুরুষ।'[২]

সেই পুরুষের হৃদয়ে ধর্মের নিয়ম প্রতিভাত হয় ও সমস্ত পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা ও রিপুর উত্তেজনাকে দমিত করে তিনি আপন কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। সেই মুহূর্তেই তিনি যথার্থ স্বাধীন পুরুষ।

সত্যেন্দ্রনাথের মনে এই ধরণের যে 'স্বাধীন' পুরুষের চিত্র অনুক্ষণ বিরাজ করতো তা তাঁর আপন পিতা মহর্ষির অত্যুজ্জ্বল জীবন-চিত্র—যার প্রভাব সত্যেন্দ্রনাথের মন থেকে কোনদিনও বিলীন হয়ে যায় নি। পিতার স্মৃতির উদ্দেশে যখনই কোন বক্তব্য রেখেছেন—তখনই সকৃতজ্ঞ অন্তরে পিতার ধর্ম-জীবনের শিক্ষাকে স্মরণ করেছেন।[৩]

রামমোহন যা ধ্যানে পেয়েছিলেন—তাকে উপলব্ধিতে প্রত্যক্ষ করে তুলেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের জীবন অনেকাংশে রামমোহনের জীবনেরই ভাষ্য।[৪] ঠাকুরবাড়ির দুর্গোৎসবে রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করতে এসেই কিশোর দেবেন্দ্রনাথের মনে প্রথম বিস্ময় উদ্রেক করেছিল—যখন তিনি নিমন্ত্রণ নিজে না নিয়ে রাধাপ্রসাদকে বলতে বলেছিলেন।[৫]

পরবর্তীকালে তাঁর কথার সত্যতা দেবেন্দ্রনাথের মনে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে ও নিরাকার সত্যের সাধনায় রামমোহনের নির্দেশিত পথই স্বচ্ছ দিবালোকের মতো দেবেন্দ্রনাথের চিন্তায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

ব্রাহ্মধর্মের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির বিবরণ দিয়ে ১৮৬৫তে আমেদাবাদ থেকে পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চিঠির মধ্যে রামমোহন থেকে দেবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের পরিণতির সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথের মতে একেশ্বরবাদী রামমোহন বেদ-উপনিষদের উদ্ধার ও প্রচার করে ও নিরাকার সত্যের উপাসনায় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতাবর্জনে ব্রতী হয়েছিলেন কিন্তু কোন বিশিষ্ট ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করে যান নি।[৬] তাঁর অনুবর্তীরা প্রথম দিকে বেদ-বেদান্তকে 'দুর্বোধ্য' ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলেই ধরে নিয়েছিলেন।[৭] নিরাকার একেশ্বরবাদের ধারণা এত মহান ও সুউচ্চ যে সাধারণের সরল বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং সাধারণের বোধগম্যতার জন্য তাঁরা কোন বহিঃশক্তির প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।[৮]

এখানে সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমধর্মী হিসেবে রেভারেণ্ড মুলেন্স-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তাঁর মতে "Though the Brahmos claim the Vedas as a revelation of divine truth, they look primarily upon the works of Nature as their religious teacher. From Nature they learned first, and because the Vedas, (as they assert) agree with Nature, therefore they regard them as inspired'.'

[Essay on Vedantism, Brahmoism and Christianity. রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (৩য় সং) পৃ. ৬৫তে পরিবেশিত।]

দেবেন্দ্রনাথও প্রথম দিকে বেদকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে কিছুটা মেনে চলতেন তবে সে মানা অন্ধের মতো নয়। যেহেতু বেদে আছে তাই তা সত্য ও অভ্রান্ত বলে নয়—বেদে এমন সব কথা আছে যা যুক্তি ও অনুভূতির সংগে মিলছে সেজন্যই বেদকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে ধরে নেওয়া যায়। পরবর্তীকালে দেখা গেল যুক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না এমন অনেক বস্তুই বেদে প্রবিষ্ট হয়েছে।[৯] সুতরাং বেদকে আর অভ্রান্তবাক্য বলে মেনে নেওয়া গেল না। প্রসংগত উল্লেখ্য যে প্রথমে মতদ্বৈধ হলেও অক্ষয়কুমার দত্তই দেবেন্দ্রনাথের মনে বেদবিচার ও বেদ-অন্বেষণের প্রেরণা দিয়েছিলেন। বেদ ছাড়াও উপনিষদের দিকেই দেবেন্দ্রনাথের অভিনিবেশ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। কারণ কঠোপনিষদের ছিন্নপত্রে পাওয়া-'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ...'এই মহিমময় বাণী থেকেই দেবেন্দ্রনাথ আপন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন।[১০] সর্বব্যাপী ব্রহ্মের অনুভূতিময় অনেক শ্লোক উপনিষদ থেকে আহরণ করে খুব সহজেই তিনি একেশ্বরবাদে উপনীত হতে পেরেছিলেন।[১১] ঐ শ্লোকগুলি মহর্ষি-সংকলিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে স্থাপন পেয়েছে। পুরাতন 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য' উপদেশের বদলে এই 'ব্রাহ্মী উপনিষদ'ই বর্তমানে ব্রাহ্মসমাজের উপদেশাবলী ও উপাসনাপদ্ধতির দর্পণ।[১২] রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ প্রসংগে বিপিনচন্দ্র প্রসংগে পালও (নবযুগের বাংলা পৃ. ৬৮) বলেছেন— "রাজা যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহার গ্রন্থাদি পড়িয়া এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। মহর্ষি ভক্তিবাদী ছিলেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদের নামগন্ধমাত্র তিনি সহিতে পারিতেন না। পরমহংস হরিহরানন্দ স্বামী রাজার গুরু ছিলেন।

মহর্ষির সাধন অন্য পথ ধরিয়া চলিয়াছিল। মহর্ষির ভক্তি সাধনের উপর হাফেজ, সাদী প্রভৃতি পারসিক ভক্তদিগের খুব প্রভাব পড়িয়াছিল।"

সুতরাং শুধু জ্ঞানের পথে না গিয়ে ভক্তির সমন্বয়ে ব্রাহ্মধর্মের শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হলো।

উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে এক নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হলো। শুধু প্রীতি নিবেদন করেই মহর্ষি আপন কর্তব্য শেষ করেন নি। তাঁকে প্রীতি করা ও তাঁর প্রিয়কার্য সাধন করাই যে তাঁর উপাসনা—পথের নির্দেশ স্বরূপ এই মহিমান্বিত কথাটি লিখে ব্রাহ্মধর্মের শীর্ষে স্থান দিয়েছেন।[১৩]

মহর্ষি তাঁর সহজাত অনুভূতি থেকে যে সত্যের আলোক লাভ করে মুখে পরিবেশিত করতেন তা প্রথম যৌবনে লিখে রাখবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত মহর্ষির দশ-উপদেশ জনসমক্ষে প্রচার করার ব্রত নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" ক্ষুদ্র গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছিলেন[১৪] ও নিজের রচিত উপক্রমণিকায়[১৫] ব্রাহ্মধর্মের সর্বকালিক বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করেছেন। মানুষের স্বাভাবিক সহজ জ্ঞানের উপরেই ব্রাহ্মধর্মের সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত। শুধুমাত্র যুক্তির পথ দিয়ে গেলে এই সত্যলোকের সন্ধান কেউ পাবে না। তাঁর মতে 'Our intellect is too weak to fathom the Infinite. We are involved in numberless doubts and dilemmas. We then seek God in our inmost heart, ···Where a thousand arguments fail, a ray of Faith enlightens us.[১৬]

পূর্বোক্ত উপক্রমণিকায় তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে সৃষ্টির আদি লগ্নেও ব্রাহ্মধর্ম ছিল : যখন জীব জগৎ ও এক অদৃশ্য চালনাশক্তি দেখে মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছিল। বুদ্ধির প্রলেপ লেগেছে আরও পরে। তাঁর ভাষায়—শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র উৎপত্তির পূর্বেও ব্রাহ্মধর্ম ছিল ; এবং এ সকল যদি একেবারে ধ্বংস হয় তথাপি তাহা থাকিবে।"

ঈশ্বরচেতনার এই প্রগাঢ় অনুভূতি যে অনন্তকাল ধরেই চলবে ও ব্যক্তি বিশেষ ও সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ না হয়েও সকল ধর্ম্মের সারভূত সত্যই যে ব্রাহ্মধর্মে অনুসৃত হয়েছে এই ভাবটি উপক্রমণিকায়[১৭] বিশদ করে বলেছেন—"বেদ কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ বা ঈসা মুসা প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষ

ব্রাহ্মধর্ম্ম আবদ্ধ নহে। যে সকল সত্য বুদ্ধির হস্তে পতিত হইয়া বিকৃত হয় নাই, যে সকল সত্য গ্রন্থ মধ্যে নিহিত হইয়া বিবর্ণ হয় নাই, যে সকল সত্য এক মত, কি সম্প্রদায়, কি একজাতির মধ্যে, বদ্ধ নহে ; তাহাই ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্গত। সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের নৈসর্গিক সৌন্দর্য প্রকাশ পাইতেছে।"

ভবিষ্যতে সমগ্র মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের মাঝে যে ব্রাহ্মধর্মের সত্যই পরিব্যাপ্ত হবে এই ভাবটি আরও দৃঢ়তার সংগে সুরাট-একেশ্বরবাদী সম্মেলনে ব্যক্ত করেছেন —

"Our great object is to establish that communion of faith, partial at present, which shall pervade the religious concious-ness of all men.... Brahmoism knocks at the door of every religious system, learns and admi es the grand discoveries of truth made in it and stores up all for the universal church of the future.[১৮]

ব্রাহ্মধর্মের সারসত্য যে 'দেশ কালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন' এই ভাবটি উপক্রমণিকায় স্পষ্ট ধ্বনিত—"ব্রাহ্মধর্ম্ম ইউরোপ কি ভারতবর্ষ কি বংগদেশের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু সকল দেশের উপরেই তাহার সমান অধিকার। ব্রাহ্মধর্ম্ম অবস্থার দাস নহে। ঘটনারও অধীন নহে, কিন্তু সকল কালেই তাহার সমান আধিপত্য।" সেজন্যই দৃঢ়তার সংগে সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধে নিরাকার ঈশ্বর-চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করতে সুরাট-সম্মেলনে আহ্বান জানিয়েছেন—"Let us not be among the number so dwarfed, so limited so bigoted as to think that the Infinite God has revealed Himself to one little corner of the globe, and at one particular period of time.'

(Address ; Surat Conference. p. 16)

ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের এই উদার ও ব্যাপক সত্যদৃষ্টি, সর্ব কালের সর্বধর্মের মানুষের সত্যানুভূতিকেই প্রচার করছে। ব্রাহ্মসমাজে বিভাজন হলেও তাঁর প্রচারিত এই সত্য চিরন্তন ও সর্বজনগ্রাহ্য।

অপৌত্তলিক উপাসনা

সত্যেন্দ্রনাথের নিরাকার ঈশ্বরবাদ অপৌত্তলিক উপাসনাকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়েছে। উপাসনা অনুষ্ঠান প্রসঙ্গেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অত্যুজ্জ্বল জীবন সত্যেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছে। আপৌত্তলিক উপাসনার জন্য অটল ধৈর্যে মহর্ষির জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও সর্বশেষে নিজ পরিবারে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান[১৯] পদ্ধতির প্রচলন সত্যেন্দ্রনাথের মনে আলোকবর্তিকার মতো বিরাজিত ছিল।

'অপৌত্তলিক উপাসনা'য় সত্যেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের চারটি স্বরূপ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন।

১ম—অপৌত্তলিক ব্রহ্মের উপাসনা।

২য়—গৃহে গৃহে পরিবারের মধ্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা।

৩য়—ব্রহ্মের সহিত জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ. অন্য কথায় মধ্যবর্তিত্বের অভাব।

৪র্থ—শাস্ত্র কোন গ্রন্থবিশেষে বদ্ধ নহে, মানব প্রকৃতিমূলক সার সত্যই আমাদের ধর্মশাস্ত্র।[২০]

সত্যেন্দ্রনাথের মতে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহীর পক্ষে নিজ পরিবারে ব্রাহ্মধর্মের অপৌত্তলিক উপাসনার প্রচলন করা সম্ভব—কারণ এখানে গুরুর মধ্যবর্তিতা নেই। পারিবারিক উপাসনায় স্ত্রী কন্যাদের অনুপ্রাণিত করা ব্রাহ্ম গৃহীর কর্তব্য। প্রতীক উপাসনার যে একটি ভয়াবহ দিক আছে সে সম্পর্কেও সত্যেন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত ভাষণে গৃহীদের সাবধান করে বলেছেন—

"—কেহ বলেন আমরা প্রস্তরখণ্ডকে দেবতা বলিয়া আরাধনা করিনা, অনন্তের স্মরণচিহ্ন ভাবিয়াই তাহার পূজা করি। কিন্তু তাহার ফল এই হয় হয় যে, যাহা স্মৃতি চিহ্ন মাত্র, কালে তাহাই দেবতা হইয়া দাঁড়ায়—নকল ও আসল একীভূত হইয়া যায়। ইহা অবশ্যম্ভাবী। যাহা স্মরণচিহ্ন মাত্র, তাহাতেই আমরা দেবত্ব আরোপ করিয়া বসি।"

গুরুবাদের বিরোধী

গুরুবাদের বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল আপত্তি ব্যক্ত হয়েছে সুরাট সম্মেলনে কারণ এপ্রথা মানুষকে প্রত্যক্ষ ধর্মবিশ্বাস থেকে সরিয়ে মনের প্রবণতা থেকে বিচ্যুত করে ও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধকে দুর্বল করে দেয়। যুক্তিবাদী

সত্যেন্দ্রনাথ মানুষের আপন চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। মানুষের পবিত্র কর্তব্য সব কিছু যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা ও যা কল্যাণকর তাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা নিজের চিন্তাকে না খাটিয়ে অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করার সহজ পথ যুগে যুগে অনেকেই বেছে নিয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে এই সহজ পথে বিশ্বাস—সর্বরোগহর মহৌষধিতে বিশ্বাসের মতো, কোন বিচার না করেই যাকে গ্রহণ করা হয়।[২১] ব্রাহ্মধর্ম শাস্ত্র গুরুবাক্য ইত্যাদির অলৌকিকত্বে অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করার বিরোধী। প্রত্যেককে যে আপন আপন বুদ্ধি ও অনুভূতির সাহায্যে পরমসত্যকে উপলব্ধি করতে হবে এ কথাটি স্পষ্ট করে সুরাট সম্মেলনে বলেছেন—

'No Gurus or prophets to stand between our soul and God. We are to see Him face to face, to hear His voice in the inner most depths of our conscience.'[২২]

যাঁরা জগতের পরিত্রাতা বলে গণ্য, তাঁদের পক্ষেও ব্যক্তিবিশেষের মুক্তি এনে দেওয়া অসম্ভব—নিজের মুক্তি নিজেরই চেষ্টা সাপেক্ষ। ধর্ম প্রবক্তাগণের প্রতি ব্রাহ্মগণ প্রচুর শ্রদ্ধা পোষণ করেন কিন্তু তাঁর মতের অন্ধ অনুবর্তন, ব্রাহ্মগণ মেনে নিতে পারেন না। তাঁকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করা মানেই অন্য ধরণের পৌত্তলিকতার আশ্রয় নেওয়া। ব্রাহ্মগণে যে এই 'মানুষী পৌত্তলিকতার ঘোর বিপক্ষে তা সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে—

"Prophets we revere, offer them our love, gratitude and admiration, but we do not invest them with divine or infallible authority nor do we follow them blindly... A saviour, if he wishes to save me, must teach me in terms of my own experiences, not his own and ultimately must make me stand on my own legs. Whatever miracles he cannot work this *viz.* that I should be religious by proxy.[২৩]

আত্মপূজার অবসানকামনা

"প্রতিমাপূজা ও গুরুপূজা ছাড়াও আর একধরণের পৌত্তলিকতায় মানুষ অন্ধ হয়ে সত্যদৃষ্টি থেকেই বঞ্চিত হয়—সেটি আত্মপূজা। এই তৃতীয় প্রকার

আরো ভয়ংকর পৌত্তলিকতা, আছে, সে কি না আপনাকে পূজা করা, আপনার হৃদয়ের কোন ক্ষুদ্র ভাবের নিকট মস্তক অবনত করা, কেহ স্বার্থপরতার নিকট সর্ব্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত। কেহ ধনলালসা, কেহ লোকপ্রিয়তা, কেহ মান, কেহ যশ, কেহ নাম, কেহ কাম এইরূপ এক এক পুত্তলী সাজাইয়া হৃদয়ে স্থান দেয়।[২৪] খোদিত মূর্তির চেয়েও এই ধরণের পৌত্তলিকতা যে আরও মারাত্মক ও এই ধরণের পৌত্তলিকতার দাসানুদাস হয়ে যে কিছুতেই সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না এ প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে সিন্ধু হাইদ্রাবাদে আপন মত ব্যক্ত করেছেন—

"There is the worship of wealth, the worship of power, of birth of rank, all these things that debase our spiritual nature that lea l us astray from the path of reghteousness, that separate us from our god are so many idols, worse than graven images and we must give them up if we want our spiritual welfare."[২৫]

যে আত্মশক্তি ঈশ্বরানুভূতির সোপান তা শুধু আত্মরতিতেই বাধিত হবে এ চিন্তা সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে অসহনীয়। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম-চিন্তায় এই তিন ধরণের পৌত্তলিকতা থেকে মুক্ত হবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে প্রকৃত পূজা হচ্ছে ব্রহ্মপূজা।[২৬] এই পূজার উদার পরিবেশ ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের হাতে প্রথম রচিত হয়েছিল।[২৭] এ পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ পুষ্প প্রেম ও বিশ্বাস— "We have no flowers to offer to to him, it is the flowers of our love and faith that we humbly present as an offering.[২৮]

পরবর্তী কালে যতই অনৈক্য ঘটুক না কেন 'ব্রহ্মোপাসনা রূপ স্বর্গীয় পতাকা যে ব্রাহ্মমাত্রেরই ঐক্যের নিশান' এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ 'ব্রহ্মপূজা'য়[২৯] ঐক্যের সুর ধ্বনিত করেছেন। উপনিষদের যে ভাবধারাকে আশ্রয় করে ব্রহ্মপূজার মন্ত্র রচিত হয়েছে, সেগুলির সহজতর বিশ্লেষণের মধ্যে সত্যেন্দ্র-নাথের ঔপনিষদ-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঔপনিষদ চেতনা

ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ং-নিরাকার অপ্রতিম। 'আবার একং রূপং বহুধা যঃ করোতি'—বহু প্রকার শক্তিযোগে একরূপকে অনেক প্রকার করেন। 'ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ'—তাঁর কোন প্রতিমা নেই—এই ভূলোক ও দ্যুলোকে তাঁরই মহিমা প্রচারিত। এই অসীম বিশ্বসংসার তাঁরই মন্দির—'তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং'—তিনি যেমন দূরে তেমনি তিনি নিকটেও আছেন—

দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যংস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং।

অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে মানুষের অনুভূতিতে যখন তিনি বিরাজ করেন তখনই তিনি নিকটে। সেসময় জীবাত্মা ও পরমাত্মা যেন একই বৃক্ষশাখে দুই পাখীর মতো—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানে বৃক্ষে পরিষস্বজাতে

একটি পাখী ফল ভক্ষণ করছে—আর একটি শুধু দেখছে। 'একজন আশ্রয় একজন আশ্রিত। একজন ফলভোগী আর একজন ফলদাতা' এই পরমাত্মার প্রকাশ বাইরের আকাশে আবার উপাসকের হৃদয়ভূমিতে। তাঁকে জেনেই ধীর মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

যশ্চায় যস্মিন্নাকাশেতেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
যশ্চায় যস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

সেজন্য তিনি সকলের চেয়ে প্রিয়

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা

সহজ কথায় সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন—৩০

"সেই যে অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মা তিনিই জানিবার বস্তু—'নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ'।

তাঁহাকে জানিয়া কি লাভ? জানিবার ফল কি? না যত্রতদ্বিদুরমৃতাস্তে

ভবন্তি' ব্রহ্মজ্ঞানেই নিত্যসুখ-শাশ্বতী শান্তি···মৃত্যুপাশ অতিক্রম করিয়া অমৃত লাভ করা হায়।"

সুতরাং প্রকৃত ব্রহ্মিষ্ঠ সত্য-তপস্যা আর সম্যক্‌জ্ঞান এই তিনের আশ্রয় নেন ও যথাকালে হৃদয়ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে আনন্দময়ের অস্তিত্বে জগৎ বিভাসিত দেখেন—

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

বেদের যাগযজ্ঞবহুল কর্মকাণ্ডের প্রতি বিরূপ হয়েই উপনিষদের ঋষিরা বলেছিলেন—'অপরা ঋগ্বেদো, যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো-ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি'—এই অপরা বিদ্যাতে উপনিষদের ঋষিগণ তৃপ্ত হতে পারেন নি বলেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ পরাবিদ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন—

'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

এই পরাবিদ্যার আশ্রয়ে ঈশ্বরের মহিমা ব্রহ্মপিপাসুর চিত্তে উদ্ভাসিত হয়। তবে তাঁকে জানাই শেষ নয়। তাঁর প্রতি প্রেম নিবেদিত না হলে জ্ঞান নিরর্থক। ব্রাহ্মধর্মে অধিকাংশ স্থানে অসীম জগৎপিতারূপে বন্দিত (ওঁ পিতা নোঽসি···)।

মায়ের প্রতি শিশুর ভালবাসা ও নির্ভরতার প্রতিরূপে কখনও কখনও তিনি অখিল মাতা রূপেও অভিব্যক্ত।[৩১] দেবেন্দ্রনাথের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সত্যেন্দ্রনাথও 'ব্রহ্মপূজা'য় অসীম-অব্যক্তকে 'অখিলমাতারূপে' উল্লেখ করেছেন।[৩২]

আধ্যাত্মিক জীবনে উত্তরণের উপায়

শুধুমাত্র শারীরিক জীবনেই যে মানুষের শেষ নয়—আধ্যাত্মিক জীবনেই তার চরম সার্থকতা তা 'জীবন, শারীরিক-আধ্যাত্মিক' ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত চেয়েছেন।[৩৩]

প্রথমে হার্বার্ট স্পেন্সারের অনুসরণে সত্যেন্দ্রনাথও জীবনের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন—"বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টাই জীবন।[৩৪]

এই জীবন রক্ষার দুই অংগ—আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। এই দুই কাজ সাধনের জন্যে দলবদ্ধ সমাজ গড়ে উঠেছে। এই সমাজে প্রেয়বোধ মানুষকে আপন স্বার্থপরতায় নিমগ্ন রাখে, আবার শ্রেয়বোধ অপরের হিত কামনায় কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত করে। শ্রেয় ও প্রেয়ের সংগ্রাম থেকেই মানুষের নৈতিক জীবনের আরম্ভ।

ভৌতিক জীবন থেকে নৈতিক জীবনে মানুষের উত্তরণ—'আত্মশক্তি' প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবৃত্তিকে দমন করার অমোঘ শক্তি যখনই মানুষ লাভ করবে তখনই তার নৈতিক জীবনে সার্থকতার সোপান রচিত হবে—আর ঐ উন্নততর সোপান বেয়েই আধ্যাত্মিক জীবনেও একদিন মানুষের চরম বিকাশ ঘটবে। মানব-প্রেমের মধ্যেই যে স্বর্গীয় প্রেমের স্ফুরণ হয় তা অন্যত্র ও তিনি বলেছেন—"That love extends beyond the limits of the family circle, beyond the limits of the Society in which we move. It then gradually ascends to Heavan, we begin to realize Heavenly Love."[৩৫]

ভৌতিক জীবনের সংগে আধ্যাত্মিক জীবনের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—"ভৌতিক রাজ্যে জীবন সংগ্রাম।...জোর যার মুলুক তার—দেবো দুর্ব্বল ঘাতকঃ। এ রাজ্যের নিয়ম—যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। এখানে দুর্ব্বলেরও অধিকার আছে।...ওদিকে আত্মরক্ষার ঐকান্তিক চেষ্টা—এদিকে আত্মসুখ বিসর্জন। ওদিকে প্রবৃত্তির প্রাধান্য এদিকে কর্ত্তব্যের আদেশ। প্রকৃতি নিয়ম পাশে বদ্ধ—তার দয়া মায়া নাই।...আধ্যাত্মিক রাজ্য দয়া মায়া মমতা করুণার রাজ্য, ইহা প্রেমের রাজ্য।"[৩৬]

আধ্যাত্মিক জীবনে চরম সার্থকতা 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হওয়া। এই সাফল্যের সন্ধান শুধু দিব্যজীবনের ক্ষেত্রেই ঘটে তবে গৃহী হয়েও নির্বিকার ভাবের জন্য আভাস অনুসরণ যে অসম্ভব নয় তা সত্যেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী উদ্ধৃত করে ব্যক্ত করেছেন।[৩৭]

মনকে বৈরাগ্য-অভ্যাস দ্বারা সংযত করলে আর সংসারে থাকলেও সে তার স্বাতন্ত্র্য হারায় না। নির্লিপ্ত ভাবে সংসারের সকল কার্য করে যায়। তপোবনে না গিয়েও 'বীতরাগ জিতেন্দ্রিয়' হয়ে গৃহজীবনেই ব্রহ্মের সাধনা

যে সম্ভব এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—"ব্রাহ্মধর্ম গৃহীর ধর্ম—আমাদের ব্রত সন্ন্যাস নয়। অরণ্যে গিয়া ঋষিরা যেমন ব্রহ্মসাধন করতেন, আমাদের আমাদের বিধান তাহা নয়। বর্ত্তমান যুগের নববিধান এই যে সংসারে থেকে ধর্ম্মসাধন করতে হবে—গৃহস্থাশ্রমে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের বীজমন্ত্র এই—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥[৩৮]

পিতারূপে, স্বামীরূপে, স্ত্রীরূপে সংসারের যথাযথ কর্তব্য সমাপনের পরেও আত্মার উন্নতিসাধনাকে কোন গৃহী যেন বিস্মৃত না হন—আত্মা যাতে অবসাদগ্রস্ত না হয় সেজন্য গীতার বাণী উদ্ধৃত করে সত্যেন্দ্রনাথ উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন—

"উদ্ধারেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ
আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ

আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে, যাহাতে আত্মার অবসাদ হয় তাহা করিবেক না। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার রিপু।[৩৯] যে আত্মার প্রেম পার্থিব স্বার্থপরতার উর্ধ্বে বিকশিত হয়েছে—তা আবার ধরার প্রেমেই শতধা বিচ্ছুরিত হয়।

"Our love then descends back into the world refincd and purified a thousand fold."[৪০]

আবার অন্যত্র বলেছেন—"প্রীতি মূল, তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন তাহা হইতে নিঃসৃত হইতেছে। যতক্ষণ প্রীতি নাই,...ততক্ষণ আপনার জন্য আমরা কার্য্য করি। স্বার্থপরতা নেতা, সংসার দেবতা, যখন প্রীতি ঈশ্বরে তখন সংসার তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের ক্ষেত্র এবং ঈশ্বর নেতা হইলেন।[৪১]

সত্যেন্দ্রনাথের মতে ইহজীবনে আত্মাকে উন্নত করতে যে পারিপার্শ্বিক রচিত হয় তা জীবনান্তেও ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে। সে যোগ নিত্যকালের যোগ। ইহ জীবনেই আত্মার এই বিকাশের পরিসমাপ্তি ঘটে না। ঈশ্বর-প্রীতি ইহলোক ও পরলোকের সংযোগ সেতু।

পরকাল তত্ত্ব

'পরকালতত্ত্ব' ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন—"আমরা এখানেই ঈশ্বরের সহিত যে যোগ নিবদ্ধ করি তাহা হইতেই আমরা পরকালের পূর্ব্বাভাস পাই। তাহা নিত্যকালের যোগ, ইহা কখনই ভংগ হইবে না। আমরা এই পৃথিবী হইতে লোকান্তরে গিয়া জ্ঞানেতে প্রীতিতে উন্নত হইয়া ঈশ্বরের সহিত আরো গাঢ়তর মিলনে সম্মিলিত হইবে—ভক্তের হৃদয়ে ভগবান এই বিশ্বাস প্রেরণ করিতেছেন—ইহা অটল বিশ্বাস।"[৪২]

ব্রহ্মজ্ঞান থেকেই পরকালের বিশ্বাস আত্মায় জাগ্রত হয় ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃত আহরণ করবার দুর্জয় শক্তি আত্মায় জাগে। মৃত্যু যে এক হিসাবে মানবজীবনের উপকারী বন্ধু তা 'মৃত্যুভয়-মৃত্যুঞ্জয়' ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন। মৃত্যু মানুষের বিষয়বাসনা ভোগলালসা প্রভৃতি জাগতিক মোহ অপসারিত করে মানুষকে সত্যচেতনায় জাগরিত করে। মৃত্যুই মনে করিয়ে দেয় পৃথিবীর এই ক্ষণিক মোহপাশে আবদ্ধ থাকার জন্য বিশ্বনিয়ন্তার কাছে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। মৃত্যু মানুষের শুদ্ধ চেতনা জাগ্রত করে বলেই মৃত্যুকে ভয় করার কিছু নেই।[৪৩]

পরকালের এই বিশ্বাসে পৌঁছবার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর যুক্তিগ্রাহ্য ভাষণে বিভিন্ন ধর্মের পরকালতত্ত্ব বিষয়ক মতের উল্লেখ করেছেন—যেমন 'বৈদিক যম...পরলোকে পথ প্রদর্শক।...কঠোপনিষদে আছে "যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থানুমন্যেঽনুসংযন্তি যন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতং'। জ্ঞান ও কর্মানুসারে জীবের বিভিন্ন যোনি ভ্রমণ অবশ্যম্ভাবী। আবার উপনিষদেই আছে—'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মেতেই বিলীন হন। গীতায় শুক্ল ও কৃষ্ণ পথে ভিন্ন গতি বর্ণিত হয়েছে। বৌদ্ধ-ধর্মে জীবের কর্মফলেই তার সদসদ্‌গতি হয়। খ্রীশ্টান মতে মানুষ পাপী হয়েই জন্মগ্রহণ করে ও Day of Judgment-এ তার বিচার হয়। মুসলমান ধর্মের কোরাণেও স্বর্গ নরকের অনেক কথা আছে বিশেষত 'স্বর্গসুখলালসায় হৃদয় মুগ্ধ' হতে পারে এমন অনেক কথা আছে। বিভিন্ন ধর্মেই যে পরকালের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে এ প্রসংগে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন—"ইহা মনুষ্যমাত্রেরই প্রাণের কথা। এ জীবনই শেষ নহে। ইহার পরেও আমাদের জীবনস্রোত

ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইবে—এই প্রকার আশ্বাস বাক্য প্রায় সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়।"[৪৪]

বিভিন্ন ধর্মমতের পরিপ্রেক্ষিতে সত্যেন্দ্রনাথ পরকালে আত্মার উল্লেখ করেছেন।

১। যোনি ভ্রমণ

২। ব্রহ্মনির্বাণ

৩। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য

সত্যেন্দ্রনাথের পরকাল চিন্তায় এই তিনের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের পথটিই যথার্থ বলে মনে হয়েছে। কারণ তাঁর মতে যোনিভ্রমণ ও জন্মান্তরবাদের সত্যতা নির্ণয় করা বুদ্ধির অসাধ্য। "আত্মপরীক্ষায় ইহার সত্যতা স্থির করিতে পারি না।"

ব্রহ্মনির্বাণ

অদ্বৈতবাদীদের আকাঙ্ক্ষিত ধন ব্রহ্মনির্বাণ। ঐ নির্বাণমুক্তি প্রলয়সাগরে সমস্ত আমিত্বের বিলোপসাধনের মতোই সত্যেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে। তিনি মনে করেন প্রকৃত ভক্ত ঐ নির্বাণ মুক্তি কামনা করেন না। ভক্ত রামপ্রসাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রকৃত ভক্ত মনে করেন—

ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, মন,
চিনি খেতে ভালবাসি।

এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব মত আরও স্পষ্ট করে বলেছেন—"আমি যে অনন্তজীবন প্রতীক্ষা করিতেছি, তাহাতে আমার আমিত্ব সুরক্ষিত থাকিবে, আমার নিজের পুণ্যফল, পাপের ভোগ আমারই। সফল জীবনের মূল যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া ব্রহ্মে কিম্বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া—ইহার পরিণামে মনুষ্যত্বের আর কি অবশিষ্ট রহিল? যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ তাঁহারা কখনই ব্রহ্মনির্ব্বাণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ।

ঈশ্বরে বিলীন হওয়া—তাঁহাদের ইচ্ছা নহে, তাঁর সহবাস আনন্দ চিরকাল উপভোগ করেন এই তাঁহাদের কামনা।"[৪৫]

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রেরণারূপে ব্রহ্মনির্বাণ প্রসঙ্গে মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের সংশয় ও সংশয়োত্তীর্ণ পথের নির্দেশ সত্যেন্দ্রনাথ উপরোক্ত ভাষণে উল্লেখ করেছেন।[৪৬] দেবেন্দ্রনাথের মতে বিজ্ঞানাত্মপুরুষ সংসার সীমা অতিক্রম করেও ব্রহ্মের সংগে 'ছায়া ও আতপের ন্যায়' নিত্য যুক্ত থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথেরও এটি হৃদয়ের কথা। তাই ঈশ্বরের সংগে 'আত্মার নিত্য যোগ ও ঈশ্বরের দিকে আত্মার অনন্ত উন্নতি'র পথেই তিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রস্তুতি

প্রস্তুতি পর্বে স্বার্থপর বাসনার বিলুপ্তি ঘটিয়ে সমাজের কল্যাণকর কার্যে আত্মনিয়োগের ভূমিকাকে তিনি পরম মূল্য দিয়েছেন। এগুলি তাঁরই আদিষ্ট ধর্মকর্মের অন্তর্গত। যে চিত্ত পার্থিব জীবনে শ্রেয় ও প্রেয়ের আবর্তে বিচলিত—প্রকৃত কল্যাণ তার দ্বারা সাধিত হয় না।

গীতার অনুসরণে সত্যেন্দ্রনাথ সকলকে দ্বিধামুক্ত ও নির্ভয়ে সংসারের সকল কর্তব্য সমাপন করতে আহবান করেছেন—

"নহি কল্যাণ কৃৎ কশ্চিৎ
দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"

সত্যেন্দ্রনাথের মতে জীবনের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করার আগেই জীবনের আদর্শকে স্থির করতে হবে। না হলে হাল-ভাংগা তরণীর মতো সংসার সমুদ্রে জীবন লক্ষ্যহীন হয়ে পড়বে। বর্তমান কর্মচাপল্যের যুগে প্রাচীন ভারতের জীবন-যাত্রার আদর্শকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলে যে পদে পদে ব্যর্থ হতে হবে তা সত্যেন্দ্রনাথ যুক্তিগ্রাহ্যরূপে 'জীবনের আদর্শ' প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন—"প্রাচীন ভারতে জীবনের একপ্রকার সুনিয়ম ছিল, চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল—এক্ষণে অবস্থার পরিবর্ত্তনে সে নিয়ম ঠিক রাখিবার উপায় নাই। তখন ভারতবর্ষই আমাদের পৃথিবীর ছিল কিন্তু এক্ষণে বাহিরের নানা জাতির সংঘর্ষে আমাদের মধ্যেও নূতন ভাব, নূতন ক্ষেত্র আসিয়া পড়িয়াছে। বাণপ্রস্থের তপোবন এক্ষণে কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চভূমিতে পরিণত হইয়াছে ; জীবন-সংগ্রামে পড়িয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার আর অবসর নাই।"[৪৭]

তবে আধুনিক জীবনেও সুপ্রাচীন নীতিগুলি যুগোপযোগী করে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন অর্থসঞ্চয় ও সদ্ব্যবহারের প্রাচীন বিধি—'পরের জন্য

ধন উৎসর্গ—ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং' ও নিষেধ—'অন্যের ধনে হস্তক্ষেপ না করে ন্যায়পথে অর্থোপার্জন' আধুনিক কালেও' ধনসঞ্চয় ও ব্যয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ বলেই সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেছেন। অর্থোপার্জনে মনে রাখতে হবে ধন means to an end। এটি উপায় মাত্র—এক কথায়—"আত্মসুখ এবং পরের সুখসাধনের উপায়।" এবিষয়ে Gladstone-এর মত সত্যেন্দ্রনাথ আদর্শ বলে মেনে নিয়েছেন কারণ জনাহতে আয়ের সপ্তমাংশ ব্যয়ের নির্দেশ তাঁর জীবন থেকে জানা যায়।[৪৮]

সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের জীবন শুধু একা নিজের নয়—পরের সুখ ও উন্নতির জন্য কিছু না কিছু সময় ও অর্থ মানুষকে ব্যয় করতেই হবে এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দৃঢ়মত পোষণ করতেন।—"We must undergo sacrifices and privations at the call of duty. As members of society we must do our duties to our neighbours, assisst the needy, feed the hungry, clothe the naked, disseminate knowledge to the best of our ability and do all to elevate and enlighten those who may be placed under our influence."[৪৯]

পরহিতে আত্মোৎসর্গ

দেশের প্রতি ভালবাসা জীবনে নূতন গৌরব নিয়ে আসে। অবসর সময়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ, দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধিকরণে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন ও সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করে দেশের প্রতি কর্তব্য কর্ম করে যেতে হবে কারণ এ সকল মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করা মানেই তাঁরই প্রিয়কার্য সাধন করা।

রাজনৈতিক জীবনেও একতা বৃদ্ধি না করলে 'স্বরাজ্য' কোনদিনই সার্থক হবে না। সমাজের মধ্যে 'ধনমদের' যে প্রবল মোহ একে অন্যের মধ্যে প্রাচীর গড়ে তোলে সেদিকে সত্যেন্দ্রনাথ বার বার সাবধান বাণী উচ্চারণ করে ধর্মকে অর্থের দাস না করে তুলতে নির্দেশ দিয়েছেন—

—"ঐশ্বর্যের এক প্রকার মত্ততা আছে। ধনমদে আমরা যথার্থ যে ছোট তাকে বড় দেখি, যে আসলে বড় তাকে ছোট দেখি। ধনেতেই মানসম্ভ্রম—যে নির্ধন সহস্র গুণ থাকিলেও তাহার আদর নাই। অনেকের নিকটে বিদ্যার

জন্য বিদ্যার গৌরব নহে, বিদ্যা অর্থকরী বলিয়া তার গৌরব। সত্যের অনুশীলনে যদিও জ্ঞান তৃপ্ত হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয়, কল্পনা প্রসারিত হয়, সে কিছু নয়—তাহা অর্থ লাভের কতদূর উপযোগী সেই দিকে দৃষ্টি। আমরা এই ভাবে ধর্ম্মকেও অর্থের দাস করিয়া দেখি।"[৫০]

বর্তমান যুগে মানুষের স্বভাবজ কোমল উচ্চবৃত্তিগুলির মূল্য যে অর্থের মানদণ্ডেই নিরূপিত হয়, সেজন্য সত্যেন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছেন। এর ফলে যখন অর্থের সংগে সমতা রক্ষা করে, তখনই মানবিক গুণগুলি গৃহীত হয় অন্যথায় তা পরিত্যজ্য হয়। এভাবে চললে মানব সভ্যতার বাইরের চাকচিক্য বাড়বে কিন্তু অন্তরের দীনতা কোনদিনই ঘুচবে না। সেজন্য এই সুবিধাবাদী প্রথা বর্জন করতে 'ধনলালসা' প্রবন্ধে আবেদন জানিয়েছেন—"সত্য সরলতা দয়া মায়া মমতা যাতে আর্থিক উন্নতি হয় না, বরং অনেক সময় ক্ষতি হয়—সে সমস্ত গুণের কোন মূল্য নাই। Honesty is the best policy—সততা সর্ব্বোচ্চ 'কৌশল'—সেই জন্যই যেন আমরা সততার পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা ঠিক নহে; সততা তাহার নিজের মহিমাতেই মহীয়ান, নিজের জন্যই প্রার্থনীয়। কৌশল বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহার অবমাননা হয়। এইরূপে ধনে আমাদের দৃষ্টি বিকৃত হয়, ভাবেরও বিকৃতি হয়, দরিদ্রের প্রতি ঘৃণা জন্মে আপনাকে বড় মনে করিয়া স্বভাবও উদ্ধত হইয়া পড়ে।"

সুতরাং জাগতিক লাভের উদ্দেশ্য ত্যাগ করে নিঃস্বার্থভাবে নৈতিক গুণগুলির স্বভাবজ বিকাশ সাধন করাই মানবিক উৎকর্ষের পরিচায়ক। সত্যেন্দ্রনাথের মতে ধর্ম ও অর্থ এই দুইয়ের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করাই ধর্মাশ্রিত জীবনের লক্ষ্য। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কেও মনে রাখা দরকার যে—অর্থের বিনিময়ে পরিশ্রম কেনা যায় না। এক্ষেত্রে কোনরূপ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ধর্মীয় জীবনের পরিপন্থী।

মানুষে মানুষে এই ধর্মসম্বন্ধ প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেও রচনা করতে হবে। কারণ প্রতিবেশীকে ভালবেসেই মানুষের অন্তরে অনন্তের প্রতি ভালবাসার অংকুর বিকশিত হয় আর অসীম ধৈর্যে ও সহিষ্ণুতায় প্রতিবেশীর অন্যায় বিরুদ্ধাচরণকে ক্ষমা করতে শিখেই মানুষ ঈশ্বরের কাছেও ক্ষমার যোগ্য হয়।[৫১] সত্যেন্দ্রনাথ অন্যত্রও এটি বলেছেন—"Unless thou lovest

thy brethren thou hast seen, canst thou love thy Father in Heaven thou hast not seen.…if we forgive not the trespasses as our neighbours against us, can we expect our own trespasses to be forgiven by the just and Righteous God ?'[৫২]

এখানে যীশুখৃষ্টের ধর্মচেতনায় সত্যেন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

প্রতিবেশীর দিকে দানের হস্ত শুধু প্রসারিত করলেই চলবে না—দানের পাত্র নির্বাচনেও সদ্‌জ্ঞান ও বিবেচনার প্রয়োজন। অকালে ও অপাত্রে দান তামসিক দান তেমনি নামের জন্য বা মানের জন্য দান রাজসিক দান (গীতা) এমন দানের কোন সার্থকতা নেই বলেই সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেছেন। প্রকৃত দুঃস্থ অশক্ত অন্ধের জন্য ধনীর উপার্জনের একটা অংশ যেন ব্যয়িত হয়। 'ধনলালসা'য় সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—'ধনীর মনে করা উচিত, আমি পরের জন্য ধনের বিশ্বস্ত অধিকারী (ট্রস্টী) মাত্র। যাহাদের শ্রমের ফলে আমি ধন সঞ্চয় করিয়াছি, তারাও তাহার অংশ পাইবার অধিকারী।'[৫৩]

সমাজব্যবস্থার রাতারাতি পরিবর্তনে কোন প্রকাশ্য আন্দোলনে না নেমেও সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধনীর প্রতি এই দৃঢ় অনুশাসন তাঁর মৌলিক চিন্তার পরিচয় বহন করছে।

ধনবণ্টন প্রথায় যে ধর্মাশ্রিত নিয়ম অনুসৃত হচ্ছে না তা সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা তৎকালীন সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ বিচার করেছেন। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাও ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

সঞ্চিত ধনে ধনীর অধিকার আইনগত স্বীকৃত হলেও জনসমাজের ভিতর যে ধন-বিভাগের নিয়ম মর্মান্তিক, এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—"আইনে যাই বলুক, জনসমাজের ভিতরে ধন-বিভাগের নিয়ম বড়ই শোচনীয়। অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে ধন আবদ্ধ—অধিকাংশ লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। একদিকে ধনপতির সমুন্নত প্রাসাদ—অন্যদিকে শ্রমজীবির ভগ্ন পর্ণকুটীর। যাহাদের শোষিত অর্থে ধনীর অতুল ঐশ্বর্য—তাহারা অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেছে।[৫৪]

স্বামী বিবেকানন্দের মতো উচ্চবর্ণদের শূন্যে বিলীন করে দিয়ে নূতন ভারতের জয়যাত্রার আহ্বান অতটা দৃপ্তকণ্ঠে সত্যেন্দ্রনাথ বলতে পারেন নি। সমাজের এই স্ফীতকায় অবস্থা যে মানবতা—তথা ধর্মাশ্রিত জীবনের বিরোধী

এবং তা যে সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করবে এ আশংকা তাঁর মনকে বিচলিত করেছিল।

আপন বক্তব্যকে শুধুমাত্র আবেগদীপ্ত না করে যতটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ও যুক্তি-নির্ভর করা যায় ধর্মীয় ভাষণেও সত্যেন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেজন্য তাঁর বক্তব্যে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট।

ধনবণ্টনে 'সোসিয়ালিস্ট' ও 'নিহিলিস্ট'দের বক্তব্যও তিনি আলোচনা করেছেন। সোসায়ালিস্টদের মতে ধনী তার নিজ ধনের সম্পূর্ণ অধিকারী আর নিহিলিস্টদের মতে—'প্রচলিত সমাজ উচ্ছন্ন গেলেই জগতের মংগল'।[৫৫]

তবে এবিষয়েও যে অনেক তর্ক উঠতে পারে সে সম্পর্কে তিনি আভাস দিয়েছেন। যেমন ধনের উপর নিজ-সত্ত্বের খর্বতা হলে ধনোপার্জন স্পৃহা কমে যেতে পারে। শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর আপন সিদ্ধান্তে পেঁৗছে এই মত ব্যক্ত করেছেন—'আমি এইটুকু বলিতে চাই যে ধনের জন্য ধনীর দায়িত্ব আছে—যার যেমন ক্ষমতা, যার যেমন অধিকার, তার তেমনি কর্ত্তব্য ভার। কোন একটা সুনিয়মে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।'[৫৬]

অর্থোপার্জন, দেশানুরাগ ও রাজনৈতিক চেতনা ছাড়াও জীবনের আদর্শ নির্ণয়ে আরও দুটি বিশিষ্ট দিক, জ্ঞানার্জন ও সমাজসংস্কার প্রসংগে, সত্যেন্দ্র-নাথ তাঁর আপন অভিমত 'জীবনের আদর্শ' প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন।

শরীরচর্চাও যে জীবনের একটি বিশিষ্ট দিক—সেদিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা হোক—বাংগালী দুর্বল—ওই ধারণা দূর হোক এটি তিনি বিশেষ ভাবে চেয়েছেন। তবে শরীরচর্চাতেই যেন সমস্ত চিন্তা নিমগ্ন না হয়—মনের উন্নতিই মানবজীবনের মুখ্য কাম্য। শরীর সেবায় ধর্মের বাণী—'সংযম'কে সব সময়েই মনে রাখতে হবে।[৫৭] গীতার নির্দেশে 'যুক্তাহারবিহারস্য…'জীবনকেই সত্যেন্দ্রনাথ নিজ জীবনে আদর্শস্বরূপ বরণ করেছিলেন।

জ্ঞানার্জনে অর্থকরী বিদ্যার প্রবল মোহে আজ সকলেই আকৃষ্ট। বিশেষত অনুশীলন ও চর্চার অভাবে যৌবনের অধীত বিদ্যা অনেক ক্ষেত্রেই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়। এই দেশেরই কত আচার্য—কত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ দেশের মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন। তাই অর্থে বড় নয়—জ্ঞানে বড় হয়েছেন এমন আদর্শ পুরুষের দৃষ্টান্ত সামনে রাখতে হবে।

যে সমাজে মানুষেরই বাস তার কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণের দায়িত্ব সম্পর্কে মানুষেরই অবহিত হতে হবে। 'বালবিধবার দুঃখমোচন, স্ত্রীশিক্ষায় উন্নতি সাধন, জনসাধারণে শিক্ষাবিস্তার ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্যবর্দ্ধন গড়ে তোলার দায়িত্ব মানুষেরই হাতে। 'এক পরিবারের সাধু দৃষ্টান্তই ক্রমে দেশের মধ্যে প্রচলিত হয়'।[৫৮] সুতরাং যে প্রথা সমাজকে জীর্ণ করছে আপন পরিবারেই তার উচ্ছেদ সাধনের ব্রত গ্রহণ করতে হবে।

জীবনের বিভিন্ন আদর্শের বিশ্লেষণ করে সত্যেন্দ্রনাথ সর্বোপরি ধর্ম ও ঈশ্বরকে স্থান দিয়েছেন।—'আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ধর্ম্ম ও ঈশ্বর। যে কোন কর্ম্ম করিবে, সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না…।'[৫৯]

শাস্ত্র গ্রন্থের বিচার

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনায় আধুনিক যুক্তিসম্মত বিচারপদ্ধতি সত্যেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় অনুসৃত হয়েছে। 'শাস্ত্রালোচনা' ভাষণে শাস্ত্র-বাক্যকে গ্রহণ করবার পূর্বে তা যাচাই করে, আধুনিক যুগের সংগে প্রাচীন স্তুতি ও বচন কতটুকু প্রয়োগ যোগ্য, তা যুক্তিশীল মন নিয়ে বিচারের জন্যে আহ্বান করেছেন—"শাস্ত্রকেই যাঁহারা আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের দেখা উচিত ঐ গণ্ডীর স্বরূপ কি? তাহাতে যাহা আছে সকলই কি সত্য, সকলই কি গ্রাহ্য, না শাস্ত্রের ভিতর হইতে কতক ছাড়িবার কতক বাছিয়া লইবার সামগ্রী আছে? আমরা মুখে বলি বেদেই সকল শাস্ত্রের মূল। কিন্তু বেদে বায়ু বরুণের স্তবস্তুতি, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, বেদের নিয়োগ প্রথা আজকালকার পক্ষে কতদূর উপযোগী।"[৬০] বেদের নির্দেশও যে আধুনিককালে ধর্মজীবনে প্রতিপালিত হচ্ছে না—সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি আরও বলেছেন—"বেদেই যদি সকলের মূল হইল তাহা হইলে দেখা উচিত আমাদের আধুনিক আচার পদ্ধতি কতদূর বেদ সম্মত।"[৬১] পৌত্তলিক উপাসনা ও জাতিভেদ প্রথা যে বেদের পরিপন্থী এ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন—"আমাদের মধ্যে যে পৌত্তলিক উপাসনা, যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত বেদ হইতে তাহার কতদূর সায় মিলে?[৬২] প্রকৃত ধর্ম ও দেশাচার যে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু আর শাস্ত্রবাক্য তলিয়ে দেখলে যে তা দেশাচারের বিরুদ্ধেই রায় দেবে এসম্পর্কে তাঁর মত প্রণিধানযোগ্য

—'যাঁহারা দেশাচারকে ধর্ম বলিয়া মানেন, শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহাদের ভ্রম-সংশোধনের উপায়। অনেক স্থলে শাস্ত্র দেশাচারের বিরোধী, সমাজ সংস্কারের পোষাক'।[৬৩] দৃষ্টান্তস্বরূপ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে[৬৪]—'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' ও বিধবাবিবাহে—'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ...'(বিদ্যাসাগরঅনুসৃত) এই দুটি শাস্ত্র মতের উল্লেখ করেছেন ; অথচ দেশাচারই যে সমাজে মুখ্য স্থান নিয়ে এই দুই বিষয়ে জনগণকে অন্ধ করে রেখেছে—এ সম্পর্কে সুধীমণ্ডলীকে অবহিত করেছেন।

প্রাচ্যধর্মশাস্ত্র সংকলনে পণ্ডিত মাক্সমূলোরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণা ও বিবিধ অনুবাদ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়নের পথ যে সুগম করেছে—একদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঐতিহাসিক শাস্ত্রগ্রন্থের কালনির্ণয়ের সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব না হলেও মোটামুটিভাবে 'শ্রুতি প্রাচীন, স্মৃতি তাহার পরবর্ত্তী এবং তন্ত্র আধুনিক সময়ের'[৬৫] বলেই তিনি ধারণা করেছেন। অদ্বৈতবাদী শংকর, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ও দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য আপন আপন মতের পোষণার্থে শাস্ত্র গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন। ঐ ভাষ্য পাঠে সত্যেন্দ্রনাথের কোন আপত্তি নেই তবে শাস্ত্রানুশ্বিৎসু ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা ও বিচার পদ্ধতি এতে যেন খর্ব না হয় সেদিকে সকলকে সজাগ করেছেন।

বুদ্ধির আলোকে উজ্জ্বল এক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বহুবিধ ভাষ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন কিন্তু তাঁর আপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেন নি তা 'আর্য সমাজের বেদের নূতনতর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে।— 'আর্য্যসমাজের প্রণালীও ঐরূপ। তাঁহারা বেদকে প্রামাণ্য ঘোষণা করেন, কিন্তু বেদের নূতন ব্যাখ্যা দিয়া আপনার মনের মত গড়িয়া তুলিয়া সেই বেদকে ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি করিতে সচেষ্ট।'

ধর্মের তিনটি লক্ষণ বিশ্লেষণে সত্যেন্দ্রনাথের যুক্তিবহ চিন্তার ছাপ সুপরিস্ফুট। তাঁর মতে—শাস্ত্রই একমাত্র প্রামাণ্য নয়। শাস্ত্র, আত্মতুষ্টি ও লোকহিত ধর্মের এই তিনি লক্ষণ। আত্মতুষ্টি অর্থাৎ যাতে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় ('মনঃপূতং সমাচরেৎ') তার অনুষ্ঠান করা আর লোকহিত অর্থাৎ যাতে জনসাধারণের কল্যাণ হয় সেটিই আচরণীয় ('ন চ ধর্মো দয়াপরঃ দয়াতেই ধর্ম")।[৬৬]

সাধারণ মানুষ শাস্ত্রের শ্রুতি-স্মৃতি ইত্যাদিকে গৌণ করে শাস্ত্রের আচরণবিধিকেই মুখ্য বলে মনে করেছে। ফলে ধর্মের নামে দেশাচারই প্রাধান্য পেয়েছে, ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ হয়েছে বিস্মৃত।[৬৭] ধর্মের এই লোক-প্রচলিত ধারণাকে তীব্র সমালোচনা করে সত্যেন্দ্রনাথ ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ গুলিকে উপস্থাপিত করেছেন। লোকহিতের প্রেরণায় শাস্ত্রবর্ণিত আচরণ বিধিকেও অনেক সময় উল্লঙ্ঘন করতে করতে হয়। কারণ প্রকৃত ধর্মের আহ্বান সেখানে প্রবলতর। অন্ত্যজকে স্পর্শ না করা দেশাচার কিন্তু তাকে বাঁচাতে গিয়েই যখন কেউ জীবন দেয় তখন ধর্মের আদেশে অন্তরাত্মার প্রেরণায় লোকহিতব্রতের অনুষ্ঠানই পালিত হয়।[৬৮] সুতরাং প্রচলিত আচরণ বিধি অনেক ক্ষেত্রেই 'ধর্মের খোলস মাত্র—সার বস্তু নয়'—এদিকে তিনি সজাগ করেছেন।

প্রার্থনা—সমবেত : একক

ধর্মীয় আচরণের মধ্যে প্রার্থনা বিশেষ রূপে উল্লেখ্য। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের সমবেত প্রার্থনার মূল্যও সত্যেন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। মনুষ্যচরিত্রের সম্পূর্ণতা ও তার প্রকৃতিগত সহানুভূতিশীল সামাজিক স্বভাবই মানুষকে যে সমবেত প্রার্থনার দিকে আকৃষ্ট করে এ প্রসঙ্গে সিন্ধ-হাইদ্রাবাদের ভাষণে তিনি বলেছেন— "... Here we have a common bond of union. We are all united in common brotherhood.... It is our own imperfections, the necessities of Human Nature that give rise to a place of public worship like this. Man is pre-eminetly a social being and as we are forced to associate with each other for various other purposes, as we enjoy sharing our bread with friends better than taking a solitary meal so in regard to prayer : it is a demand of our sympathetic nature that we should assemble in public worship."[৬৯]

বাইরে আড়ম্বরপূর্ণ সমবেত উপসনার চেয়ে নির্জনে একক উপাসনার মূল্যও কিছুমাত্র কম নয় কারণ অন্তরের আকূতিই উপাসনার মূলবস্তু।

তাঁর মতে মৌখিক উপাসনার কোন ফল নেই। যদি বিষয়ের প্রলোভন

অতিক্রম করে ও অন্তরের সাধু প্রতিজ্ঞা পালন করে জীবনের কর্তব্য সাধনে নব বল, নব উৎসাহ আসে তবেই উপাসনা সার্থক। প্রার্থনা প্রসঙ্গে হ্যামলেট নাটকের Claudius এর উক্তি অনুসরণে সত্যেন্দ্রনাথ প্রার্থনার দুরকম ফল বিশ্লেষন করেছেন। প্রথমটি প্রলোভন সামনে দেখে আগে থেকেই সাবধান করে দেয়— দ্বিতীয় পাপে পড়লে ঈশ্বরের ক্ষমাগুণে পতিতকে উদ্ধার করে। তবে তখন শুধু মৌখিক অনুতাপ জানিয়েই ক্ষমাগুণ লাভ করা যায় না। পাপের উৎস সম্পূর্ণ নির্মূল না করলে তাঁর ক্ষমা পাওয়া যায় না।

মননশীল সত্যেন্দ্রনাথ উপাসনার মন্ত্র—'তমসো মা জ্যোতির্গময়··· 'দুভাগ বিশ্লেষণ করেছেন। 'জ্ঞানের জ্যোতি ও পুণ্যের জ্যোতি'। একটি অন্যটির সঙ্গে জড়িত। মনের আলোক জ্ঞান, আত্মার আলোক পুণ্য। যখন যে অবস্থায় থাকি—তাহার কর্তব্য সাধনের জন্য প্রথম জ্ঞানের আবশ্যক। জ্ঞান না থাকলে মানুষ জড় জগতের চক্রান্তে অভিভূত হয়। কিন্তু কেবল জ্ঞানেতেই মনুষ্যত্ব হয় না "যেমন অজ্ঞান তিমির —তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক অন্ধকার পাপ। ···অতএব কেবল জ্ঞানের আলোক নহে—পুণ্যের আলোক-পবিত্রতা উপার্জ্জন করিতে হইবে'।[৭০]

জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি, ধর্মের বিধি ও ঈশ্বরকে জানে কিন্তু পুণ্যের জ্যোতিতে ঈশ্বরনির্দিষ্ট ধর্মপথে পরিচালিত হয়। আত্মার জ্ঞান —সৎ ও অসৎ এর পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে কিন্তু পুণ্যের দ্বারাই মানুষ সৎপথে পরিচালিত হয়। যদি পবিত্রতাই অর্জিত না হয় তবে ঈশ্বরের কাছে দুর্জয় সাহস মানুষ কি করেই বা লাভ করবে?[৭১] শুধু মুখের উপাসনায় পৌঁছবার জ্ঞান ও পুণ্য ভিক্ষা করেই কর্তব্য শেষ হয়না— জীবনে তার প্রত্যক্ষ রূপায়ণ প্রয়োজন।

এতক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ, পিতৃপ্রভাব, অপৌত্তলিক উপাসনা, ঔপনিষদ চেতনা, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রস্তুতি, পরকালতত্ত্ব, শাস্ত্রগ্রন্থের বিচার, ও উপাসনা প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের মতামত তাঁর বিভিন্ন ভাষণ, পুস্তিকা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে যথাসম্ভব বিশ্লেষিত হলো।

যুক্তিবাদ সত্যেন্দ্রনাথ—সত্য যাচাই করতে যেমন প্রতিটি মানুষের বুদ্ধি ও অনুভূতির প্রতি গভীর আস্থা রেখেছেন— তেমনই অনুশীলনের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের আত্মিকশক্তি জাগ্রত করার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছেন।

বিভিন্ন স্থানে সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সত্যেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে কেবল মৌখিক ধর্ম করে রেখেই তৃপ্তি পান নি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাতে ব্রাহ্মধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিভাত হয় এই ছিল তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তাঁর উক্তিতে—"It is no book-religion that we want... what we want is Purity and Love and truth and the living God. Theism is our creed. We must make it a part of our everyday life.[৭২]

ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিয়েই সকল কর্তব্যের শেষ হয় না। এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন—"It is not lip-worship that our Father wants. We must not flatter ourselves that we have done every thing to please Him by meeting together at stated times for purpose of worship."[৭৩]

প্রথম যৌবনে একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে ভাষণ দিতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সকলকে সজাগ করে বলেছেন "যাঁহারা কেবল সমারোহ দেখিবার জন্য অদ্য এখানে সমাগত হইযাছেন, তাঁহারা অদ্যকার দিনের যথার্থ গৌরব কিছুই জানেন না··· আমরা এখানে আসিয়াছি— যে হৃদয়ে হৃদয়ের সম্মিলনে প্রীতির শিখা উত্থিত হইয়া উধর্বমুখে সেই মহেশ্বরের প্রতি গমন করিবে" (তত্ত্ববোধিনী ১৭৮২ শক ফাল্গুন) কায়মনোবাক্যে প্রকৃত ব্রাহ্ম হওয়াই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের ব্রত। সেজন্য প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মধর্মের যে তরুণ প্রচারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন তা কর্মজীবনেও রাজকার্যের চাপে অবনমিত হয়ে যায় নি। কর্মস্থলের বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রার্থনা-সমাজ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার-কার্যে আত্মনিয়োগের সাক্ষ্য রয়েছে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রার্থনা সমাজ[৭৪] স্থাপিত হলে পরে সত্যেন্দ্রনাথ কর্মজীবনের ফাঁকে মাঝে মাঝে এই সমাজে যোগদান করতেন। এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পুণার প্রার্থনা সমাজের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ গভীর ভাবে জড়িত ছিলেন। এই সমাজের উপাসনাপদ্ধতি আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ হওয়াতে সত্যেন্দ্রনাথ এই সমাজের প্রচার ও গঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। নিরাকার ঈশ্বরানুভূতির চেতনা জাগ্রত করতে সত্যেন্দ্রনাথের

মারাঠী বক্তৃতা—পুণার জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছিল। (দ্র. ১৭৯৪ শক আষাঢ় তত্ত্ববোধিনী।) ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধু-হাইদ্রাবাদে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথ যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তার সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে।[৭৫] উপর প্রতিষ্ঠাদিবসের ভাষণে তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মের পালনীয় কর্তব্যগুলি সম্পর্কে সমাগত জনগণকে অবহিত করেন। 'সিন্ধু-হাইদ্রাবাদ ব্রাহ্মসমাজে'র উৎসাহী নেতা 'নবলরাও আডবাণী'র প্রেরণায় স্থানীয় হিন্দু তরুণ যুবকদের মধ্যে পানভোজনে সংকীর্ণতা অতিক্রমণের প্রেরণা আসে। সত্যেন্দ্রনাথের মতো উদার ও পদস্থ ব্যক্তিকে দলে পেয়ে তাদের উৎসাহ দ্বিগুণতর হয়। (বোম্বাইচিত্র ; পৃ. ২০।) ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর ভোলানাথ সরাভাইএর সভাপতিত্বে 'আমেদাবাদ-প্রার্থনা সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৬] খ্রীস্টাব্দে আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের পুনরাগমনে আমেদাবাদ প্রার্থনাসমাজে নব উদ্দীপনা জাগে। আমেদাবাদ-প্রার্থনাসমাজের উপাসনায় স্ত্রীলোকদের যোগ দেবার ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথই উদ্যোগী হয়েছিলেন। স্বামী নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক আর স্ত্রী পৌত্তলিক, এ ব্যবস্থা স্ত্রী স্বাধীনতার পূজারী সত্যেন্দ্রনাথ কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর সংস্কারমুখী মন চেয়েছে —শুধু জ্ঞানের আলোক থেকে স্ত্রীসমাজও যেন বঞ্চিত না হয়।

মহীপতরাম[৭৭] রূপরাম পরিবেশিত ৬ষ্ঠ সাম্বৎসরিক আমেদাবাদ-প্রার্থনা-সমাজের (১৮৭৭ খ্রী.) বিবরণে জানা যায় বেদীর আসন থেকে সত্যেন্দ্রনাথের উপদেশ শুনতে এত লোকের সমাগম হয়েছিল যে তিল ধারণের স্থান ছিল না। ধর্মীয় ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার এটি একটি প্রামাণ্য বিবরণ।

সাতারা প্রার্থনাসমাজেও সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গড়ে ওঠে। চিন্তামণ নারায়ণ ভট্, যাদবরাও জাহ্নরে ও রামচন্দ্র কালে সর্বদাই সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। সাতারার অধিবাসীগণ ব্রাহ্মধর্মকে বিদেশী ধর্মের ছায়া মনে করে দূরে থাকতেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ উপাসনার প্রচলন করেই সত্যেন্দ্রনাথ তাদের মন থেকে এই ভুল ধারণার নিরসন করেন। ব্রাহ্মধর্ম যে বিদেশীর ধর্ম নয়—ভারতেই প্রাচীন সনাতন ধর্ম—এই ভাব জনমনে প্রতিষ্ঠিত করতে সত্যেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল অগ্রণী।

সাতারা প্রার্থনা সমাজেও উপাসনায় যোগদানের জন্য স্ত্রীজাতির আসন

নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো। মারাঠীতে সত্যেন্দ্রনাথের মহর্ষি রচিত 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' শ্রবণে সাতরার জনগণ উদ্বোধিত হতেন। কন্যা ইন্দিরা দেবীকে নিয়ে একসাথে ব্রহ্মসংগীতে গেয়ে ও সংগীতগুলির মূল ভাব বিশ্লেষণ করে সত্যেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীতের মাধুর্য ও ভাবার্থের প্রতি জনমনকে আকৃষ্ট করেছিলেন।

এছাড়াও ধর্মীয় মতবাদের খোলাখুলি আলোচনার জন্য কর্মজীবনে সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে প্রীতিসম্মেলনের আয়োজন হতো। ব্রাহ্মসমাজের 'পঞ্চ-ষষ্টিতম সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সাতারা প্রার্থনাসমাজে রামচন্দ্র কালে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে প্রার্থনাসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ যে 'একার্থবাচক' একথাই ব্যক্ত হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের সংগে আর্যসমাজ ও প্রার্থনাসমাজের যে সংযোগ রচিত হয়েছে তা ভবিষ্যতে সুফলপ্রসূ হবে বলেই আর্যসমাজের 'সেবকলাল' আশাপোষণ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের উদার ধর্মচেতনায় এই তিন সমাজের মধ্যে যে মূলগত কোন পার্থক্য নেই, এ বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছিলেন। [দ্র. ১৮১৭ শক বৈশাখ, তত্ত্ববোধিনী] সুতরাং দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মের কর্তব্য বিস্মৃত না হয়ে যথাযথ তা পালন করে গেছেন। এ প্রসংগে দ্বারকা গোবিন্দবৈদ্য লিখিত সত্যেন্দ্র-নাথের শোকপ্রশস্তি পরিশিষ্টে তৃতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৮৬৭তে বোম্বাই প্রার্থনা সমাজ, ১৮৭২-এ পুনা প্রার্থনা সমাজ, ১৮৭৫-এ সিন্ধু-হাইদ্রাবাদ ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৭৬-৭৭-এ আমেদাবাদ প্রার্থনাসমাজ ও ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত সাতরা প্রার্থনা সমাজ সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় প্রভূত উপকৃত হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কর্মজীবনে যে ঐক্যের বীজ উপ্ত হয়েছিলো বিভিন্ন মনীষীদের প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে একেশ্বরবাদী সম্মেলনগুলিতে সেই ভাব আরও পুষ্ট ও বর্ধিত হয়েছে।

কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে কোলকাতায় আসার পরেও একেশ্বরবাদী কর্মসূচীর সংগে সত্যেন্দ্রনাথ যে জড়িত ছিলেন তার প্রমাণ ১৯০৭-এ সুরাটে একেশ্বরবাদী সম্মেলনে সত্যেন্দ্রনাথকেই সভাপতিত্ব করতে আহ্বান করা হয়। সুরাট সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন—প্রার্থনা সমাজ ইচ্ছে করলেই ব্রাহ্মসমাজের নামের সংগে তার নাম যুক্ত করতে পারে—

"And here parenthetically I may throw out the suggestion that the Prarthana Samaj might advantageously adopt the name of Brahmo Samaj as a token of union with the Theists of the present Samaj in Bengal.[৭৮]

ঈশ্বর নিরাকার ও এক এই চেতনাকে একসঙ্গে গ্রথিত করে ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে একটি বৃহত্তর ধর্মের প্রতিষ্ঠা হোক এটি ছিল সত্যেন্দ্রনাথের কামনা। মহর্ষি ধর্মের মধ্য দিয়ে জাতীয়তার উদ্বোধনে যে প্রাথমিক প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন, তাঁর সুযোগ্য পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ তাকে রূপায়িত করতে চেষ্টিত হয়েছেন। সকল সমাজের ঐক্যবদ্ধ কর্ম প্রচেষ্টায় সামাজিক কুসংস্কারগুলি দূরীভূত হয়ে সর্বভারতে যে সত্যদৃষ্টি সত্যদৃষ্টি জাগ্রত হবে এই মত দৃঢ়তার সঙ্গে সুরাট সম্মেলনে ব্যক্ত করেছেন—

"I cannat let slip this opportunity without exhorting all sections of the Theistic church to unite...Each section of the Brahmo Samaj, the The Prarthana Samaj of Bombay, the Arya Samaj of northern India and other theistic bodies—who all agree in the broader principles of our Faith—should they not combine their forces and try to conquer false gods, false creeds, and break through the barriers of caste that tend to keep up apart from one another ? Should not all Theists unite themselves into a common brotherhood..."[৭৯]

ম্যাক্সমূলারের উক্তি অনুসরন করে ঐ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন যে বর্তমান সময়ে প্রত্যেক ধর্মের বাইরের আচারকে বাদ দিয়ে তার অন্তর্নিহিত সারবস্তুকে নির্ণয় করার সময় এসেছে। কারণ সত্যেন্দ্রনাথের মতে—'In brief, the great fundamental principles of all religion are the same. They differ only in their minor details...."[৮০]

প্রকৃত সত্য সকল ধর্ম থেকেই আহরণ করা যেতে পারে। যদি সেই সত্যের সঙ্গে নিজ ধর্মের মিল দেখা যায় তবে আনন্দ আরও বর্ধিত হয়।

বহুভাষাবিদ সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে বোম্বাই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নিরাকার

একেশ্বরবাদের চেতনা জাগ্রত করা সম্ভব হয়েছে। দ্বারকা গোবিন্দ বৈদ্যের রচিত সত্যেন্দ্রনাথের শোকপ্রশস্তি থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের উদার ধর্মচেতনা বহির্বঙ্গে কিরূপ প্রতিষ্ঠিত করেছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান যেমন মারাঠীতে সত্যেন্দ্রনাথ (আংশিক) প্রচার করেছেন তেমনি ইংরেজীতেও এই গ্রন্থ অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথই অগ্রণী হয়েছেন।[৮১] দ্বারকা গোবিন্দবৈদ্য[৮২] তাঁর রচিত মারাঠী গ্রন্থ 'প্রার্থনা সমাজচা ইতিহাস' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথের গুজরাটী উপদেশ মালার উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি করেছেন। তাঁর মতে ভাষার লালিত্যে ঐ উপদেশমালা গুজরাটী ভাষার অপূর্ব সম্পদ। সেজন্য দ্বারকা গোবিন্দ বৈদ্য তা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও ঐ গ্রন্থে ব্যক্ত করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের দুটি গুজরাটী উপদেশ উদ্ধৃত করেছেন। এর মধ্যে 'মুক্তি' পুজানী জরুর শী ছে' উপদেশটি পরিশিষ্টে দেওয়া হলো। ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি ও মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ অভি-ব্যক্ত যে বিশ্বময় বিরাজিত এই চেতনায় তাঁর উপদেশ মালা শান্তরস ও পবিত্রতায় মণ্ডিত হয়েছে।

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে সিন্ধু-হাইদ্রাবাদে ব্রাহ্মমন্দিরের উপলক্ষে বিবৃত সত্যেন্দ্রনাথের যে ভাষণ পুস্তিকা পাওয়া গেছে সেটি সত্যেন্দ্রনাথ নিজের হাতে লিখে ১৫ই জুলাই ১৮৭৬-এ আমেদাবাদে মিস কার্পেণ্টারকে উপহার দিয়েছিলেন।

এদেশে সমাজ সেবায় এসে মিস কার্পেণ্টার সত্যেন্দ্রনাথের গৃহেও কয়েক-দিন ছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর আত্মকথায় বলেছেন—"Miss Mary Carpenter খুব গোঁড়া একেশ্বরবাদী (Unitarian) খ্রীস্টান ছিলেন।... তিনি এদেশে মন্দির দেখতে চাইতেন না—পৌত্তলিকতা বলে।"

ব্রাহ্মধর্মের মৌলনীতিগুলির সঙ্গে মিস কার্পেণ্টার পরিচিত হন—এই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছা। তাঁর মাধ্যমে বিদেশেও ব্রাহ্মধর্মের কথা প্রচারিত হবে এই আশা সত্যেন্দ্রনাথ পোষণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে বিদেশী একেশ্বরবাদী চার্লস ভয়েসীর[৮৩] নামও উল্লেখ্য। কেশব-চন্দ্রের খ্রীষ্টধর্মানুরক্তির বিরুদ্ধে চার্লস ভয়েসী কটাক্ষ করে যে মন্তব্য লিখে ছিলেন, তার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের মতের সম্পূর্ণ মিল ছিল বলেই আদি ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে রাজনারায়ণ বসুকে দিয়ে একটি ধন্যবাদসূচক পত্র চার্লস

ভয়েসীকে পাঠানোর জন্য সত্যেন্দ্রনাথকে পত্রে অনুরোধ করেছিলেন। পুত্রের যুক্তি দেবেন্দ্রনাথ মেনে নিয়ে রাজনারায়ণ বসুকে[৮৪] চিঠি দিয়েছিলেন ও চার্লস ভয়েসীর মন্তব্যের অনুবাদ (১৮০১ শক কার্ত্তিক সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে) প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ধর্ম সম্পর্কে সকল গোঁড়ামি-মুক্ত হয়ে এক উদার মানবপ্রেমে সকলকে উদ্বোধিত করাই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের ব্রত। কোন সম্প্রদায়ের দাসানুদাস হয়ে পড়া তার কাম্য ছিল না। প্রকৃত ব্রাহ্ম সকল সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে শুদ্ধ চৈতন্য লোকে নিজের চিত্তকে নিবিষ্ট করেই তৃপ্তি পান। তাই উদার মনোভাব জাগ্রত করতে তিনি সকলকে আবেদন জানিয়েছেন সুরাট সম্মেলনে—"Brethren, let us be catholic in the real sense of the term, unsectarian and broadminded."

ভারতে যদি একেশ্বরবাদের চেতনা সুদৃঢ় হয়—যদি পরস্পরে বিভেদ না আসে তবে সমগ্র বিশ্বে একেশ্বরবাদী চেতনা জাগ্রত হওয়া অসম্ভব নয়। বিপ্লবের পথে না গিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ধীরে ধীরে জনমনকে প্রভাবিত করা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের পথ। দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে পারস্যের সাধকদের চিন্তাধারায়ও সত্যেন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথকে বিদেশে পাঠিয়ে সম্ভবতঃ মহর্ষি আশা করেছিলেন যে অধ্যয়নের ফাঁকে বিদেশের একেশ্বরবাদী আচার্যদের সঙ্গে সুযোগমতো যোগাযোগের ফলে সত্যেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-চিন্তা আরও উন্নত হবে ও দেশে ফিরে ব্রাহ্মধর্মের গঠনকাজে তা রূপলাভ করবে। সেজন্যই বিলাত গমনের রাত্রিতে মহর্ষি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন—"যখন দেখিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে—এই আশাতেই তোমাকে দূর দেশে প্রেরণ করিতেছি।" [তত্ত্ববোধিনী ; আশ্বিন, ১৮৪৬ শক।]

সত্যেন্দ্রনাথ অধ্যয়নে প্রতিষ্ঠালাভ করে দেশজননীর মুখ উজ্জ্বল করুন—এটি মহর্ষি যেমন চেয়েছেন তেমনি তাঁর দ্বারা ব্রাহ্মধর্মেরও উন্নতি হোক এটিও তিনি কামনা করেছেন।

ঘটনাচক্রে সত্যেন্দ্রনাথের কর্ম্মস্থল বোম্বাই প্রবাসে হওয়ায় জন্মভূমির নিরবচ্ছিন্ন সেবা করার সুযোগ তাঁর হয় নি তবে 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী'দের মধ্যে তাঁর দান সশ্রদ্ধে স্মর্তব্য।

সত্যেন্দ্রনাথ জীবনের বিভিন্ন বিকাশের সর্বশীর্ষে যেমন ধর্ম ও ঈশ্বরকে স্থান দিয়েছেন তেমনি নিজের জীবনাচরণের মধ্যেও যে তা প্রতিপালন করে গেছেন তা ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সত্যেন্দ্রনাথ উপাসনায় প্রভাব' প্রবন্ধে স্পষ্টই ধ্বনিত হচ্ছে—"স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আজ সর্ব্বজনবিদিত সাধারণ সম্পত্তি। সুতরাং সে সকল বিষয়ে বিস্তৃত উল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিনা। তাঁহার সেই সকল কার্য্যের দ্বারা কোলাহল কলরবের ফলে তাঁহার জীবনের একটা দিক ঢাকিয়া গিয়াছে, লোকের দৃষ্টি হইতে একটু অন্তরাল পড়িয়া গিয়াছে—সেটী হইতেছে তাঁহার একনিষ্ঠ ধর্ম্মভাব, জীবনের সকল কার্য্য ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা নিয়মিত করিবার ভাব (তত্ত্ববোধিনী ; ফাল্গুন, ১৮৪৪ শক)।

সবশেষে সত্যেন্দ্রনাথের সংগীত দিয়েই তাঁর ঈশ্বরানুভূতির স্বরূপ ও প্রচারের আকুলতা প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

জাননা রে কত তাঁর করুণা
যে জন দেখে না, চাহে না তাঁকে, তারেও করিছেন প্রেম-দান।
রসনা, যাও তাঁর নাম প্রচারো,
তাঁর আনন্দ-জনন সুন্দর আনন, দেখো রে নয়ন, সদা দেখো রে ॥

১. 'দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগৎ' : তত্ত্ববোধিনী আষাঢ়, ১৮২৮ শক।

২. অদৃশ্যমগ্রাহ্যং—সত্যেন্দ্রনাথ—ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে আচার্যের উপদেশ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—অগ্রহায়ণ, ১৮২৯ শক।

৩. মহাপুরুষের মৃত্যু নাই,··· সত্য বটে, আমরা তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না, তাঁহার মধুর বাণী শুনিতে পাই না কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি কি আমাদের সংগে নাই ?···তাঁহার শরীর নাই কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।'—মহর্ষির জন্মতিথি : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; তত্ত্ববোধিনী ; আষাঢ়, ১৮৩১ শক।

অপিচ

'হে পিতঃ। এ আমাদের পরম লাভ যে, তুমি তোমার আত্মসাধনার ফল লোকসকলকে বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তোমার প্রদত্ত অমৃত ফল ভক্ষণ করিয়া আমরা নবজীবন লাভ করিয়াছি।' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাবে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ; মাঘ, ১৮৪৬ শক। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)

৪. দেবেন্দ্রনাথ : মণি বাগচী। পৃ. ২।

৫. আত্মজীবনী : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত পঞ্চম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৯।

৬. ...his leading idea was to establish the doctrine of Monotheism but that he failed to build up a positive system of religion.' (Satyendranath's letter to Max Muller printed in 'The Life and Letters of the Right Honorable Friedrich Max Muller' edited by his wife. Vol. II Apx. A. p. 443)

৭. 'The immediate followers of this great Hindu reformer endeavoured, through feebly to uphold the Vedas and even some of the later Vedic writings, as Revelation...' Ibid.

৮. The earlier Brahmas seem to have imbibed from their leader an idea that the doctrines of Theism are too pure and sublime to suit the gross ideas of the common people, and that therefore some sort of external authority is necessary to convince them.' [Satyendranath's Letter to Max Muller—p. 443—Ibid]

৯. It was soon felt that the veda, vedanta, upanishads ...containing as they do a mass of heterogeneous subjects ...could not stand the test of reason. Ibid.

১০. He picked up a torn leaf accidentally which excited his curiosity. Ibid. p. 444

১১. Many of the Pantheisiic doctrines contained in them were easily contrued into Monotheism.' Ibid.

১২. 'This book is our Shikshapatri—the Bible from which we draw our inspiration'— p. 11. Surat Conference Satyendranath's Address.

১৩. মহর্ষির হৃদয় প্রসূত ব্রাহ্মধর্ম বীজ হইতে আমরা এই মহামন্ত্র শিক্ষা করিয়াছি যে—'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব… মহর্ষির জন্মতিথি' : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী—আষাঢ় ১৮৩১ শক।

১৪. কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস' শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থবদ্ধ ও মুদ্রিত করিয়া তাহার সহস্র খণ্ড ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ; (তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন, ১৭৮২ শক।

১৫. 'এই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের সহজ ভাব সকল বুদ্ধির দ্বারা আলোচনা করিয়া কলিকাতা ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে আমার পরম পূজনীয় পিতা মহাশয় যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সাধারণের উপকারের জন্য গ্রন্থবদ্ধ করিয়া আমি প্রকাশ করিতেছি ; ইহাতে যদি একটি আত্মা-ও ধর্ম্মের সহায় উন্নতি লাভ করে এবং ঈশ্বরভাবে পূর্ণ হয়, তবে আমি কৃতার্থ হইব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস : উপক্রমণিকা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৬. 'An Address Read by Babu Satyendranath Tagore C. S. on the occastion of the inaugural ceremony of the Brahmo Mandir at Hyderabad Sind [1875]. p. 7, Received from India Office Library and Records, London.

১৭. ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস (দেবেন্দ্রনাথ প্রদত্ত উপদেশের সংকলন গ্রন্থ) সংকলক সত্যেন্দ্রনাথ লিখিত উপক্রমণিকা।

১৮. Presidential Address of Mr. S. N. Tagore. The Theistic Conferenee. 1907 [pp. 13-14]. Surat.

১৯. 'পিতৃশ্রাদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ কেবল অপৌত্তলিক মন্ত্রদ্বারা দানোৎসর্গ করিয়াছিলেন মাত্র। ...তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারী দেবীর বিবাহই (২৬শে জুলাই ১৮৬১) তাঁহার রচিত ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত পদ্ধতির প্রথম অনুষ্ঠান। —সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষির আত্মজীবনী : পরিশিষ্ট। পৃ. ৩৫৫।

২০. আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে আচার্যের উপদেশ—'অপৌত্তলিক উপাসনা'। —তত্ত্ববোধিনী ; শ্রাবণ, ১৮২৯ শক।

২১. Presidential Address— The Theistic conference, Surat (1907) p. 14.

২২. -do- p. 12.

২৩. Presidential Address—The Theistic Conference, Surat (1907), p. 12.

২৪. একমেবাদ্বিতীয়ম্ : পুস্তিকা, দ্বাচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা। ১১ই মাঘ, ১৭৯৩ শক, পৃ. ১৩।

২৫. Satyendranath's Address—Sind—Hyderabed—p. 10.
দ্র. ১৬নং পাদটীকা।

২৬. ব্রহ্ম পূজা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী ; জ্যৈষ্ঠ, ১৮২৮ শক।

২৭. 'His liberal views may be witnessed in the trust-deed in regard to a particular building, set apart for worship of the true God in accordance with the principle of the Brahma Samaj'. —Satyendranath's letter to Max Muller from Ahmedabed 1895. Published in The life and letters of Max Muller, Appendix A. p. 443.

২৮. Satyendranath's Addreess : Sind-Hyderabad-p. 9.

২৯. ব্রহ্মপূজা : তত্ত্ববোধিনী ; জ্যৈষ্ঠ, ১৮২৮ শক-পৃ. ২৬-২৯।

৩০. ব্রহ্মপূজা : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৮২৮ শক, পৃ. ২৯।

৩১. আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম'। —আত্মজীবনী : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২০৯।

৩২. 'তোমরা সেই অখিল মাতার স্নেহ প্রেম অনুভব করিয়া তাঁর পদে প্রণত হও' —ব্রহ্মপূজা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৩. 'জীবন শারীরিক-আধ্যাত্মিক' : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী ; ১৮২৮ শক, কার্ত্তিক, পৃ. ১১৩।

৩৪. আত্মশক্তি : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী ; ১৯২৮ শক—শ্রাবণ।

৩৫. An Address read by Babu Satyendranath Tagore C. S. on the occasion of the inaugural ceremony of the Brahmo Mandir at Hyderabad Sind. Sept. 1875, p. 8.

৩৬. 'দৃশ্যমান ও অদৃশ্যজগৎ' : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : তত্ত্ববোধিনী, আষাঢ় ১৮২৮ শক, পৃ. ৫৩।

৩৭. 'পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব এইরূপ উপদেশ দিতেন—'সংসার জল, আর মানুষের মন যেন দুধ,' যদি জলে ফেলিয়া রাখ তাহা হইলে দুধে জলে মিশিয়া এক হইয়া যায়—খাঁটি দুধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেই দুধকে মাখন করিয়া তুলিয়া যদি জলে রাখা যায় তা হলে তাহা জলের সংগে মিশিয়া যায় না।' জীবন, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী—কার্ত্তিক ১৮২৮ শক পৃ. ১১৪।

৩৮. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাবে : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী ; মাঘ ১৮৪৬ শক। পৃ. ২৭৪-২৭৭ [সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৩৯. আত্মশক্তি : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী—শ্রাবণ ১৮২৮ শক। পৃ. ৭১-৭৩।

৪০. Satyendranath's Address : Sind Hyderabad. p. 8.

৪১. ভাষণপুস্তিকা—আদি ব্রাহ্মসমাজ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৭৯৩ শকের ফাল্গুন মাসে বিবৃত হয়।

৪২. পরকালতত্ত্ব : ভক্তিভাজন আচার্য শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

বুধবারের উপাসনায় প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ। তত্ত্ববোধিনী; বৈশাখ ১৮২৮ শক।

৪৩. দ্র. 'মৃত্যুভয়-মৃত্যুঞ্জয়'—তত্ত্ববোধিনী; ভাদ্র ১৮৩১ শক।—আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণ।

৪৪. পরকালতত্ত্ব: সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী; বৈশাখ, ১৮২৮ শক; পৃ. ১২।

৪৫. পরকালতত্ত্ব: সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ১২। তত্ত্ববোধিনী; বৈশাখ, ১৮২৮ শক।

৪৬. "যখন উপনিষদে দেখিলাম, ব্রহ্মোপাসনার ফল নির্ব্বাণ মুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল।...বিজ্ঞানাত্মাপুরুষ উন্নত লোক স্বর্গেতেই থাকুক কিম্বা এই অধঃস্থ পৃথিবীতে থাকুক, যখন তাহার সমুদায় বিষয়কামনার পরিসমাপ্তি হইয়া একমাত্র অন্তর্যামী পরমাত্মাকে লাভ করিবার কামনা অহোরাত্র হৃদয়ে জাগিতে থাকে, যখন সে আপ্তকাম ও আত্মকাম হয়...তখন সে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সংসারের পার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অন্তরতম অমৃত ব্রহ্মের তিমিরাতীত জ্ঞানোজ্জ্বল প্রেমসিক্ত ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখানে নূতন প্রাণ পাইয়া পবিত্র হইয়া, তাঁহার কৃপাতে, জ্ঞানে-প্রেমে-আনন্দে সেই অনন্ত জ্ঞান-প্রেমে-আনন্দের সহিত ছায়া ও আতপের ন্যায় নিত্যযুক্ত থাকে।"—আত্মজীবনী: দেবেন্দ্রনাথ। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ; পৃ. ১২৮-১২৯।

৪৭. জীবনের আদর্শ: সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী; চৈত্র, ১৮২৮ শক। পৃ. ১৮৫।

৪৮. ধনলালসা: ঐ পৃ. ১৯১।

৪৯. Satyendranath's Address ; Sind, Hyderabad. p. 4.

৫০. ধনলালসা: সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা: চৈত্র ১৮২৮ শক, পৃ. ১৯২।

৫১. দ্র. ধনলালসা (পূর্বোক্ত)।

৫২. **Satyendranath's address in the inaugural ceremony of the Brahmo-Mandir at Sind ; Hyderabad, 1875 p. 5.**

৫৩. ধনলালসা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী; চৈত্র, ১৮২৮ ; পৃ. ১০৯।

৫৪. ধনলালসা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী ; চৈত্র, ১৮২৮ শক।

৫৫. ঐ।

৫৬. ঐ।

৫৭. 'জীবনের আদর্শ' : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮২৮ চৈত্র, পৃ. ১৮৫-৮৬, ১৮৮।

৫৮. ঐ। পৃ. ১৮৮।

৫৯. ঐ। পৃ. ১৮৮।

৬০. শাস্ত্রালোচনা : তত্ত্ববোধিনী ; ১৮২৯ আষাঢ়। (আদি ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।)

৬১. শাস্ত্রালোচনা : আদি ব্রাহ্মসমাজে সত্যেন্দ্রনাথের বেদীর ভাষণ, তত্ত্ববোধিনী ; আষাঢ়, ১৮২৯ শক।

৬২. ঐ।

৬৩. ঐ।

৬৪. ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মে কাউন্সিল অব এডুকেশন এর সভাপতি ড্রিংক-ওয়াটার বীটন সাহেবের প্রচেষ্টায় বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়। মুষ্টি-মেয়দের মধ্যে বীটন সাহেবের প্রিয়পাত্র মদনমোহন তর্কালংকার আপন কন্যাকে, দেবেন্দ্রনাথ সৌদামিনীকে (পত্রাবলী ৩০) ও হরদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর দুই মেয়েকে এই স্কুলে দিতে সাহসী হয়েছিলেন। স্কুলের যে মেয়েদের আনতে যেতো তার গায়ে মহানির্ব্বাণতন্ত্রোদ্ধৃত 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ' এই বাক্য লেখা থাকতো (দ্র. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত ; পৃঃ ৬২)। এই মহান বাণীর প্রচার সত্যেন্দ্রনাথের কাম্য ছিল।

৬৫. শাস্ত্রালোচনা (পূর্বোক্ত)।

৬৬. শাস্ত্রালোচনা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী ; আষাঢ়, ১৮২৯ শক।

৬৭. 'সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে যাহা বেদে আছে তাহাই ধর্ম্ম'। কিন্তু আমরা ফলে দেখিতে পাই শ্রুতি স্মৃতি ছাড়িয়া আমরা

দেশাচারকেই সর্বোচ্চ আসনে স্থাপন করিয়াছি। দশবিধ সংস্কার, সন্ধ্যা, আহ্নিক, বার মাসের তের পার্ব্বণ এইরূপ সংখ্যাতীত ক্রিয়া-কলাপ পঞ্জিকাদৃষ্টে সম্পন্ন করিয়া মনে করি ইহাই ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব'।— শাস্ত্রালোচনা : সত্যেন্দ্রনাথ।

৬৮. দুই কুলির জীবনকথায় ভবানীপুরে নফরচন্দ্র কুণ্ডুর আত্মোৎসর্গের কাহিনী উল্লিখিত। শাস্ত্রালোচনা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ব-বোধিনী ; আষাঢ়, ১৮২৯ শক।

৬৯. Satyendranath's address in the inaugural ceremony of Brahmo Mandir, Hyderabad, Sind. pp. 1, 3.

৭০. একমেবাদ্বিতীয়ম্' পুস্তিকা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বাচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত বক্তৃতা থেকে মুদ্রিত (১৭৯৩ শক)।

৭১. 'How can we venture to appr ach Him with our hearts full of sin and selfishness ? (p. 6) Fastings and prayers avail not when the heart is impure' (p. 5).
Satyendranath's Address in the Inaugural Ceremony of the Brahmo Mandir at Hyderabad Sind. (1875).

৭২. Satyendranath's address in the Inaugural Ceremony of Brahmo-Mandir at Hyderabad, Sind. p. 10.

৭৩. Ibid. p. 3.

৭৪. Prarthana Samaj was established in Bombay in 1867 on the 31st March *Prarthana Samajacha Itihas* [English from Marathi] by D. G. Weidya. p. 36.

৭৫. Reader Printer Copy of Satyendranath's Address on the occasion of the Inaugural Ceremony of the Brahmo-Mandir at Hyerabad Sind (1875). Received from India Office Library and Records : London.

৭৬. Ahmedabad Prarthana Samaj was established on 17th December 1871. In 1873 Rao Bahadur Beechardas Ambadas donated Rs. 5500/-for a building of the Samaj.

The building was opened in 1876. ***Prarthana-Samajacha-Itihas.*** Eng. rendering from Marathi by S. B. Joshi. p. 301.

৭৭. 'In the evening Babu Satyendranath Tagore conducted the divine Service. The gathering was so great that not an inch was left occupied....The worthy son of the great man, who reared the tender plant sown by Rammohan Rai, the founder of Brahmo Samaj in Calcutta, delivered an excellent and a very learned sermon.'—Mahipatram-Rupram, Secretary, ***Ahmedabad Prathana Samaj.*** ১৮০০ শকের বৈশাখ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে মুদ্রিত।

৭৮. Presidential Address of Mr. S. N. Tagore. The Theistic Conference ; Surat. p. 15.

৭৯. Ibid.

৮০. Presidential Address : Theistic Conference, Surat, p. 16.

৮১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়—১৮৩০ শক, সপ্তদশ কল্প, ২য় ভাগের প্রথমেই অকারাদি বর্ণক্রমে সূচীপত্রে Sermons of Maharshi Devendranath Tagore—এ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়।

৮২. দ্বারকাগোবিন্দ বৈদ্য : জন্ম ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৭৭ বম্বের নিকটবর্তী ঠানা জেলার কালোয়ায়। মৃত্যু—১৯৪১।
সুবোধ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে), প্রার্থনা-সমাজ-চা-ইতিহাস, সংসার ও ধর্মসাধনা, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের বক্তৃতা, ও নারায়ণ চন্দ্র বারকার-এর বক্তৃতা সংকলন করেন।'
বি. বি. কেশকর সম্পাদিত দ্বারকা গোবিন্দ বৈদ্যের 'সংসার ও ধর্ম-সাধনা' পুস্তকে প্রাপ্ত।

৮৩. জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : পুরাতনী।

৮৪. 'প্রায় দশ বৎসর হইল সুপ্রসিদ্ধ স্বাধীন চেতা ব্রহ্মবাদী বয়েসী সাহেব লণ্ডনে নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন...সম্প্রতি বয়েসী সাহেব ইংলণ্ডবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাদরের বৃদ্ধি দেখিয়ে

লণ্ডন নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছেন।...ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী বেডফোর্ড ব্লাকবার্ন নগরদ্বয়ে দুইটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' ১৮০৩ শক ভাদ্র, তত্ত্ব-বোধিনী।

৮৫. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলীর ৮৮নং পত্রে সত্যেন্দ্রনাথের কথা জানা যায়। পত্রটির তারিখ-'দার্জ্জিলিং-৩১ আষাঢ় ৫০' (ব্রাহ্মসম্বৎ)।

সত্যেন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা

ভূমিকা

সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনে সামাজিক রীতিনীতির ও পরিবর্তন হয়। সুতরাং যে পুরাতন ঐতিহ্য, আচার, নিয়মকানুন ও বিশ্বাসের মধ্যে সমাজ গঠিত হয়েছিল—সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে তার মধ্যে ভাংগন সূচিত হয়। Maciver ও Page বলেন—"Society is a system of usages and procedures, of authority and mutual aid, of many grouping and divisions, of controls of human behaviour and of liberties. This ever—changing, complex system we call society. It is the web of social relationships."[১] সমাজ ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যায়, শুধু মাত্র সহযোগিতায় নয়, পরস্পর সংঘাতের ফলেও সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘনিয়ে আসে। সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে যতই বহিরাগত প্রভাব আসে সমাজের রীতিনীতির ততই পরিবর্তন হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের সূচনায় যুক্তিবাদের সাহায্যে ভারতীয় সমাজের পুরাতন ঐতিহ্য ও রীতিনীতিগুলিকে নূতন ভাবে যাচাই করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাতন প্রথাকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়। এই সংঘাতের পটভূমিকায় যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ অন্যতম।

সমাজের কুপ্রথা দূরীকরণে সত্যেন্দ্রনাথ ব্যক্তিবিশেষের একক সাহসিক কর্ম প্রচেষ্টার উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। যদি কেউ সাহস করে নিজ পরিবারে সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন, তবে তাঁর অনুকরণে সমাজের অন্যান্যরাও নিজ গৃহে তা প্রতিপালন সচেষ্ট হবেন। ফলে সমগ্র সমাজ থেকে ধীরে ধীরে ঐ কুপ্রথার অবসান হবে। প্রতিটি ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ—আর এই সমাজে প্রথম সাহস করে কুপ্রথা দূর করতে অনেকেই এগিয়ে আসেন না। এ প্রসংগে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন—"তুমি বলিবে, আমি একাকী সমাজকে কিরূপে আমার মনের মতন গড়িয়া তুলিব? কিন্তু এ কথা কোন কার্যেরই নহে। এক একজন লোক লইয়াই ত সমাজ। তুমি যদি স্ত্রীশিক্ষা প্রয়োজনীয় বোধ কর, তবে কি তাহা তোমার নিজের পরিবারের

মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পার না। বাল্যবিবাহ যদি তোমার বিবেচনায় অপকারক হয়, তুমি কি তোমার নিজ পুত্রকন্যার বেলায় প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে যাইতে পার না? এক এক পরিবারের সাধু দৃষ্টান্তই ক্রমে দেশের মধ্যে প্রচারিত হয়।"[২]

নারীকল্যাণে আত্মনিয়োগ ও জাতিভেদপ্রথার অবসান করে সবল ও যুক্তিনিষ্ঠ জাতীয় চরিত্রকে গঠিত করাই সত্যেন্দ্রনাথের সমাজসংস্কারমূলক চিন্তাধারার প্রধান উপজীব্য বিষয়।

প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথের নারীকল্যাণমূলক চিন্তাধারা আলোচনার পর অন্যান্য সমাজ সংস্কারের দিকগুলি বিশ্লেষিত হবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সত্যেন্দ্রনাথের নারীকল্যাণমূলক চিন্তাধারার অন্তর্গত।—

স্ত্রী-স্বাধীনতা ও অবরোধ প্রথার অবসান,

স্ত্রীশিক্ষা,

বাল্য বিবাহ প্রথারোধ ও কোর্টসিপ বিবাহের প্রচলন।

চিরবৈধব্য প্রথার বিলোপ।

বহু বিবাহ প্রথার বিলোপ।

এ ছাড়া জাতিভেদ প্রথার অবসান।

জাতীয় আলস্য দূরীকরণ ও একান্নবর্তী পরিবার প্রথার অবসান।

ধর্মের আবরণে সামাজিক ব্যভিচার দূরীকরণ ইত্যাদি সত্যেন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার অন্যান্য মুখ্য বিষয়।

'পরিবারিক খাতা,' 'বোম্বাই চিত্র,' 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে ও সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন পত্রাবলীতে তাঁর সমাজসংস্কারমূলক চিন্তাধারার ছাপ সুস্পষ্ট। পারিবারিক খাতায় বিবাহ, একান্নবর্ত্তী পরিবার, নৃত্যপ্রিয়তা সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের রচনা তাঁর সমাজচিন্তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। (দ্র. পরিশিষ্ট ৯)।

খেয়ালখুশিতে ভরা এই পারিবারিক খাতার অনেক রচনাই অপ্রকাশিত ও রচনারীতির দিক থেকে চোখে পড়ার মতো; সেজন্য পারিবারিক খাতা সম্পর্কে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হবে।

স্ত্রী-স্বাধীনতা ও অবরোধ প্রথার অবসান

'বাংলার স্ত্রী-স্বাধীনতার পথিকৃৎ'[৩] এই অভিধা সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি সার্থক প্রযুক্ত। সত্যেন্দ্রনাথের সমাজ সংস্কারের মূল বৈশিষ্ট্য—আপন পারিবারিক জীবনে একক কর্মপ্রচেষ্টার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আপন জীবনাচরণে কুপ্রথার বিসর্জন দিয়ে সমাজে আদর্শদৃষ্টান্ত স্থাপনে তিনি প্রয়াসী ছিলেন। প্রকাশ্য জনসভায় আন্দোলন ও প্রচারের পথ বেছে নেন নি বলে সমাজ সংস্কারকদের নামের তালিকায় সত্যেন্দ্রনাথের উল্লেখ বিরল হলেও তাঁর আপন অভীষ্টপথে তিনি যে সফলকাম হয়েছেন তা শ্রীপুলিনবিহারী সেনের বক্তব্য থেকে জানা যায়।[৪]

বিলাত থেকে পত্নীকে লেখা চিঠির মধ্যে, তাঁর ভাইবোনদের ও পত্নীর স্মৃতিকথায়, বোম্বাইচিত্র (১২৯৫) ও 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে (১৯১৫) 'স্ত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজাবাহী' সত্যেন্দ্রনাথের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

বিলাতযাত্রার পূর্বেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের প্রচলিত নিয়ম না মেনে সত্যেন্দ্রনাথ ছোটবোনকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। মেয়েদের পক্ষে তখন গাড়িচড়া লজ্জার বিষয় হলেও সত্যেন্দ্রনাথ তা মানতেন না। অন্তঃপুরের বদ্ধজগত থেকে বেরিয়ে এসে ভীত ত্রস্ত নেত্রে বাইরের পৃথিবীকে দেখে মন কি অপার বিস্ময়ে ভরে উঠতো তা স্বর্ণকুমারীর বক্তব্যে পরিস্ফুট।[৫]

জননী সারদাদেবী মেয়েদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া প্রথম প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন নি, সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন সেজন্য মায়ের কাছে অনুযোগ শুনতে হয়েছে।[৬] মায়ের অনুযোগে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে পরম ধৈর্যে তিনি মায়ের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য মাকে অবিরত বোঝাতেন—স্বর্ণকুমারী দেবীর কথায় তা জানা যায়।[৭] মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে মায়ের অনুযোগের কথা ধীরে ধীরে সত্যে রূপান্তরিত হলো। শেষ পর্যন্ত তিনিও সায় না দিয়ে পারেন নি।[৮]

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন পরিবারে 'আশৈশব মহিলা-বন্ধু'। হাতে শত কাজ থাকলেও বাড়ির মেয়েদের বাইরে নিয়ে যাবার ভার সত্যেন্দ্রনাথ সানন্দে বহন করতেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর কথায় 'বাড়ীর মেয়েরা মিউজিয়াম বা পশুশালা বা কোন বক্তৃতা শুনিতে যাইতে চাহিলে মেজদাদা অমনি শত কাজ শত

অসুবিধা সত্ত্বেও তাহাকে সংগে করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইতেন।" [শোক-নৈবেদ্য : সাহিত্যস্রোত।]

মহর্ষি'র কাছে মেয়েদের যদি কোন আবেদন থাকতো তবে তাদের 'মুরুব্বি' হয়ে সত্যেন্দ্রনাথই তা অসংকোচে নিবেদন করতেন। স্বর্ণকুমারী বলেছেন—"বাড়ীর মেয়েরা সকলেই জানিত মেজদাদার মত সহায়বন্ধু তাহাদের আর কেহ নাই, তাঁহার উপর সকলেরই বিশ্বাস ছিল অসীম। বাস্তবিকপক্ষে মহিলাদিগের সর্ব্বতোভাবে এমন মংগলাকাংক্ষী বন্ধু ও নেতার উপযুক্ত এমন উদার মহদন্তঃকরণ ব্যক্তি সংসারে কম দেখিতে পাওয়া যায়।"

বিলাতযাত্রার পূর্বেই অন্তঃপুরের 'কয়েদখানাকে' তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। মুসলমান রীতির অনুকরণে ও মুসলমানদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই এই অবরোধ প্রথার উৎপত্তি হয়েছে বলে তিনি স্থিরবিশ্বাস পোষণ করতেন। বিলাতে এসে স্বাধীনভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের কর্মচঞ্চল স্বচ্ছন্দ জীবনপ্রবাহ দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। তাই দেশে ফিরে গিয়ে অবরোধ প্রথা উন্মোচনে তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ মুগ্ধবিস্ময়ে বিদেশে দেখেছিলেন—'গার্হস্থ্য জীবনে মেয়েদের মোহন সুন্দর প্রভাব' ও 'বিবাহিতা অবিবাহিতা রমণী'দের 'সমাজের বিবিধ মংগলব্রতে' উৎসর্গীকৃত জীবন। তুলনায় দেশের মেয়েদের জীবন 'পর্দা'র অন্ধকারে কি খর্বীকৃত বদ্ধ' তা তিনি সখেদে অনুভব করেছেন।[৯] অবিরত এই অবরোধ প্রথা উন্মোচনের চিন্তা—বিদেশে তাঁর রাত্রির স্বপ্নকেও আচ্ছন্ন করতো। যে 'ঝরকা' অন্তঃপুরবাসিনীদের পৃথক্ করে রেখেছে তা ভেংগে ফেলার অস্থিরতায় তাঁর সুখনিদ্রাও ব্যাহত হতো।[১০]

দেশে ফিরে মুক্তাংগনে আপন পরিবারের অন্তঃপুরবাসিনীদের প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে তাঁর শান্তি ছিল না। বিদেশ বাসকালে দেশের অন্তঃপুর প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর মন যে চরম বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তা পত্নীকে লেখা তাঁর চিঠির মাধ্যমে জানা যায়—'স্ত্রীলোক জীবনউদ্যানের পুষ্প'।—তাহাদের বায়ু ও আলোক হইতে লইয়া কেবল ঘরের মধ্যে শীর্ণ ও বিশীর্ণ করিয়া রাখিলে কি মংগলের সম্ভাবনা'। (পত্র-১৬ নভেম্বর, ১৮৬৩) স্ত্রীলোকের মর্যাদাই যে ইউরোপীয় সমাজের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করেছে এই স্থির বিশ্বাস নিয়েই জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখেছেন—'এখানকার জনসমাজের যাহা কিছু

সাধু সুন্দর প্রশংসনীয়—স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল। আমাদের দেশে এরূপ সৌভাগ্য কবে হইবে? যেখানে স্ত্রীলোকদের কোন বিষয়ই কর্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্তার আদেশ ও পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম সেখান হইতে স্ত্রী-সৌভাগ্য এখনো অনেক দূর।' [পত্র ১৬ই নভেম্বর, ১৮৬৩। পুরাতনী : ২নং, স্ত্রীর প্রতি পত্র]

তাই দেশে ফিরে এসে আপন পত্নীর জীবন বিকাশের মাধ্যমেই অবরোধ প্রথা উন্মোচনে সফলকাম হয়েছিলেন।

ইউরোপীয় সমাজের মুক্ত প্রাণচঞ্চল তরঙ্গের স্পর্শ জ্ঞানদানন্দিনীও কিছুদিন লাভ করে সুশিক্ষিত হয়ে গার্হস্থ্যজীবন শুরু করুন—এই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের কামনা—'আমি থাকিতে থাকিতে তুমি এখানে আসিতে পারিলে আমি কি সুখী হইব। তাহা হইলে এ দেশে যাহাতে তোমার সুন্দররূপ রক্ষা ও শিক্ষা হয় তাহার উপায় করিয়া যাইতে পারি'। (পত্র ১৮ই জানুয়ারি, ১৮৬৪)। জ্ঞানদানন্দিনীর শিক্ষার জন্য প্রকৃত সংসার জীবনে প্রবেশ করতে কিছু বিলম্ব হলেও স্ত্রীর উন্নতির জন্য সে বিলম্বকে বরণ করতে সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তুত ছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত পত্রে জানা যায়—মহর্ষিকেও তিনি এই আভাস দিয়েছিলেন।[১১]

সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মহর্ষি তা অনুমোদন করেন নি—কারণ এতে তৎকালীন 'অন্তঃপুরের মানমর্যাদা' ব্যাহত হতো। পিতার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার অগ্নি তাঁর হৃদয়ে আরও প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। যতই পর্বতপ্রমাণ বাধা আসুক না কেন সব কিছু উল্লংঘন করার শক্তি তাঁর মধ্যে জেগেছিল।[১২] তাই দেশে ফিরে এসেই 'স্ত্রী-স্বাধীনতার দ্বার খোলবার' প্রথম সুযোগটিকেই গ্রহণ করলেন। কর্মস্থল বোম্বাইতে হওয়ায় এদিকে তিনি লাভবান হয়েছেন। দূরদর্শী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সমাজজীবনে ভাংগনের আভাস পেয়েছিলেন। এবারে অনুমতি না দিলে হিতে বিপরীত হবে জানতেন। তবে অন্তঃপুরের প্রাচীন প্রথা যাতে অক্ষত থাকে সেদিকে সত্যেন্দ্রনাথকে সতর্ক করেন।[১৩] পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীকে মুক্ত করার আকাংক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয় তখন দৃঢ় সংকল্পে বদ্ধ। তাই প্রথম পদক্ষেপে অন্তঃপুরের প্রাচীন প্রথা মেনেই কুলবধূ জ্ঞানদানন্দিনীকে নিয়ে যেতে হয়েছিল।[১৪] প্রসংগত অন্তঃপুরের প্রাচীন প্রথার চিত্র

স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা থেকে জানা যায়।[১৫] মহর্ষি যে জ্ঞানদানন্দিনীর বোম্বাই যাত্রায় কোন 'উচ্চবাচ্য' করেন নি—এটাই সত্যেন্দ্রনাথ যথালাভ বলে মেনে নিয়েছিলেন। কারণ সমাজসংস্কার বিষয়ে অনেকেই মহর্ষিকে conservative বলেই জানতেন—সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে জীবনের প্রথম দিকে তিনি যে রকম সমাজসংস্কার করেছেন অনেকেই তা করতে পারেন নি। 'বয়সের সংগে সংগে' ও 'বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায়' তিনি কতকটা conservative হয়ে পড়েছিলেন 'সাবধানে পা ফেলে মাটি পরীক্ষা করে চলতে' চাইতেন, তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন 'ঘোর radical' (আমার বাল্যকথা, পৃ. ২৪।) তারুণ্যের প্রচণ্ড আবেগে যাকে সত্য বলে একবার মেনে নিয়েছেন —যে কোন ভাবে তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রবল আগ্রহে তিনি ছিলেন তখন অধীর। শান্তস্বভাবা সৌদামিনী দেবী মহর্ষি প্রসংগে যে কথা বলেছেন তা সত্যেন্দ্রনাথের বেলায়ও খাটে। 'একবার পথে বাহির হইলে সে পথে চলা তেমন কঠিন নহে কিন্তু পথ দেখানোই শক্ত'।[১৬] মহর্ষির কাছে সম্মতি না পেলে সত্যেন্দ্রনাথের ঈপ্সিত কার্য সাধন করা যে সহজ হতো না তা স্বর্ণকুমারী দেবীও স্পষ্ট করেই বলেছেন।[১৭] সত্যেন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে 'ছেলেবেলার কথা'য় বলেছেন যে পিতার মতের অনুবর্তী হয়ে সকল কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি—কিছু কিছু অপ্রিয় কাজও তাঁকে করতে হয়েছে। কিন্তু মহর্ষি কোন কাজেই সুকঠোর বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়াননি। পুত্রের 'মনের উপর উদ্যমের উপর খড়্গাহস্ত হলে অন্যরকম ভাব দাঁড়াত'।[১৮] মহর্ষি পরিবারে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রধান উদ্‌যোগী সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে এটি সহায়ক হয়েছিল। আপন পত্নীকে যেমন তিনি 'দেশের দৃষ্টান্তস্বরূপ' করতে চেয়েছেন তেমনি আপন জীবনাচরণের মধ্যে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় তাতে সফলকাম হয়েছেন।[১৯] বোম্বাইতে এসে পার্সী পরিবারের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার অবাধ স্ফুরণ, উদ্যানে, পথেপ্রান্তরে, উৎসবে বর্ণাঢ্য পোষাকে নারীসমাজের অবাধ সঞ্চরণ সত্যেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। সেজন্যই বংগদেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থা উন্নত করতে তিনি বোম্বাইয়ের আদর্শ গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। বোম্বাই শহরকে দেখে সেকালের 'নারীবর্জিত কলকাতার দৈন্য' পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছেন।[২০] সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবে অনুজদের চিন্তাধারা

যে পরিবর্তিত হয় তা 'পরিজন-পরিবেশে সত্যেন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

অবরোধ-প্রথা উচ্ছেদের দ্বিতীয় পদক্ষেপে দুবছর পর ছুটিতে পাল্কী করে বধূ নিয়ে না এসে সরাসরি গাড়ি করে নিয়েই জোড়াসাঁকোয় এলেন। বাড়িতে সেদিন 'শোকাভিনয়' হলেও সত্যেন্দ্রনাথ তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নি।[২১] বাইরে যাবার উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিতা জ্ঞানদানন্দিনী সেদিন শ্বশুরগৃহে এলেও অন্তঃপুরবাসিনীরা তাঁকে দূরে দূরেই রেখেছিলেন। পিতৃভবনে এসেও সত্যেন্দ্রনাথকে প্রায় 'একঘরে' হয়ে থাকতে হয়েছে।[২২] আপন পরিবারে এই দ্বিধা ও সংকোচ দেখে সত্যেন্দ্রনাথ ব্যথিত হলেও এই বিশ্বাস রাখতেন যে সময়ে একদিন সব সহজ হয়ে আসবে।

স্ত্রী-স্বাধীনতার তৃতীয় পদক্ষেপে সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় গবর্ণমেণ্ট হাউসের পার্টিতে জ্ঞানদানন্দিনীকে নিয়ে যান।[২৩] বিষয়টি তৎকালীন দিনে যে কিরকম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল তা ১৮৬৭র 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' থেকে জানা যায়। ১৮৬৬-র ২৭শে ডিসেম্বর জাতীয় বস্ত্র পরিধান করে জ্ঞানদানন্দিনী ঐ পার্টিতে যোগ দেন। তাঁর পরিচ্ছদ 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সংবাদ পরিবেশক কর্তৃক প্রশংসিত না হলেও হিন্দু রমণীদের মধ্যে জ্ঞানদানন্দিনীই প্রথম গবর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়েছিলেন একথা ঘোষিত হয়েছে।[২৪] সত্যেন্দ্রনাথের লেখায়ও পাওয়া যাচ্ছে—'সে কি মহা ব্যাপার। শত শত ইংরাজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী—সেখানে একটি মাত্র বঙ্গবালা।'[২৫] জ্ঞানদানন্দিনীর লাটসাহেবের বাড়িতে যাওয়ার কথা এ পরিবারের অনেকেই তাঁদের স্মৃতি-কথায় লিখেছেন। মাঝে মাঝে কিছু অনৈক্য চোখে পড়ে। জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা থেকে জানা যায় সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থ থাকায় তিনি নিজে না গিয়ে সম্ভবত Lady Phear এর সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনীকে একাই পাঠিয়েছিলেন। লাট সাহেবের নাম বলেছেন 'বোধহয় লর্ড লরেন্স'। বিবিধ ভূষণে সুসজ্জিতা জ্ঞানদানন্দিনীকে দেখে অনেকেই তাঁকে ভূপালের বেগম ভেবেছিলেন একথার উল্লেখ করেছেন। কারণ তখন একমাত্র ভূপালের বেগমই বাইরে বেরোতেন। ঠাকুরগোষ্ঠীর অনেকেই এতে আহত হয়ে চলে গিয়েছিলেন—একথা জ্ঞানদা-নন্দিনী পরে শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন—কিন্তু কারও নাম বলেন নি। সত্যেন্দ্রনাথের ছেলেবেলার এক শিক্ষক পরিচয় পেয়ে আগ্রহী হয়ে জ্ঞানদা-

নন্দিনীর সংগে সেখানে কথা বলেছিলেন—একথাও জ্ঞানদানন্দিনী বলেছেন।
[দ্র. পুরাতনী—পৃ. ৩৩।]

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরগোষ্ঠীর মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাম বিশেষ করে বলেছেন—'তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্য স্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।'[২৬] সরলা দেবীর লেখায় গবর্ণমেণ্ট হাউসে পার্টির প্রসংগে জ্ঞানদানন্দিনীকে দেখে 'যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির লজ্জায় পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার' উল্লেখ আছে।[২৭] সুতরাং ঘটনাটির বর্ণনায় স্থানের ঐক্য থাকলেও কালের ঐক্য নিয়ে একটু প্রশ্ন জাগা অসম্ভব নয়। স্যার জন লরেন্স ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন।[২৮] ১৮৬৬তে ও ১৮৬৭তে দুবারই সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়েছিলেন।[২৯] কোনও বারে বিশেষ অসুস্থ থাকার জন্য জ্ঞানদানন্দিনীর অন্তরে আত্মশক্তি জাগ্রত করার উদ্দেশ্য তাঁকে পার্টিতে একা পাঠিয়ে থাকতে পারেন। তদানীন্তন এক হাইকোর্ট জজের পত্নী Lady Phear সত্যেন্দ্রনাথদের বিশেষ পরিচিত ছিলেন—সত্যেন্দ্রনাথের পত্রে তার আভাস পাওয়া যায়।[৩০] জ্ঞানদানন্দিনীর স্মৃতিকথায় বিভিন্ন স্থানে অনেকবার লাটসাহেবের বাড়িতে যোগ দেওয়ার কথা আছে যদিও তাঁর 'হাঁটু নুইয়ে Courtesy করাটা ভাল অভ্যাস হয় নি।'[৩১] সুতরাং লাট সাহেবের বাড়িতে জ্ঞানদানন্দিনীকে প্রথমে নিজে নিয়ে সংকোচ কাটিয়ে পরে একাই পাঠিয়েছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আর যতবার গেছেন সম্ভবত ততবারই পাথুরেঘাটা ঠাকুরবংশের কারো না কারো বিরাগভাজন হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবে ধীরে ধীরে 'এমন দিন এল ব্যবহারগত যেসব সংস্কারে মহর্ষির পুত্রকন্যার অগ্রণী হয়েছিলেন্ সমস্ত ঠাকুরগোষ্ঠীর শাখাপ্রশাখায় তা অনুপ্রবিষ্ট হল—অন্তঃপুরপ্রথা উঠে গেল, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার হল, সংগীতানুশীলন মেয়েদের জীবনের অংগ হল। ভেদ রয়ে গেল শুধু পূজা ও উপাসনাপদ্ধতিতে।'[৩২] স্ত্রী-স্বাধীনতার যে উদ্‌যোগ সত্যেন্দ্রনাথ নিজ পরিবারে নিয়েছিলেন তা পরবর্তীকালে দেশময় পরিব্যাপ্ত হয়েছে দেখে তাঁর 'মনস্কামনা' অনেকটা পূর্ণ হয়েছে তা নিজের মুখেই বলে তৃপ্তি পেয়েছেন।[৩৩] অসীম ধৈর্যে নানা ধিক্কারকে উপেক্ষা করে নিজের অটল বিশ্বাস স্থির হয়ে থাকার পুরস্কার তাঁর জীবনে এসেছে। পরবর্তী

চিত্র স্বর্ণকুমারী পুনরায় এঁকেছেন—'মেজদাদা আর নিজের ঘরে একঘরে নহেন—দলে পুষ্ট।' সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থলে আত্মীয়েরা গিয়েছেন। বোম্বাই অঞ্চলের—'স্ত্রী-স্বাধীনতার মুক্তবায়ু' সেবন করে তাঁদের অনেকেরই চিন্তাধারা আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের মত ছিল—'যাঁহারা স্ত্রীকে লইয়া বাহিরে যান না তাঁহাদের নিকট স্ত্রীকে বাহির না করিলে তাঁহাদের শিক্ষা হইবে কিসে? অভ্যাস পরিবর্ত্তন হইবে কেমন করিয়া?'[৩৪] তাঁর কথাও কাজের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। বোম্বাই প্রবাসে বিভিন্ন সভা সমিতি ও 'পানসুপারি'-র[৩৫] নিমন্ত্রণে বাড়ির মেয়েরা নিমন্ত্রিত না হলে তিনি সেখানে যেতেন না। স্বর্ণকুমারী দেবীর কথায়—'মেজদাদার স্বভাবে স্ত্রী-সম্মান এতই ওতঃপ্রোতভাবে বর্তমান ছিল যে. কোন ভদ্রপুরুষে স্ত্রীজাতির প্রতি অসম্মান দৃষ্টিতে চাহিতে পারে, ইহা তিনি অন্তরে ধারণা করিতেও অক্ষম ছিলেন।'[৩৬]

ছুটিতে জোড়াসাঁকোয় এসে অবগুণ্ঠনবতী ভ্রাতৃবধূদের জড়সড় ভাব ও দুরবস্থা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। সহজ সাবলীল অথচ পরিমার্জিত আচরণ ছিল সত্যেন্দ্রনাথের কাম্য। ইউরোপীয় প্রথায় যেটুকু ভাল আছে তিনি নির্দ্বিধায় তা গ্রহন করেছিলেন—ইন্দিরাদেবী 'সত্যেন্দ্র স্মৃতি'তে তা বলে গেছেন।[৩৭] ইংরেজদের ভোজনগৃহে নরনারীর মেলা। ইউরোপীয় সভ্যজগতের এই 'একত্র ভোজনরীতি' 'পারসী পরিবারে' সমাদৃত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ও রীতি যথার্থই অনুকরণযোগ্য মনে হয়েছে।

মারাঠী পরিবারে পারসী পরিবারের মতো একত্রভোজন প্রথা প্রচলিত না হলেও তাঁদের ভোজনগৃহে স্ত্রীরা যে তৎকালীন বঙ্গদেশীয়া রমণীদের মতো পর্দা অন্তরালে না থেকে বলয়ঝঙ্কৃত হস্তে অতিথিদের পরিবেশন করেছেন—এটি সত্যেন্দ্রনাথকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছে। গৃহিনীর উপস্থিতি খাদ্যসম্ভারের আয়োজনের গৌরব বৃদ্ধি করে। তুলনায় স্বদেশের গৃহিণীহীন আপ্যায়নকে শ্রীহীন বলেই তাঁর মনে হয়েছে।[৩৮]

স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য সতেজ যুক্তি প্রদর্শন করে সত্যেন্দ্রনাথ 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' পুস্তিকাটি লিখেছিলেন একথা পরিবারের অনেকেই লিখেছেন। বহু অনুসন্ধানেও পুস্তিকাটির সন্ধান না পাওয়ায় এর রচনাকাল সম্পর্কে কিছুটা সংশয় জাগে। জন স্টুয়ার্ট

মিলের Subjection of Women গ্রন্থ পাঠ করেই সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রী-স্বাধীনতা পুস্তিকা প্রণয়নে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন একথা নিজেই বলেছেন।[৩৯]

স্ত্রী-লোকের পরাধীনতা মানবসভ্যতার উন্নতির পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। মূলতঃ নারী ও পুরুষ উভয়েই সমাজে সমমর্যাদার অধিকারী। যে বশ্যতা স্ত্রী-লোকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সামাজিক মংগলের জন্য তার যে আশু প্রতিবিধান দরকার সেজন্য জন স্টুয়ার্ট মিল উপর্যুক্ত গ্রন্থের প্রথমেই বলেছেন—That the principle which regulates the existing social relations between the two sexes—the legal subordination of one sex to the other—is wrong in itself and now one of the chief hindrances to human improvement ; and that it ought to be replaced by a principle of perfect equality, admitting no power or privilege on the one side, now disability on the other.[৪০]

স্ত্রীলোকের সমাধিকার প্রসংগে মিলের সত্যেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সাধর্ম্য খুঁজে পাওয়া কষ্টকর নয়। মিল তার Subjection of women গ্রন্থে স্ত্রী-স্বাধীনতার সুফল সম্পর্কে লিখেছেন—'The Second benefit to be expected from giving to women the free choice of their employments, and opening to them the same field of occupation and the same prizes and encouragements as to other human beings, would be that of doubling the mass of mental faculties available for the higher service of humanity' (p. 525).

সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্যেও একথা প্রতিধ্বনি শোনা যায়— 'ভারতমহিলা বল, বিদ্যা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া উন্নত হইলে পুরুষেরাও যে সেই উন্নতির ফলভাগী হইবে ইহা কে না স্বীকার করিবে ?' (বোম্বাইচিত্র ; পৃ. ৮৭)।

'বোম্বাইচিত্র' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন যে স্ত্রীজাতিকে অবাধ চলাফেরার সুযোগ দিলে পুরুষকেও দায়ে পড়ে সাহসী ও শক্তিমান হতে হবে। তাঁর ভাষায়— 'আর এক দিক দিয়া দেখ, স্ত্রীরক্ষণের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমাদের বল ও সাহস দায়ে পড়িয়া হইবে কিনা ?·· স্ত্রীকে কোন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইলে যে দুর্বল সেও সবল হয়—ভীরুও অভয় হয়।' (পৃ. ৭৮-৭৯)

ইউরোপীয় সমাজে অবরোধপ্রথা না থাকলেও নারীর প্রশংসালাভের স্বাভাবিক প্রবণতাই পুরুষকে নারীর মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে সবল ও সাহসী করে তোলে। পুরুষের নৈতিক চরিত্রের উপর নারীজাতির এই পরোক্ষ প্রভাবের কথা উল্লেখ করে মিল বলেছেন—The chivalrous ideal is the came of the influence of women's sentiments on the moral cultivation of mankind...' The Subjection of Women (p. 529).

স্বর্ণকুমারী দেবীর বক্তব্যে জানা যায়—পুরুষের সংগে তুলনায় নারীজাতি যে কোন অংশেই হীন নয়—এই দৃঢ় বিশ্বাস সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। তাঁর কথায়—'মেজদাদার কাছে যদি কেহ বলিত বুদ্ধিতে পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদি কেহ বলিত—পুরুষের ন্যায় তাহাদের উচ্চশিক্ষা অনাবশ্যক, কার্যক্ষেত্রে তাহারা পুরুষে অসমকক্ষ, অমনি তিনি গরম হইয়া উঠিতেন, মেয়েদের পক্ষ লইয়া তর্কপরায়ণ হইতেন।' [শোক নৈবেদ্য]

এই সমস্ত ধারণার বিরুদ্ধে মিল তাঁর Subjection of Women গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ও তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে মতগুলিকে খণ্ডন করেছেন। ধারণা করা যায় যুক্তিবাদী মিলের চিন্তাধারায় তিনি যথার্থই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এদেশে তুলনায় ইংরেজ মহিলারা অনেক অগ্রসর হলেও তাদের পারিবারিক অধীনতা সম্পর্কে জন স্টুয়ার্ট মিল কঠোর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন সমাজের কোন অংশে সে সময়ে দাসত্ব প্রথা না থাকলেও পরিবারের স্ত্রী-অধীনতা প্রায় দাসত্বের সমপর্যায়ে। 'There remain no legal slaves, except the mistress of every house'. The Subjection of Women (p. 522.)

বোম্বাই চিত্রে সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের দেশের অন্তঃপুরপ্রথার উল্লেখ করে বলেছেন—'বলিতে কি, অন্তঃপুরপ্রথা আমার নিতান্ত অনিষ্টকারী কুপ্রথা বলিয়া মনে হয়, তাহাতে অবলাদের নিজের সুখস্বাস্থ্যের হানি, সামাজিক হানি। সমাজের অর্দ্ধাংগ অবরুদ্ধ ও বিকল হইলে অপরার্দ্ধ কিরূপে সুশিক্ষিত, সুস্থ সবল হইবে বল?' (পৃ. ৭৭)

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে এই কুপ্রথার প্রচলন ছিলনা তা সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্যকথায়' বলেছেন। নিজের অর্ধাংগিনীকে ও সন্তানের জননীকে অবরুদ্ধ করে রাখলে সমগ্র জীবনেই যে ক্রীতদাসত্বের অভিশাপ নেমে আসবে

তা পুনার বালিকা বিদ্যালয়ে 'ইটপত্তন' কালে বোম্বে গভর্ণর স্যার জেমসও তাঁর ভাষণে বলেছেন। মিলের চিন্তাধারার সংগে স্যার জেমস-এর উক্তির গভীর সাদৃশ্য আছে। উক্তিটিতে সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয়ের সমর্থন থাকায় বোম্বাইচিত্রে তা হুবহু উদ্ধৃত করেছেন—

'Put the custom of secluding your women is not sanctioned by antiquity and it is a custom which not only degrades them, but reduces them to abject slavery. You cannot degrade your wives and the mothers of your children from their rightful position in this life without degrading your race to a slavery, that is sure to act injuriously on yourselves.' (বোম্বাই চিত্র, পৃ. ৭৭)

বোম্বাইচিত্র গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন—'আমাদের অনেকের ভয় হয় স্ত্রীলোকেরা বাহিরে গেলে তাহাদের কোন বিপদ ঘটিতে পারে। ···তাহার উত্তর এ ভয় কল্পনা মাত্র,···এ মুসলমান রাজ্য নয় যে অত্যাচার-ভয়ে কুল-কামিনীদিগের গৃহরুদ্ধ রাখা আবশ্যক, ইহা ইংরাজরাজ্য, স্ত্রীলোকের সম্মাননা যাহার প্রধান ধর্ম্ম।' (পৃ. ৭৭-৭৮)। এ ভয় যে নিতান্তই অমূলক তা সত্যেন্দ্রনাথ নিজের জীবনযাত্রা দিয়ে প্রতিপন্ন করেছেন। প্রথমে যখন বোম্বাইতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আসেন তখন কত লোকে কত বিভীষিকা দেখিয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল সে 'মিথ্যা জুজুর ভয় বই আর কিছুই নয়'। এ বিষয়ে প্রাচীন শাস্ত্রবচনকেই আদর্শরূপে সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থাপিত করেছেন—

অরক্ষিতা গৃহেরুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তা সুরক্ষিতাঃ।

স্ত্রীরা আপ্তপুরুষ কর্তৃক গৃহরুদ্ধ থাকলেও অরক্ষিতা—যাঁরা আপনাদের রক্ষা করতে পারেন তারাই সুরক্ষিতা। এই আত্মরক্ষার শক্তি বাইরে বেরিয়েই উপার্জন করতে হয়।[৪১]

নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে সমাজের অমূলক ভীতি সমগ্র সমাজের ক্ষতি করছে, মানুষের সুখ ঐশ্বর্য ও জীবনের মান অবনত করছে— এবিষয়ে মিল তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে বলেছেন—'Their vain fears only substitute

other and worse evils for these which they are idly apprehensive of ...'—'The Subjection of Women'—(p. 548.)

সৌদামিনী দেবী সত্যেন্দ্রনাথের 'স্ত্রী-স্বাধীনতা'·চটি বইকে' তাঁর অল্প বয়সের রচনা উল্লেখ করেছেন [৪২] স্বর্ণকুমারী দেবী সত্যেন্দ্রনাথের 'একটি স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক পুস্তিকা' বিলাত যাত্রার পূর্বেই লিখিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন [৪৩] ঐ পুস্তিকাটি যে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নামক পুস্তিকা এবং মিলের Subjection of Women—পড়ে লেখা একথা শ্রদ্ধেয় পুলিনবিহারী সেন সত্যেন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর প্রবন্ধের পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।[৪৪] Subjection of women গ্রন্থ পাঠে প্রভাবিত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ 'স্ত্রীস্বাধীনতা' পুস্তিকাটি লিখেছিলেন একথা মেনে নিতে কোন বাধা নেই। কারণ তৎকালীন অনেক চিন্তানায়কই মিলের মতবাদে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী-স্বাধীনতা পুস্তিকাটির সন্ধান না মিললেও মোটামুটিভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে আহরণ করে সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ক চিন্তাধারার সংগে মিলের মতবাদের সাধর্ম্য ইতোপূর্বে বিশ্লেষিত হয়েছে। তবে পুস্তিকাটি 'অল্পবয়সে রচনা' বা 'বিলাত যাত্রার পূর্বেই' লিখিত একথা Subjection of Women গ্রন্থের রচনাকাল অনুসরণ করলে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। Millicent Garrett Fawcett তাঁর লিখিত ভূমিকায় মিলের Subjection of Women রচনাটি ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে রচনাটির লেখার কাজ শেষ হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। প্রসংগত ছাপার আগে রচনা পরিশোধনের জন্য বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করা মিলের স্বভাবজ ধর্ম ছিল বলে তিনি তাঁর আত্মজীবনী থেকে তথ্য প্রদান করেছেন।[৪৫] ১৮৬১তে লেখার পর রচনাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা Fawcett তারও উল্লেখ করেন নি। প্রসংগত পত্নী ও পত্নীর পূর্ববিবাহজ কন্যার কাছ থেকে মিল প্রভূত সহায়তা পেয়েছেন। এছাড়া J. Stanton Coit ও Alexander Bain উভয়েই মিলের Subjection of Women গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দ বলেই নির্দেশ করেছেন।[৪৬] ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মিল পার্লামেন্টে সদস্য থাকাকালীন স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার ও নারীসমাজের পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে বহু বিতর্কিত ভাষণ দেন।[৪৭] হানসার্ড-এ প্রকাশিত

মিলের নারীপ্রগতিমূলক পার্লামেন্টীয় বক্তৃতাগুলিও ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের আগে প্রকাশিত হয় নি। অবশ্য স্ত্রীলোকের পরাধীনতা সম্পর্কে বহুদিন থেকেই যে মিল ভাবিত ছিলেন তা পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন পত্রাবলী ও ডায়েরি থেকে আভাস পাওয়া যায়।[৪৯]

সাহিত্যসাধক চরিতকার সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জীর সর্বপ্রথমেই প্রকাশের সাল তারিখ ছাড়া 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' পুস্তিকাটিকে স্থান দিয়েছেন।[৫০] পুস্তিকাটি থেকে কোন বক্তব্য বা উদ্ধৃতি পরিবেশন করেন নি। সুতরাং পুস্তিকাটি তিনি যথার্থই দেখেছেন কিনা তার কোন প্রামাণিকতা নেই। 'Subjection of Women' পড়েই স্ত্রী-স্বাধীনতা নামে এক Pamphlet বের করেছিলুম।[৫১] তা সত্যেন্দ্রনাথ নিজের মুখে বললেও এটি যে বাল্য-কালেই লিখেছেন একথা স্পষ্ট করে কোথাও বলেননি। পূর্বোক্ত তথ্যের আশ্রয়ে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ঐ গ্রন্থপাঠের সুযোগ সত্যেন্দ্রনাথের কোন-ক্রমেই হয় নি। সে সময়ের রচনাকে অল্পবয়সের রচনা বলা চলে না। সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যকথা' গ্রন্থে 'আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী' এই উক্তির কিছু পরেই স্ত্রী-স্বাধীনতা পুস্তিকাটির কথা আলোচিত হওয়ায় সম্ভবতঃ 'অল্পবয়সের রচনা' এই ধারণার উদ্ভব হয়েছে।

প্রথমবার বিলাতযাত্রার পূর্বে অর্থাৎ ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মার্চের আগে সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁর এই 'সাধের পাঠ্য পুস্তক'[৫২] হাতে পাওয়া দুষ্কর। কারণ যতদূর জানা গেছে তখনও মিলের Subjection of Women পাণ্ডুলিপি আকারেই ছিল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়বার বিলাতে যাত্রার পূর্বে (১৮৭৮, ২০শে সেপ্টেম্বর) এই গ্রন্থ বেশ কয়েকবার পাঠ করা ও পুস্তিকা প্রণয়নের প্রচুর সময়ও সুযোগ তাঁর হাতে ছিল।

সুতরাং দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার পূর্বে লিখিত হয়েছিল বলে ধরে নিলে স্বর্ণকুমারী দেবীর বক্তব্যও যথার্থ বলে মনে করা যায়।

আবার সৌদামিনী দেবীর বক্তব্যে 'অল্পবয়সের রচনাকে' ছেলেবেলার রচনা মেনে না নিলেও—পুস্তিকাটি যৌবনেই রচিত হয়েছিল—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তৎকালীন উন্নতিশীল শিক্ষিত সমাজ মিলের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। চৌধুরী পরিবারেও আশুতোষ চৌধুরীদের জীবনে মিলের

প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর সাত-আট বছর বয়সের সময় (অর্থাৎ ১৮৭৫-৭৬ খ্রীস্টাব্দে) চৌধুরী পরিবারে বিপুল উৎসাহে মিলের চর্চা হতো একথা তিনি 'আত্মকথা'য় বলেছেন।[৫৩] সুতরাং এদেশের প্রগতিশীল সমাজে মিলের স্ত্রী-স্বাধীনতার চিন্তাধারা উনিশ শতকের সত্তরের দশকেই বেশি জোরদার হয়েছিল।

অবশ্য ঠাকুর পরিবারের আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের মধ্যে যাঁরা রক্ষণশীল ছিলেন তাঁরা পশ্চিমের স্ত্রী-স্বাধীনতাকে খুব সুনজরে দেখেন নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন সনাতনপন্থী। 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের (বিদেশের স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক) বঙ্গীয় যুবকের পত্র প্রকাশিত হলে সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বাদ প্রতিবাদের মধ্যে এর সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৪]

সত্যেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পরবর্তী কালে 'পুণ্য' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩০৫) 'জন স্টুয়ার্ট মিল ও স্ত্রী-স্বাধীনতা' প্রবন্ধে ভারতীয় আদর্শ বিরোধী বলে মিলের ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে—'ভোট দিবার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আনুষঙ্গিক ভোট সংগ্রাহক প্রভৃতির উৎপাতও আসিয়া উপস্থিত হইবেই এবং পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্ত বুঝিতেছি যে সেরূপ গোলযোগে মাতৃত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় উপস্থিত হয়।' গোঁড়া সনাতনপন্থীদের সমর্থক রূপে ক্ষিতীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের যুক্তি অনেক স্থলেই দুর্বল। সেজন্যই তাঁর সকল কথা মেনে নেওয়া যায় না।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি স্বর্ণকুমারী দেবীর সশ্রদ্ধ উক্তি দিয়েই এই প্রসঙ্গের শেষ করা যায়—'রীতিমত বিদ্যাচর্চা, শ্বশুর শাশুড়ীর নিকটও কন্যাভাব, গাড়ী করিয়া যাতায়াত, বোম্বাই ফ্যাসানে পরিচ্ছদ পরিধান—এ সকল এখন হিন্দু সমাজনীতির অঙ্গীভূত—আর এ সকলের যিনি প্রবর্তক তাঁহাকে শত বাধা একাকী এক হস্তে উৎপাটন করিতে করিতে অগ্রগামী হইতে হইয়াছে। নিজের বাড়ীর লোকে পর্যন্ত তাঁহার সহিত যোগ দিতে ভয় পাইয়াছে।… কিন্তু—স্ত্রীজাতির উন্নতিতে ইনি এমনই অটলসংকল্প ছিলেন…যে এ সাধনার জন্য তিনি কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করেন নাই, কোন অপমানেই তাঁহাকে নত করিতে পারে নাই।'[৫৫]

স্ত্রী-শিক্ষা

শিক্ষা মনের বিচারক্ষমতাকে বর্ধিত করে। সেজন্য পুরস্ত্রীরা শিক্ষিত না হলে সামাজিক কুপ্রথাগুলি কিছুতেই দূর হবে না এই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের মত। আপন পরিবারে প্রাচীন কুলাচারকে বাঁচিয়ে রাখতে মেয়েদেরই ভূমিকা অগ্রণী। সরলা দেবীও বলেছেন—'বাড়ির মেয়েরা বিগড়লে বা বিমুখ হলে কুলাচার টেঁকেনা।'[৫৬] সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবে আচারগুলির মূল্য নিরূপিত হয় বলেই তা পালনে মেয়েদের নিষ্ঠার অন্ত নেই—এর ভালমন্দ বিচারে এরা সম্পূর্ণ অন্ধ। শিক্ষার ফলে এই চিরাচরিত আচারগুলির ভাল-মন্দের বিচারক্ষমতা স্ত্রীদের অন্তঃকরণে জাগ্রত হয়ে নবভাবে পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। সেজন্য সত্যেন্দ্রনাথের মতে—'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ' এই প্রাচীন আদর্শ সকল পিতামাতারই গ্রহণ করা উচিত। বিশেষতঃ মাতৃত্বই যে সমাজের মুখ্য লক্ষ্য সেখানেও জননীর মধ্যে শিক্ষার অভাব থাকলে সন্তানের পরিচর্যা ও মানসিক গঠনে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। মাতৃভাষার সংগে সংগে দেশের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির সংগে পরিচিত হবার জন্য কিছু সংস্কৃত শিক্ষা ও বিদেশের রীতিনীতির সংগে পরিচিত হবার জন্য কিছু ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সত্যেন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে মেয়েদের শিক্ষার চিরাচরিত প্রথা ছিল বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রীর কাছে, কলার পাতায় প্রাথমিক বাংলা লেখা; রামায়ণ পাঠ ও কিছু সংস্কৃত চর্চা। খড়দহের গোস্বামীদের কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়েই এই বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রীরা গোস্বামীদের ধনী শিষ্যসম্প্রদায়ের গৃহে কন্যাদের শিক্ষার ভার নিতেন।[৫৭] এঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সেকালের পক্ষে যে উত্তমই ছিল সুন্দর হস্তাক্ষরে বৈষ্ণবী লিখিত সংস্কৃত স্তবের বঙ্গানুবাদে তার নিদর্শন রয়েছে।[৫৮]

পারিবারিক আচার ও ধর্মসংস্কারের সংগে সংগে যুগোপযোগী মেয়েদের শিক্ষাসংস্কারেও দেবেন্দ্রনাথ মনোযোগ দিয়েছিলেন।

বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত[৫৯] হবার কিছু পরেই দেবেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে—এর ফল কি হয়—তা দেখতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন।[৬০] সৌদামিনী দেবী লিখেছেন—'পিতৃদেব আমাকে এবং

আমার খুড়তত ভগিনীকে সেখানে পাঠাইয়া দেন' (পিতৃস্মৃতি)। সত্যেন্দ্র-নাথ বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের গৃহশিক্ষায় নানা পরিবর্তন সূচিত হয়। কেশব সেনের বাড়িতে মিশনারি মেয়েরা শিক্ষা দিতে আসতেন। তারই অনুসরণে দেবেন্দ্রনাথ অন্তঃপুরে বাঙালী খ্রীস্টান শিক্ষয়িত্রী ও সপ্তাহে একদিন বাইবেল পড়ানোর জন্য মেম নিযুক্ত করেছিলেন।[৬১]

কিছুদিন এ প্রথা চলার পর—এদেশীয় খ্রীস্টান শিক্ষয়িত্রীর কাজ ও দেবেন্দ্রনাথের মনঃপূত হয় নি। অবশেষে মেয়েদের শিক্ষার জন্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়কেই নিযুক্ত করেছিলেন। অন্তঃপুরে অনাত্মীয় পুরুষের প্রবেশ নিষেধ হলেও শিক্ষার উদ্দেশ্যে আদিব্রাহ্মসমাজের এই প্রবীণ আচার্যকে সকলেই সানন্দে বরণ করেছিলেন। মেয়েদের শিক্ষা সংস্কারে দেবেন্দ্রনাথের নূতন চিন্তা তরুণ সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও উৎসাহে কার্যকরী হয়েছিল। বাড়ির মেয়েদের শিক্ষা ও সংগীতচর্চা যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে হেমেন্দ্রনাথ দৃষ্টি দেওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। মেয়েদের—ও বধূদের ইংরেজি শেখাবার ভার ও ইনি সাগ্রহে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কর্মজীবনে পত্নী ও কন্যার শিক্ষার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ যে পথ গ্রহণ করেছিলেন তা অন্যান্য সিভিলিয়ান ও ব্যারিস্টারদের পথ থেকে কিছুটা পৃথক্। তিনি এঁদের পুরোপুরি মেমসাহেব করতে চান নি তবে বিচিত্র জাতির সংস্পর্শে বাইরের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে এঁদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রায় একটি স্বচ্ছন্দ প্রবাহ রচিত হোক—সেদিকে দৃষ্টি রেখেছেন। শিক্ষার সর্বাঙ্গীন সুফল লাভ করতে হলে গৃহের বাইরেও চর্চার ক্ষেত্রের প্রয়োজন। সেজন্য সরলাদেবীর মহীশূরের বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদেওয়া সত্যেন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে অনুমোদন করেছিলেন। অভিভাবকরূপে সগর্বে ও সানন্দে সরলাদেবীকে সেতারা থেকে মহীশূর পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে এসেছিলেন। এর দ্বারা ধনী মহর্ষি পরিবারে কোন অগৌরব সাধিত হচ্ছে বলে সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন নি।[৬২] সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ঠাকুর পরিবারে মেয়েদের বাইরে বেরোনোটা তখন রপ্ত হয়ে এসেছে। গাড়ি করে সুবেশে সুসজ্জিত হয়ে বাইরে যাবার ফলে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যতই 'ধিক্কার' আসুক না কেন সব কিছুকে উড়িয়ে দেবার মতো মনোবল সরলাদেবীর মা-মাসীরাই সত্যেন্দ্র-নাথের কাছ থেকে লাভ করেছেন।[৬৩] কিন্তু এই পরিবারের মেয়েদের বাইরে

চাকরী করা তখনও ধারণাতীত ছিল। যদিও সরলাদেবী খুব বেশিদিন বাইরে কাজ করেন নি তথাপি স্ত্রীলোকের স্বাবলম্বী হওয়ার পথে শিক্ষা যে একটি বড় সহায়—এই ভাবটি তাঁর মাধ্যমে পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার ফলেই নারীর পরনির্ভরতা দূর হয়—স্বাধীন ক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক-সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়। সেজন্যই এদেশের নারীজাতির কল্যাণে পথ দেখাবার জন্যে আরও কয়েকজন বন্ধুর সংগে সত্যেন্দ্রনাথ মেরী কার্পেন্টারকে এদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের জীবনকথায় মেরী কার্পেন্টারের কথা পৃথক ভাবে আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধিতে পরিমার্জিতা, অতিথি আপ্যায়ণে তৎপরা, শিল্প ও সংগীতে উৎসাহী, গৃহ জীবনে শৃংখলা বিধানে মনোযোগী, স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্পর্কে অবহিতা, সর্বোপরি ন্যায়পথে স্বামীকে পরিচালনে যিনি সমর্থা—তিনিই আদর্শ স্ত্রী। শৈশবেই কন্যার শিক্ষায় তার উপযুক্ত পরিবেশ পিতামাতাকে রচনা করে দিতে হবে। এদেশে জাতে উঠবার এক প্রবল আকাংক্ষা বলবৎ হওয়ায় কন্যার শিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা—অধিকন্তু বালিকা কন্যার উপর নানা অবিচার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। ব্যথিত হৃদয়ে সত্যেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে কন্যার পিতাদের উদার মনোভাব জাগাতে চেয়েছেন।

বাল্যবিবাহ প্রথা রোধ ও কোর্টসিপ বিবাহ প্রসঙ্গে

বাল্যবিবাহকে সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃত অর্থে 'বিবাহ' বলেই স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে এ প্রথা 'কন্যাদান'। তাঁর নিজের জীবনেও এর ব্যতিক্রম হয় নি—জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত পত্রে তা জানা যায়।[৬৪] ঐ পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বালিকা স্ত্রীকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিয়ে যথার্থ সহধর্মিণী করে তোলার প্রস্তাব পিতার নিকট খোলাখুলি ভাবে দিয়েছিলেন—সেটাও জানা যায়।[৬৫]

সত্যেন্দ্রনাথের মতে—ভারতের সর্বত্র এই বাল্যবিবাহের 'গরলময় কুফল' প্রত্যক্ষ করা যায়। গভীর ক্ষোভের সংগে তিনি বলেছেন—'কন্যাকে অত ছোট বয়সে পিতামাতা গৃহ থেকে বিদায় করে যে কি স্বর্গসুখ লাভ করেন, তা আমি ভেবে পাই না। (আমার বোম্বাইপ্রবাস পৃ. ২৩৯।) বাল্য-বিবাহকে 'পুতুল বিয়ের' সমতুল্যই তিনি মনে করেছেন। তিনি আরও বলেছেন—'একজন পাইকওয়াড়' 'তাঁর সভাসজ্জন নিমন্ত্রণ করে' মহা ধুমধামে

পায়রার বিবাহ দিতে বড় ভালবাসতেন। এদেশের বালক বালিকার বিবাহ অনেকটা সেইরূপ'। [আমার বোম্বাইপ্রবাস ; পৃ. ২৩৯।]

অপরিণত অবস্থায় একত্রে বাসের ফলে যে হৃদয়ের মিলন গড়ে ওঠে তা মেনে নিয়েও এক্ষেত্রে যে অনর্থের ভাগটাই প্রকট হয়ে ওঠে দীর্ঘ তালিকা সহ তিনি তা উপস্থাপিত করেছেন—'বালিকা প্রসূতি—স্কুলের ছাত্রের উপর বৃহৎ পরিবার পোষণের ভার—নিবীর্য্য রুগ্ন সন্তানসন্ততি, শিক্ষার ব্যাঘাত, দারিদ্র্য, অকালজন্ম, অকালমরণ, অকালপক্কতা, অকাল জীর্ণদশা এই সকল অনিষ্ট কাহার চ'খে আংগুল দিয়া দেখাইয়া দিবার আবশ্যক করে না।' [বোম্বাইচিত্র পৃ. ৮৩-৮৪।]

তৎকালীন দিনে বহু সজ্জন ব্যক্তি বাল্যবিবাহের ঘোর সমর্থক ছিলেন। সেসময়ে 'ভারতী' পত্রিকায় রসিকবাবু বাল্যবিবাহের সপক্ষে যে সকল যুক্তি পরিবেশন করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন তা—'ব্রীফ লইয়া ব্যারিস্টারের মত একপক্ষে কথা' বলার মতো। প্রকৃতপক্ষে দু দিকের ভালমন্দ যাচাই না করে এমন একতরফা মতবাদে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন—কন্যার স্বাস্থ্যরক্ষায়, চিকিৎসকদের নির্দেশিত এদেশের উপযোগী বিবাহের বয়স সকল পিতারই মেনে নেওয়া উচিত। ১৬ জন ডাক্তারদের মধ্যে দুদলের[৬৬] মত মিলিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—'পুরুষের ধর ১৮ বৎসর মেয়েদের ১৫ বৎসরের নীচে বিবাহ নিষেধ এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া কি নিতান্ত অন্যায় ?' [বোম্বাইচিত্র পৃ. ৮৫।]

বিশেষতঃ অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের হিতাহিতের জন্য আইনের দ্বারা বিবাহের একটি বয়স নির্দিষ্ট করা সত্যেন্দ্রনাথ যথার্থই সমীচীন বলে মনে করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা শুধুমাত্র ব্রাহ্মদের উন্নতিবিধানেই নিয়োজিত থাকে নি। ভারতের নানা স্থানে বালিকাকন্যার উপর নানা বর্বরোচিত কার্যকলাপ দেখেই তিনি আইনের সাহায্যে বিবাহের বয়সসীমা বেঁধে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রসংগত এর বহু বছর পরে সারদা-আইনে তা রূপায়িত হয়।[৬৭]

ধর্মের নামে দেশাচারের আবিলতায় সমাজজীবন যখন পঙ্কিল হয়ে ওঠে তখন এক্ষেত্রে আইনের দ্বারাই কিছুটা সমাধান সম্ভব বলে সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেছেন। কন্যাধর্ম প্রাপ্ত হবার পূর্বেই কন্যাকে বিবাহ দিতে হবে—না হলে

জাতি কুল মান সব বিসর্জিত হবে—এই দেশাচারে সমাজে বহু বিকারের সৃষ্টি হয়েছে। বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশুকন্যার বিবাহের নামে যে সকল ছলচাতুরী অনুষ্ঠিত হয় তা কন্যার জীবনবিকাশের অন্তরায় হয়ে ওঠে। বিবাহের নামে এ ধরণের অমানবিক আচরণকে সত্যেন্দ্রনাথ কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নিতে পারেন নি।

সেজ বিধি ও বাহুবর বিবাহ

মন্দিরের দেবদাসীধর্মে দীক্ষা দেওয়ার আগে বালিকা কন্যাকে নিয়ে, যে 'সেজবিধি' অনুষ্ঠিত হয় তা সত্যেন্দ্রনাথের মতে—'বিবাহের ভড়ং মাত্র'। 'বরের ঠিকানায় একটি খড়্গ রেখে তার উপর ফুলের মালা সাজিয়ে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে এবং বালিকা তাকে পতিত্বে বরণ করে'। সে অবধি মন্দিরের সেবায় ও 'নায়িকা' বৃত্তিতে বালিকার জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ কারওয়ারে থাকাকালীন এধরণের মকদ্দমার বিচার করেছেন। আসামীর বক্তব্য ছিল চিরন্তন কুলধর্মে কন্যাকে দীক্ষিত করাতে দোষ কি?' দেশাচার যাই থাক না কেন—বালিকার জীবনরক্ষায় আইনের সাহায্যে দণ্ডবিধান করা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বাহুবর বিবাহ

গুজরাটের কড়ুয়া কণবীদের[৬৮] 'বাহুবর বিবাহ' এমনি আর এক ছল বিবাহ। বারো বছর অন্তর এদের বিবাহের লগ্ন আসে। দুগ্ধপোষ্য কন্যা থেকে অবিবাহিতা যুবতী পর্যন্ত সকলেরই বিবাহ এই লগ্নে সমাধা করতে হয় কারণ তা না হলে আরও বারো বছর অপেক্ষা করতে হবে। তাই টাকা দিয়ে কোন পুরুষকে বিয়ের পর কোন দাবি থাকবে না এই অংগীকার করিয়েই বিবাহ-কার্য সমাধা হয়। সুতরাং বিবাহের পর বর স্বগৃহে একা যাত্রা করে। যেমন-'ছল-বিবাহ' তেমনি 'ছল-বৈধব্য'। বর স্বগৃহে চলে যাবার পরেই কন্যা হাতের চুড়ি খুলে ফেলে পিতৃগৃহে কিছুদিন বিধবার সাজে থাকে। পরে এই কন্যার আবার 'নাত্রা' বা পুনর্বিবাহ হতে বাধা নেই। বাহুবর পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেলে পুষ্পরাশির সংগে হলেও ঐ লগ্নে বিবাহ হতে হবে ও পরে ছলবৈধব্য ধারণ করে কন্যার 'নাত্রা'র জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে বিবাহের নামে একে মিথ্যাচার বলাই ভাল। অপেক্ষাকৃত নীচকুলের কণবীদের মধ্যে পাত্রসংগ্রহে অর্থব্যয়ের পরিমাণ কিছু কম হওয়াতে ও নাত্রা বা পুনর্বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় কন্যাকে চিরজীবন ছলবৈধব্য নিয়ে থাকতে হয় না। কিন্তু উচ্চকুলের কণবীগণ[৬৯] নীচকুলের সংগে কন্যার বিবাহ স্থির করা অপমানজনক মনে করেন। বাংলাদেশের কৌলীন্যপ্রথার মতো বৃদ্ধ কুলীন পাত্রের হাতে শিশুকন্যাকে সানন্দে তুলে দিয়ে পিতামাতা গৌরব অনুভব করেন। বাংলার কৌলীন্যপ্রথার চেয়েও আরও ভয়ংকর প্রথা কুলাভিমানী নির্ধন কণবী ও রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উচ্চকুলের পাত্র সংগ্রহে যেখানে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন—অথচ হাতে অর্থ নেই কিন্তু বংশের গরিমায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন, সেখানে নিষ্ঠুর 'দুধপীতী'[৭০] প্রথার মাধ্যমে সূতিকাগৃহেই কন্যার জীবনদীপ নির্বাপিত করা হতো। ইংরেজ সরকার দৃঢ় শাসনের দ্বারা সতীদাহের মতো এই নিষ্ঠুর প্রথার বিলুপ্তি ঘটাতে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টিত হয়েছেন।[৭১] ইংরাজ সরকারের প্রতি সেজন্য সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয়ের প্রশস্তি নিবেদিত হয়েছে।

বালিকাহরণ

বোম্বাই অঞ্চলে জজিয়তি কাজের সংগে যুক্ত থাকার ফলে সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে বহু বালিকাহরণের মামলার সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই পণের অধিক লোভ অভিভাবককে বিপথে পরিচালিত করে বিপত্তি ডেকে এনেছে।

সুতরাং উপর্যুক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন—বালিকাবিবাহ প্রকৃত অর্থে 'বিবাহ'ই নয়। অভিভাবকদের কাছে সত্যেন্দ্রনাথ এই নিবেদন করেছেন—'আমি বলি নিদান এতটুকু বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত যে বয়সে দম্পতী আপনারা জানিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে পারে—আপনাদের ইচ্ছানিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে'। (বোম্বাইচিত্র পৃ. ৯২।) মালাবারি নামে এক পারসী লেখক 'বাল্যবিবাহ ও বলাৎকার বৈধব্য' (বোম্বাই চিত্র; পৃ. ৮৪।) বিষয়ে এক পুস্তিকায় বলেছেন—বাল্যবিবাহ রোধ করার উপায়—য়ুনিভারসিটিতে ও চাকরীর ক্ষেত্রে বেছে বেছে অবিবাহিতদের সুযোগ দেওয়া। তাহলে শীঘ্র বিবাহ করার নেশা টুটে যাবে। সত্যেন্দ্র-

নাথ তাঁর এই মত গ্রহণ করতে পারেন নি কারণ যারা আগেই বিবাহিত তাদের কাছে বিদ্যার দ্বার ও অর্থাগমের দ্বার রুদ্ধ হলে এরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মারা যাবে। তার চেয়ে এদেশের সকল শিক্ষিতেরা যদি দলবদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে চিকিৎসকদের নির্দেশিত বয়স না আসা পর্যন্ত কেউ বিবাহ করবেন না তাহলেই স্থায়ী ফলের আশা করা যেতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই প্রবাস গ্রন্থে বিশেষ করে ছাত্রদের ও গৃহকর্তাদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন—'গৃহকর্ত্তারা এবিষয়ে মনোযোগ করুন, বিশেষতঃ আমাদের ছাত্রবৃন্দ সচেষ্ট হোন, তাঁদের উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা।' [পৃ. ২৪২।]

সত্যেন্দ্রনাথের মতে—'স্বাধীন ইচ্ছাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব'[৭২] 'আমাদের সমাজে বিবাহের স্বাধীন ক্ষেত্র নাই—স্ত্রী-পুরুষের স্বয়ম্প্রণয়ের (court-ship) সুবিধা নাই—বাপ মায়ের ঘটকালী ব্যতীত চলে না'। কিন্তু তাই বলে পাত্রপাত্রীর নিজস্ব মতামতের কোন প্রয়োজন নেই একথা সত্যেন্দ্রনাথ কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। পারিবারিক খাতায় তিনি স্পষ্টত কোর্টসীপ বিবাহের পক্ষে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য এজন্য তাঁকে অনেক অনুযোগ শুনতে হয়েছে।—'এই দুই প্রথার মধ্যে কোনটী প্রার্থনীয় ? আমার মতে "কোর্টসীপ" বিবাহ। বিবাহ কি না—স্ত্রীপুরুষের মধ্যে চিরজীবনের বন্ধন—সেটা পরের হাতে দিয়ে কি কোনমতে তৃপ্ত থাকা যায়। পুরুষের যদি কোন জিনিস বাছিয়া লইবার থাকে সে তার মনোমত স্ত্রী। স্ত্রীর যদি কোন জিনিস বরণ করিবার থাকে সে তার মনোমত পতি।'[৭৩] বিশেষত এই ধরণের বিবাহে যদি কোন অমিল অসুখের কারণ ও উপস্থিত হয়' তবে পাত্র পাত্রী নিজেরাই দায়ী করে, 'মা বাবার ঘাড়ে দোষ চাপাবার যো থাকে না'।

পুত্রকন্যার বিবাহে মা বাবার কোন অধিকার নেই যা তাঁদের মতামত দেবার ক্ষমতা নেই একথা যেমন সত্যেন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি— তেমনি সন্তানের স্বাধীন মত গঠিত হওয়ার আগেই পিতামাতার পক্ষে তাদের বিবাহ দেওয়া অন্যায় বলেই তিনি মনে করেছেন। কন্যার স্বাধীন ইচ্ছার উপর সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে প্রথা কন্যার প্রতি একেবারেই লক্ষ্য করে না—তা কখনও 'হিতাবহ হতে পারে না।' কঠোর ভাষায় পিতামাতাদের

দৃষ্টি ফেরাতে তিনি আরও বলেন—'কন্যার উপর পিতামাতার যতই অধিকার থাক না কেন তবুও দেখতে হবে যে সে স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব—ঘটী বাটীর মত ব্যবহারের জিনিস নয়।' [পৃ. ২৪১]

এতক্ষণ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের পরিবেশিত বিবিধ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বাল্য বিবাহের কুফল আলোচিত হলো। কোর্টসীপ বিবাহের পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথের আন্তরিক সমর্থন থাকলেও—'জাতিভেদ প্রথা এরূপ বিবাহের মূলে যে কুঠারাঘাত করছে' এ সম্পর্কেও তিনি ভাবিত হয়েছেন। পুত্রকন্যার এই স্বাধীন ইচ্ছাদানকে সে সময় অনেকেই সমর্থন করতে পারেন নি।[৭৪] সর্বশেষে সমাজপতিদের চৈতন্যোদ্রেক করতে সত্যেন্দ্রনাথ বিবাহের যে দুটি মূলতত্ত্বের উল্লেখ করেছেন তাই দিয়েই আলোচ্য অংশের উপসংহার টানা যায়— 'প্রথম এই যে—স্ত্রী-পুরুষের যোগ্য বয়সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করা—দ্বিতীয় স্ত্রী-পুত্র ভরণপোষণে সমর্থ বুঝে দারপরিগ্রহ করা।'[৭৫]

চিরবৈধব্য প্রথার বিলোপ

বাল্যবিবাহের মতো চিরবৈধব্য প্রথা হিন্দুসমাজের কলঙ্কস্বরূপ বলে সত্যেন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন। সামাজিক অনুশাসনকারীদের প্রতি তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—'আমার মতে সামাজিক অনুশাসনে বিধবাবিবাহ বন্ধ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়; অপ্রাপ্তবয়স্কের কথা ছেড়ে দিলে, বিবাহবিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীন অধিকার সমান থাকা উচিত।'[৭৬] বহুদারগ্রস্ত যে সকল পুরুষেরা বিধবার ব্রহ্মচর্যের বিধান দিয়ে থাকেন এঁদের প্রতি তীব্র ঘৃণায় সত্যেন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করে বলেছেন—'পুরুষেরা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনের উচ্চ উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু কিন্তু আপনাদের বেলায় কি করেন? বহুদারগ্রস্ত বিলাসীর মুখে সতীত্ব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা যেরূপ বিসংগত, তাঁদের উপদেশও কতকটা সেইরূপ। উপদেষ্টাগণ বিধবার ব্রহ্মচর্য্য যতই সমর্থন করুন না কেন, তাঁরা যখন নিজেদের বেলায় মৃতপত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সংগে সংগে নববধূর পরিণয়ে একটুও ইতস্তত: করেন না, তখন তাঁদের কথার মূল্য কি? স্ত্রী-পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যে কি বিধাতা নির্দিষ্ট এতই প্রভেদ?'[৭৭]

ব্রহ্মচারিণী বিধবা স্ত্রীদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েও প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে জোরজবরদস্তি করে এই ব্রহ্মচর্য চাপানোর ফলে অনেক

ক্ষেত্রে যে সমাজে অনর্থেরই সৃষ্টি হয় সেদিকে তিনি অবহিত করে বলেছেন—'বিধবা স্ত্রীদের মধ্যে ব্রহ্মচারিণী আদর্শ-সতী অনেকে আছেন স্বীকার করি, তাই বলে বিধবার উপর জোরজবরদস্তী করে ব্রহ্মচর্য চাপানো—এটা কি ঠিক? প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষতাচরণে কি সুফল প্রত্যাশা করা যায়? এ থেকে আমাদের সমাজে যে ভ্রূণহত্যাদি কুফল ফলছে, হে ভণ্ডতপস্বি, তা কি তুমি দেখেও দেখবে না? একবার ভেবে দেখ, বালবিধবার চিরবৈধব্য কি মমতাহীন নিষ্ঠুর বিধান।'[৭৮]

বোম্বাই অঞ্চলের হিন্দু সমাজের কোন কোন অংশে চিরবৈধব্য ব্রত পালিত না হলেও ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণদের দৃষ্টান্তপ্রভাবিত সমাজে এই প্রথা অতি কঠোর ভাবেই যে পালিত হতো, তা সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই দেখেছেন। বৈধব্য-প্রথার আনুষঙ্গিক নিয়ম 'মস্তকমুণ্ডন'কে সত্যেন্দ্রনাথ এক চরম অমানবিক নির্মম প্রথা বলে ধিক্কার দিয়েছেন। বঙ্গদেশীয় বিধবাগণের ক্ষেত্রে উপবাস, এক সন্ধ্যা আহার, অলংকারপরিহার ইত্যাদি নিয়ম পালনের নির্দেশ থাকলেও মস্তকমুণ্ডনের কড়াকড়ি নিয়ম এখানে ততটা পালিত না হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ গভীর স্বস্তি লাভ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—'ভবিষ্যতে বিধবা স্ত্রীর যে সকল জ্বালাযন্ত্রণা অদৃষ্টে আছে, পতিবিয়োগের পরক্ষণেই নাপিতের হাতে কেশচ্ছেদন তাহার পূর্বাভাস।' (বোম্বাইচিত্র; পৃ. ৮২।) যে সকল পুরুষের হাতে এ নিষ্ঠুর প্রথা রচিত হয়েছিল তারা স্ত্রীলোকের মর্মবেদনার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন বলেই সত্যেন্দ্রনাথ মস্তকমুণ্ডন প্রসঙ্গে বলেছেন—'স্ত্রীলোকের পক্ষে এ যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা তাহা আমরা সহজে কল্পনা করিতে পারি না। আমার বিবেচনায় এ অপেক্ষা সহমরণ অনেকগুণে ভাল ছিল, মুহূর্তের মধ্যে সতীর সকল কষ্টের অবসান হইত।'[৭৯] স্ত্রীলোককে বীভৎস করে তুলে তার সতীত্ব অটুট রাখবার প্রচেষ্টা থেকেই যে এই নির্মম প্রথার সৃষ্টি হয়েছে সেজন্য শ্লেষের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—'স্ত্রীলোকের যা অমূল্য আভরণ…সেইটী হরণ করিতে পারিলেই নির্ভীক হওয়া গেল…আর তাহার সতীত্বের প্রতি আঘাতের কোন শংকা রহিল না।'[৮০] পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও এই নির্মম প্রথাকে মেনে নিতে দেখে সমাজ সংস্কার বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ হতাশা অনুভব করেছেন;[৮১] কারণ আমাদের সমাজে 'নৈসর্গিক নিজ-বলে' কোন পরিবর্তন

হওয়ার উপায় নেই—একমাত্র বাইরের সংস্রবেই পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন যাতে স্ত্রীলোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কার্য করা না হয়,—'তাঁদের সম্মতি প্রকাশের কোন উপায় নির্দিষ্ট হয়, সমাজ-সংস্কারকদের তাহা বিবেচ্য'।[৮২] মহাদেব গোবিন্দ রানাডে এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে রাজবিধি প্রয়োগ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বৈধব্য প্রথা প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের মতবাদ উল্লেখের পর এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বৈধব্যপ্রথাকে সামাজিক অনুশাসনে বেঁধে না দিয়ে পুরুষের মতো নারীর ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর এই প্রথার ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন। বিশেষতঃ বালবিধবার ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহ ছাড়া তিনি কোন গত্যন্তর দেখতে পান নি।

বহুবিবাহ প্রথার বিলোপ

বহুবিবাহ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোরজীবনে বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করেছেন—'আমার বেশ মনে পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিষয় নিয়ে কত আন্দোলন করতেন, পারিবারিক শান্তিহর এই অনর্থকর প্রথা উচ্ছেদের কত উপায় চিন্তা করতেন, বলতেন যে বহুবিবাহনিবারণী রাজবিধি প্রচলন ভিন্ন এ রোগের ঔষধ নেই"।[৮৩] বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠিত করার জন্যই ঠাকুরবাড়িতে গণেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় 'নবনাটক' অভিনীত হয়। এজন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল ও রামনারায়ণ তর্করত্নকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।[৮৪] গণেন্দ্রনাথই যে নাটকটি লিখিয়েছিলেন তা 'জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা' থেকেও জানা যায়।[৮৫] দূরে থাকার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ নাটকে অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও অভিনয়ের পূর্বেই কর্মস্থল থেকে সত্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাব অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী ভ্রাতা ও ভগ্নীপতিদের মধ্যে নূতন প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। বিশেষতঃ একপত্নীত্বের আদর্শ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের দৃঢ় মনোভাবের সঙ্গে উদ্যোক্তা গণেন্দ্রনাথের হৃদয় এক সুরে বাঁধা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ জীবনের প্রান্তসীমায় 'আমার বাল্যকথা' লিখিবার সময়েও এই নাটকটির কথা ভুলে যান নি।[৮৬] ধীরে ধীরে আইন ছাড়াই অর্থনৈতিক চাপে শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্রের দিকেই পিতামাতারা আকৃষ্ট হয়েছেন। এটি লক্ষ্য করে জীবনের শেষ বেলায় আশান্বিত হয়ে

সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—'এই অল্পকালের মধ্যে আমরা কি দেখছি ? দেখছি যে বিনা আইনে বহুদারব্যবসায়ী কুলীনদের অন্ন মারা গিয়েছে—বহুবিবাহ প্রথা আপনার ভারে আপনি চাপা প'ড়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে।' (পৃ. ২৪৬, আমার বোম্বাই প্রবাস)

জাতিভেদ প্রথার অবসান

সত্যেন্দ্রনাথের মতে 'বিবাহ ও ভোজনবিচার হিন্দুয়ানীর এই দুই দুর্গপাল'। পৃথক ভোজনপ্রথা যে জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ দৃঢ় মত পোষণ করতেন। একত্রে পানভোজনের মাধ্যমেই এক অন্যের হৃদয়ের দ্বার প্রসারিত হয়—মানুষ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাই একত্রে ভোজন শুধু দেশীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে তিনি তৃপ্তি পান নি—আন্তর্জাতিক ভোজনপ্রথার পক্ষপাতী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ সমাজ সংস্কারে বিপ্লবাত্মক পথকে বেছে না নিয়ে কুপ্রথাবর্জনে আপন পারিবারিক জীবনেই যে দৃষ্টান্ত স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন তা স্ত্রী-স্বাধীনতার ক্ষেত্রেই উল্লিখিত হয়েছে। জাতিভেদ প্রথা বর্জনেও এর অন্যথা হয় নি। কর্মস্থলে যোগদেবার সংগে সংগেই মোতি নামে এক মুসলমান পাচক তাঁর গৃহে নিযুক্ত হয়। এছাড়াও দিনু মহম্মদ বলে আর একটি গৃহভৃত্যের উল্লেখ জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রে পাওয়া যায়। (31 May, 1866 ; পুরাতনী ১০নং পত্র)।

সিন্ধু-হাইদ্রাবাদের ব্রাহ্মসমাজের নেতা নবলরাও আড়বাণীর প্রেরণায় কয়েকজন উৎসাহী যুবক যখন সম্মিলিত আহারে সত্যেন্দ্রনাথকে আহ্বান জানিয়েছিলেন—তখন তিনি সানন্দে তাতে যোগ দিয়েছিলেন। তবে এজন্য প্রকাশ্যে কোন উচ্ছৃংখল কার্যকলাপ ধীরচিত্ত সত্যেন্দ্রনাথের রুচিবিরুদ্ধ ছিল।

জাতিভেদ প্রথা আমাদের জাতীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করলেও এই প্রথা আমাদের সমাজে এতই বদ্ধমূল যে—'সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভের আশা' দুরাশা মাত্র বলে সত্যেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন। সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় সত্যেন্দ্রনাথ ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরংগের ভ্রাতা দাদোবা পাণ্ডুরংগের সংগে ইয়ং বেংগল দলের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিল দেখতে পেয়েছেন।

কলকাতার ইয়ং বেংগল দলের কয়েকজন, ভক্তবৈষ্ণবের গৃহ-প্রাংগনে গোমাংস নিক্ষেপ করে যেমন বিপত্তি ডেকে এনেছিল, তেমনি অতি উচ্ছ্বাস বশতঃ দাদোবা পাণ্ডুরংগ-প্রতিষ্ঠিত পরমহংস সভার কয়েকজন সভ্যও কেল্লার দোকান থেকে রুটি নিয়ে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে উল্লাস সহ বাড়ী ফিরে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। দাদোবা পাণ্ডুরংগের প্রবল উৎসাহ ও রামবালকৃষ্ণ প্রমুখ সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় বোম্বাই পরমহংস সভার প্রচার মফঃস্বলে অনুষ্ঠিত হলেও এর ভিত্তিভূমি দুর্বল থাকায় জাতিভেদ উন্মূলনে ব্যাপক ও স্থায়ী ফল লাভ করা এঁদের ভাগ্যে ঘটে নি। সত্যেন্দ্রনাথের মতে—'জনসমাজে গভীর নিখাত কোন কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে প্রথমে লোকের মন নবমার্গে চলিবার জন্য প্রস্তুত করা আবশ্যক'। নবমার্গে চলার প্রস্তুতি হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ কতকগুলি উপায়ও নির্ধারণ করেছেন।—'ধর্মোৎকর্ষ সাধন—বিদ্যালোক প্রকাশ—স্ত্রীশিক্ষাদান, গার্হস্থ্যপ্রণালী সংশোধন ইত্যাদি উপায়ে সামাজিক উন্নতি সাধন কর, জনসমাজে সভ্যতা বিস্তার কর, জাতিভেদ বন্ধন আপনা আপনি শিথিল হইয়া আসিবে।' (পৃ. ১৩৬, বোম্বাই চিত্র।)

কলকাতার মতো সমাজসংস্কার বিষয়ে বোম্বাই অঞ্চলেও দ্বিমত ছিল। একদলের মত ছিল 'জোর জবরদস্তি করে জাতিবন্ধন ভেংগে ফেল'। অন্যদল শান্ত ও দূরদর্শী। তাঁদের মতে জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি সাধন করে সোপান করতে পারলেই ধীরে ধীরে জীর্ণ আচার খসে পড়বে, তার স্থানে নূতন ভিত্তি রচিত হবে। 'বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত' করলে বৃক্ষ আপনিই 'ভূমিসাৎ হবে'। বালগংগাধর শাস্ত্রী ছিলেন শেষোক্ত দলের লোক। দাদোবা পাণ্ডুরংগ যে নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন বালশাস্ত্রী ছিলেন তারই প্রতিষ্ঠাতা। বালশাস্ত্রীর পথকেই সত্যেন্দ্রনাথ জাতিভেদ প্রথা নিরসনের আদর্শ পথ বলে মনে করেছেন। ধর্মভিত্তির উপরে তাঁর সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার সংগে সত্যেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের চিন্তাধারার সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। বহু সাবধানে পদক্ষেপ করার পরেও বালশাস্ত্রী গোঁড়া হিন্দুদের কটাক্ষ এড়াতে পারেন নি ; 'জাতিতে কহ্রাড় ব্রাহ্মণ হলেও ব্রাহ্মণেরা তাঁকে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী' বলেই ঘৃণা করতেন। তার কারণ জাতির অনুরোধে প্রকৃত সত্য পথ থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি। রেবরেণ্ড নারায়ণ শেষাদ্রির ভ্রাতা শ্রী-পাদ শেষাদ্রি

অকারণে জাতিভ্রষ্ট হলে নানা মানা উৎপীড়ণ সহ্য করেও বালশাস্ত্রী পতিতোদ্ধারের সাহায্যে তৎপর হয়ে সফলকাম হয়েছিলেন।[৮৭] বিদেশ থেকে ফিরে এলে প্রায়শ্চিত্ত প্রথাকে সত্যেন্দ্রনাথও আদর্শ বিরোধী চরম ভীরুতার কার্য বলেই মন্তব্য করেছেন। 'যেখানে কোন পাপ নেই অথচ প্রবাসের পাপকলংক ধুয়ে ফেলবার জন্য লোক দেখান অনুষ্ঠানে নিজেকেই খাট করা হয়।' অথচ শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও যখন বিদেশের অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে গোদাবরীতে স্নান, পঞ্চগব্য ভক্ষণ ও শিরোমণ্ডন ইত্যাদির মাধ্যমে বিনা দ্বিধায় এই প্রায়শ্চিত্ত কার্য সমাধা করেন তখন অশিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি ফেরাবার জন্য আর কাদের উপর নির্ভর করা চলে। আপন সত্যে অবিচলিত থেকে সমাজে যারা সুদৃষ্টান্ত স্থাপন পশ্চাৎপদ হয় সেই ভীরুদের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ তীব্র ধিক্কার বর্ষণ করেছেন—'কোন হিন্দুর কি এতটুকু সাহস নাই যে আপনি যাহা সত্য বলিয়া জানেন যাহা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন তাহা অকুতোভয়ে অবলম্বন করিতে পারেন—আপনার আন্তরিক বিশ্বাস অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারেন?…বহুরূপীর মত একবার ইউরোপীয় সভ্যতার সং সাজিয়া নৃত্য করা আবার তাহা পাপ বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া এই কি সত্যনিষ্ঠ সাহসী পুরুষের কার্য্য।' [বোম্বাই চিত্র পৃ. ৮১]

বংগদেশের তুলনায় দক্ষিণ অঞ্চলে জাতিভেদ প্রথা 'নিরতিশয় কঠোর' বলেই সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেছেন। বৈশ্য শূদ্রের প্রসংগ দূরে থাক—এক ব্রাহ্মণের মধ্যেই কত শাখা। 'সেনওই' ব্রাহ্মণদের মধ্যে মৎস্যাহার নিষিদ্ধ নয়—সেজন্য গুজরাটের নিরামিষাশী উচ্চ-কুলাভিমানী নাগর ব্রাহ্মণগণ এঁদের অবজ্ঞার চোখে দেখেন। নেমন্তন্নে সেনওয়ী ব্রাহ্মণদের স্পর্শ বাঁচিয়ে পরিবেশন করা হয়—মহিলারা সেনওয়ী মহিলাদের থেকে দূরে দূরে থাকেন। কালের স্রোতে এর বাঁধন যে ক্রমেই শিথিল হয়ে আসবে এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ স্থির বিশ্বাস পোষণ করতেন। কারণ যেখানে বিচার নেই সেখানে দেশাচারের শিকড় যতই শক্ত হোক না কেন ঘটনাস্রোতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

বিচারাসনে থাকার ফলে আইনের সাহায্যে নেওয়ায় ও আইন প্রণয়নে সত্যেন্দ্রনাথের উৎসাহ থাকলেও জনসাধারণের মানসিকতা সংশোধনের দিকেই তাঁর মনোযোগ বেশি ছিল আর সেজন্য প্রতি পরিবারে সংস্কার-সাধনে সাহসী পদক্ষেপ ছিল তাঁর একান্ত কাম্য।

জাতীয় আলস্য দূরীকরণ ও একান্নবর্তী পরিবার প্রথার অবসান

আমাদের জাতীয়চরিত্রের আর একটি বিশেষ ত্রুটি আছে—সেটি আলস্য। এই আলস্য দূর না করলে আমাদের জাতির উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে থাকবে। সত্যেন্দ্রনাথের মতে ইউরোপীয় সমাজের কর্মচাঞ্চল্য আমাদের ঢিলেঢালা জীবনছন্দের মধ্যে প্রবাহিত করতে হবে। না হলে যে সমাজের তথা পরিবারের উন্নতির আশা নেই তা পারিবারিক খাতায় সত্যেন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন।[৮৮] আমাদের দেশের একান্নবর্তী প্রথা সত্যেন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। কারণ অলস নিষ্কর্মা ভাইয়েরা উপার্জনশীল ভাইএর উপর বসে থেকে জীবনধারণ করে ফলে জাতীয় চরিত্রে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। একান্নবর্তী পরিবার প্রথায় 'সকলে মিলে একসাথে বাস যেমন সুখের হয় আবার পরস্পর বিরোধী element—এর একত্রীকরণ তেমনি অসুখের কারণ' হয়। সত্যেন্দ্রনাথের মতে একান্নবর্তী পরিবারে বিবাদ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা পুরুষের চেয়ে মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রবল হয়। এর চেয়ে আলস্য ত্যাগ করে শান্তিপূর্ণ-ভাবে স্ব স্ব রোজগারে বাস করাই শ্রেয়।

'পারিবারিক খাতায়' সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন যে আলস্য আমাদের শরীরে এমনি অবসাদ এনেছে যে আমরা ইউরোপীয় সমাজের মতো কর্মচঞ্চল না হয়ে ঝিমোতে ভালবাসি। নৃত্যের বাজনা শুনলে ওদেশের মতো আমাদের তালে তালে পা ফেলা দূরে থাক—আমাদের দেশের নৃত্যবিলাসিনীরাই বসে বসে হাত নেড়ে গানের ভাব ব্যক্ত করেন।[৮৯] সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন জগৎ যে বিশাল গতির ধারা চলছে তার স্বাদগ্রহণে আমরা অসমর্থ। সর্বাগ্রে তাই আলস্য দূর করে পরিবার ও সমাজকে প্রাণবন্ত করে তোলার দিকেই সত্যেন্দ্র-নাথের ঐকান্তিক ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে।

ধর্মের আবরণ সামাজিক ব্যভিচার দূরীকরণ

ধর্মের আবরণে এদেশের সমাজে যে নৈতিক ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে শাণিত ভাষায় সমালোচনা করে সত্যেন্দ্রনাথ জনগণের চৈতন্য উদ্রেক করতে চেয়েছেন। সামাজিক দুর্নীতি দূর করতে জনসাধারণের অন্ধ ভক্তি অনেক সময় তাদের সৃষ্টি আচ্ছন্ন রাখতে পারে—সেদিকে সত্যেন্দ্রনাথ

অবহিত করেছেন। বৈষ্ণব বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের কোন কোন মহারাজ নিজেদের দেবতার আসনে বসিয়ে স্ত্রীলোকের সতীত্বে পর্যন্ত আঘাত হানবার স্পর্ধা রাখতেন। নিরপরাধ কুলবধূকে ধর্মকথায় ভুলিয়ে এই জঘন্য পাপাচার যে সমাজে অবাধে চলতো তার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণায় সত্যেন্দ্রনাথের অন্তর শিহরিত হয়েছে। গুজরাটের প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক করসনদাস মুলজী বোম্বাই সুপ্রীম কোর্টের মকদ্দমায় বল্লভাচারী বৈষ্ণবদের নীতিবিরুদ্ধ আচারগুলি উদ্ঘাটিত করে দিয়ে সমাজের যে প্রভূত উপকার সাধন করেছেন সেজন্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশ্যে সাধুবাদ দিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তার বিভিন্ন দিক আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সত্যেন্দ্রনাথ সমাজ সংস্কারে progressive হলেও aggressive ছিলেন না। বিদেশের সংঘাতে আমাদের ধর্মের মধ্যে যে সকল অসার বস্তু আছে তা সকলে উপলব্ধি করতে পারলে ধীরে ধীরে জীর্ণ দেশাচারকে আর কেউ আঁকড়ে থাকবে না। 'ভারতী'তে বোম্বাই প্রসঙ্গে লেখার সময় সমাজসংস্কার বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ খুব হতাশা অনুভব করেছিলেন। পরবর্তীকালে 'আমার বোম্বাইপ্রবাস' প্রকাশের সময় সমাজের অবস্থা দেখে কিছুটা আশান্বিত হয়েছেন। সবশেষে সমাজসংস্কারে তাঁর এই আশার বাণী দিয়েই আলোচনাকে শেষ করা যেতে পারে।—'এই পূর্ব পশ্চিমের যোগে নবীন প্রাচীনের সংঘর্ষে আমাদের সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে। এই সংঘর্ষের ফলে সকলি যে ভাল, সকলি উন্নতি হচ্ছে তা বলা যায় না ; ভালর সঙ্গে মন্দও প্রসূত হচ্ছে মানতেই হবে…নকলের যে সমস্ত কুফল, কতটা কৃত্রিমতা এসে পড়ছে—আমাদের মধ্যে য়ুরোপ সমাজের বিলাসিতা কতকটা প্রবেশ করছে। সে যাই হোক, মোটের উপর বলা যেতে পারে এই ভালমন্দর ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজ পরিবর্তন ও উন্নতির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।'[৯০]

---

১. Society : An Introductory Analysis by R. N.Maciver and Charles H. Page ; p. 5.

২. জীবনের আদর্শ : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ; চৈত্র ১৮২৮ শক।

৩. অভিধাটি শ্রদ্ধেয় পুলিনবিহারী সেন প্রদত্ত। 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার স্ত্রী-স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ' নামে তাঁর প্রবন্ধটি ইন্দিরা দেবী সংকলিত 'পুরাতনী' গ্রন্থে ও শারদীয়া দেশ ১৩৬৩তে 'প্রবাসীর পত্রে'র সংগে মুদ্রিত।

৪. 'বাংলাদেশে স্ত্রীজাতির উন্নতি ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের বিবরণে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ বিরল, কারণ আন্দোলন বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি তার সংগে সত্যেন্দ্রনাথের যোগ তেমন প্রত্যক্ষ ছিল না। কর্মজীবন বাংলার বাইরেই অতিক্রান্ত হয়েছিল বলে তার সুযোগও তাঁর পক্ষে সামান্যই ছিল। ···উনবিংশ শতাব্দীর নারী আন্দোলনে তাঁর দেশ প্রধানতঃ তাঁর পরিবারের মধ্য দিয়েই লাভ করেছে ; আমরা যদি একথা স্মরণ রাখি যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের প্রধান একটি কেন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রভবন, বংগনারীর আত্মবিকাশের উদ্‌যোগ এই পরিবারের কন্যা ও বধূদের দ্বারা এক কালে অনেক খানি পরিপুষ্টি লাভ করেছে, তাহলে স্ত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র এই পরিবারের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁর প্রবর্তনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যাঁর প্রভাব কেবল পরিবারের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি—তাঁর কথাও শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়'।—প্রাগুক্ত প্রবন্ধ : শ্রীপুলিন বিহারী সেন। পুরাতনী ; পৃ. ১৮৭।

৫. 'দূরাতীতের একটি কথা বলি—বিলাত যাইবারও কিছু পূর্বে মেজদাদা একদিন আমাকে গাড়ী করিয়া তাঁহার সংগে গংগার ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন। জাহাজ গুলাকে এমন প্রকাণ্ড দৈত্যাকার বলিয়া মনে হইয়াছিল যে সেদিনকার সেই ভয় বিস্ময়ের ছাপ—আলোকচিত্রে অস্পষ্ট ছায়াপাতের ন্যায় এখনো অস্ফুট আকারে মাঝে মাঝে আমার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে'।

—সাহিত্য স্রোত ১ম ভাগ—শোকনৈবেদ্য : স্বর্ণকুমারী দেবী।

৬. 'আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন—"তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি নাকি ?" ' আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈতানিক প্রকাশনী—পৃ. ৫।

৭. 'অন্তঃপুরের অবস্থা সংশোধনের জন্য মাতাকেও ইনি ক্রমাগত ভজাইতেন।' আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার : স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রদীপ ; ভাদ্র, ১৩০৬।

৮. 'অল্পদিনের মধ্যেই মাতার এই বাণীকে তিনি সফলতা দান করিলেন। মা যে ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন একথা বলিতে পারি না।' সাহিত্য স্রোত—১ম ভাগ : শোকনৈবেদ্য : স্বর্ণকুমারী দেবী।

৯. আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৫।

১০. 'স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমি বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছি…হঠাৎ আমাদের বাড়ীর ভিতরকার কাঠের ঝরকার দিকে নজর পড়িল। তাহা সহ্য করিতে পারিলাম না।…কৈলাস (মুখুয্যেকে) আবার ডাকাইয়া বলিলাম,…যে পর্য্যন্ত ও ঝরকা না ভাঙ্গিয়া ফেলিবে সে পর্যন্ত আমি একগ্রাস অন্ন মুখে করিব না, এক বিন্দু জল পান করিব না। এই কথাগুলি এমন জোরে কুপিতভাবে বলিলাম যে আমার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল ও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাতেই তুমি বুঝিতে পার যে আমি তোমাদের জেলখানার যন্ত্রণা কত মনে করি'।—জ্ঞানদা নন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র। University Hall, Gordon Square—থেকে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪।

১১. 'আমি বাবামহাশয়কে এক পত্র লিখিয়াছি, আমার ইচ্ছা যে তিনি তোমাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। …আমি বাবামহাশয়কে লিখিয়াছি যে যেমন উৎকৃষ্ট বীজ ফলিবার জন্য উপযুক্ত সরস জমিকে প্রতীক্ষা করে আমি তোমার জন্য সেইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব'। [পত্র—১১ই জানুয়ারী, ১৮৬৪।]

১২. 'বাবা-মহাশয়কে লিখিলাম—কিন্তু আমার সমুদয় যত্নই ব্যর্থ হইল। বাবা-মহাশয় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মানমর্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি, অর্থাৎ তোমাকে চিরজীবনে মত চারিপ্রাচীরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখি। আমি ত ভাই বুঝিতে পারি না বাবামহাশয়ের এই ইচ্ছা কেমন করিয়া রক্ষা করি। তোমাকে আমি কারাবন্ধ রাখিয়া কখনই সুখী থাকিতে পারিব না'। (জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র—২রা জুলাই ১৮৬৪)।

১৩. 'অসূর্য'ম্পশ্যা কুলবধূ কর্ম'চারীর চোখের সামনে দিয়ে বাহির দেউড়ি ডিঙিয়ে গাড়ীতে উঠবেন, এ তার কিছুতেই মনঃপূত হল না'। —আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ। —পৃ. ৬।

১৪. 'স্ত্রীকে মেজদাদা লইয়া যাইতেছেন বোম্বাইসমুদ্র পার, কিন্তু তখনো অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহির্ব'াটীর প্রাঙ্গণ পর্য'ন্ত হাঁটাইয়া গাড়ী চড়াইতে পারিলেন না। অগত্যা পাল্কী করিয়া তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে হইল।' —স্বর্ণ'কুমারী দেবী : আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার : প্রদীপ ; ভাদ্র ; ১৩০৫। পুলিনবিহারী সেন রচিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলার স্ত্রী-স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ' প্রবন্ধে প্রাপ্ত। ইন্দিরা দেবী সংকলিত পুরাতনী গ্রন্থে প্রবন্ধটি মুদ্রিত। পৃ. ১১৭।

১৫. 'তখন অন্তঃপুরে অবরোধপ্রথা পূর্ণ' মাত্রায় বিরাজমান। তখনো মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ী যাইতে হইলে ঘেরা-টোপ মোড়া পালকীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনো নিতান্ত অনুনয় বিনয়ের গঙ্গা-স্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পালকীশুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে'। —প্রাগুক্ত প্রবন্ধ : স্বর্ণ'কুমারী দেবী। পুরাতনী পৃ. ১৯৭।

১৬. পিতৃস্মৃতি—সৌদামিনী দেবী। স্মৃতিকথা (রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ পত্রিকা) বৈতানিক প্রকাশনী। বৈশাখ, ১৩৭৯। পৃ. ৫।

১৭. স্বর্ণ'কুমারী দেবীর শোকনৈবেদ্য।

১৮. 'তিনি (বাবামশায়) আমাদের মনের উপর উদ্যমের উপর খড়গহস্ত হলে হয়ত অন্যরকম ভাব দাঁড়াত। আমার সকল কার্য' যে তাঁর অমতে—তা বলা যায় না—হয়ত কতক তাঁর মতের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কতক বা তার অপ্রিয় ও হতে পারে—কিন্তু আমাদের জীবনপথে তিনি কঠোরভাবে কোন বিঘ্ন বাধা উপস্থিত করেন নি'—ছেলেবেলার কথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পারিবারিক খাতার পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত। রবীন্দ্রসদন—শান্তিনিকেতনে রক্ষিত।

১৯. দ্রঃ পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী —'পরিজন পরিবেশে' অধ্যায়।

২০. 'সবচেয়ে যাহা দেখিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যায় তাহা এখানকার নরনারীর

মেলা। নারীবর্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা মানুষকে আধখানা করিয়া দেখি, এইজন্য তাহার আনন্দরূপ দেখা যায়। নিশ্চয়ই সেই না-দেখার একটা দণ্ড আছে।' পথের সঞ্চয় : রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ২৮।

২১. 'ঘরের বৌকে মেমের মত গাড়ী হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া সেদিন বাড়ীতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। দারোয়ান ভৃত্যগণ মাথা হেঁট করিয়া রহিল!' —শোকনৈবেদ্য : সাহিত্য স্রোত—১ম ভাগ ; স্বর্ণকুমারী দেবী।

২২. 'বাড়ীতেও এই সময় ইঁহারা একরূপ একঘরে হইয়া রহিলেন। মেজদাদা তাঁহার পত্নীর সহিত একত্রে টেবিলে বসিয়া আহার করিতেন। বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বধূঠাকুরাণীর অসংকোচে খাওয়াদাওয়া করিতে বা মিশিতে কুণ্ঠিত হইতেন।' তদেব : স্বর্ণকুমারী দেবী।

২৩. 'আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গভর্ণমেণ্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম।' আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৬।

২৪. সংবাদসার··· ২৭ ডিসেম্বর ১৮৬৬ বৃহস্পতিবার গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের বাটীতে যে মজলিশ হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী আমাদের জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া উক্ত মন্দিরে গিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন হিন্দু রমণী গবর্ণমেণ্ট হাউসে যান নাই। তাঁহার অন্য রকম সভ্য-পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক গমন করিলে ভাল হইত।

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, জানুয়ারি ১৮৬৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৬৭ নং-এ প্রাপ্ত। দ্র. পরিচ্ছদ পরিকল্পনা : পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী প্রসংগে—পরিজনপরিবেশে অধ্যায়।

২৫. আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ। পৃ. ৬।

২৬. আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৬।

২৭. জীবনের ঝরাপাতা : সরলা দেবী চৌধুরাণী। পৃ. ১০৬।

২৮. Sir J. Lawrence. 1864-69. 'Chronology' p. 844. The

Oxford History of India by Late Vincent A. Smith C. I. E. (Third edition) edited by Percival Spear.

২৯. Sick Leave from 28th Oct. 1866 to 7th April 1867 ; Sick Leave from 16th Oct. 1867 to 15th June 1868 ; Service Record—Department of Archives, Maharashtra State.

৩০. 'আমি যে Mrs. Phear কে রহস্য করিয়া মনোমোহনের আবার বিবাহ হইলে তাহার স্ত্রীর Bridesmaid হইতে বলিয়াছিলাম—তাহাতে একটি বিলক্ষণ ভুল হইয়াছিল, এখন বুঝিতেছি, কেননা অবিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন Bridesmaid হয় না'—জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র। Bombay, 3 June, 1868.

৩১. জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : ইন্দিরা দেবী অনুলিখিত। পুরাতনী গ্রন্থে মুদ্রিত।

৩২. জীবনের ঝরাপাতা : সরলাদেবী চৌধুরাণী। পৃ. ৫৪।

৩৩. আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৭।

৩৪. শোকনৈবেদ্য—সাহিত্য স্রোত : স্বর্ণকুমারী দেবী।

৩৫. দ্র. কর্মজীবন—৯৬ নং পাদটীকা।

৩৬. শোকনৈবেদ্য-সাহিত্য স্রোত : স্বর্ণকুমারী দেবী।

৩৭. 'ভ্রাতৃবধূদের মাথার কাপড় টেনে খুলে দিতেন শুনেছি, অথচ তাঁরই আপন দাদা জ্যাঠামশায় আব্রু সম্বন্ধে খুবই রক্ষণশীল ছিলেন'। সত্যেন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী : বিশ্বভারতী পত্রিকা-৩য় বর্ষ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২।

৩৮. 'তবে পরিবেশনের বেলায় গৃহিনীর আগমনেও কতকটা তৃপ্তি লাভ করা যায়। আমাদের মত নয় যে, কোন গৃহস্থের গৃহে নিমন্ত্রণে গেলে গৃহকর্ত্রী পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকেন, তাঁর হাতের বালাগাছাটি পর্যন্ত দৃষ্টিপথে পড়ে না'। আমার বোম্বাই প্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ১৯৪।

৩৯. আমার বাল্যকথা : পৃ. ৫।

৪০. John Stuart Mill—On Liberty, Representative Govern-

ment Subjection of Women. (Published in one volume in the World Classics Series (1912)

৪১. আমার বোম্বাই প্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৮৭।

৪২. 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' বলিয়া একখানি চটি বই তাঁহার অল্প বয়সেই তিনি লিখিয়াছিলেন'। পিতৃস্মৃতি : সৌদামিনী দেবীর 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে মুদ্রিত—বৈতানিক প্রকাশনী।

৪৩. 'আশৈশব ইনি (সত্যেন্দ্রনাথ) মহিলা-বন্ধু, স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বিলাত যাইবার পূর্বে'ই উক্ত বিষয়ে ঔচিত্য সম্বন্ধে সারগর্ভ সতেজ যুক্তি প্রদর্শ'ন করিয়া ইনি একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন'।—স্বর্ণকুমারী দেবীর 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার' (প্রদীপ ; ভাদ্র, ১৩০৬-পৃ-৩১৪-১৬) শ্রীপুলিনবিহারী সেন রচিত—'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলার স্ত্রী-স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ'-প্রবন্ধে প্রাপ্ত। ইন্দিরা দেবী সংকলিত 'পুরাতনী' গ্রন্থে মুদ্রিত। পৃ. ১৯০।

৪৪. প্রাগুক্ত প্রবন্ধের ৭নং পাদটীকা। সত্যেন্দ্রনাথের আমার বাল্যকথা গ্রন্থের উক্তি—'John Stuart Mill-এর Subjection of Women গ্রন্থ আমার সাধের পাঠ্যপুস্তক ছিল ; আর তাই পড়ে 'স্ত্রী-স্বধীনতা' নামে এক Pamphlet বের করেছিলুম'।

৪৫. 'The Subjection of Women was the last book Mill published. It appeared in 1869,...Mill always attached great importance to the choice of the right time for the publication of his books. He says in his Autobiography that it was his custom to write each of his works at least twice, and after even the second writing to subject them to careful revision, reading, weighing and criticising every sentence....The Subjection of Women was first written in 1861 but not published till 1869...we know from his Autobiography and also from Professor Bain's—J. S. Mill : a criticism, that it was the joint work of Mill

and his stepdaughter, Miss Helen Taylor'. Millicent Garret Fawcett Introduction : On Liberty Representative Government, The Subjection of women, Three Essays-by John Stuart Mill. Published in one volume in the World's Classics Series in 1912.

৪৬. 'In the Subjection of Women, published in 1869, he stands up as the champion of Women's rights'. J. Stanton Coit (ed) The Subjection of Women, pp. 34-35. 'The Subjection of Women was published in 1869' Alexander Bain ; John Stuart Mill (1882) 1st ed., ch. I, p. 4. Political Philosophies ; Chester C. Maxey. P. 476.

৪৮. Hansard. Parliamentary Debates—Vol. CL. XXXVII (1868)

৪৯. ক) Elliot : Letters of John Stuart Mill. vol. I এ Carlyle কে লেখা চিঠি।

খ) Mrs. Taylor কে লেখা চিঠি। Hayek-John Stuart Mill and Harriet Taylor.

গ) Lord Morley কে লেখা চিঠি। Bain : John Stuart Mill.

৫০. সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৬৭ নং।

৫১. আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর। পৃ. ৫।

৫২. আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৫।

৫৩. 'আমার যখন সাত-আট বৎসর বয়স তখন আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরী এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবরা জন স্টুয়ার্ট মিল-এর মহা ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রায়ই তাঁদের মুখে মিলের নাম শুনতুম। অবশ্য তাঁরা মিলের Logic Economics—কেউ পড়েন নি। তাঁরা পড়তেন শুধু Three Essays on Religion—আর Subjection of Women'—আত্মকথা : প্রমথ চৌধুরী। পৃ. ৮৪।

[প্রমথ চৌধুরী-জন্ম ১৮৬৮-মৃত্যু ১৯৪৬।]

৫৪. য়ুরোপ যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র—স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক আলোচনাও তর্ক। ভারতী, ১২৮৬, অগ্রহায়ণ। ১২৮৭, বৈশাখ। (পৃ. ২৯)।

৫৫. সাহিত্যস্রোত : শোকনৈবেদ্য ; স্বর্ণকুমারী দেবী।

৫৬. জীবনের ঝরাপাতা : সরলা দেবী চৌধুরাণী। পৃ. ৬৩।

৫৭. আত্মজীবনী দেবেন্দ্রনাথ। পরিশিষ্ট, ৪-পৃ. ২৫২।

৫৮. আত্মজীবনী : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরিশিষ্ট-৪ ; সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত।

৫৯. '১৮৪৯ খ্রী. ৭ই মে বীটন স্কুল স্থাপিত হয়'। সময় সূচী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী। (১৯৬২)।

৬০. ২৫ শে আষাঢ় ১৭৭৩ শক [১৮৫১] 'আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত) পত্র নং ৩০—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

৬১. 'পিতৃদেব সিমলা পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মন দিলেন। কেশববাবুদের অন্তঃপুরে মিশনারি মেয়েরা পড়াইতে আসিত। আমাদের শিক্ষার জন্য পিতা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বাঙালী খ্রীস্টান শিক্ষয়িত্রী প্রতিদিন আমাদিগকে পড়াইতেন এবং হপ্তায় একদিন মেম আসিয়া আমাদিগকে বাইবেল্ পড়াইয়া যাইতেন।' পিতৃস্মৃতি : সৌদামিনী দেবী। স্মৃতিকথা ; বৈতানিক প্রকাশনী (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থমালা)। পৃ. ৩।

৬১. 'মেজমামা তখন সেতারায়। মহীশূর যেতে বম্বে দিয়ে সেতারা পথে পড়ে। মা (স্বর্ণকুমারী) সেতারা পর্যন্ত আমার সঙ্গে গেলেন। মেজমামা সেতারা থেকে আমার অভিভাবক হয়ে আমায় মহীশূর ছাড়তে গেলেন। মেয়েদের চাকরী করা সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন দ্বিধা নেই—সবরকম সমাজসংস্কারের তিনি পক্ষপাতী। মহর্ষির দৌহিত্রী হয়ে চাকরি করতে যাওয়ায় কোন পারিবারিক লাঘব তিনি অনুভব করলেন না। আমায় পৌঁছিয়ে সব রকম সুবন্দোবস্ত আছে দেখেশুনে

নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি ফিরে গেলেন।' জীবনের ঝরাপাতা : সরলাদেবী চৌধুরাণী। পৃ. ১০৮।

৬৩. 'একখানি পাতলা শাড়ী মাত্রই তখন মেয়েদের পরিধেয় ছিল। আমাদের বাড়িতে মেজদাদাই, সমস্ত উল্টাইয়া দিলেন। আমরা যখন সেমিজ জামা জুতা মোজা পরিয়া গাড়ি চড়িয়া বাহির হইতে লাগিলাম তখন চারিদিক হইতে যে কিরূপ ধিক্কার উঠিয়াছিল তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নহে।'—পিতৃস্মৃতি : সৌদামিনী দেবী। পৃ. ৪। স্মৃতিকথা—বৈতানিক প্রকাশনী।

৬৪. 'তোমার বিবাহ ত তোমার হয় নাই, তাহাকে কন্যাদান বলে, তোমার পিতা কেবল তোমাকে দান করিয়াছেন।…যে পর্যন্ত তুমি বয়স্ক শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে সে পর্যন্ত আমারা স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না'—জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র। ১১ই জানুয়ারী ১৮৬৪ (—পুরাতনী দ্র.) Univesity Hall Gordon Square, London.

৬৫. 'আমি বাবামহাশয়কে লিখিয়াছি যে যেমন উৎকৃষ্ট বীজ ফলিবার জন্য উপযুক্ত সরস জমিকে প্রতীক্ষা করে, আমিও তোমার জন্য সেইরূপ প্রতীক্ষা করিরা থাকিব।' —জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত পত্র। University Hall, Gordon Square, London. 11th January, 1864.

৬৬. '১৬ জন ডাক্তারের মত নেওয়া যায় তার মধ্যে কেবল একজন (ডাক্তার চন্দ্র) এদেশে স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স অন্যূন ১৪ বৎসর নির্দেশ করেন।' আমার বোম্বাই প্রবাস-পৃ. ২৩৯।

৬৭. In 1929, the Sarda Act fixed the minimum age for marriage at 14 for girls (amended in 1949 to 15) and 18 for boys.

৬৮. গুজরাটে কৃষিদলের সাধারণ নাম কণবী। বোম্বাই চিত্র। পৃ. ১৪৬।

৬৯. আহমদবাদের আদিমবাসী কণবীগণ কুলশীলে শ্রেষ্ঠরূপে প্রখ্যাত—বোম্বাই চিত্র। পৃ. ১৪৭।

৭০. 'কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে এক দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া দিয়া

পিতা মাতা কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন ; এই প্রথার নাম দুধ-পীতী'।—বোম্বাইচিত্র। পৃ. ১৪৭।

৭১. '(রেসিডেন্ট) জোনাথান ডনকান তৎকালের প্রসিদ্ধ ভারত-হিতৈষী ইংরেজদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। সে-সময় উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজপুতানা ও পাঞ্জাব প্রভৃতি অনেক প্রদেশে বিশেষতঃ রাজপুতদিগের মধ্যে সূতিকাগারে কন্যা-হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। ডন্‌কান কাশীতে অবস্থিত কালে বহুসংখ্যক রাজপুত পরিবারকে কন্যা-হত্যা হইতে বিরত হইবার জন্য শপথবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে…কন্যা হত্যা নিবারণার্থ গুজরাট ও রাজপুতানাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন'।—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃ. ৭০।

৭২. বোম্বাই চিত্র। পৃ. ৯২।

৭৩. দ্র. পারিবারিক খাতা-পরিশিষ্টে পরিবেশিত—কোর্টসীপ বিবাহ (৮ই অক্টোবর ১৮৮৯)।

৭৪. 'ইদানিং আমাদের দেশে ইউরোপীয়দের দেখাদেখি এক সম্প্রদায় লোক আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তাহাদের সংখ্যাও বিরল নহে, তাঁহারা স্বাধীন বিবাহেও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহার স্বাধীন প্রণয় Free Love প্রচলিত করিতে যত্নবান। তাঁহারা বলেন সভ্য সমাজে স্বাধীন প্রণয়ই সর্বাপেক্ষা মঙ্গলকর'।—রসিকলাল সেন : বাল্যবিবাহ—ভারতী-ফাল্গুন ১২৯১।

৭৫. আমার বোম্বাই প্রবাস—পৃ. ২৪২।

৭৬. আমার বোম্বাইপ্রবাস—পৃ. ২৪২।

৭৭. ঐ।

৭৮. ঐ।

৭৯. বোম্বাইচিত্র-পৃ. ৮২।

৮০. ঐ।

৮১. 'সেদিন দেখিলাম আমার এক কায়স্থ বন্ধু, রায়বাহাদুর, আপনার পরিবারস্থ এক তরুণবয়স্কা বিধবা কন্যার শিরোমুণ্ডন স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করিলেন।—স্বচ্ছন্দে বলাটা ঠিক হইল না—জাতির অনুরোধে বলা উচিত, কিন্তু তিনি একজন শিক্ষিত নব্যদলের লোক

হইয়া এরূপ স্থলে এ অনুরোধ এড়াইতে না পারিলেন ত···সমাজ সংস্কার-আশা আর কোথায় রহিল'।—বোম্বাইচিত্র, পৃ. ৮২।

৮২. আমার বোম্বাইপ্রবাস-পৃ. ২৪৩।

৮৩. ঐ। পৃ. ২৪৬।

৮৪. 'কাগজে বিজ্ঞাপন দাও যে বহুবিবাহ সম্বন্ধে একখানা নাটক লিখে দিতে পারবে তাকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে'। (গণেন্দ্রনাথের উক্তি); ঘরোয়া-পৃ. ৭৬।

৮৫. 'আমরা বাড়ী গেলে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওর কাছে সর্বদা এসে বসতেন।···তখনকার কালে একজন গরীব নাট্যকারকে দিয়ে প্রথম এক নাটক লিখিয়ে অনেক খরচ ও ধুমধাম করে নিজের বাড়ীতে অভিনয় করিয়েছিলেন···নাটকটির নাম বোধহয় নবনাটক। মেয়েদের দেখবার জন্যেও আলাদা জায়গা দিয়েছিলেন।' জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : পুরাতনী গ্রন্থে মুদ্রিত। ইন্দিরা দেবী অনুলিখিত।

৮৬. 'আমি ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসবার দুই বৎসর পরে ছুটী নিয়ে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের (গণেন্দ্রনাথ) বাড়ীতে নবনাটক অভিনয়ের প্রভৃত আয়োজন হয়েছে—আমি সেই সমারোহের মধ্যে এসে পড়ি।···বহুবিবাহ প্রথায় পারিবারিক দুঃখজ্বালা অশান্তি প্রকটন সূত্রে লোকশিক্ষা দেওয়া ঐ নাটকের উদ্দেশ্য। আমাদের বাড়ীর ছেলেরা আত্মীয় স্বজন বন্ধু সেই নাটকের পাত্রপাত্রী সেজেছিলেন।'—আমার বাল্যকথা। পৃ. ৫১-৫২।

৮৭. আমার বোম্বাইপ্রবাস। পৃ. ২৫১।

৮৮. দ্র. পারিবারিক খাতা : পরিশিষ্ট : একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা।

৮৯. দ্র. পারিবারিক খাতা : পরিশিষ্ট : নৃত্যপ্রিয়তা।

৯০. আমার বোম্বাইপ্রবাস পৃ. ২৪৭।

অর্থনৈতিক চিন্তা

তিন পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্টসহ 'বোম্বাইরায়ত' শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনাটি সত্যেন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তার একটি সার্থক নিদর্শন। বোম্বাই অঞ্চলে রেভিনিউ কার্যাবলীর সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে তাঁর এই রচনাটি যেমন বাস্তবভিত্তিক তেমনি রায়ত-সমস্যা সমাধানে তাঁর মতামত ও যথার্থই ন্যায়-সংগত।

বোম্বাই অঞ্চলে রায়তের সমস্যা সম্পর্কে যে তদন্ত কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তাঁরা রায়তদের সমস্যা সমাধানের জন্য যে সব রিপোর্ট দিয়েছেন তার কয়েকটির সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের মতের সাদৃশ্য রয়েছে।

রচনাকাল

ভারতী[১] পত্রিকায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা থেকে ১২৮৫-র আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত বোম্বাইরায়ত প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৯৫ সালে 'বোম্বাইচিত্র' গ্রন্থে রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয় ও সেই সঙ্গে একটি পরিশিষ্টও যুক্ত হয়।

বিষয়বস্তু

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে দু'রকম মনোভাব, মহারাষ্ট্রে রায়তবিদ্রোহ, বোম্বাই অঞ্চলের রাজস্ব প্রশাসন, রায়তওয়ারী ব্যবস্থার গুণ, বাস্তবক্ষেত্রে ব্যর্থতা, রায়তদের দুর্দশা প্রতিকারের পথ ইত্যাদি প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে। তৎকালীন অনেক দেশী ও বিদেশী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁদের রাজকাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিজের মধ্যেই সীমায়িত করে রাখেন নি। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য নিজের মতামত সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন।[২] সত্যেন্দ্রনাথের রচনাটি সেই শ্রেণীভুক্ত। আলোচনার প্রথমেই তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের বিরূপ মনোভাবের কথা বলেছেন। তাঁদের মতে—'ইহাতে গবর্ণমেণ্টের স্পৃহনীয় রাজস্ব জমিদারের ঘরে যাইতেছে এবং সে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের উপর অযথোচিত করভার ন্যস্ত হইতেছে।'

আবার অন্যান্য কৃতবিদ্য লোকের মতে—'বঙ্গদেশের যাহা কিছু উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায় সে কেবল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে। বঙ্গদেশে জমিদার ও প্রজামধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অন্যান্য স্থলে গবর্ণমেণ্ট ও প্রজার মধ্যে সে সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না।'

মহারাষ্ট্রে রায়ত বিদ্রোহ

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে বোম্বাই অঞ্চলের রায়তগণ যে অসহনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার ফলেই মহারাষ্ট্রে রায়ত বিদ্রোহ হয়। সাহুকারদের অত্যাচারের শেষ সীমায় উপনীত হয়ে দীন অভাজন রায়তদের পক্ষে এই বিস্ফোরণ সম্ভব হয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে পুণা জেলার 'সুপা' গ্রামে হাটের মাঝে বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলে ওঠে। মহাজনদের খতপত্র পুড়িয়ে ফেলা, খাতা দিতে দেরী করলে সাহুকারদের উপর দৈহিক অত্যাচার করা—সবই রায়তদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এ বিপ্লব ধীরে ধীরে পল্লী অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনারের তৎপরতায় বিদ্রোহ প্রশমিত হলেও এবিষয়ে প্রথম সরকারের চৈতন্যোদ্রেক হয় ও একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত হয়।

বোম্বাই অঞ্চলের রাজস্ব প্রশাসন

রায়তওয়ারীর ব্যবস্থার সঙ্গে বোম্বাই অঞ্চলের রাজস্ব প্রশাসন যুক্ত থাকায় এবিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তৎকালীন বোম্বাই রাজস্ব প্রশাসনের একটি দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। এবিষয়ে Revenue Handbook of Bombay থেকে ও তিনি যে কিছু কিছু সাহায্য নিয়েছেন, পাদটীকায় তার উল্লেখ আছে। একটি সংক্ষিপ্ত চার্টে নিম্নলিখিত রূপে তা সাজানো যেতে পারে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি
(সিন্ধু ও বোম্বাই শহর ছাড়া)

এলাকা বিভাগ	কর্মী বিভাগ
৩টি বিভাগে বিভক্ত উত্তর মধ্য দক্ষিণ	: প্রত্যেক বিভাগে ১ জন কমিশনার ১জন সহকারী কমিশনার
কালেক্টরেট	: প্রত্যেক কালেক্টরেটে একজন কালেক্টর
প্রত্যেক বিভাগ ১৮টি কালেক্টরেটে বিভক্ত	: কয়েকজন সহকারী ও ডেপুটি কালেক্টর
তালুক প্রত্যেক কালেক্টরেট কয়েকটি তালুকের সমষ্টি।	: তালুকের প্রধান মামলতদার
গ্রাম	: গ্রামের প্রধান—পাটেল'
প্রত্যেক তালুক কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি।	: ঐ হিসাব রক্ষক—'কুলকর্ণী'
	: গ্রাম রক্ষক—'মাহার' ফসল ও সীমাচিহ্ন রক্ষণাবেক্ষণ, চিঠিপত্র ও সরকারী খাজনা তালুকে নিয়ে যাওয়া মাহারের কাজ।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের গুণ

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের 'মূলসূত্র' এই যে রাজা প্রজার 'সাক্ষাৎ সম্বন্ধ'। এদের 'মধ্যবর্ত্তী কোন ভূস্বামী নাই' এবং 'সরকারই জমিদার ও সরকারী কর্মচারীদিগের প্রতি খাজনা আদায়ের ভার অর্পিত'।

১৮৩৬-৩৭ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই অঞ্চলে জরিপের কাজ শুরু হয়। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ের ১ আইনে এবিষয়ে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হয়।

ভূপৃষ্ঠের পরিমাপ, জমির গুণানুসারে শ্রেণীবদ্ধকরণ, জলবায়ু, বাজার, কৃষির অবস্থা অনুসারে তালুকগুলির পৃথক্‌করণ, জরিপের কাজের অন্তর্গত বিষয়। প্রত্যেক জমির জন্য কত খাজনা দেয়, তা সরকারী আমিনেরাই রায়তদের ডেকে বলে দেন। এরূপ জমাবন্দী সম্বন্ধীয় বন্দোবস্তই হচ্ছে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত। এর মেয়াদ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী; যে খাজনা নির্দিষ্ট হল, রায়ত তা সরকারের কাছে যতদিন দিতে পারবেন, ততদিন পর্যন্ত জমির উপর তাঁর পূর্ণ স্বত্ব থাকে। ইচ্ছা করলে রায়ত তাঁর জমির সম্পূর্ণ বা অংশত হস্তান্তরও করতে পারেন। এতে সরকারী খাজনারও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। জমির স্বত্ব যার কাছেই থাকবে নির্দিষ্ট খাজনা তাকেই দিতে হবে। ত্রিশ বৎসরের আগে খাজনা বৃদ্ধি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই—এটি রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের বিশেষ সুবিধা। এ ধরণের সুবিধা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রায়তেরা যাতে ভোগ করতে পারেন সেজন্য ইংরেজ সরকারের কাছে ভারতের ভূমিকার[৩] হ্রাস নিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত যে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন তার অন্যতম দাবিই ছিল—ভূমিকর একবার বৃদ্ধি হলে 'ত্রিশ বৎসরের পূর্বে" আর যেন তা বৃদ্ধি করা না হয়। এই বন্দোবস্তে খাজনা দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে সমস্তই রায়তের প্রাপ্য। জমিদার কি পত্তনিদারের কোন ভূমিকা এ বন্দোবস্তে নেই। নূতন বন্দোবস্ত করার সময় রায়ত নিজ যত্নে ও পরিশ্রমে কৃষি কার্যের ও জমির যে উন্নতি সাধন করেন তা খাজনা বৃদ্ধির বিচারে ধার্য হয় না। কাজেই খাজনা বৃদ্ধির আশংকা না থাকায় কৃষির উন্নতির দিকে মনোযোগ দিতে রায়ত সাহসী হন। এসব দিক থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তুলনায় রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত বরং ভাল হলেও সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই অঞ্চলে এ বন্দোবস্তের দোষের দিকগুলিও আলোচনা করেছেন।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের ত্রুটি

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের ত্রুটির প্রসংগ সত্যেন্দ্রনাথ সরকারী কর নির্ধারণ রীতির সমালোচনা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের মতে—চাষের খরচ বাদ দিয়ে যে মুনাফা অবশিষ্ট থাকে 'গবর্ণমেণ্টের খাজনা তার অর্ধাংশ কিম্বা তার

সামান্য কিছু বেশি' ধরলেও ক্ষতি হয় না। 'কৃষকের পরিশ্রমের বেতন ও হল বলদ প্রভৃতি কৃষিসাধন জিনিসের মূল্য'ও আবাদের খরচের মধ্যেই ধরা উচিত।

কিন্তু বোম্বাইতে যে ভাবে সরকারী খাজনা নিরূপিত হয়েছে তাতে এ নিয়ম অনুসৃত হয় নি বলেই সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেছেন। বোম্বাই রায়তদের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মুনাফা কিছুই থাকে না। অগত্যা সরকারী খাজনা মেটাবার জন্য রায়তকে মহাজনের শরণাপন্ন হতে হয়। রায়ত বহু কষ্টে, নিজের ও পরিবারের সম্বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র যোগাতে পারেন অনেক সময় সম্বৎসরের ফসলও ঘরে আসে না। ভাল বর্ষণের ফলে যদি শস্য ভাল হয় ও সামান্য মুনাফা হাতে আসে পরবর্তী বৎসরে অজন্মার ফলে সেই উদ্বৃত্ত অংশটুকুও আর হাতে থাকে না। ফলে মহাজনের ঋণ শোধ করা রায়তদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না। সরকারী খাজনা মেটাতে নিরুপায় রায়তকে তার মুনাফার সবটা অংশ তো দিতে হচ্ছেই, উপরন্তু, তার সর্বনিম্ন গ্রাসাচ্ছাদনের অংশও দিতে হচ্ছে। সুতরাং রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের সব কিছু ভাল একথা এক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের নিয়ম উল্লেখ করেছেন—রাজার বৃত্তি ছিল উৎপন্ন ফসলের···ষষ্ঠাংশ। যে বৎসর ভাল বর্ষণ হতো, রাজভাণ্ডার পূর্ণ হতো, আবার অজন্মার ক্ষতি রাজাকেই বহন করতে হতো : সেবছর প্রজাদের খাজনা মাপ করা হতো। বর্তমানে অনাবৃষ্টিই হোক আর সুবৃষ্টিই হোক—নিয়মিত সময়ে সরকারী খাজনাটি না দিলে জমি নিলাম হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। সুতরাং রায়তওয়ারী ব্যবস্থার সুফল বোম্বাইএর রায়তগণ ভোগ করছেন না ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত হয়, ত্রিশ বছর পরে ১৮৬৫ সালে আবার তা নূতন ভাবে ধার্য হয়। ১৮৬৪-৬৫ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের জন্য এদেশের তুলার ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বলেন—সেসময় রায়তদের অবস্থা কিছুটা সচ্ছল হয় ও জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঐ উন্নতি ক্ষণস্থায়ী, যুদ্ধশেষের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বের অবস্থা আবার ফিরে আসে। অথচ ঐ ক্ষণস্থায়ী মূল্যবৃদ্ধি অনুসারে আগামী ত্রিশ বৎসরের খাজনার মূল্য নির্ধারিত হয়। ফলে ঐ বর্ধিত হারে খাজনা দেওয়া রায়তদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথ আরও বলেন—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের মূল্য ও কৃষিকার্যের

খরচও বাড়ে। নূতন বন্দোবস্তের সময় এবিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। ফলে রায়তদের উপর করভার বিনা বিবেচনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'পুণা সার্বজনিক সভা'র প্রচেষ্টার কথা সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। প্রথম ত্রিশ বছরের তুলনায় দ্বিতীয় বন্দোবস্তে রায়তদের বর্ধিত হারে খাজনা নির্ধারণের জন্য ঐ সংস্থাও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

রায়তদের দুর্দশার সকরুণ চিত্র ও তার কারণ

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সাহুকারের[৪] ঋণজালে আবদ্ধ বোম্বাই রায়তদের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করেছেন।

মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে একবার সাহুকারের জালে আবদ্ধ হলে আর পরিত্রাণের পথ থাকে না। যে সুদ ভবিষ্যতে জমা হওয়ার কথা তা আগে থেকেই আসল টাকার সঙ্গে যুক্ত করে ঋণের পরিমাণ খতে লিখিয়ে নেওয়া হয়। খতের জামিনদার হিসাবে রায়তের বৃদ্ধ মাতা বা স্ত্রীকে বদ্ধ রাখা হয়, কারণ বৃদ্ধ মাতা ও স্ত্রীর কারাবাসের ভয়ে রায়ত যেমন করেই হোক ঋণ শোধ করবেন। ঋণ বেড়ে গেলে অসহায় রায়তকে সমস্ত ফসলই সাহুকারকে দিতে হয় ও সম্বৎসরের জিনিসপত্র সাহুকারের দোকান থেকেই ধারে আনতে হয়। এভাবে বছরের পর বছর ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলে। উৎপন্ন ফসলের কোন অংশই রায়তের ভোগে আসে না। বর্ধিত ঋণের দায়ে ক্রমে ক্রমে রায়তের জমি, বাসগৃহ সবই সাহুকারের কাছে বন্ধক রাখতে হয়। শেষকালে যখন আর কিছুই থাকে না তখন আদালতের ডিক্রিজারী করে রায়তের ভূসম্পত্তি নিলাম হয় ও নিলাম থেকে ঐ সম্পত্তি অল্পমূল্যে সাহুকারই আবার কিনে নেয়। ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে সেই জমিই আবার রায়তকে চাষ করতে হয় সাহুকারের করদ প্রজা হয়ে।

সত্যেন্দ্রনাথের মতে—'এদেশের আইন এ বিষয়ে মহাজনের যেমন পক্ষপাতী আর কোন আধুনিক আইন তেমন আছে কি না সন্দেহ।…যদিও আইনে দাসত্বের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তথাপি যখন অশক্ত ঋণীকে বন্দী-খানায় প্রেরণ করা মহাজনের ইচ্ছাধীন, তখন পক্ষান্তরে দাসত্বই প্রশ্রয় পাইতেছে বলিতে হইবে। কেন না অনেক দেনাদায়ে কারাবাস অপেক্ষা মহাজনের দাসত্ব অল্প যন্ত্রণাদায়ক জ্ঞান করিয়া তাহাতেই ব্রতী হইবে সন্দেহ নাই।'[৫] এ বিষয়ে

তিনি তদন্ত কমিশনের রিপোর্টেরও উল্লেখ করেছেন। 'জুডিসিয়াল মেম্বার'রা বলেছেন—'রায়তেরা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ভাবে প্রপীড়িত, তাহার লাঘব করা কর্ত্তব্য।' রেবেনিউ মেম্বার'দের মতে—'আদালত ও মকদ্দমার হাংগামেই রায়তের সর্বনাশ—তৎসংক্রান্ত নিয়ম সংশোধন করা কর্ত্তব্য।' সভ্যগণ যখন এদেশীয় আইনের উপর এই দোষারোপ করেছিলেন তখনও নূতন দেওয়ানী কার্যবিধি আইন প্রচলিত হয় নি। সত্যেন্দ্রনাথের মতে—পরবর্তী কালে এই আইনের ফলে 'ঋণ সম্বন্ধীয় কঠোর নিয়ম অনেকাংশে সংশোধিত হয়েছে' ও মহাজনের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কিছুটা পথ উন্মুক্ত হয়েছে। তদন্ত কমিশনের সভ্যেরা রায়তদের দুর্দশার আরও যে সকল কারণ নির্দেশ করেছেন, এর মধ্যে অনেকগুলিই সত্যেন্দ্রনাথের যথাযথ মনে হয়েছে। তাঁরা—রায়তদের উৎসবখাতে ঋণগ্রহণ ও অপরিমিত ব্যয়, সরকারের খাজনা আদায়ের কড়াকড়ি নিয়ম, উৎপন্ন ফসল বিক্রীর উপযুক্ত বাজারের অভাব, মহাজনদের অত্যাচার ও সর্বোপরি রায়তদের ভীরুতা ও অজ্ঞানতার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রতিকারের পথ

সত্যেন্দ্রনাথের মতে—উপযুক্ত শিক্ষাদান রায়তদের কল্যাণ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। সহজ লিখনপঠনে রায়তদের অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। যাতে তাঁরা নিজেদের হিসাব নিজেই দেখেশুনে নিতে পারেন, সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। সত্যেন্দ্রনাথ বলেন—'যেমন উচ্চশ্রেণীর লোকদের হিতকারী উচ্চশিক্ষা দানে গবর্ণমেণ্ট ব্রতী হইয়াছেন, সেইরূপ নিম্নশ্রেণীস্থিত সাধারণ জনগণের উপযোগী…শিক্ষাপ্রচারেও তাহাদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।'[৬] গ্রামে গ্রামে পাঠশালা, কৃষিবিদ্যালয়, আদর্শক্ষেত্র (model farms) স্থাপনের উপর সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

মহাজনের অত্যধিক সুদের হার কমানো সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে—'ঋণীর টাকার প্রয়োজন ও তাহাকে ধার দিবার মতো মহাজনের অর্থের প্রাচুর্য—এই দুইয়ের উপরে সুদের হার নির্ভর করে।'[৭] সেই সময়ের প্রচলিত চাহিদা ও যোগানোর অবস্থা অনুসারে অর্থনীতির মূল্য নিরূপণ তত্ত্বকেই তিনি এখানে প্রয়োগ করেছেন। এই

তত্ত্ব অনুসারে আইনের কোন কার্যকারিতা না থাকলেও মহাজনের অন্যায় যুক্তি ও সেই চুক্তি অনুসারে পাওনা আদায়ের দাবি থেকে গরীব রায়তকে একমাত্র আইনই রক্ষা করতে পারে। সেজন্য তিনি মহাজনের অতিরিক্ত সুদ আদায়ের চুক্তির বিরুদ্ধে আদালতকে বিশেষ ক্ষমতাদানের প্রস্তাব করেছেন।

তাঁর মতে—প্রত্যেক তমসুক, কোন রেজিস্ট্রার বা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সামনে লিখিত পঠিত ও স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত। এতে রায়ত ও মহাজন উভয়েরই মঙ্গল। এভাবে খত লিখিত হলে ঋণীও যেমন তার ঋণ অস্বীকার করতে পারব না, তেমনি মহাজনের দ্বারা খত জাল হওয়ার ভয় থাকবে না।

তিনি আরও বলেন—যে সকল স্ট্যাম্প কাগজে খত লেখা হয় তা চেক্ বই-এর মতো সচ্ছিদ্র রেখাযুক্ত, দুভাগে ভাগ করা উচিত। তার একভাগে খত লিখে, খতের সারাংশ অন্য ভাগে লেখার নিয়ম করা উচিত। রায়তের অংশে মহাজনের স্বাক্ষর, ও মহাজনের অংশে রায়তের স্বাক্ষর থাকবে। সহজে মেলানোর জন্য দুভাগের একই ক্রমিক সংখ্যা থাকবে। এতে খত জাল হওয়ার কোন ভয় থাকবে না, আবার ঋণ অস্বীকার করাও রায়তের পক্ষে অসম্ভব হবে।

তাঁর মতে—সবচেয়ে ভাল পন্থা—সরকারই মহাজনের স্থান গ্রহণ করতে পারেন। রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে সরকার ও রায়তের মধ্যে যখন রাজা-প্রজার সম্পর্ক তখন অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ায় ব্যবস্থা সরকারই করতে পারেন। রায়ত ও মহাজনের মধ্যে বিবাদ 'দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বলিষ্ঠ পালোয়ানের সমতুল্য'। মামলা করতে হলে গ্রাম ছেড়ে রায়তকে শহরে অসতে হয়। রায়তের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। উপরন্তু মকদ্দমার খরচ ও উকিলের ফী সংগ্রহ করা রায়তের পক্ষে কঠিন। এসব কারণে মহাজনের দায়ের করা মকদ্দমায় রায়তগণ প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন ও ৯০% ভাগ মকদ্দমা রায়তের অবর্তমানেই নিষ্পত্তি হয়। আদালতের সাহায্য পাওয়া রায়তদের পক্ষে অসম্ভব জেনেই সত্যেন্দ্রনাথ সালিসী বিচারের পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। গ্রামের পাঁচজনে মিলে বিবাদ মেটানোর প্রথা এদেশে চিরকালই প্রচলিত ছিল।

সালিসী কোর্ট স্থাপনে পুণানিবাসী গণেশ বাসুদেব জোশীর প্রচেষ্টারও তিনি উল্লেখ করেছেন। বোম্বাই অঞ্চলের একজন জেলা জজ্ মিস্টার

উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ সালিসী কোর্ট ও আদালতের কার্যপ্রণালী সংযুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কারণ পঞ্চায়েতের একজন সভ্য, সুশিক্ষিত মুন্সেফের মতো আইনজ্ঞ নন, কিন্তু গ্রামবাসীদের চরিত্র রীতিনীতির সংগে তিনি অধিক পরিচিত। সুতরাং উভয় কোর্ট যুক্ত হলে দোষত্রুটিমুক্ত বিচার হতে পারে। এই প্রস্তাব সত্যেন্দ্রনাথের কাছে যুক্তিসংগত মনে হয়েছে। প্রত্যেক গ্রামে এ ধরণের সালিসী কোর্ট স্থাপিত হতে পারে। সেখানে যে সমস্ত মকদ্দমার সহজে নিষ্পত্তি হবে না সেগুলি মুন্সেফ কোর্টে আনা হবে। মুন্সেফ গ্রামে গ্রামে ঘুরে সার্কিট টুরে বিচারের কাজ নির্বাহ করতে পারেন।

মকদ্দমার খরচ বহন করা রায়তের পক্ষে যে অসম্ভব তিনি তা হিসাব সহ তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে আইনকর্তাগণের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন। বিশেষ করে অল্প টাকার মকদ্দমা সংক্রান্ত ফী কমানো প্রয়োজন।[৮]

গরীব রায়তেরা যাতে বিনা ফী-তে উকিলের সাহায্য পেতে পারেন, এবিষয়েও সরকার মনোযোগ দিতে পারেন।

সর্বশেষে সত্যেন্দ্রনাথ এও বলেছেন—'যে ব্যক্তি স্বয়ং কৃষিকার্য চালাইতে অক্ষম, সে যেন ভূম্যধিকারী না হয়'[৯]—সরকার এরূপ আইন প্রবর্তন করতে পারেন। এর ফলেই গরীব রায়তদের সর্বস্বান্ত হওয়ার পথ বন্ধ হতে পারে।

বোম্বাই রায়ত—পরিশিষ্ট : কৃষি কষ্ট নিবারণী বিল

'ভারতী' পত্রিকায় বোম্বাই রায়ত তিনটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরেই ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই রায়ত পরিশিষ্টটি 'কৃষিকষ্ট নিবারণী' আইনের আলোচনা। এই আইন প্রবর্তনের পরেই পরিশিষ্টটি লিখিত হয়। রায়ত কমিশনের রিপোর্ট, সরকারী কর্মচারীদের আলোচনা ও বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগ এই আইন প্রণয়নে ও সংশোধনে সহায়তা করেছে। আইনটি প্রবর্তনে সত্যেন্দ্রনাথের খুশী হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইতোপূর্বে ভারতী পত্রিকায় রায়তদের সমস্যা দূর করতে তিনি যে সমস্ত প্রতিকারের পথ দেখিয়েছিলেন—তার অনেকগুলিই কৃষিকষ্ট নিবারণী আইনে গৃহীত হয়।[১০] বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—'এই আইন মহাজনের পক্ষে যেমন কঠোর, রায়তের তেমনি লাভজনক।'[১১]

তবে সরকার আরও কিছু সুযোগ সুবিধা রায়তকে দিতে পারতেন—নির্ভীক হৃদয়ে তার সমালোচনা করতেও সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিধা করেন নি। তাঁর মতে—মহাজনের হাত থেকে রায়তকে রক্ষা করতে সরকার যতখানি তৎপর হয়েছেন, নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে রায়তকে সুবিধা দিতে ততখানি আগ্রহী হতে পারেন নি। সরকার ইচ্ছা করলে দুঃসহ করভারে প্রপীড়িত রায়তদের খাজনার অংশ মাপ করে দিতে পাবেন, রাজস্ব আদায়ে কঠোর নিয়মগুলি শিথিল করতে পারেন, রায়তদের ঋণ গ্রহণের জন্য ব্যাংক খুলতে পারেন ইত্যাদি প্রতিকারের কথা জানিয়েই 'বোম্বাই রায়ত—পরিশিষ্ট'টি শেষ করেছেন।

উপসংহার

এতক্ষণ পর্যন্ত বোম্বাইরায়ত নামক বিস্তৃত প্রবন্ধটির নানা দিক আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, তৎকালীন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত রাজকর্মচারীর পক্ষে এ ধরণের প্রবন্ধ লেখা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

গরীব রায়তের সম্পর্কে তাঁর হৃদয়ের সংবেদনশীলতা পাঠককে অভিভূত করে। অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ কত সচেতন ছিলেন সুদের হার আলোচনায় তা স্পষ্ট প্রমাণিত। তবে তত্ত্বের অন্ধ অনুবর্তন তাঁর মধ্য নেই। সেজন্যই সুদের নির্দিষ্ট হার বেঁধে দেওয়া রায়তের পক্ষে সব সময় কল্যাণকর হবে বলে তিনি মনে করেন নি। বাস্তব ক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তার আলোকেই প্রতিকারের পথ বেছে নিয়েছেন। এখানেই তাঁর স্বকীয়তা।

আইন আদালত সম্পর্কে সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ সমালোচনা তাঁর অনমনীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বহন করে। বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি এই প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন—'দরিদ্র প্রতিবাদীর-ন্যায়দণ্ড কিরূপ দুর্ঘট।'[১২]

দুর্ভিক্ষের বছরেও সরকারের খাজনা আদায়ের কঠোরতা, রায়তদের কল্যাণ সাধনে সরকারের স্বার্থহীন প্রচেষ্টার অভাব, সরকারী কর্মচারীদের নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি তিনি এই প্রবন্ধে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। ব্রিটিশ প্রভুর অধীনে কর্মরত অবস্থায় এ ধরণের সমালোচনা করা নিতান্ত সাহসিকতার কাজ। মহারাষ্ট্রে রায়ত বিদ্রোহের ফলে, সমস্যা সমাধানে সরকার ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভাবিত হয়েছেন, ঐ সময় সতেন্দ্রনাথের মতো সমাজ সচেতন ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়ে নীরব থাকা অসম্ভব ছিল।

সবশেষে চাষআবাদে সক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই জমির মালিকানা থাকার জন্য তিনি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব দিয়েছেন। এ ধরণের চিন্তা যথার্থই আধুনিক। এ যুগে প্রচলিত—'লাঙ্গল যার জমি তার' কথাটির অনেক আগেই সত্যেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ভেবেছেন।

সমগ্র রচনাটিতে একটি স্থিরবুদ্ধির পরিচয় সুস্পষ্ট। এর দ্বারা তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের অর্থনৈতিক আলোচনার পরিসর যেমন বিস্তৃত হয়েছে তেমনি তাঁর সুচিন্তিত মতের ঔজ্জ্বল্য এ যুগের পাঠককে আজও বিস্মিত করে।

১. বোম্বাই রায়ত : ভারতী—চৈত্র ১২৮৪।
ঐ ঐ—বৈশাখ ১২৮৫।
বোম্বাই রায়ত ২য় ভাগ : ঐ— শ্রাবণ ১২৮৫।
বোম্বাই রায়ত ৩য় ভাগ : ঐ—আশ্বিন ১২৮৫।

২. দ্রষ্টব্য W. W. Hunter : The Annals of Rural Bengal.
Alexander Mackenzie : History of the Relations of the Government with the Hill Tribes of the North East Frontier of Bengal.
ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা : রমেশচন্দ্র দত্ত। ভারতী ; ফাল্গুন, ১৩০৮।
বৃটিশশাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি : ঐ। ভারতী ; শ্রাবণ ১৩০৮।
বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত : ঐ। ভারতী ; পৌষ, ১৩০৮।
ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল : ঐ ভারতী ; আষাঢ়, ১৩০৯।
—ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত রমেশ-রচনাবলী-২য় খণ্ড(পৃ. ১-৪১) সংকলিত।
কালেক্টরেটের সর্বময় কর্তা কলেকটর, তালুকের রাজস্ব প্রধান মামলতদার, গ্রামের মণ্ডল পাটেল, হিসাব রক্ষক কুলকর্ণী ও গ্রামরক্ষক মাহার প্রমুখের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ইনি পাঠকের মনে স্পষ্ট ধারণা

জাগাতে সক্ষম হন। 'পাটেল' ও কুলকর্ণী'র কাজ বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ কারণ সরকারের সঙ্গে রায়তদের মধ্যবর্ত্তী হয়ে এঁরাই কাজ করেন।

৩. ভারতীয় দুর্ভিক্ষ (প্রথম প্রতিকার ভূমিকরের দাস) : রমেশচন্দ্র দত্ত দ্র: আশুতোষ দাস সম্পাদিত—রমেশ-রচনাবলী ! ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭।

৪. মহাজন।

৫. বোম্বাইচিত্র—পৃ. ২২৪।

৬. ঐ —পৃ. ২৩২।

৭. ঐ —পৃ. ২১৫।

৮. ঐ —পৃ. ২৯৫ দ্রষ্টব্য।

৯. ঐ —পৃ. ২২৯।

১০. '১২৮৫ সালের কয়েক সংখ্যক ভারতীতে প্রকাশিত "বোম্বাই রায়ত" শিরস্ক প্রবন্ধ পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে···উল্লিখিত প্রবন্ধে রায়ত ও মহাজনের পরস্পর ব্যাবহার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক বলিয়া সূচিত হয় বিচার্য আইন এ তাহার কতকগুলি নিয়ম সন্নিবিশিত দৃষ্ট হইবে'—বোম্বাই রায়ত; পরিশিষ্ট, পৃ. ২৩৭; বোম্বাইচিত্র।

১১. বোম্বাইচিত্র—পৃ. ২৪৬।

১২. ঐ পৃ. ২০৪।

সত্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা

রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ ও সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রের সংবিধান ও শাসনপদ্ধতি, সরকারী নীতির সমালোচনা, দেশের মংগল অমংগল ও ব্যক্তি অধিকারকে নিয়েই রাজনৈতিক চিন্তার আলোড়িত। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন থাকে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত—তেমনি থাকে সমাধানের পথ। প্রধানত এ দুটি নিয়েই রাজনৈতিক পরিবেশ রচিত হয়।[১]

সত্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার আদর্শ তাঁর নিজের মুখেই নাটোরের বংগীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে ব্যক্ত হয়েছে, 'It should be our aim to foster a spirit of independnce and self-reliance, among our countrymen ; our motto should be : Heaven helps those that help themselves.' দেশের মংগল সাধনে পরমুখাপেক্ষিতার পরিবর্তে আত্মশক্তির সাধনাকেই তিনি উচ্চে স্থান দিয়েছেন।

এলান অক্টেভিয়ান হিউমকে আমাদের 'রাজনৈতিক মন্ত্রদাতা'[২]র উচ্চ আসনে বসিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি হৃদয়ের অজস্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এদেশের জাতির উন্নতি বিধানে হতাশা দূর আত্মশক্তিতে বলীয়ান হবার জন্য ভারত-দরদী হিউম তাঁর 'Awake' কবিতায় যা বলেছেন—তার সংগে সত্যেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার গভীর সাদৃশ্য লক্ষিত।

'Sons of Ind, Why sit ye idle,
Wait ye for some Deva's aid ?
Buckle to, be up and doing !
Nations by themseves are made !'[৩]

সত্যেন্দ্রনাথের কথায় অনুরূপ প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়—'There are a great many things we have got to do independently of Government aid, if we desire to rise in the scale of nations.'[৪] দেশের নুতন নুতন ক্ষেত্র আবিষ্কার করে সম্পদের উৎস বাড়ানো, দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালন, সামাজিক কুপ্রথার বিসর্জন ও অবকাশ মতো জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিকিরণ প্রভৃতি কাজগুলি বিদেশী সরকারের সাহায্য

ছাড়া নিজেদেরই করতে হবে বলে সত্যেন্দ্রনাথ দৃঢ় মত পোষণ করতেন। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা ও কর্তব্যানুভূতিই দেশের মঙ্গল সাধন করতে পারে। আইন মানুষের প্রতি মানুষের সকল দুঃখ দূর করতে পারে না। তাকে কার্যকরী রূপ দিতে মানুষেরই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হয় আবার যে আইনে প্রকৃত কল্যাণ নেই মানুষেরই শুভবুদ্ধি তাকে বর্জন করে। এ প্রসঙ্গে গোল্ডস্মিথের দুটি লাইন সত্যেন্দ্রনাথের যথাযথ মনে হয়েছে—

> How small of all human hearts endure
> That part which laws of kings can cause or ours ![৫]

মৌলিক উপাদান—স্বদেশ প্রেম

স্বদেশের প্রতি সম্ভ্রম ও মমত্ব রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যেই অনুস্যূত থাকে। ভারত-সংগীতের মাধ্যমে দেশাত্মবোধের উজ্জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ যে কতখানি সফলতা লাভ করেছিলেন তা তাঁর মৃত্যুর পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত তাঁর শোকসভায় হেমেন্দ্রনাথ ঘোষের কণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে। 'তাঁহার স্বজাতিপ্রীতি কতদূর প্রবল ছিল—উক্ত গানটিই তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।'[৬]

সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার আদর্শের স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে স্বদেশচেতনা অধ্যায়ে। বর্তমান অধ্যায়ে ভারত সাম্রাজ্যের বিদেশী সরকার অনুসৃত আইনকানুন, রাজস্ব, শাসন ব্যবস্থা, ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের সদ্ভাব স্থাপনে অনীহা, সরকারী উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্পর্কে ইংরেজদের প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমতগুলি আলোচিত হবে। রাজনৈতিক আন্দোলনে যে বিশিষ্ট পথ তিনি সত্য বলে গ্রহণ করেছেন আলোচ্য অংশে তাঁর বিভিন্ন পত্রাবলীর মাধ্যমে তার পূর্ণ পরিচয় আহরণ করা যেতে পারে।

নবযুগের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

সত্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার বিশ্লেষণের পূর্বে স্বদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সামান্য আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কারণ যুগের প্রভাব মানুষের চিন্তাধারার উপর ছায়া ফেলে। উনিশের শতকের চতুর্থ দশক থেকে নবম দশক পর্যন্ত এদেশে যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে

সেগুলি তৎকালীন রাজনৈতিক ভাবধারাকে পুষ্ট করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই দ্বারকানাথ প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত 'বংগভাষা প্রকাশিকা' সভার মধ্যেই সেযুগের রাজনৈতিক চিন্তার অংকুর দেখা যায়।[৭] ঐ সভায় রক্ষণশীল ধর্মসভার দল যোগদান করেন নি। কিছুদিন পরে নিতান্তই অর্থনৈতিক স্বার্থকে ভিত্তি করে 'ভূম্যধিকারী সভা'র সৃষ্টি হলেও, রক্ষণশীল—ধর্মসভা ও ব্রহ্মসভা—দুদলের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এই সভার অবদান উল্লেখ্য।[৮] তথাপি নব্য বংগীয়েরা, যাঁদের ভূসম্পত্তি নেই, তাঁরা এই এই সভার সভ্য হতে পারেন নি। এঁদের প্রচেষ্টায় ১৮৩৮ সনে স্থাপিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি ছাড়াও রাষ্ট্রবিধি প্রভৃতি আলোচিত হতো।[৯] এই সভার স্থায়ী সভাপতি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। দ্বারকানাথের উদ্যোগে এদেশে জর্জ টম্পসনের আগমন ও দ্বারকানাথের প্রচেষ্টায় নব্য-বংগীয়দের সংগে তাঁর যোগাযোগ এদেশে রাজনৈতিক চিন্তার জগতে একটি নূতন ভাবের সূচনা করে। এর ফলে নব্যবংগীয়েরা পাশ্চাত্যের পরিশীলিত রাজনৈতিক কর্ম-পদ্ধতির সংগে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান এবং ১৮৪৩-এর ২০শে এপ্রিল 'বেংগল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা হয়, 'সভাপতি জর্জ টমসন, সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র'।[১০] এই সভার সভ্যদের অনেককে জীবিকার্জনের জন্য বিষয়ান্তরে লিপ্ত হতে হয়। ফলে দীর্ঘদিন এক নাগাড়ে সভার কাজ চলতে পারেনি।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-দরদী ড্রিংক ওয়াটার বেথুন ভারতীয়দের সংগে ইংরেজদের অধিকার ও বিচার ব্যবস্থার বৈষম্য দূর করার জন্য যে আইনের খসড়া রচনা করেন ভারতবর্ষীয় ইংরেজগণ সে আইনকে কালো আইন (Black Act) নাম দিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে তার বিরোধিতা করেছিলেন, যে জন্য সেটি আর আইনে রূপান্তরিত হয় নি। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষিত ভারতবাসীর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যার ফলেই দেবেন্দ্রনাথের আহ্বানে রক্ষণশীল ধর্মসভার দল, রামমোহন অনুসারী মধ্যপন্থী দল ও তৎকালীন নব্যপন্থীদল—এই তিন দলের সংমিশ্রণে ১৮৫১ সালের ২৯শে অক্টোবর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য বিবিধ আন্দোলনের সূচনা

হয়[১১] এই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহকারী সম্পাদক দিগম্বর মিত্র। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় এর উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছিল—

"...the object of this Association shall be to promote the improvement and efficiency of the British Indian Government by every legitimate means in its power, and thereby to advance the common interest of Great Britain and India and the condition of the native inhabitants of the subject territory."[১২]

প্রকৃতপক্ষে এই অ্যাসোসিয়েশন, কয়েকমাস পূর্বে দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত 'দেশহিতৈষিণী সভা'রই পরিণতি।[১৩] সে সময় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে দেশীয় মংগলজনক অভিধাকে যুক্ত করার একটা প্রবণতা ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কর্মপদ্ধতি শুধুমাত্র কলকাতায় সীমাবদ্ধ রাখেন নি। মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে যাতে অনুরূপ রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হয় তারজন্য সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংগে যোগাযোগ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে দেবেন্দ্রনাথ দুবছর দেড়মাস সম্পাদকরূপে কাজ করেছেন। তাঁর যত্নে ঐ সময় অ্যাসোসিয়েশন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসেসিয়েশন-এর সংগে সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংযোগ আরও বিস্তৃততর করার উদ্দেশ্য এর বার্ষিক চাঁদা পঞ্চাশ টাকা থেকে পাঁচ টাকায় নিয়ে আসার জন্য শিশির কুমার ঘোষ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তিনি নিজেই সাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য ১৮৭৫ সালে ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপন করেন।[১৪]

মহারাণীর অনুমতিতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার দরজা যে ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে—এ সংবাদ সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু মনোমোহন ঘোষই সর্বপ্রথম নিয়ে আসেন ও দুজনে মিলে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য 'বিলেতে' যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন (১৮৬২)।[১৫] ঐ পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্যের ফলে ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগের সুযোগ ঘটে ও ভারতীয় সিভিলিয়ানগণ ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের বৈষম্যমূলক আচরণগুলো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন।

সত্যেন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সিভিলিয়ানী পরীক্ষার নিয়মকানুন এমন ভাবে বদলানো হয় যাতে ভারতবাসীর পক্ষে তা উত্তীর্ণ হওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে। মনোমোহন ঘোষ বিলাতের কর্তৃপক্ষের কাছে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার পাঠ-ক্রম পরিবর্তন নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন।[১৬] কিন্তু কিছুই হয়নি। অগত্যা ব্যারিস্টর হয়েই তাঁকে দেশে ফিরতে হয়েছে।

বয়সের বাধাসৃষ্টি করে সুরেন্দ্রনাথকে কী রকম ভাবে আটকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল তা তাঁর আত্মজীবনীতে ব্যক্ত হয়েছে।[১৭] সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার পরেও ইংরেজদের ঈর্ষামূলক আচরণের জন্য সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে দীর্ঘদিন ঐ কাজে নিযুক্ত থাকা সম্ভব হয়নি।[১৮] ইংরেজের কাছে ঘা খেয়েই তাঁর জীবনের মোড় ফিরে যায়। আনন্দমোহনের প্রতিষ্ঠিত ছাত্রসভায় সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সহ দেশ-বিদেশের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীতে অভিব্যক্ত হয়েছে।[১৯]

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা 'ভারতসভা' স্থাপিত হয়।[২০] অতীত গৌরবাশ্রিত ভারতের স্বদেশাভিমানের প্রবাহকে সুরেন্দ্রনাথ কল্পনার আদর্শভূমি থেকে নূতন পথে পরিচালিত করে আধুনিক ইতিহাসের বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ভাবগৌরবময় দেশাত্মবোধের উজ্জীবনে সত্যেন্দ্রনাথের প্রাথমিক কৃতিত্ব সশ্রদ্ধে স্বীকার করে নিয়েও নবযুগের ছাত্রদল যেদিন দূরাতীত কালের মহাভারতের বীরদের চেয়েও সুরেন্দ্রনাথের মুখে শোনা শিখবীরত্বকেই স্বদেশাভিমানের আশ্রয় করে ছিলেন —তা বিপিনচন্দ্র পালের বক্তব্যে পরিস্ফুট।[২১] শিখ খালসার উৎপত্তি ও অভ্যুত্থানের কাহিনী ছাড়াও সুরেন্দ্র বক্তৃতায় 'Young Italy' ও Young Ireland' -এর স্বাধীনতার আন্দোলন ভারতের যুবকদলের রক্তে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

সে সময়ে উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ মেনে নিলেও কার্যত ভারতীয় সিভিলিয়ানদের স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই সীমায়িত করা হতো। ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের স্বার্থরক্ষার জন্য রচিত আইন কানুন এদেশের মর্যাদাসম্পন্ন সিভি-লিয়ানদের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট বিহারীলাল গুপ্তের আবেদনে লর্ড রিপন ভারতীয় ইংরেজ ও এ দেশীয় সিভিলিয়ানদের অধিকারের বৈষম্য দূর করতে ইলবার্ট বিলের যে খসড়া

প্রস্তুত করান, তা এ দেশীয় ইংরেজদের প্রবল বিরোধিতায় পরিবর্তন করতে হয়। সংশোধিত ইলবার্ট বিল যেভাবে পাশ হয় তাতে ইংরেজদের স্বার্থই রক্ষিত হয়েছিল। পারিবারিক জীবনে বিহারীলাল গুপ্তের সংগে সত্যেন্দ্র নাথের গভীর সৌহার্দ্যের ফলে এদেশীয় সিভিলিয়ানদের প্রতি ইংরেজদের মনোভাবের যে আশু প্রতিবিধান দরকার, এ বিষয়ে দুজনেই একমত ছিলেন তা ধরে নিতে কোন বাধা নেই। প্রসংগত এ ব্যাপারে সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তেরও আন্তরিক সমর্থন ছিল।[২২]

সংঘবদ্ধ ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের জন্য অনুরূপ সংঘবদ্ধ শক্তির একান্ত প্রয়োজন—তাই সর্বাগ্রে দেশের নানা স্থানে এই ঐক্যবদ্ধ জনশক্তি গঠিত করার দিকে 'ভারতসভা'র কর্মীবৃন্দ আত্মনিয়োগ করলেন।

সিভিলিয়ান হিউম ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছিলেন। তাই অবসর জীবনে ভারত বাসী ও ইংরেজদের মধ্যে বিদ্বেষ দূর করার ব্রত নিয়েই ১৮৮৩ সালে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৮৩ সালেই একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য হিউম চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ১৮৮৫ সালের আগে আর কোন সম্মেলন হতে পারেনি। ১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইতে সম্মেলন আরম্ভ হয় তার কয়েকদিন মাত্র পূর্বে 'কংগ্রেস' নামটি গৃহীত হয়। প্রকৃত পক্ষে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন' ই 'কংগ্রেসের' অগ্রজ।[২৩]

এপর্যন্ত যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনা করা হলো, সেগুলিতে সত্যেন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব থেকে তাঁর কর্মজীবনের শেষ অবধি তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। ঐ পরিমণ্ডলের বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ ও কর্মোদ্যোগ সত্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে গঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের শৈশব থেকেই হওয়া সম্ভব। ফলে ভারতীয়দের অধিকার রক্ষায় আইন-প্রণয়ন, শাসন-সংস্কার রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল।

ঐ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তাঁর ভারতীয় ইংরেজদের প্রভুসুলভ আচরণের প্রতিবাদে, কংগ্রেসকে রাজদ্রোহী বলার জন্য ক্ষোভে ও বিরক্তিতে, কারণ তাঁর মতে শাসকের উদ্দেশ্য প্রজার কল্যাণ, আইনের সাহায্যে প্রজাদের সুখসুবিধা

ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার দান, আর প্রজার কর্তব্য শাসকের সঙ্গে সহযোগিতা ও আত্মশক্তিতে জাগ্রত হয়ে দেশের ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ। তাঁর রাজনৈতিক কর্ম ও চিন্তায় এই সব ধারণাই প্রতিফলিত। পরবর্তী আলোচনায় এর প্রমাণিকতা আর ও স্পষ্ট হবে।

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের মনোভাব

ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্যের অবসান করে যে প্রীতির সম্পর্ক রচনা করা হিউমের উদ্দেশ্য ছিল—সেদিকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও চিন্তা করেছেন। জাতি হিসেবে ইংরেজ যে কত কর্তব্যনিষ্ঠ, সময়নিষ্ঠ পরিশ্রমী ও সভ্য একথা মুক্তকণ্ঠে সত্যেন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। কিন্তু ইংলণ্ডে যে ইংরেজদের আচরণ মোহিত করে সেই ইংরেজই ভারতবর্ষে এলে তার মধ্যে কোন সদ্ভাবের চিহ্ন থাকে না। ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের এই অদ্ভুত আচরণ সত্যেন্দ্রনাথকে পীড়া দিয়েছে। সেজন্যই 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ"[২৪] পুস্তিকার প্রথমেই বলেছেন—"ইংরাজেরা এদেশ জয় করিয়া শতাব্দীর অধিক কাল আমাদের উপর রাজত্ব করিতেছে, কিন্তু এদেশীয়দিগের সহিত এখনও তাহাদের সদ্ভাবের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না'। ইংরেজগৃহে—ইংরেজ গৃহিণীর ঔদার্য ও সেবায় ভারতবাসী ছাত্রগণের প্রবাসে—গৃহের স্নেহময় অভাব দূরীভূত হয় অথচ সেই ইংরেজ ভারতবর্ষে এলেই নেটিভের কাছে তাদের দ্বার রুদ্ধ—হাস্যের পরিবর্তে ভ্রূকুটি। সত্যেন্দ্রনাথের কথায়—'তাহাদের আপনাদের দলবল লইয়া যে ব্যূহ বন্ধন করে, সাধ্য কি যে, এদেশীয় কোন ব্যক্তি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাদের রাত্রি আমাদের দিন—আমাদের দিন তাহাদের রাত্রি।'

এদেশে আনন্দ উপভোগের জন্য তাঁরা যে 'ক্লাব' সৃষ্টি করেন—নাচের সময় তা ইন্দ্রপুরীর মতো সজ্জিত হয়ে ওঠে। এসকল ক্লাবে ভৃত্যগণের কর্মতৎপরতা, শৃঙ্খলা, আহারপারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও সোলাপুরে এই ইংরেজ ক্লাবেরই প্রেসিডেণ্ট ছিলেন তবে এ সকল ক্লাবের সমারোহ ও 'নাচের মজলিস-এ প্রথম বিলাতে গিয়ে অনেকেরই যে 'মস্তক ঘূর্ণিত' হয়, এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ মন্তব্য না করে পারেন নি।

এই ক্লাবের মোহে অনেকেরই নিজের স্বদেশকে বর্বর মনে হয় ফলে অন্ধভাবে পরানুকরণের দাস হয়ে পড়েন।

এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রয়োগ করে সজাগ করেছেন—'ভারতবর্ষে ফিরিয়া আমাদের চক্ষু ফুটে, আমরা দেখিতে পাই যে, এ জাদুর রাজ্য আমাদের নহে, আমরা যে ইংরাজের পদধূলি লইতে যাই, তাহাদের পদাঘাত পাইয়া আমাদের অবশেষে চেতনা হয়।' [পৃ. ১৫-১৬ ভারতবর্ষীয় ইংরাজ]

অনুকরণ সম্পর্কেও সত্যেন্দ্রনাথ কঠোরভাবে সাবধান করেছেন—'যদি অনুকরণ করাই আবশ্যক হয় তবে দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা খাটাইয়া যেন অনুকরণ করি। এমন মনে করিও না যে, ইংরাজী রীতি নীতি অবলম্বন করিলে ইংরাজ সমাজে সমাদৃত হইবে। বরং তাহাতে তোমার একুল ওকুল দুকুল যাইবারই সম্ভাবনা'।[২৫] সত্যেন্দ্রনাথের মতে ইংরেজদের কাছ থেকে ব্যায়ামচর্চার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করলে ভারতবাসী নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে কারণ 'আমরা মনে করি বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ—বাল্যকালই ক্রীড়ার কাল··· শীতকালে অর্দ্ধক্রোশ পদচালনা—বাবুদের ব্যায়ামের এক শেষ।'[২৬] ইংরেজের অনেক ভাল গুণ থাকলেও ভারতবর্ষের পরিবেশে রাজপুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁরা ভারতীয়দের সঙ্গে যে ভাবে আচরণ করেন তাতে দু জাতির বিচ্ছিন্ন ভাব যে কোনকালে অপনীত হবে এ আশা সত্যেন্দ্রনাথের মনে স্থান পায় নি। সত্যেন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন—'তাঁহাদের মনে রাখা উচিত—প্রজারঞ্জন রাজার প্রধান ধর্ম। তাঁহারা যদি একপদ অগ্রসর হইয়া আসেন আমরা সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে প্রস্তুত।'[২৭] সুতরাং অতি অল্প প্রয়াসেই ইংরেজরা আমাদের সদ্ভাব আকর্ষণ করতে পারেন অথচ এই সদ্ভাবস্থাপনকে ইংরেজরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন না। কারণ বর্ণে ধর্মে সামাজিক রীতিনীতিতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এই জাতিকে ইংরেজ কখনও আপন মনে করতে পারেন না—তাঁদের আন্তরিক বিদ্বেষভাব কিছুতেই দূর হয় না। প্রথম যুগে ইংরেজরা যাও বা ভারতবাসীর সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করেছিলেন—সুয়েজ খাল উন্মোচনের পর স্বদেশে যাওয়া সহজ হওয়াতে সে চেষ্টাও আর রাখবার প্রয়োজন হলো না। এখানে অর্থসঞ্চয়ের পর দেশে ফিরে বার্দ্ধক্যে নিশ্চিত আরামে পেনসন ভোগ করাই ভারতবর্ষীয়

ইংরেজদের লক্ষ্য। অথচ এই মোটা পেনসনগুলি ভারতীয় রাজস্ব থেকেই ব্যয় হচ্ছে। যেহেতু ইংরেজরা ভারতবর্ষে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সেজন্য কোন ভারতীয় যে এঁদের কাছে সামাজিক সম্পর্কে যেতে পারেন একথা তাঁরা ভাবতে পারেন না। সব সময়েই মনে করেন যে চাকুরীপ্রার্থী হয়েই ভারতবাসীরা তাঁদের কাছে যাচ্ছে সুতরাং কালো আদমীদের কাছ থেকে 'সেলাম' প্রত্যাশা করেন। প্রভু-দাসের সম্পর্কটি অনুক্ষণ এঁদের মধ্যে বিরাজ করে। পদ-মর্যাদার ফলে যে বিচ্ছিন্নতা এখানে রচিত হয় তা পরে আপন সমাজে গেলেও ঘোচে না—কারণ আমাদের জাতিভেদ বংশমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত আর ইংরেজদের জাতিভেদ ধন ও পদমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরাজচরিত্রের জাতীয় ঔদ্ধত্য John Bull[২৮] ভাব ত্যাগ না করার ফলেই ভিন্ন জাতির সংগে তার মিলনের অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের কথায়—'ইংরাজেরা পৃথিবী জুড়িয়া আপনাদের রাজত্ব বিস্তার করিতেছেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের সংকীর্ণ দ্বীপোচিত ক্ষুদ্র ভাবে পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন জাতির সংগে মিশিতে পারেন না, তাঁহাদের স্বভাবই এরূপ নয়। ইংরাজ ও ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির মধ্যে যখন এমন অমিল তখন এদেশীয়দের ত কথাই নাই।'[২৯] অথচ পশ্চিম থেকেই, জাতীয়-ঔদ্ধত্যকে ঝেড়ে ফেলে, বিশ্বমানবতার দৃষ্টি নিয়ে যাঁরা ভারতকে দেখতে এসেছেন তাঁরা ভারতের সংগে এক নিবিড় ঐক্য অনুভব করেছেন। তাঁদের সংগেই ভারতের নিবিড় আত্মিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এণ্ডরুজ-এর উক্তি দিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ তা সবশেষে প্রমাণ করেছেন,—'একটি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমি নিজের মনেও এখনো পর্য্যন্ত পরিষ্কার ভাবে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই, কিন্তু ইহা সত্য যে, কোন কোন অসাধারণ মনীষী পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, যাঁহারা এদেশের জীবনের মর্ম্মস্থলে তৎক্ষণাৎ যেন সহজ জ্ঞানের দ্বারা প্রবেশ লাভ করেন, প্রেমের দ্বারা তাহার সহিত এক হইয়া যান। এই যে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রণয়ের উদ্রেক তাহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার,...ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এক বংশজাত ছিলেন বলিয়াই আজ আমরা এমন অবিলম্বে, এমন অভূতপূর্ব্বভাবে এই আত্মীয়তা অনুভব করিয়া থাকি।'[৩০] রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের অবদান বিশ্লেষণের পূর্বে ভারতবর্ষীয় ইংরেজ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব সামান্য

আলোচিত হলো। কারণ দীর্ঘদিন এই সমাজের সংগে তিনি মিশেছেন; দেশের শাসনযন্ত্রের কলকাঠি এঁদের হাতেই নড়তো। কর্মক্ষেত্রে সমানাধিকার প্রযুক্ত হলেও, 'রাজার জাত' ও 'প্রজার জাতে'র মধ্যে বাইরে ভদ্রতার খোলস থাকলেও, অন্তরের ব্যবধান যে কিছুতেই ঘুচবে না এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ দৃঢ়মত পোষণ করতেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মূল্যে 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' প্রসংগে সত্যেন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি মোটামুটি প্রামাণিক বলে ধরে নিতে কোন বাধা নেই।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অবদান

ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের সংগে ছক কাটা জীবনযাত্রার ফাঁকে সরকারী কর্মচারী রূপে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেবার তাঁর সুযোগ হয় নি অবসর নেবার সংগে সংগেই সিবিলিয়ানি খোলসটুকু ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক কর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর সিভিল সার্ভিসের সাফল্যে দেশবাসী পূর্বেই গর্বিত ছিলেম। নাটোরের বংগীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির আসনে তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁরা উৎফুল্ল হলেন। রাজকাজের মাঝে থেকে দেশের ডাকে সাড়া না দিতে পারার দুঃখ তাঁর কম ছিল না সেজন্য প্রথম সুযোগেই পরম উৎসাহে ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। সভাপতি বরণের ভাষণে মাননীয় গুরুপ্রসাদ সেনের বক্তব্যে একদিকে যেমন জনতার বিপুল হর্ষধ্বনির আভাস পাওয়া যাচ্ছে তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের আগমন যে পরম আশাপ্রদ এই ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট।—"It gives me, I say, unbounded pleasure again that no sooner he has freed himself from the trammels of his official career than he has come forward and infact heartily and enthusiastically joined us in the political movements that mark the hopes and aspirations of the people of this land (*loud cheers*).[৩১]

নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সংগে ঠাকুর পরিবারের গভীর সম্প্রীতি ছিল। এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে তিনি ঠাকুর পরিবারে সকলকেই নাটোরে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ ঘোষাল, আশুতোষ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ

ও অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখেরা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।' 'রাণী ভবানীর রাজধানী'[৩২] নাটোরে তাঁরা যে রাজকীয় আতিথ্য লাভ করেছিলেন তার বিস্তৃত সরস বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'[৩৩] গ্রন্থে পাওয়া যায়। জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সৌজন্যে যে সকলেই মুগ্ধ ও সর্বশ্রেণীর জনসমাবেশে সম্মেলনে নূতন প্রাণের বন্যা এসেছিল অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদ-প্রতিনিধির লেখনীতেও তার সাক্ষ্য রয়েছে—'No one can go through the admirblc speech of the Maharajah of Nattore, chairman of the Reception Committee, without feeling that it has at last pleased Providence to bring abott that happy combination of the classes that divide our people, which is bound to secure the ultimate regeneration of the country.'[৩৪] বস্তুত সর্বশ্রেণীর বিপুল জনসমাবেশে নাটোরের সম্মেলনকে গুরুপ্রসাদ সেন একটি যুগান্তকারী সম্মেলন বলেছেন। একদিকে দুর্ভিক্ষের দুঃখ ভুলে গিয়ে রাজসাহী অঞ্চলের জনগণ এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন তেমনি বহু জমিদার নূতন উদ্দীপনা নিয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, এমনকি যে সমস্ত রাণীরা সম্মেলনে উপস্থিত হন নি তাঁরাও নিজ নিজ দেওয়ানকে প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়, দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায়, চৌগাছ্‌এর রাজা রমণীকান্ত রায়, জমিদার সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী, কিশোরীনাথ চৌধুরী, দ্বারকানাথ চৌধুরী, যোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী, কুঞ্জমোহন মৈত্র প্রমুখেরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রাণী হেমন্তকুমারী দেবী, রাণী মনোমোহিনী দেবী ও দুবলহাটির রাণীরা তাঁদের দেওয়ানদের পাঠিয়েছিলেন। নাটোর কোন 'টাউন হল' না থাকায় সহস্রলোকের স্থানধারণের উপযোগী একটি প্যাণ্ডেল তৈরী করতে হয়েছিল। নয়নাভিরাম এই প্যাণ্ডেলটি দূর থেকেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নাটোরের ছোট তরফের রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সভাপতি পদের জন্য সত্যেন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করেন। অভ্যাগতদের আতিথেয়তার প্রতি তাঁরও প্রখর দৃষ্টি ছিল ও নিজের বাগান-বাড়ি অভ্যাগতদের থাকার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৩৫]

সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাব সভায় কতখানি গৃহীত হবে সেসম্পর্কে তাঁর সামান্য সংশয় ছিল, কারণ একজন অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ানের চিন্তাধারা রাজনৈতিক

কর্মীদের মনঃপূত নাও হতে পারে। সেজন্য তাঁর ভাষণের প্রথমেই বলেছেন— 'I am bound to warn you, gentlemen, that you run some risk in dragging an ex-civilian from the obscurity of his retirement, into the open field of politics. The field is new to me and untried ; and I know not how far I shall be at one with you in what I have to say.'[৩৬]

সরকারের সমালোচনা করে মার্জিতভাবে নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা পেশ করার অধিকার প্রত্যেক উন্নতিশীল রাষ্ট্রের নাগরিকদের থাকা প্রয়োজন। এদিক থেকে কংগ্রেসকে বিরোধী দলের ভূমিকাই নিতে হয়েছে। জনসাধারণকে সজাগ করার জন্য কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সরকারী বিধিনিষেধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে সংবিধান-নিয়ন্ত্রিত পথে চলার দিকেই আগ্রহশীল হবেন একথা নিজেই ব্যক্ত করেছেন—'I am free to place my humble services at your disposal, and join in any movement calculated to secure the political advancement of our countrymen by methods strictly within constitutional limits.''[৩৭]

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগকে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই মন্তব্য করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন কংগ্রেসের আন্দোলনের দ্বারা যাদের কাজকে সমালোচনা করা হচ্ছে ও যাদের একচেটিয়া অধিকারকে আক্রমণ করা হচ্ছে তারাই শুধু এধরণের অভিযোগ সহজ ভাবে তুলতে পারছে। কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ কি ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে স্বীকার করেন না? বা ব্রিটিশ শাসনে দেশ যে নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে সেজন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করেন না? সুতরাং এর প্রতি রাজদ্রোহের অভিযোগ নিতান্তই অমূলক। ব্রিটিশ শাসনের স্থানে অন্য কোন কর্তৃত্বকে সেসময়ে কল্পনা করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব ছিল। সেজন্য সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ জোরের সংগে তাঁর ভাষণে বলেছেন—'I do not think that even the wildest dreamer, who aspires to a free and united India does not realise that for generations at least cessation of British rule

would be the most grievous of calamities, bringing, as it would, the most hopeless anarchy in the place of Pax Britannica'.[৩৮] স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সেসময় এদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসনের অপসারণ জনগণের পক্ষে কল্যাণমূলক হবে বলে তিনি মনে করেন নি।

প্রসংগত ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের যে সকল পত্র বিনিময় হয়েছে—সেখানে দ্বিজেন্দ্রনাথও ব্রিটিশরাজের বিরোধী পক্ষ হয়েও ব্রিটিশের অন্তর্ধান যে তৎকালীন সময়ে দেশের পক্ষে হিতজনক হবে না তা তাঁর পত্রে আভাস দিয়েছেন। সুতরাং রাজনৈতিক চিন্তায় দুই ভাইয়ের মধ্যে মিল না থাকলেও এক্ষেত্রে অমিল ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন—'ভাই সতু।...Politics-এ তোমার আমি বড়দাদা আর সেইজন্য তোমরা নীচে পড়া দূরে থাকুক—তোমার চেয়ে আমি আরো এককাটি সরেস। আমার বিশ্বাস এই যে, British Government-এর Pressure বর্তমান অবস্থায় আমাদের মাথার উপর থেকে অপনীত হয়, তবে আমাদের কী যে শোচনীয় দশা হইবে তাহা এক মুখে বলা যায় না। এখন এই ঘোরতর দুরবস্থার মধ্যেও যখন আমাদের চক্ষু ফুটিতেছে না—তখন British Government-এর Pressure অন্তর্ধান করিলে—আমাদের দিশী Governor-এরা, অত্যাচারী জমিদারেরা, Priest-ridden উচ্চবংশীয়েরা এবং স্বার্থপর ধনাঢ্যেরা যে হাতে মাথা কাটিবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই। British Government আমাদের পল্লীগ্রামস্থ জমিদারদের Government অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল।[৩৯] সেজন্যই কংগ্রেসের প্রতি রাজদ্রোহের অভিযোগের বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন—'why should it be stigmatized as seditious ?...we are simply here to express our wants and aspirations, and interpret the sentiments of our people on questions which concern their welfare.[৪০]

ব্রিটিশ শাসনের অধীনে জনসাধারণের মনে যদি সন্তোষ না থাকে তাহলে সমস্ত শাসনব্যবস্থাই ব্যর্থ। সেজন্য জনসাধারণের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করা কংগ্রেসের প্রধান কাজ। ব্রিটিশ সরকার উন্নতিশীল সরকার হলেও এটি একটি বিদেশী সরকার। সত্যেন্দ্রনাথের মতে এই বিদেশী সরকারের পক্ষে দেশের লোকের সকল সমস্যা বোঝা অসম্ভব।

সেইজন্যই দেশের লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিও এই সরকার উদাসীন। এই কারণেই ধীরে ধীরে জনগণের মনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই বিদ্বেষ-বহ্নি যতই প্রজ্বলিত না হয়, ততই দেশের মঙ্গল। এই বিদ্বেষ-বহ্নি প্রশমনে কংগ্রেসের ভূমিকা অন্যতম।

দুই জাতির মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য দূর করে সম্পূর্ণ মিলন ঘটানো যে অসম্ভব ব্যাপার তা 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' প্রসঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন। তবে যতদূর সাধ্য দুদলের বিভেদের প্রাচীর যাতে উঁচু না হয়ে ওঠে সেদিকে দেশের চিন্তাবিদদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের উপযুক্ত পত্রের মধ্যেও দুই ভাই যে এবিষয়ে একই রকম চিন্তা করেছেন তার আভাস পাওয়া যায়—

'একথা খুব ঠিক যে, তুমি যেমন লিখেছ, Governor & the Governed-এর মধ্যে gap বাড়ানো অনর্থের মূল—gap কমানো শ্রেয়ের মূল।'[৪১]

পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করতে আত্মত্যাগের সাধনা

সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন—শুধু মাত্র মুখে দেশ-প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করে ও পরছিদ্রান্বেষী সমালোচকের মতো ব্রিটিশের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেই দেশের প্রকৃত হিতসাধন হয় না। আমাদের মধ্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায়। সেজন্য আত্মস্থ হয়ে প্রতিটি আইন ও নিয়মকে সতর্ক দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে বিচার করে, প্রতিকারের পথও সরকারকে দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব জননেতাদের হাতে আছে। সেজন্য কোন ন্যায়সঙ্গত ও সুবিবেচিত সিদ্ধান্তে পেঁছবার আগে জননেতাদের কঠোর শ্রমের সম্মুখীন হতে হবে। সত্যেন্দ্র নাথের মতে—যদি আমরা আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে সামঞ্জস্যের দৃষ্টিতে আমাদের সম্মুখের নানা সমস্যার কথা চিন্তা করি ও অসংখ্য অসুবিধায়ও পশ্চাৎপদ না হই তবে আমাদের আইনসঙ্গত আকাঙ্ক্ষার ফললাভে শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই সমর্থ হবো। প্রসঙ্গত সত্যেন্দ্রনাথ গ্রেট ব্রিটেনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—সেখানকার জনসাধারণ অতটা সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় কাজ না করলেও, সেখানেও বহু সংগ্রামের পর প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হয়েছে। অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগপূর্ণ বীরত্ব ছাড়া কোন মহৎ প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে না।[৪২]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এক মহান সত্যের সংগ্রাম। সেজন্যই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে দেশবাসীকে সজাগ করে বলেছেন—'Let us beware that we do not prove unworthy soldiers on the field of battle. We are volunteers in a noble cause, and not merely playing as soldiers engaged in a sham fight.'[৪৩]

কি কি বিষয়ে সংগ্রাম করতে হবে তার পূর্ণ তালিকাও ঐ সম্মেলনেই সত্যেন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন। দেশের দারিদ্র্যে বিরুদ্ধে জনসাধারণের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে, স্বার্থপর লোকের বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে ও সর্বোপরি ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। শত্রুকে পরাজিত করতে হলে সমান বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করতে হবে আর সেই বীরত্ব অর্জিত হবে আত্মত্যাগের সাধনায়।

দেশের মধ্যেই আর একদল সমালোচক ছিলেন। তাঁরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ ধরণের সম্মেলন আহূত হয় সেই উদ্দেশ্যগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করলেও, এ ধরণের সম্মেলনে তা সাধিত হবে বলে বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং সত্যেন্দ্র নাথ তাঁদের সংগে কতখানি একমত হতে পারাবন সে সম্পর্কে সংশয়ান্বিত ছিলেন।

প্রাদেশিক সম্মেলনে সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাব ও রবীন্দ্রনাথের বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

শিক্ষা বিষক পদগুলির পুনর্গঠন :

'রোডসেসের' সমুদয় অর্থে রাস্তাঘাটের উন্নতিসাধন :

জুরি প্রথার স্থায়িত্বকরণ :

অস্ত্র-আইনের ফলে বন্যজন্তুর আক্রমণে নিরাপত্তার অভাব দূরীকরণ ;

দেওয়ানী আপীলের অধিকার সংকোচ-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন ;

দুর্ভিক্ষ ত্রাণভাণ্ডার গঠন ও প্লেগের মূল উৎস নিবারণ ইত্যাদি প্রসংগে সত্যেন্দ্রনাথ বংগীয়প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রস্তাব রাখেন।[৪৪]

শিক্ষাবিষয়ক (Educational Service এর) উচ্চপদ থেকে ভারতীয়দের বহিভূর্ত করার যে অপচেষ্টা চলেছিল তার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানানোর সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন। ইতোপূর্বে কংগ্রেসের অধিবেশনেও[৪৫] এই

আলোচিত হয়েছে। আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ পুনরায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৮৬১-৬৫ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় বিলাতে তুলার অভাব ঘটায় মধ্যপ্রদেশ ও বেরার অঞ্চল থেকে তুলা রপ্তানি আরম্ভ হয়। সে সময় রাস্তা ঘাট নির্মাণের আবশ্যক হয়। ১৮৭১ সালে ভারত সরকার একটি আইন বিধিবদ্ধ করে প্রত্যেক জেলার অধিবাসীদের উপর রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য 'রোড-সেস' বা পথকর নামে একটি নূতন কর বসান। ক্রমে দেখা গেল রাস্তাঘাট ছাড়াও জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষার ব্যয়ও এর দ্বারা নির্বাহিত হতে থাকে। সত্যেন্দ্রনাথ এটিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি বলে প্রকাশ্য সম্মেলনে 'রোড-সেস' এর টাকা যে অন্য খাতে ব্যয় হচ্ছে— সেদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন—সাম্রাজ্যের অর্থকোষে যেখানে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের নির্দিষ্ট বাজেট আছে সেখানে পথকরের উপর আরও কতগুলো আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বোঝা চাপিয়ে সাম্রাজ্যের অর্থকোষে টাকা সঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। ফলে হয় অকারণ সীমান্ত যুদ্ধে তা খরচ করা হচ্ছে নয়তো বিনিময় মুদ্রায় বিদেশী সরকার লাভবান হচ্ছেন।

এই খাতে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর হাতে খরচের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, তার যথার্থ উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ জনগণকে অবহিত করেন। পূর্বে ডিস্ট্রিক্ট কমিটিতে দুই তৃতীয়াংশই ছিলেন সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারী সদস্য। সুরেন্দ্রনাথ ভারত সভার মাধ্যমে জেলা কমিটি ও মিউনিসিপ্যালিটিকে জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রস্তাব দিলে লর্ড রিপণ তা গ্রহণ করেন। ফলে ১৮৮৫ সালে বঙ্গে 'লোক্যাল সেলফ গবর্ণমেণ্ট অ্যাক্ট' পাশ হলে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড নূতন ভাবে গঠিত হয়। সাধারণের ভোটে লোক্যাল বোর্ডের প্রতিনিধি নির্বচন ও লোক্যাল বোর্ড থেকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর সদস্য নির্বচিত হয়। সুতরাং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বাজেটের কতটা টাকা পাচ্ছেন ও কি ভাবে তা ব্যয় হচ্ছে সেদিকে মনোযোগ দেওয়া জনগণের অধিকার ও কর্তব্য বলেই সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেছেন।

১৮৬২ সালে বাংলাবিহার উড়িষ্যা আসাম সমন্বিত বঙ্গদেশের সাতটি জেলায় জুরিপ্রথা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জুরিপ্রথার

ক্ষেত্র অন্য জেলায় প্রসারিত হয় নি। ১৮৯০ সালে এই প্রথার সফলতা সম্পর্কে যে তদন্ত হয় তাতে জুরিপ্রথার অনুকূলে কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নি। স্বভাবতই এই প্রথা চালু রাখা উচিত কিনা এ সম্পর্কে ইংরেজ সরকার ও সন্দিহান হয়ে ওঠেন। অবশেষে রাজনৈতিক কারণে ও প্রভাবশালী ব্যক্তি-দের চাপে সরকার বাধ্য হয়েই সাতটি জেলার বাইরে জুরিপ্রথা প্রসারিত করলেও, ইত্যাদি জটিল মামলার বিচার জুরিদদের হাতে দেওয়া হলো না—এ ব্যবস্থায় স্বভাবতই জনসাধারণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। ১৮৯৩ সালে বিহারীলাল গুপ্তের কটকের বাড়ির ভোজসভায় জুরিপ্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজ অধ্যক্ষের বিরূপ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথও ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেনি—এই প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজদের মনোভাব তাঁর পত্রে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে।[৪৭] জুরির বিচার তুলে দেওযার যে হীন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল সে আশংকা তখনও সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নি—এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ সম্মেলনে জনগনকে সজাগ করেছেন। দেশময় উকিলদের জুরি হিসেবে কাজ করার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বিচারক সত্যেন্দ্রনাথ সরকারের এই কাজকে কিছুতেই সমর্থন করাত পারেন নি।

সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন অস্ত্র-আইন অপরাধ বন্ধ করতে কিছুমাত্র সাহায্য করবে না, উপরন্তু বন্যজন্তুর আক্রমণে গ্রামবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দেওয়ানী আপীলের অধিকার সংকুচিত করার যে আয়োজন চলছিল সত্যেন্দ্রনাথ তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ঐ প্রথায় ভালোর চেয়ে মন্দই বেশি, সেজন্য সর্বত্র এর বিরূপ সমালোচনা হচ্ছিল।

দুর্ভিক্ষের সময় যে সকল দেশ ভারতের সাহায্যে এসেছিল—তাদের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ সকৃতজ্ঞ অন্তরে ঋণ স্বীকার করেছেন। ব্রিটিশ বহির্ভূত ঐ সকল দেশের উদারতায় সত্যেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছেন, তবে ঐ সকল ত্রাণসাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার ভারতের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের কেবলমাত্র বেঁচে থাকার মতো খাদ্য সরবরাহ করতে সমর্থ হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন প্রয়োজনের তুলনায় তা যে যথেষ্ট নয়—একথা সরকারকে বোঝাতে হবে। তাই ভারতের কল্যাণকামী কতিপয় ইংরেজ বন্ধুর উপদেশমতো সরকার ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য যদি পার্লামেন্ট থেকে কিছু অর্থ মঞ্জুর করাতে পারেন তাহলেই

দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতীয়দের যথার্থ অভাব দূর হবে। জনগণের চিত্তে স্বস্তি ফিরে এলে, বিদেশী সরকার তাদের প্রতি যে সহানুভূতিশীল, এই ভাবটি জাগ্রত হবে, তখন সন্তুষ্ট চিত্তে তারা সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাবে।

এ ছাড়াও প্রাচুর্যের সময় সম্পদের উৎসর্গগুলির সদ্ব্যবহার করে 'দুর্ভিক্ষ ত্রাণ ভাণ্ডার' গড়ে তোলার জন্য সরকারকে অবহিত করতে হবে। ভারতের রাজস্ব, সীমান্ত যুদ্ধে ব্যয় না করে জনসাধারণের দুঃখের দিনের প্রস্তুতি হিসাবে 'ত্রাণ তহবিল' গঠনের জন্য সরকারকে এদেশীয়দের তরফ থেকে সতর্ক করে দেওয়ার অধিকার রাজনৈতিক কর্মীদের অবশ্যই রয়েছে বলে সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেছেন।

জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ স্বদেশের উন্নতি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যেসকল প্রস্তাব সময়ে সময়ে সরকারকে দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ পুনরায় সেগুলি উল্লেখ করেন। যেমন—

কৃষি ব্যাংক স্থাপন
রাজস্ব আইন সংশোধন
রেলপথ ও জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার ও
উন্নত কৃষিপদ্ধতির প্রবর্তন।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন ভারতের স্বার্থের জন্য এই পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করতে সরকারকে বাধ্য করাতে হবে। সর্বোপরি দেশের সম্পদ যাতে কিছুতেই বাইরে যেতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

কয়েক মাস ধরে প্লেগের যে ভয়ানক তাণ্ডবলীলা ভারতের উপর দিয়ে চলেছিল তা কিছুটা প্রশমিত হলেও, এ রোগের মূল উৎপাটনের জন্য সরকারকে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন।

সবশেষে মহারাণীর রাজত্বের হীরক জয়ন্তী উৎসবের সমারোহের কথা উল্লেখ করে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। ভারত শাসনে তিনি যে উদার মার্জিত রুচির পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে সাম্রাজ্যের সকল স্থানে যে ঈশ্বর-প্রার্থনা ও অভিনন্দনগীতি মুখরিত হবে তাতে ভারতেরও কণ্ঠ মেলাতে কোন বাধা নেই বলেই সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেছেন। লর্ড ক্যানিং-এর প্রতি মহারাণীর পূর্ণ সমর্থন ছিল, কারণ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ পরিচালিত সংবাদপত্র গুলির প্রতিহিংসাপরায়ণ মনো-

বৃত্তির ইনি বিপক্ষে ছিলেন। লর্ড ক্যানিংকে বিদ্রূপ করে ইংরেজরা যে নাম দিয়েছিলেন সেজনাই তিনি ভারতের ইতিহাসে সম্মানের আসন লাভ করেছেন।[৪৭] বিদ্রোহ শেষ হওয়ার পর প্রথমে মহারাণীর ঘোষণার যে খসড়া প্রস্তুত হয়েছিল তা যেমনি মর্মান্তিক তেমনি অবিশ্বাসারূপে কুরুচিপূর্ণ বলে সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। কেবলমাত্র মহারাণীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলেই ঐ ঘোষণাটি অত মার্জিতরূপে পুনর্লিখিত হয়েছে। ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঐতিহাসিক ঘোষণায় ভারতের জন্য দরদ পরিস্ফুট।—

'In their prosperity will be our strength ; in their contentment, our security ; and in their gratitude, our best reward.'[৪৮]

সুদূর ভারতের জনগণের প্রতি ভারতেশ্বরীর হৃদয়ে মাতৃত্ব সুলভ স্নেহ ধারার অভাব ঘটে নি। তাই ভারতবাসীও তার স্বভাবসুলভ বিনম্র আচরণে —এই শুভ মুহূর্তে ভিক্টোরিয়ার প্রতি যথোপযুক্ত আনুগত্য ও প্রীতি প্রদর্শনে বিরত থাকবে না বলেই সত্যেন্দ্রনাথ আশা করেছেন। সবশেষে ইংলণ্ডের রাজকবির লেখা প্রশস্তি সূচক কবিতা দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণ শেষ করেছেন।

> Revered, beloved—O You that hold
>   A nobler office upon earth
> Than arms, or power of brain, or birth
> Could give the warrior kings of old,
> Victoria : May you rule us long…
> …   …   …[৪৯]

এতক্ষণ পর্যন্ত নাটোরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথের যে সকল মতামত আলোচিত হলো তা থেকে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সত্যেন্দ্রনাথকে পুরোপুরি নরমপন্থী বলা চলে। সরকারী নীতির সমালোচনা তিনি করেছেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাধানের পথ দেখিয়েছেন 'আবেদন-নিবেদনে'।

ভারতের সমস্যাকে উপলব্ধি করবার মতো মানসিকতা বিদেশী সরকারের

না থাকলেও তিনি এই সরকারকে 'enlightened and beneficent Government'[৫০] এই আখ্যা দিয়েছেন।

তৎকালীন দিনে রাজানুগত্য রক্ষা করেই আন্দোলনের ধারা রচিত হতো। সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্যেও রাজানুগত্যে অপ্রতুলতা নেই। বিশেষত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অবিচল শ্রদ্ধা পিতামহ দ্বারকানাথের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। বিলাতে অবস্থানকালে দ্বারকানাথকে ভিক্টোরিয়া বিশিষ্ট ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং নিজের ও প্রিন্স আলবার্টের অটোগ্রাফসম্বলিত ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি দ্বারকানাথকে উপহার দিয়েছেন। দ্বারকানাথও যথোপযুক্ত উপঢৌকন দিয়ে মহারণীর প্রতি হৃদয়ের প্রীতি ও আনুগত্য নিবেদন করেছেন।[৫১] মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের মনোভাব শুধুমাত্র 'রাজভক্তির প্রস্রবণ' হিসাবে বিচার করলে কিছুটা অবিচার করা হয়, কারণ এদেশের প্রতি ভিক্টোরিয়ার বিশেষ দরদই তাঁকে এই সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রসঙ্গত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শোকসভায় সভাপতি রূপে সত্যেন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানেও বিশাল সাম্রাজ্যের সুদূর প্রান্তের এই দেশে ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরীর যে একটি বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল সে কথারই উল্লেখ করেছেন,—'বিক্টোরিয়া দেবী এই অসীম গৌরবশালী বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী বলেই যে আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি আকর্ষণ করেছিলেন তা নয়—আমরা তাঁর নিজগুণেই মুগ্ধ। তাঁর অতুল্য প্রজাবাৎসল্য দয়া মায়া মমতা কে না অবগত আছেন? এই সহনীয় রাজধর্মের মোহিনী শক্তিতে আমাদের চিত্ত বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হয়েছিল। ব্রিটিশ রাজ্যের অন্যান্য ভাগের তুলনায় ভারতের উপর ভারতেশ্বরীর বিশেষ মমতা ছিল। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ বাৎসল্য ভারতবাসীর প্রতি বিক্টোরিয়ার তাহাই ছিল।'[৫২]

ভারতের জনগণ ভিক্টোরিয়ার কাছে কত বিশ্বাসভাজন ছিলেন—এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ শোকসভার ভাষণে আরও বলেন—'তাঁহারই ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর পরেও তাঁর দেহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এদেশীয় লোক নিযুক্ত হয়েছে।' ভারতের জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার জন্যই বৃদ্ধবয়সেও মহারাণী ভিক্টোরিয়া হিন্দুস্থানী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। প্রিন্স আলবার্টের মৃত্যুর পর তিনি যে আদর্শ জীবন যাপন করেছেন তাতে ভিক্টোরিয়াকে 'সতী' আখ্যায় ভূষিত

করা যে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন হয় না তা সত্যেন্দ্রনাথ উপরিউক্ত ভাষণে আবেগস্পন্দিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।[৫৩]

সরকারী নীতির সমালোচনা করে তিনি যে সকল প্রস্তাব দিয়েছেন তা ইতোপূর্বে কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে কিছু কিছু উত্থাপিত হয়েছে। তবে যেকথা জাতীয় সভায় আলোচিত হয়েছে তা প্রাদেশিক পরিবেশে নূতনভাবে আলোচিত হওয়ার যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। সেদিক থেকে প্রস্তাবগুলি মূল্যবান। আর্মস এ্যাক্ট সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ যতটা নরম সুরে বলেছেন ইতোপূর্বে তা অতটা নরমসুরে আলোচিত হয় নি। ১৮৮৬ সালেই কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অযোধ্যার রামপাল সিং আর্মস এ্যাক্টের-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই আইনে একটি 'যোদ্ধা ও বীর জাতিকে কলমপেশা কেরাণীতে' পরিণত করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছিলেন।[৫৪] শিক্ষাবিষয়ক পদগুলির পুনর্গঠন সম্পর্কে আনন্দমোহন বসুর সংগে তাঁর মতের সম্পূর্ণ মিল ছিল তা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

জুরি, দেওয়ানী আপীল ও পথকর সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল সমস্যা সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন তাতে দীর্ঘকাল রেভিনিউ ও বিচার বিভাগের সংগে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রস্তাবগুলির যৌক্তিকতা বিশেষজ্ঞের দাবি রাখে।

অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদ প্রতিনিধির (১৮৯৭, ১২ই জুন) বিবৃতি থেকে জানা যায়—রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণটি বংগানুবাদ করে জনগণকে পুনরায় শুনিয়েছিলেন।[৫৫] প্রাদেশিক সমস্যাগুলিকে পৃথক ভাবে আলোচনার জন্য ১৮৮৭তে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখের ইচ্ছায় মাদ্রাজ কংগ্রেসেই প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। বাংলা দেশ এ ব্যাপারে অগ্রণী। ১৮৮৮ সালেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সভাপতিত্বে বংগীয় প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হয়। বেশ কয়েকবার কলকাতায় সম্মেলন হওয়ার পর দেখা গেল, যে সমস্ত আলোচনা প্রাদেশিক সম্মেলনে হয় তা মফঃস্বলের জনগণের সমস্যার সংগেই জড়িত। সুতরাং এ ধরণের সম্মেলন কলকাতায় না হয়ে মফঃস্বলে অনুষ্ঠিত হবার প্রয়োজনীয়তা সকলে অনুভব করলেন। ১৮৯৫ সালেই সর্বপ্রথম বিশিষ্ট নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেনের প্রচেষ্টায় তাঁর নিজ শহর বহরমপুরে সম্মেলন আহূত হয়। ঐ আদর্শে

১৮৯৬ সালে মনোমোহন ঘোষের প্রচেষ্টায় কৃষ্ণনগরে সম্মেলন আহূত হয় ও ১৮৯৭ সালে আলোচ্য দশম সম্মেলন জগদিন্দ্রনাথ রায় নাটোরে (রাজসাহী) আহ্বান করেছিলেন।[৫৬]

বৃহত্তর জনসমষ্টিকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মফঃস্বলেই সম্মেলন আহ্বান করলেই হবে না; জনগণের সুবিধার্থে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কাজ কর্মের ভাষাও যাতে বাংলা হয় সেদিকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সেদিনের নবীনদল সেখানে বাংলাভাষার জন্য কেমন লড়েছিলেন তার সরস বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'[৫৭] গ্রন্থে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে সত্যেন্দ্রনাথের ও জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সমর্থন থাকলেও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের তা মনঃপূত হয় নি। কারণ তাঁরা বরাবর ইংরেজিতে বলেই অভ্যস্ত ছিলেন, আর জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে তাঁরা ইংরেজিতেই সভার কাজ চালনা করার পক্ষে ছিলেন। সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহ থাকায় রবীন্দ্রনাথের প্রাদেশিক সম্মেলনে বাংলা ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব জগদিন্দ্রনাথ কর্তৃক সমর্থিত হয়ে সভার প্রথমেই গৃহীত হয়েছিল বলে রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে জানা যায়। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা ক্ষুব্ধ হলেও ইংরেজিতে বলার পর রবীন্দ্রনাথ সকলেরই বক্তৃতা বাংলা তর্জমা করেদেবেন—এভাবে একটা ফয়সালা[৫৮] হয়েছিল বলে 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য জনগণকে কিছু বোঝাতে গেলে একদম তাদের ঘরোয়া পরিবেশে না গেলে বক্তৃতা মঞ্চের ভাষা তা বাংলাই হোক আর ইংরেজিই হোক সবই তাদের কাছে সমান—রবীন্দ্রনাথের প্রতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাট্টার উক্তিতে তার ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘরোয়া' গ্রন্থে নবীনদের আক্রমণের আরও কিছু বিবরণ আছে। তাঁদের আক্রমণ থেকে স্বয়ং প্রেসিডেন্টও যে রেহাই পান নি অবনীন্দ্রনাথ সকৌতুকে তা ব্যক্ত করেছেন। ঐ সভায় ইংরেজিতে অভ্যস্ত বক্তাদের মধ্যে একমাত্র লালবিহারী ঘোষ চমৎকার বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে নবীনদের যে অভিভূত করেছিলেন সেটিও গর্বের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদ প্রতিনিধির বিবরণে জানা যায় বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন ও নির্বিঘ্নেই তাঁর ভাষণ শেষ

করেছিলেন। নবীনদের আক্রমণে সত্যেন্দ্রনাথের ও যথেষ্ট সায় ছিল। সুতরাং তিনিও সকৌতুকে তা মেনে নিয়ে বক্তৃতার শেষে বাংলায় তর্জমার ভার অনুজের উপরে দিয়ে বিষয়টি উপভোগ করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত নবীনদের 'পাবলিক্লি বাংলা ভাষার জন্য লড়াই' ঐ সম্মেলনে সার্থক হলো। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথের নাম লেখা না থাকলেও এক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। বিলাতে উচ্চশিক্ষিত, ইংরেজ রাজপুরুষদের সহকর্মী অথচ সৌম্য, মার্জিত সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা ভাষার প্রতি যথার্থ অনুরাগ সেদিনের সব বিরোধের অবসান করেছিল। সেদিন সত্যেন্দ্রনাথকে নেতার আসনে না বসালে অত সহজে কংগ্রেসের নেতারা তা মেনে নিতেন না।

সুতরাং নবীনদের জয়মাল্য লাভে সত্যেন্দ্রনাথের ভূমিকাও বিশেষ রূপে উল্লেখ্য। সেসময়ে দেশের নেতাদের উগ্র সাহেবিয়ানা যে নবীনদের অপছন্দ ছিল এর মূলে সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। পুরোপুরি সাহেব না সেজে ভারতীয় ভাবে থেকেও সাহেবদের গুণটুকু অর্জনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজ সমাজে মিশতে হলে বা ইংরেজদের জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে সর্বাগ্রে ইংরেজি ভাষা আয়ত্তের প্রয়োজন—এ পাঠ সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের কাছেই নিয়েছিলেন। তাই বলে যথোপযুক্ত পরিবেশে মাতৃভাষার অনাদর তিনি কিছুতেই মেনে নেন নি।

প্রসংগত এত চেষ্টার পরেও যে সম্মেলনে বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠিত হল তা ভূমিকম্পের জন্য শেষ দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। ১৮৯৭ সালের সেই ভূমিকম্পের বিবরণ অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আছে।[৫৯]

উপসংহার

সত্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য—দেশপ্রেম। তখনকার যুগের শিক্ষিত সমাজের সমাজসচেতন মনোভাবের সংগে বিশ্লেষণ করলে সত্যেন্দ্রনাথের দেশপ্রেম অসাধারণ কিছু নয়। তবু ও একথা স্বীকার করতে হবে যে দীর্ঘদিন ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে কাজ করেও এদেশীয় অনেক রাজকর্মচারীর মতো ব্রিটিশ স্বার্থকে দেশের স্বার্থের উপরে স্থান দিতে পারেন নি। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত

থেকেও সরকারের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা ও তার দোষত্রুটি সংশোধনের প্রচেষ্টা করার মতো সাহসিকতা তাঁর ছিল। অবসর-জীবনে প্রত্যক্ষ রাজনীতির আহ্বানে যখন তাঁকে রাজনৈতিক মঞ্চে দেখতে পাওয়া যায় তখন তাঁর মধ্যে আইনানুগ আন্দোলনের মাধ্যমেই দেশের দুর্দশা নিবারণের ও অগ্রগতির জন্য আবেদন করার প্রবণতাই লক্ষিত হয়।

তাঁর চিন্তাধারায় কংগ্রেসের তৎকালীন চরমপন্থীদের মনোভাব কখনই সমর্থিত হয়নি। আমৃত্যু তিনি গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আইনানুবর্তী আন্দোলনকারীদের নির্ধারিত পথকেই সমর্থন করে গেছেন। ব্রিটিশ রাজপুরুষদের সংগে মেলামেশার ফলে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষের প্রতি বিশ্বাস ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা থেকেই তাঁর এই মানসিকতার উদ্ভব হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ বা আক্রমণাত্মক আন্দোলনকে তিনি কখনও সমর্থন করেন নি। জীবনের শেষ অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্রনাথকে লেখা পত্রে সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনে কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মধারা প্রসংগে ও কংগ্রেসের মধ্যে পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁর মতামত ও সমর্থন স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন দেখে তিনি তার বিপক্ষে লিখেছেন—'ভাই বড়দাদা, তুমি Non-co-operation পক্ষ সমর্থন করে লিখেছে তা আমার আদবেই ভাল লাগছে না। Non co-operation-এর অর্থ কি? গবর্ণমেণ্টের সংস্রব থেকে দূরে থাকা—তা কি কখন সম্ভবে? তা হলে আমাদের স্কুল কালেজ পোষ্ট টেলিগ্রাফ রেল-গাড়ী ছেড়ে ভ্যাবা-গংগারাম হয়ে বসে থাকতে হয়—আমাদের লেখাপড়া চলাচল সব বন্ধ; তা কিসের জন্যে? গবর্ণমেণ্টকে জব্দ করা না আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করা?'[৬০]

খিলাফৎ আন্দোলনে মুসলমানেরা যে নিজেদেরই ক্ষতি ডেকে আনবেন একথাও তিনি ঐ পত্রে স্পষ্ট করেই বলেছেন।

অসহযোগের মাধ্যমে খিলাফৎ আন্দোলন যে সুফলপ্রসূ হবে না—এ প্রসংগে সত্যেন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় ঐ পত্রে বলেছেন—

"মুসলমানেরা খালিফৎ নিয়ে ক্ষেপে উঠেছে তাতে কি সুলতানের পদবৃদ্ধি হবে না আপনারই ফাঁদে পড়ে শেষে হাহাকার করবে? ওরা অনেক সাধ্য-

দ্বিজেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের নন-কো-অপারেশন বিষয়ে লিখিত পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা

দ্বিজেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের উক্ত পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

দ্বিজেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের উক্ত পত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠা

দ্বিজেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রের চতুর্থ পৃষ্ঠা

সাধনার পর যা কিছু উন্নতি লাভ করেছিল, আবার যে কে সেই—ওদের ভাগ্যে বাবুর্চি খানসামা হওয়া ভিন্ন দেখছি আর কিছু নেই।'[৬১]

'খিলাফৎ আন্দোলন' ও মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব দেশে যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ উদ্বেগাকুল ছিলেন। বিশেষত গান্ধীজির কার্যকলাপের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তান্বিত হয়েই তিনি উপরোক্ত পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথকে লিখেছেন—'গান্ধী আবার এই খেলাফতের সংগে মিলে কি অঘোরকৃত্যে তৎপর হয়েছেন। ছেলেদের বাপ মায়ের অমতে ভোগা দিয়ে স্কুল ছাড়ানো তাদের তাদের উন্নতির পথ বন্ধ করা—পারিবারিক অশান্তি আনা—এই কি মহাত্মার যোগ্য কাজ? তাঁর নিগূঢ় মর্ম্ম বোঝা ভার!' ব্রিটিশ সরকারের অসহযোগ না করে দেশের সংগঠনমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ—তখনকার কালে অনেক রাজনৈতিক নেতাই সমর্থন করতেন। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথকে সক্রিয় রাজনীতিতে পরিপূর্ণ ভাবে দেখতে না পেলেও তাঁর সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনে 'মডারেট'দের চিন্তাধারায় তিনি প্রভাবিত হয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিতে সাল তারিখ না পাওয়া গেলেও, ঐ চিঠিতে যে Reformed Council-এর উল্লেখ আছে, তা মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারে রচিত আইনে পরিষদ বলেই মনে হয়। ১৯১৮ সালে এর খসড়া প্রণয়নের কাজ শেষ হয় এবং ১৯১৯ সালের ১৮ই জুন এই শাসন সংস্কার আইন প্রচারিত হয়েছিল।[৬২] খিলাফৎ আন্দোলন (১৯২০) ও গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সমসাময়িক কালেই হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিতে এ সকল আন্দোলনের উল্লেখ আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সত্যেন্দ্রনাথের উল্লিখিত Reformed Council-কে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারে রচিত কাউন্সিল বলে ধরে নেয়া যুক্তিসংগত। এই আইনসভার বিরুদ্ধে না গিয়ে এতে উৎসাহের সংগে যোগ দেওয়া সত্যেন্দ্রনাথ সমীচীন বলে মনে করেছেন। এবিষয় লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, ভূপেন বসু, বালগংগাধর তিলক ও মতিলাল নেহেরুর সংগে তাঁর মতের মিল দেখা যায়। মহাত্মা গান্ধী তখন পর্যন্তও এই সংস্কার আইনের পক্ষেই ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে মত পরিবর্তিত করে সম্পূর্ণ অসহযোগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উপরোক্ত বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি

লালা লজপত রায় অভিভাষণে 'অসহযোগ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করে সিদ্ধান্তের ভার কংগ্রেসের উপর ছেড়ে দেন'। তবে তিনি উপসংহার বক্তৃতায় 'মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেও ত্রুটি করেন নি।' বিশেষ করে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জনের সার্থকতা তিনি মোটেই স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে 'জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যতিরেকে জাতীয় শিক্ষা অসম্ভব। বঙ্গে স্বদেশী যুগের জাতীয় শিক্ষাপ্রচেষ্টার ব্যর্থতায় এ বিষয় যথেষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে।'[৬৩]

লালা লজপত রায়ের বক্তব্যের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের উপরিউক্ত চিঠির সম্পূর্ণ মিল রয়েছে—'বঙ্গ দেশে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে এই বর্জন পলিসি কোন দিকেই সফল হয়নি—আমাদের National School বঙ্গলক্ষ্মী তার সাক্ষী।'[৬৪]

Reformed Council-এ যা পাওয়া গেছে তাতেই নিজেদের শক্তির পরীক্ষা দেবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন সেজন্য দ্বিজেন্দ্রনাথকে ঐ পত্রে স্পষ্ট করেই লিখেছেন—'অতএব আমার উপদেশ এই গান্ধীপন্থা পরিত্যাগ করে আমরা হাতে যা পেয়েছি তাই ভালোরূপ চালনা করা যাক। শক্তির চালনাতেই বলসঞ্চয় হয়—বর্জনে নয়।'[৬৫]

রাজনৈতিক বিক্ষোভের মধ্যেও মণ্টেগু-চেমস-ফোর্ড শাসন সংস্কার ১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর 'ভারত সংস্কার আইন নামে বিধিবদ্ধ হয়।[৬৬]

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পোন্নয়ন এই তিনটি বিশিষ্ট বিষয়ের পরিচালনা ভারতীয়দের হতে আসায় সত্যেন্দ্রনাথ খুব উৎসাহিত হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথকে লিখেছেন—'তাঁরা এই নতুন Reformed Council-এ আমাদের যে সব অধিকার দিয়েছেন তাতে কি মনে হয় না যে তাঁরা সত্যিই চান যে আমরা Political ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে তাঁদের সমান সমান হতে পারি? তুমি কি এই নতুন Reform Act পড়ে দেখেছ? পড়লে দেখতে পাবে যে দিনে তিনটি গুরুতর বিষয় আমাদের নিজহস্তে সমর্পিত হয়েছে—Education Sanitation, Industry. তার মধ্যে একটিও যদি আমরা ভাল রকম চালাতে পারি তাতে দেশের কত উপকার হবে বলা যায় না।[৬৭]

অভিজ্ঞ সরকারী কর্মচারী হিসাবে আলোচ্য আইনটি বিষয়ে যে গম্ভীর-ভাবে চিন্তা করেছিলেন তার প্রমাণ চিঠিতেই পাওয়া যায়। এই আইনে

ভারতীয়দের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা এসেছে সেগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্র-নাথকে অবহিত হতে বলেছেন।

Reformed Council—এ যখন ভারতীয়দের সামর্থ্য প্রকাশের সুযোগ এসেছে—এসময়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান সত্যেন্দ্রনাথের মতে 'গোসাঘরে পালিয়ে থাকার' মতো। তাঁর স্পষ্ট মত—নিবেদন পরীক্ষা করে দেখা উচিত আমরা কতটা করতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদের Policy হচ্ছে সহযোগিতা—তার বিপরীত পন্থা অনর্থকর। দুর্ব্বলের কর্ত্তব্য হচ্ছে বল সঞ্চয় করা—বর্জ্জনে তা হবে না—অর্জ্জন করা চাই—এর দুপক্ষে মিলে মিশে কাজ করতে হবে—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।'[৬৮]

প্রসংগত অসহযোগ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মতও উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই দুভায়ের ভিন্ন মত সরস ভাবে ব্যক্ত করেছেন—"ভাই সতু, তুমি একজন হাড় পাকা co-operator ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত, আমি একজন হাড় পাকা non-co-operator-ditto দিগের সহিত..."।[৬৯]

অসহযোগ প্রসংগে সত্যেন্দ্রনাথ এ্যাণ্ডরুজকে দু ভাইয়ের মধ্যস্থ হিসাবে মানতে রাজী ছিলেন। এ্যাণ্ডরুজকে দুভাইয়ের মধ্যস্থ হিসাবে মানতে রাজী ছিলেন। কারণ এ্যাণ্ডরুজ গান্ধীভক্ত হলেও তাঁর মতে কিছুটা বৈশিষ্ট্য থাকবেই—এটি আশা করেই লিখেছেন—'এ বিষয়ে Andrews কি বলেন তাঁকে ত আমরা একরকম মধ্যস্থ বলে মেনে নিতে পারি! তাঁর কি মত? তিনি যদিও গান্ধীর একজন গোঁড়া শিষ্য তবু তাঁর মতে সম্পূর্ণ মত দেবেন মনে হয় না।'[৭০]

১৯২০ সালে সৌদামিনী দেবীর মৃত্যুর পরে সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের আর একখানি পত্রে এ্যাণ্ডরুজ নিকট সত্যেন্দ্রনাথের মতামত প্রকাশের আভাস পওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই চিঠিতে লিখেছেন—'এ্যাণ্ডরুজ সাহেবকে যে দুখানা চিঠি লিখেছ দেখিলাম তো সব, কিন্তু ভাই British Government-কে এখনো তুমি চেনো নাই। তৎসম্বন্ধে আমার মতামত যদি জিজ্ঞাসা কর তাহা এক কথায় এই যে 'All that glitters is not gold।'[৭১] ব্রিটিশ শাসনে দেশের উন্নতি ও বিত্তশালী শ্রেণীর অত্যাচার থেকে দরিদ্র জনসাধারণ রক্ষা পাবে একথা বিশ্বাস করলেও দ্বিজেন্দ্রনাথ

ব্রিটিশ সরকারের দমননীতিকে সমর্থন করতে পারেন নি। দেশের কল্যাণকামী আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার নিষ্ঠুর প্রচেষ্টাই দ্বিজেন্দ্রনাথকে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী করে তুলেছিল। সত্যেন্দ্রনাথের মতের সংগে সায় দিয়ে দুদলের দূরত্ব কমিয়ে আনা শ্রেয়ের মূল একথা দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বীকার করে স্পষ্ট ভাবে নিজের বিরোধী মনোভাবের কারণ ব্যক্ত করেছেন —'British Government কাজ একটি করেন অতিশয় গর্হিত—সেটা এই যে, আমাদের দেশের যে কোনো লোক দেশের যে কোনো লোক দেশের হিতসাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন (যেমন তিলক প্রভৃতি) অমি Government তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হন—তাই আমি বর্ত্তমান British Government-এ মর্ম্মান্তিক বিরোধী পক্ষ।'[৭২]

নিজের প্রতিষ্ঠার চেয়েও দেশের মংগল যে রবীন্দ্রনাথের কাছে অনেক উপরে ছিল তা রবীন্দ্রনাথের কংগ্রেসে পদত্যাগের পর তাঁকে লেখা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রে জানা যায়।[৭৩] রাজনীতির বাইরে আশ্রমিক পরিবেশে সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেই তিনি তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিলেন, তবে প্রয়োজনমতো ব্রিটিশ দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ করতে তিনি যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি তা সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রেই ব্যক্ত হয়েছে।

'ভাই মেজদাদা—Gourley-কে জোড়াসাঁকোয় ডেকে এনে তাঁদের এখনকার দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে কিছু বলেছিলেম। মেছুয়াবাজারে মসজিদের মধ্যে পুলিস প্রবেশ করে যে সব উৎপাত করেছিল তাতে সর্ব্বসাধারণের মনে ধারণা হয়েছে যে ওরা গায়ে পড়ে খোঁচা দিয়ে N.C.O. পক্ষের অহিংসাব্রত ভাঙবার চেষ্টা করছে। আমি ওকে বলেচি এ রকম ঘটতে আরম্ভ হলে আমাদের মত নিরপেক্ষ লোকদের দায়ে পড়ে অপর পক্ষের সংগে যোগ দিতে হবে।'[৭৪]...

সুতরাং তিনজনের রাজনৈতিক চিন্তায় কমবেশি পার্থক্য থাকলেও মনুষ্যত্বের অবমাননায় বিদেশী শাসননীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে কারোরই সাহসিকতার অভাব হয় নি।

১. ...the essence of the political situation remains : that of conflict and the resolution of that conflict.'—Alan R. Ball—Modern Politics and Government ; p. 21.

২. আমার বোম্বাইপ্রবাস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ. ২৬৬।
৩. হিউম রচিত Old Man's Hope পুস্তিকা থেকে যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত মুক্তির সন্ধানে ভারত—৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৪৪।
৪. নাটোরে অনুষ্ঠিত বংগীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণ, ১১ই জুন ১৮৯৭, অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত।
৫. ঐ ভাষণে উদ্ধৃত।
৬. বংগীয় সাহিত্য পরিষদে সত্যেন্দ্রনাথের শোকসভার ভাষণ।
৭. "১৮৩৬ সালে এই সভা সংগঠিত হয়।" মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ৪১।
৮. "১৯শে মার্চ (১৮৩৮) ভূম্যধিকারী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।" ঐ, পৃ. ৪২।
৯. ঐ, পৃ. ৪৩-৪৪।
১০. ঐ, পৃ. ৪৫-৪৭।
১১. যোগেশ চন্দ্র বাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত : পৃ. ৫১।
১২. ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ৮ই নভেম্বর-এর 'সিটিজেন' পত্রিকা থেকে এই সভার উদ্দেশ্যজ্ঞাপক প্রস্তাবটি পরিবেশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'র পরিশিষ্টে মুদ্রিত যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত 'মহর্ষি'র জীবনের আরও তথ্য : রাজনীতি' রচনায় উল্লিখিত। পৃ. ৪৭৫।
১৩. ১৮৫১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর, দেশ হিতৈষিনী সভাস্থাপিত হয়। সম্পাদক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।' মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ. ৫১।
১৪. ঐ পৃ. ১০৮।
১৫. 'জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা'—পুরাতনী : শ্বশুর বাড়ী অধ্যায়। পৃ. ২৫।
১৬. এই গবেষণা গ্রন্থে জীবনকথা : প্রথম পর্বে উল্লিখিত।
১৭. 'In filling up the form required by the Calcutta University... I had put down sixteen years as my age when I appeared for the Matriculation Examination of that

University in December 1863...If I were sixteen in 1863 I would be above the required limit of age in 1869...Born in November, 1848, I was fifteen and not sixteen years of age when I went up for my Matriculation Examination...The truth is that...we reckon the age not from the time of one's birth, but from the time of the conception of the child in the mother's womb....We decided to move the Queen's Bench for writ of mandamus upon the Civil Service Commissioners....I won my case'. A Nation in Making'. Surendra Nath Banerjea pp, 12-16

১৮. নব যুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল। পৃ. ২৬৪-২৬৬।

১৯. ১৮৭৫ সালের শেষাশেষি কিংবা '৭৬ সালের প্রথমে কলিকাতা ছাত্রমণ্ডলীর Calcutta Students' Association এর প্রতিষ্ঠা হয়।...সভাপতি ছিলেন আনন্দমোহন, সহকারী সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্র,...এই কলিকাতা ছাত্রমণ্ডলীর বা Students' Association-এর রঙ্গমঞ্চেই সর্বপ্রথম সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মীপ্রতিভা প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়।...তাঁহার প্রথম বক্তৃতার কথা এখনও মনে আছে, বিষয় ছিল 'Rise of the Sikh Power in India'। নবযুগের বাংলা : সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন অধ্যায় ; বিপিনচন্দ্র পাল—পৃ. ২৭৭-৭৮।

২০. মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ. ১১৩-১১৫।

২১. 'সত্যেন্দ্রনাথ ভারতের জয় গাহিতে যাইয়া পৌরাণিক কীর্তি' কাহিনীর আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহাতে নূতন স্বাদেশিকতা ভাবাবেগে মাত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। কল্পনাই তখন আমাদের স্বদেশ-সেবার আশ্রয় ছিল। ভীষ্ম দ্রোণ, কর্ণার্জুন প্রভৃতি স্মরণাতীত অতীতের প্রতিধ্বনি মাত্র আনিতেন।...সুরেন্দ্রনাথের এই প্রথম বক্তৃতা আমাদের কল্পনাকে বাস্তব রাজ্যে আনিয়া ফেলিল।...সুরেন্দ্রনাথের Rise of the Sikh Power বিষয়ক বক্তৃতা যুগপৎ আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া

দেয় এবং স্বাজাত্যাভিমানকে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করে।' নবযুগের বাংলা : বিপিনচন্দ্র পাল পৃ. ২১৮-১৯।

২২. 'রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে বিহারীলাল হাওড়ার জজ থাকার সময়ে যে মন্তব্যলিপি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠান তাহারই ফলে ইলবার্ট বিলের জন্ম ও তদানীন্তন অন্দোলনের সূত্রপাত হয়।'— রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ. ২১৫। অপিচ —রমেশচন্দ্র দত্ত : মণি বাগচি পৃ. ৩৬।

২৩. মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ. ১৪৯, ১৫১।

২৪. ভারতবর্ষীয় ইংরাজ : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশ ১৩১৪ সাল (১৫ মার্চ ১৯০৮)। বোম্বাইচিত্র—পরিশিষ্ট-পৃ. ২।

২৫. ভারতবর্ষীয় ইংরাজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাই চিত্রে মুদ্রিত— পৃ. ৩১।

২৬. ঐ—পৃ. ২১।

২৭. ঐ—পৃ. ৩৭

২৮. 'একদলের কাগজ কোম্পানীর কর্মচারীদের নির্দেশে পরিচালিত হ'ত। এরা সর্ববিষয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাপৃত থাকত। "জন-বুল" (পরে ইংলিশম্যানে পরিণত) কাগজ ছিল এ শ্রেণীর মধ্যে প্রধান' (পৃ. ৩৩; মুক্তির সন্ধানে ভারত)। অপিচ 'জনবুল পত্রিকার পরিচালক ছিলেন রেভারেণ্ড ডক্টর ব্রাইস'। 'ভারতীয়দের উপর "জনবুল" পত্রিকার বর্বরোচিত ও বিবেকহীন আক্রমণকে প্রতিহত, করবার জন্যই দ্বারকানাথ ঠাকুর "হরকরা" পত্রিকার স্বত্ব-স্বামিত্ব ও উপস্বত্বের একটা বড় অংশ কিনে ফেলেছিলেন' (পৃ. ৪৬, দ্বারকানাথ ঠাকুর : কিশোরীচাঁদ মিত্র : অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ : সম্পাদনা কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত দ্র.)। ইংরেজদের জাতীয় ঔদ্ধত্য ও একরোখা ভাব সত্যেন্দ্রনাথের না-পছন্দ ছিল বলেই সম্ভবত 'জন-বুল' নামে অভিহিত করেছেন।

২৯. ভারতবর্ষীয় ইংরাজ : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : পৃ. ৩৩-৩৪ বোম্বাইচিত্র থেকে।

৩০. With Ravindranath in England—Modern Review,

January, 1913. আমার বোম্বাইপ্রবাস গ্রন্থে পৃ. ২৯৬-এ পরিবেশিত।

৩১. Report of the Special Reporter—Amrita Bazar Patrika, 12th June, 1897.

৩২. We all meet here in the capital of the illustrious Rani Bhobani' ; Hon'ble Gurprasad Sen's speech at Nattore : Special Reporter's News : Amrita Bazar Patrika 12th June 1897.

৩৩. 'এখান থেকে স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে আমাদের জন্য। …চোগা চাপকান পরেই তৈরি হলুম। তখনও বাইরে ধুতি পরে চলাফেরা অভ্যেস হয় নি। ধুতি পাঞ্জাবি সঙ্গে নিয়েছি। ·· নাটোরের ব্যবস্থা রাস্তায় খাওয়া দাওয়ার কি আয়োজন। স্টেশনে স্টেশনে খোঁজখবর নেওয়া …কী সুন্দর সাজিয়েছে বাড়ি, বৈঠকখানা,…যেন ইন্দ্রপুরী। কি আন্তরিক আদরযত্ন··· একেই বলে রাজ সমাদর। …ধুতি চাদরও আমাদের জন্য পাট করা সব দেখি তৈরি, বাক্স আর খুলতেই হলনা'। ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রানী চন্দ।

৩৪. Bengal provincial Conference.

Session at Nattore

Crowded Meeting Enthusiastic Gathering

(From our Special Reporter) Amrita Bazar Patrika

12th June, 1897

৩৫. ঐ

৩৬. The President's Address. Bengal provincial Conference, Nattore. Amrita Pazar Patrika. Friday 11 June 1897.

৩৭. সাহিত্যসাধক চরিতমালায় নং ৬৭ : পৃ. ২৪এ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণটি '১২ই জুন ১৮৯৭ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে'—বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১১ই জুন ১৮৯৬ এর অমৃত বাজার পত্রিকায় এটি মুদ্রিত হয়েছে।

৩৮. প্রাগুক্ত ভাষণ।

৩৯. পত্রটিতে 'শান্তিনিকেতন সোমবার' মাত্র লেখা। সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠি, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৭৫৯ বৈশাখ-আষাঢ়, দশম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

৪০. প্রাগুক্ত ভাষণ, নাটোর।

৪১. সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠি। বিশ্বভারতী পত্রিকা—১৩৫৯ বৈশাখ-আষাঢ়, দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

৪২. প্রাগুক্ত ভাষণ, নাটোর।

৪৩. ঐ।

৪৪. প্রাগুক্ত ভাষণ,

৪৫. ১৮৯৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে আনন্দমোহন বসু কর্তৃক শিক্ষাবিভাগে ভারতীয় প্রতি অবিচার ও অসম ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ১৮৮০ সালের পূর্বে বংগদেশে অন্ততঃ শিক্ষাবিভাগে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে কোন তারতম্য হতো না। তাঁরা সকলেই সমান বেতন পেতেন ও পাঁচ শ' টাকা মাসিক বেতনে তাঁদের চাকরি হতো। ১৮৮০ সালে ভারতীয় কর্মচারীদের প্রারম্ভিক বেতন কমিয়ে তিন শ তেত্রিশ টাকা ও ১৮৮৯ সালে আড়াই শ' টাকা করা হয়। তখন পর্যন্তও কিন্তু পদমর্যাদা সমান ছিল। ১৮৯৬ সালে যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে বেতনের তারতম্য ত আছেই, উপরন্তু পদমর্যাদারও তারতম্য করা হয়েছে। শিক্ষাবিভাগে উচ্চতম চাকরিগুলি দু শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে—ভারতীয় ও প্রাদেশিক। ভারতীয় শ্রেণীতে বিলাতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা থাকবেন, প্রাদেশিক শ্রেণীতে থাকবেন ভারতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা। বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও ভারতীয়েরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হবেন। দ্র. মুক্তির সন্ধানে ভারত : শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল।

৪৬. 'জানিস বোধহয় গবমেণ্ট আমাদের দেশের জুরি প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল বলে চারিদিকে ভারি একটা আপত্তি উঠেছে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ে কথা তুলে…তর্ক করতে লাগল। বললে moral standard low—এখানকার life-এর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যোগ্য নয়। আমার যে

কি রকম করছিল সে তোকে কি বলব।' ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র। ছিন্ন পত্রাবলী : ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

৪৭. 'Canning was awarded his nickname of "Clemency" in Calcutta in disgust at his stand against vengeance ; the intended insult, as such things so often do, became his recognised title of honour'. The Oxford History of India : Vincent A. Smith (Third ed.) p. 675.

৪৮. Queen's Proclamation of 1858. সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণে উদ্ধৃত।

৪৯. Amrita Bazar Patrika 11th June 1197, Satyendranath's Address.

৫০. Amrita Bazar Patrika 11th June 1897, Satyendranatth's Address. Nattore.

৫১. দ্বারকানাথ রাণীর জন্য কতকগুলি মূল্যবান উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন।…সে উপহারের মধ্যে রাণী গ্রহণ করলেন শুধু কতক-গুলো বিচিত্র গড়নের চীনা অলংকার এবং দিল্লীর তৈরী কতকগুলো সোনার তাগা আর সোনার বালা।…

বাকিংহাম প্যালেস থেকে দ্বারকানাথ একটি বিশেষ নিমন্ত্রণ পেলেন… প্রথম সাক্ষাতের সময় মহারাণী দ্বারকানাথকে যে ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন এ উপলক্ষে তা তাঁর হাতে দেওয়া হল। এগুলির উপর নিচের অটোগ্রাফটি শোভা পাচ্ছিল :

শ্রদ্ধার সঙ্গে

বাকিংহাম প্যালেস — দ্বারকানাথ ঠাকুরকে

৮ই জুলাই ১৮৪৫ — ভিক্টোরিয়া আর এলবার্ট

দ্বারকানাথ ঠাকুর : কিশোরীচাঁদ মিত্র। অনুবাদ—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ সম্পাদনা—কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। পৃ. ১২৯-১৩০।

৫২. মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর তিরোভাব উপলক্ষে আহূত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত ভাষণ। ১৩০৭ সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা-অতিরিক্ত সংখ্যা—

৫৩. "অনেক সম্রাট ইন্দ্র চন্দ্র সিংহ বীর বিক্রমাদি অনেক প্রকার উপাধি

গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিক্টোরিয়া নামের যথার্থ উপাধি 'সতী' "।
—ঐ শোক সভায় সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণ।

৫৪. মুক্তির সন্ধানে ভারত—পৃ. ১৬২।

৫৫. Session At Nattore from our special Reporter. Published in Amrita Aazar Patrika. 12th June, Saturday, 1897.

৫৬. Satyendranath's Address at Nattore.

৫৭. রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বসল। মেজো জ্যাঠামশায় প্রিসাইড করবেন।...রবিকাকা প্রস্তাব করলেন প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে। আমরা ছোকরারা সবাই রবিকাকার দলে;...সেই নিয়ে আমাদের বাধল চাঁইদের সংগে। তাঁরা আর ঘাড় পাতেন না, ছোকরার দলের কথায় আমলই দেন না। তাঁরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয় তেমনি এখানেও হবে সব কিছু ইংরেজিতে। অনেক তর্কাতর্কির পর দুটো দল হয়ে গেল। একদল বলবে বাংলাতে একদল বলবে ইংরেজিতে। সবাই মিলে গেলুম প্যাণ্ডেলে।—পৃ. ৬২-৬৩ ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাণী চন্দ।

৫৮. 'ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অধিবেশনে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার-তার মানে আছে। কিন্তু প্রাদেশিক সম্মেলনেও ইংরাজিতে বক্তৃতা হবে বাবার তাতে খুব আপত্তি ছিল। কনফারেন্সের সভাপতি মেজ জ্যাঠা-মশায়েরও তাই মত দেখে বাবা বললেন—বাংলা ভাষা ব্যবহার হোক এই মর্মে সভার প্রারম্ভেই তিনি এক প্রস্তাব তুলবেন। স্থির হল মহারাজা এই প্রস্তাবের সমর্থন করবেন।...প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু কংগ্রেসের যাঁরা প্রকৃত পাণ্ডা তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন দেখে বাবা তাঁদের শান্ত করলেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে তাঁদের ইংরেজি বক্তৃতা তিনি নিজে সংগে সংগে বাংলায় তর্জমা করে দেবেন। তাঁরা তখনকার মতো আশ্বস্ত হলেন বটে কিন্তু তাঁদের মনে রাগ রয়ে গেল। অধিবেশন ভাঙার সময় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাট্টা করে বাবাকে শোনালেন—"Rabibabu your Bengali was wonderful, but do you think that your *chasas* and *bhusas* understood

your mellifluous Bengali better than our English ?'—
পিতৃস্মৃতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ২৪-২৫।

৫৯. অবনীন্দ্রনাথ : রাণী চন্দ—ঘরোয়া, পৃ. ৬৪-৬৬।

৬০. পত্রটির মূল কপি দ্রষ্টব্য। বিশ্বভারতী রবীন্দ্র সদনে প্রাপ্তব্য।

৬১. দ্র. চিঠিটির কপি দ্রষ্টব্য। শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদনে প্রাপ্তব্য। চিঠিতে শুধু 'শুক্রবার রাঁচি' লেখা আছে। সাল নেই। অসহযোগ আন্দোলনের সময়, সম্ভবত ১৯২০তে পত্রখানি লেখা।

৬২. Although the Montford Report was published on 8 July, 1918, the text of the Reform Bill was not issued till 18 June, 1919. R. C. Majumdar—History of Freedom Movement in India. V. III, 43.

৬৩. যোগেশ চন্দ্র বাগল—মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ. ৩০৬।

৬৪-৬৫. দ্র. মূল চিঠি।

৬৬. যোগেশ চন্দ্র বাগল—মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ. ২৯১।

৬৭. দ্র. সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি।

৬৮. ঐ।

৬৯. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠি। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৯ বৈশাখ-আষাঢ়।

৭০. দ্র. সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি।

৭১. সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠি। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৯—বৈশাখ-আষাঢ়।
১৯২০ খৃ. সৌদামিনী দেবীর মৃত্যুসংবাদ তত্ত্ববোধিনীতে প্রাপ্ত।— 'আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাকন্যা সৌদামিনী দেবী গত ২০শে শ্রাবণ রবিবারের শেষরাত্রে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ৪টা ১০ মিনিটে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভাদ্র ১৮৪২ শক (২০ কল্প ২য় ভাগ)।

৭২. বিশ্বভারতী পত্রিকা : ১৩৫৯ বৈশাখ-আষাঢ় : সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্র।

৭৩. 'This act of yours is worthy of sincere well-wisher of the country and an ardent advocate of its political progress,' Cal., 1. 10. 1917. Letter-S. N. Banerjea to Rabindranath.

(শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে প্রাপ্ত।)

৭৪. ২৬শে পৌষ ১৩২৮-এ সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের মূল পত্রটি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন থেকে প্রাপ্ত। চিঠিতে পোস্টমার্ক আছে ১১ই জানুয়ারী, ১৯২২।

স্বদেশচেতনা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক স্বদেশানুরাগ তাঁর পুত্রদের জীবনবিকাশে স্থায়ী রেখাপাত করেছিলো। পাশ্চাত্যে শিক্ষিত হয়েও সিবিলিয়ানদের ইংরেজিআনার স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশীয় কৃষ্টির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন।[১] সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলেই এ পরিবারে কিছু কিছু পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঘটলেও এসব ছিল সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস। ঠাকুরপরিবারের আন্তরিক ভাবটি ছিল খাঁটি স্বদেশী। পরিবারের মধ্যে 'স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে' বিরাজ করতো।

এই দেশাত্মবোধ উগ্র নয়, আপোষবিরোধী নয়। যে সব মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েও স্বদেশীভাবনার পরিপন্থী নন, তাঁদের মনোভঙ্গী বোঝার জন্য পিছনের পটভূমি আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণে সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশ চেতনার মর্মটি অনুধাবন করতে তাঁকে পিছনের পটে ফেলেই বিচার করা প্রয়োজন।

ইংরেজি শিক্ষার নূতন মোহে নব্যবঙ্গীয়দের মধ্যে অনেকেই দেশের ভাব, দেশের ভাষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন। অন্যদিকে ছিলেন প্রচণ্ড রক্ষণশীল দল। তাঁরা পুরাতনকেই আঁকড়ে ছিলেন। এ দুয়ের মাঝামাঝি পথে ঠাকুর পরিবার—পুরাতনকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করে, পরিমার্জিত করে গ্রহণ করার পথই বেছে নিয়েছিলেন তাই বিপ্লবের মধ্যেও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে এঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারে বাংলা-ভাষা চর্চার স্রোত ছিল অব্যাহত। স্বদেশীয়দের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের চিঠিপত্র-আদানপ্রদানের ভাষাও ছিল বাংলা।[২] দেবেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ রাজনারায়ণ বসুর—'জাতীয় গৌরবসম্পাদনীসভা'র[৩] প্রস্তাব সেজন্যই দেবেন্দ্রনাথের নিকট বিশেষ আদৃত হয়েছিলো। কারণ রাজনারায়ণ বসু—কথোপকথনে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা শব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। জাতীয় পোষাক, জাতীয় সংস্কৃতি ও রীতিনীতির প্রতি শিক্ষিত জনগণের অনুকূল

মনোভাব তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিদেশীয় হস্তক্ষেপ দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। তিনি মনে করতেন তাহলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মতো একদিন আমাদের ধর্ম ও সামাজিক স্বাধীনতাও হারাতে হবে। সেজন্য তিনি কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় সরকারের 'ব্রাহ্ম বিবাহ আইন'এর তীব্রপ্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন।[৪] ব্রাহ্ম বিবাহকে আইনসংগত করবার তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নি,[৫] কারণ তাঁর মতে—ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা না মানলেও হিন্দুধর্মের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যগৌরব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁর সহযোগী রাজনারায়ণ বসু তখনকার আদি ব্রাহ্মসমাজের মনোভাবটি স্পষ্ট করে তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন—'হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকারমাত্র মনে করি।' (পৃ. ৮৪ : আত্মচরিত)। দেবেন্দ্রনাথেরই সভাপতিত্বে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক যুগান্তকারী বক্তৃতা[৬] জাতীয় সভায় পরিবেশিত হয়। সুতরাং হিন্দু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ভাবনার মধ্যে সেদিনের স্বদেশ প্রেমের মূল নিহিত ছিল—যা থেকে দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণও অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। আর্যসংস্কৃতির মহিমাগানে হিন্দুমেলার প্রাংগণ তাই মুখরিত হয়েছে।

যুগোপযোগী ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য হিন্দুকলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। তবে এই কলেজে পড়ে ছেলে পুরোপুরি সাহেব বনে যাবে—এটা কেউ চান নি। হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়া রাজনারায়ণ বসুর জীবনেও লেগেছিল, তবে তিনি তাঁর অন্তর প্রকৃতি যেমন অপরিবর্তিত রেখেছিলেন অনেকেই তা রাখতে পারেন নি। এই কলেজেরই চতুর্থ শিক্ষক ডিরোজিওরও উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশের অতীত গৌরবের দিকে ছাত্রদের মনকে আকৃষ্ট করা ও প্রচলিত সংস্কারের অন্ধ অনুবর্তন থেকে তাঁদের মনকে মুক্ত করা। ফিরিংগী হয়েও তিনি এই দেশকেই যে স্বদেশ বলে ভালবাসতেন তা 'টু ইণ্ডিয়া মাই নেটিভ ল্যাণ্ড' কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।[৭] আবার দরদী তরুণ ছাত্রদের মনের পাপড়ি কি ভাবে বিকশিত হচ্ছে তাও গভীর স্নেহে লক্ষ করেছেন।[৮]

তবে ডিরোজিয়ান সম্প্রদায়ের কেউ কেউ সংস্কারমুক্ত হাতে গিয়ে খাদ্য ও পান বিষয়ে যে উচ্ছৃংখল পথ বেছে নিয়েছিলেন—তার ফলেই তাঁরা দেশের

লোকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন; যদিও তৎকালীন সমাজে উৎকোচ গ্রহণ, বারবনিতালয়ে গমন ও মিথ্যাভাষণের বিরুদ্ধে এঁরা তৎপর হয়ে দেশের কিছু কিছু উন্নতিসাধনও করেছেন। রাজনারায়ণ বসু 'সেকাল ও একাল' বক্তৃতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব ও উত্তর যুগের চিত্র তুলনামূলক বিচারসহ সরসভাবে উত্থাপিত করেছেন। (১৮৭৩ সালে জাতীয় সভায় পরিবেশিত।) এই বক্তৃতা নিয়ে কোলকাতায় যে আন্দোলন হয়েছিল—এমন কি ছেলে ছোকরারা রাজনারায়ণ বসুর নাম পর্যন্ত 'সেকাল-একাল' দিয়েছিল[৯] ও লর্ড নর্থব্রুক বিষয়বস্তু জানতে—রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে এর ইংরেজি তর্জমা করিয়েছিলেন তা রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত থেকে জানা যায়। এই বক্তৃতার শেষে অতীতের বাঙালী সন্তানদের আদর্শ সামনে রেখে বর্তমানের নিরাশা ঝেড়ে ফেলার জন্য তিনি দেশবাসীকে অনুরোধ করেছেন। তাঁর ঐ বক্তৃতায় যেখানে বাঙালীদের প্রশস্তি করেছেন তা সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি সার্থক প্রযুক্ত হতে পারে। রাজনারায়ণ বসুর ভাষায়—'বাঙালীরা এক্ষণে সিবিলসার্বিসের পরীক্ষা দিয়া কলির ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে।'[১০]

কাজে কাজেই বাঙালীর সামর্থ্য কিছু মাত্র কম নয়—তাঁরা তৎপর হলে, ইংরেজি শিক্ষার প্রবল মোহ থেকে দেশের সুপ্রাচীন 'সুনীতি ও সুরীতির গৌরব' রক্ষা করতে পারবেন বলেই তিনি আশা পোষণ করেছেন।

এই সভার অনেক আগেই জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কার্যক্রম অবলম্বনে রচিত পুস্তিকায়ও শিক্ষিত বাঙালীর কাছে তিনি এই আবেদনই রেখেছিলেন।[১১] তাঁর প্রস্তাবে দেবেন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থনের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। মহর্ষি 'ন্যাশনাল পেপার' এও এটি হুবহু মুদ্রণের নির্দেশ দেন।

হিন্দুমেলা ও জাতীয় গৌরব

সত্যেন্দ্রনাথের হিন্দু স্কুলের সতীর্থ নবগোপাল মিত্রই[১২] ছিলেন হিন্দু মেলার প্রধান উদ্যোক্তা আর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর প্রধান উপদেষ্টা। পরে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদনার ভার নিলে মেলার কাজ সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় তা সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন।[১৩]

মেলার কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ছয়টি মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল। জোড়াসাঁকো ও পাথুরেঘাটা ঠাকুর বংশের অনেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১৪] রাজনারায়ণ বসুর জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভার পুস্তিকা পাঠ করেই নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত জাতীয় মেলা স্থাপিত হচ্ছে এই আনন্দময় বার্তা শ্রবণ করেও রাজনারায়ণ বসু প্রথম অধিবেশনে (১৮৬৭) অসুস্থতার জন্য যোগ দিতে পারেন নি, বোড়াল থেকে পণ্ডিত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রচিত কবিতাটি সংশোধন করে পাঠিয়েছিলেন।[১৫]

হিন্দুমেলার বিভিন্ন অধিবেশন

১৮৬৭ সাল থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত হিন্দুমেলার যে সকল অধিবেশনের[১৬] বিবরণ পাওয়া গেছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে একটি তালিকায় সাজানো যেতে পারে।

(১) প্রথম অধিবেশন	: ১৮৬৭ খ্রী. ১২ই এপ্রিল ১২৭৩ ৩১ চৈত্র	: রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়ের বাগানবাড়ি। চিৎপুর।
(২) দ্বিতীয় „	: ১৮৬৮ খ্রী. ঐ	: আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়া উদ্যান।
(৩) তৃতীয় „	: ১৮৬৯ খ্রী. ঐ	: ডনকিন সাহেবের উদ্যান, : বেলগাছিয়া।
(৪) চতুর্থ „	: ১৮৭০ খ্রী. ১২ই, ১৩ই : ফেব্রুয়ারি	: আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়া উদ্যান।
(৫) পঞ্চম „	: ১৮৭১, : ১১, ১২, ১৩ ফেব্রুয়ারি	: হীরালাল শীলের বাগান বাড়ি কলকাতা থেকে তিন মাইল দূরে
(৬) ষষ্ঠ ঐ	: ১৮৭২ ১১, ১২, ১৩ : ফেব্রুয়ারি মাঘ সংক্রান্তি	: মৃত রাজাবৈদ্যনাথ রায়ের কাশীপুরের বাগান বাড়ি।
(৭) ৭ম ঐ	: ১৮৭৩ ; ১৫, ১৬, ১৭ : ফেব্রুয়ারি	: হীরালাল শীলের সৈনানের বাগানে

(৮)	৮ম	"	: ১৮৭৪ । ১১-১৫ই ফেব্রুয়ারি	: পার্শীবাগান
(৯)	৯ম	"	: ১৮৭৫ " "	: "
(১০)	১০ম	"	: ১৮৭৬ । ১৯, ২০ ।	: সংঘর্ষ। রাজা বদনচাঁদের টালা উদ্যান
(১১)	১১শ	"	: ১৮৭৭ খ্রী.	: অনুল্লিখিত
(১২)	১২শ	"	: ১৯৭৮ খ্রী. সরস্বতী পূজার সময়	: কলকাতা থেকে দূরে, স্থান অনুল্লিখিত
(১৩)	১৩শ	"	: ১৮৭৯ খ্রী. ১১-১৭ ফেব্রুয়ারি	: রাজা বদনচাঁদের টালা উদ্যান।
(১৪)	১৪শ	"	: ১৮৮০ খ্রী. ২৯শে মাঘ থেকে আরম্ভ	: ব্রজনাথ ধরের বাগান, রাজাবাজার।

বিভিন্ন জনের কণ্ঠে এই মেলার বিভিন্ন নাম শোনা গেছে। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে এই মেলাকে বলেছেন 'নেশনাল মেলা'। 'ন্যাশনাল নব গোপালের' প্রধান উদ্‌যোগে প্রতিষ্ঠিত বলেই মেলার এরূপ নামকরণ হয়েছিল ; কারণ 'জাতীয়' ভাবনায় নবগোপাল সেদিন এতই মগ্ন হয়েছিলেন যে তাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার সংগেই ন্যাশনাল নাম যুক্ত করেছিলেন। মেলার ভাবাদর্শের সংগে মিলিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ এই মেলাকে 'স্বদেশী মেলা' ও বলেছেন। (আমার বাল্যকথা : পৃ. ৫০) প্রথম দিকে এই মেলা অনুষ্ঠিত হতো বলে, নাম হয়েছিল। অবশ্য এই নামকরণের ফলে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণার ও উদ্ভব হয়েছিল। চৈত্রমেলার উদ্দেশ্য যে স্বাজাত্যবোধের উজ্জীবন— এ ভাবটি মনে আনতে অনেকের নময় লেগেছিল। প্রথম তিন বছর পর, সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার আবেদনে, সর্দিগর্মির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চৈত্র সংক্রান্তি থেকে মাঘ সংক্রান্তিতে মেলাসরিয়ে নেওয়া হয়। এতে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকা ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন।[১৭] ঐ পত্রিকার বক্তব্য থেকে ধারণা করা যায়—প্রথমদিকে চৈত্রমেলাকে চড়কের মেলার সহধর্মী হিসাবেই অনেকে ধরে নিয়েছিলেন।

তৃতীয় বর্ষের কার্য বিবরণীতে এই মেলা 'হিন্দু মেলা' বলে আখ্যাত হয়। এতদিন পরে 'হিন্দু মেলা' নামটি যে যথার্থই সার্থক নাম হয়েছে—

তা চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে মেলার সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে—'অদ্যকার এই যে অপূর্ব সমারোহ ইহা এতদিন পরে ইহার প্রকৃত নামধারণ করিয়াছে, ইহা হিন্দুমেলা নামে আপনাকে লোক সমক্ষে পরিচয় দিতেছে।'[১৮]

বিনয় ঘোষ-এর মতে—'মেলার নামকরণের মধ্যে যে হিন্দুয়ানির গন্ধটুকু আছে, তা শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের হিন্দু প্রাধান্যের জন্য, সাম্প্রদায়িকতা বোধের জন্য নয়।'[১৯] সেদিন হিন্দু নামের মধ্যে সমগ্র জাতির ঐক্যবন্ধনের প্রবণতাই মূর্ত হয়েছে। হিন্দু জাতীয়তা থেকেই ধীরে ধীরে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের চেতনা জনমনে জাগ্রত হয়। সুকুমার সেন স্পষ্ট করে বলেছেন—'এখন অখণ্ড ভারতবোধ বলতে যা বুঝি, তখন সে ভাবনা ছিল না।...ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য থেকেই আমাদের ভারতীয় জাতীয়তাবোধ স্পষ্টকরে প্রশ্রয় পেয়েছিল। চিন্তাশীল মনীষী যাঁরা স্বদেশভাবনা ভাবছেন, তাঁরা এই সময় থেকে ন্যাশনাল (জাতীয়) বিশেষণটির দিকে ঝুঁকলেন। ন্যাশনাল মানে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল।'[২০] 'ন্যাশনাল পেপার' এ মুদ্রিত নবগোপাল মিত্রের ঘোষণায় এই ভাবটি ধ্বনিত।[২১]

এ বিষয়ে বিপিন চন্দ্র পাল-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"হিন্দুরাই সর্বপ্রথমে এই নূতন শিক্ষালাভের জন্য অগ্রসর হয়েন। মুসলমানেরা বহুদিন পর্যন্ত এই নূতন শিক্ষা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই...সুতরাং তাঁহারা প্রথম হইতে ভারতের এই নবজাগরণের মাঝখানে আসিয়া পড়িতে পারেন নাই...এই সকল কারণে আমাদের প্রথম যুগের স্বাদেশিকতা যে হিন্দুত্বের অভিমানকে আশ্রয় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এইজন্যই আধুনিক বাংলার প্রথম স্বাদেশিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় মহামেলা নামে অভিহিত না হইয়া 'হিন্দুমেলা' নামে অভিহিত হয়"।[২২] হিন্দুমেলায় অতীত গৌরবের কাহিনী নিয়ে যাঁরা নাটক ও কবিতা লিখেছিলেন তাতে হিন্দুযুগের বীরত্বের কথা স্থান পেলেও প্রকৃত পক্ষে হিন্দুমেলার দ্বার সকলের জন্য খোলা ছিল। মেলার চতুর্থ অধিবেশনে ১৮৭০ সালের ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি দু'দিনেই যে অনেক ইংরেজ, হিন্দুস্থানী ও মুসলমান ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল তা ১৮৭০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সমাচার চন্দ্রিকার প্রাপ্ত খবরে জানা যায়।[২৩]

হিন্দু মেলার পূর্বে যে সকল রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল—তাতে

ইংরেজ রাজপুরুষদের কিছু সাহচর্য ছিল। হিন্দুমেলাই একমাত্র এদেশীয়দের দ্বারা গঠিত হয়।[২৪] এই প্রথম জাতীয় আন্দোলনের সংগঠনে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়। স্বদেশী শিল্পের মাধ্যমে 'স্বাবলম্বন ও সমবায়-নীতি'র প্রতিষ্ঠাই যে হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য—তা দ্বিতীয় বর্ষের অধিবেশনের প্রধান বক্তা মনোমোহন বসুর বক্তব্যে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমের 'সমব্যবসায়ী সমশিল্পী-দের' মধ্যে এই মেলায় যে ঐক্যের বন্ধন স্থাপিত হলো তা থেকে দূর ভবিষ্যতে একদিন 'স্বাধীনতা' ফললাভও সম্ভব হতে পারে বলে তিনি আশা পোষণ করেছেন।[২৫]

হিন্দুমেলা ও জাতীয় কংগ্রেস

প্রসংগত রাষ্ট্রীয় মুক্তি চেতনার যে উন্মেষ হিন্দু মেলায় উপ্ত হয়েছিল, সেটি পরবর্তীকালে রূপ পরিগ্রহ করে জাতীয় কংগ্রেসে। প্রথম দিকে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের ধারা ছিল আবেদনপন্থী। জাতীয় মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন বহিঃশক্তির কাছে। আর হিন্দুমেলার আবেদন জাতির অন্তরের কাছে—যার প্রতিফলন জাতীয় আত্মার উদ্বোধনে। হিন্দু কলেজীয় শিক্ষায় জাতির জড়তা মোচন হয়েছিল সত্য কিন্তু অন্যদিকে যে মোহাচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছে হিন্দুমেলা। এখানেই এর সার্থকতা।

হিন্দুমেলায় সত্যেন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় অবদান

এতক্ষণ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার পটভূমিকা হিসাবে—পারিবারিক তথা তৎকালীন জনগণের স্বদেশভাবনার স্বরূপ কিছুটা উদ্ঘাটন করা গেল। স্বভাবতই এ প্রসংগে হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির কথা একটু বিস্তৃত করার প্রয়োজন রয়েছে—কারণ প্রধানত ঠাকুর বাড়ির আনুকূল্যেই হিন্দুমেলার পরিপুষ্টি আর এর উপযুক্ত পরিবেশেই সত্যেন্দ্র-নাথের ভারত সংগীতের জন্ম। সত্যেন্দ্রনাথের কথায়—'সেই মেলাই আমার ভারত সংগীতের জন্মদাতা।' ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।

পারিবারিক আবহাওয়া তখন স্বদেশ সংগীত রচনার অনুকূল; অগ্রজেরা

স্বদেশভাবনায় মগ্ন হয়ে সংগীত লিখেছেন। কিশোর অনুজদের মধ্যেও সে ভাবের জোয়ার এসেছে। বিশেষত মেজদাদা গণেন্দ্রনাথের কাছেই তিনি বিশেষ প্রেরণা লাভ করেছেন। এই সংগীত রচনার ফলে হিন্দুমেলার স্মৃতির সংগে সত্যেন্দ্রনাথের নাম অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকে তা প্রমাণিত হয়।[২৬] দ্বিতীয় অধিবেশনে এই সংগীত যে উদ্দীপনা এনেছিল—এর ফলে প্রায় প্রতিবছরই এই সংগীত দিয়ে অধিবেশন শুরু হতো।[২৭]

প্রথম জাতীয়সঙ্গীত

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেন—"এটি হল ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সংগীত—বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ ও রবীন্দ্রনাথের জনগণমন গানের অগ্রদূত ও প্রেরণাস্থল।'[২৮] রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর মেজ জ্যাঠামহাশয় সত্যেন্দ্রনাথকেই ভারতের প্রথম জাতীয় সংগীত রচয়িতা বলেছেন।[২৯]

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁকে প্রথম স্বদেশী সংগীত রচয়িতা বলেছেন।[৩০] প্রসংগত সমসাময়িক কালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের রচিত স্বদেশ সংগীতগুলিও জনপ্রিয় হয়েছিল।[৩১] পরবর্তী কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর পুরুবিক্রম নাটকে সত্যেন্দ্রনাথের ভারতসংগীতটি পরিবেশন করেন।

ভারতসঙ্গীত ও সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা

'অতীত গৌরববাহী' ভারতের সন্তানগণ দীন নয় কিন্তু ঐক্যের অভাবে হীনবল। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন একতার, যা আমাদের নির্ভীক করে তুলবে। এই উদ্দীপনাময় আশার সুখেই ভারতসংগীত তৎকালীন জনগণের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

স্বদেশের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের মুখ্য অনুরাগ তৎকালীন দিনে জাতীয় হীনতামোচনের সহায়ক হয়েছে ও পরানুকরণের অন্ধ আসক্তি থেকে জাতিকে প্রকৃত গৌরবের পথপ্রদর্শন করেছে। ১৭৯৯ শকে বৈশাখ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায়—'বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ' প্রবন্ধে লেখক দেশানুরাগী সত্যেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথকেই

শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করেছেন। তাঁর মতে—স্বদেশের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের 'মুখ্য অনুরাগ,' সুতরাং তিনি প্রকৃত দেশানুরাগী [৩২]

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, নারীত্বের আদর্শে, জ্ঞানের সাধনায় ও বীরত্ব গৌরবে ভারত যে অতুলনীয় এই ভাবটি ভারত সংগীতে বারে বারে ধ্বনিত হয়েছে।

সংগীতটির প্রথমেই আছে হিমাদ্রি শোভিত, চিরশ্যামল, খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতের সৌন্দর্য স্তুতি—

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খানি রত্নের নিধান।[৩৩]

প্রসংগত বিদেশ থেকে গণেন্দ্রনাথকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চিঠির মধ্যেও, বিদেশের সংগে তুলনামূলক বিচারে গংগাবিধৌত শ্যামল ভারতবর্ষের প্রতিই তাঁর মুখ্য অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে।[৩৪] ভারতীয় আদর্শের প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা, জনমনকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বর্ণনায় পাতিব্রত্যের মহান আদর্শে প্রাচীন ভারতের নারীগণ স্থির দীপ্তশিখার মতো উজ্জ্বল ও অতুলনীয়া।

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারতললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?

লুপ্ত তপোবনের জন্য সত্যেন্দ্রনাথের সংগীতে বিলাপ নেই, বরং গৌরব আছে যা জনমানসে প্রেরণা আনে। জড়সভ্যতার বিপুল সমারোহ ভারতকে স্পর্শ করেনি। তাই ভারতের আত্মিক সাধনা জগতের বিস্ময়, ভারতীয় বরপুত্রগণের একনিষ্ঠ কাব্যসাধনায় জগত বিমোহিত।

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ…
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়।

মহাভারতের যুগে যে বীরত্বের আদর্শ স্থাপিত হয়েছে—সেই মৃত্তিকায় যাদের জন্ম তারা কিছুতেই দীন হীন নয়। সেই আদর্শ সামনে রেখে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান করেছেন। সুতরাং ভারতসংগীতে একটুও নিরাশা নেই বরং কর্মোদ্দীপনার মহান ইংগিত রয়েছে। ভারতের জয়নাদের সংগে সংগেই তিনি সাহস জানিয়েছেন।

কেন, ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,

অধীনতার তিমির ভারতের আকাশে চিরস্থায়ী হতে পারে না ; নূতন উষার স্বর্ণচ্ছটায় দিগন্ত ভরে উঠবে—এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু তার আগে আত্মগঠনের উদ্‌যোগে জাতিকে তৎপর হতে হবে, সেদিকেও তিনি ইঙ্গিত করেছেন।

পরাধীন জাতিকে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ যে পথ দেখিয়েছেন, স্বদেশ ভাবোদ্দীপক কবিতা রচনায় তা অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছে। 'গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই' এমন অসহায় অবস্থা থেকে ত্রাণ পেতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভারতসংগীতে যে মহান ঐক্যের পথ দেখিয়েছেন তা সত্যেন্দ্রনাথেরই সমধর্মী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের—

জাগ রে জাগ সবে ভারত সন্তান
মাকে ভুলি কত কাল রহিবে শয়ান

সংগীতে তরুণ কবির কণ্ঠে জড়তামোচনের আহ্বান ব্যক্ত হয়েছে।[৩৫] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আত্মগঠনের উদ্‌যোগে সত্যেন্দ্রনাথের অবদান ও দুজনের নিবিড় সান্নিধ্যে ধারণা করা যায় একই বছরে দুটি সংগীত পরিবেশিত হলেও মেজদাদার ভাবাদর্শে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হয়েছেন। মেলার নবম অধিবেশনে (১৮৭৫) চতুর্দশবর্ষীয় বালক রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতায় হতাশা থাকলেও পরবর্তী একাদশ অধিবেশনে (১৮৭৭ খৃ.) 'দিল্লীর দরবার' কবিতায় কিশোর রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের সুর দৃপ্ত।

ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান

প্রসঙ্গত এই মুষ্টিমেয়—আমরা ক-জনের মধ্যে সঞ্জীবন সভার সভ্যগণ হয়তো ছিলেন বলে প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেছেন।[৩৬] সঞ্জীবনী সভার সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, উৎসাহী সদস্য ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখেরা। এমন কি নবগোপাল মিত্রও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই সভার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের সংযোগ-এর কথা শোনা যায় নি।

উপসংহার

ভারতসংগীত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার স্বরূপ কিছুটা উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করা গেল। হিন্দুমেলায় এই সংগীত যে আলোড়ন এনেছিল—সেটিও বিভিন্ন জনের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে। বন্দেমাতরম (১৮৭৫) রচনার আগেই সত্যেন্দ্রনাথের ভারত-সংগীতের ভাবাদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর প্রশস্তি দিয়েই এ আলোচনা শেষ করা যেতে পারে।

স্বদেশের গঠনমূলক কর্মধারা এবং ব্রিটিশের সঙ্গে আমাদের কতটুকু সহযোগিতা রাখা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের মতামত তাঁর 'রাজনৈতিক চিন্তা' প্রসঙ্গে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'রাজনৈতিক চিন্তা'য় বিশেষ করে তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তাধারা বিশ্লেষিত হয়েছে। বক্ষ্যমান আলোচনায় স্বদেশের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট 'আইডিয়া' বা ভাবাদর্শের বিশ্লেষণ করা গেল। রাজনৈতিক চিন্তায় সত্যেন্দ্রনাথের বাস্তবভিত্তিক নির্দেশাবলী আলোচিত হয়েছে। মূলত তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাও স্বদেশভাবনার মধ্যেই অনসূ্যত।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের ভারতসংগীত বন্দেমাতরম্ এর মতো দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। বন্দেমাতরম্ সংগীতের ভাষা প্রধানত সংস্কৃত বলেই সকল প্রদেশের লোকের কাছে সহজে আদৃত হয়েছে ও এর উদ্দীপনা সকলের মাঝে সহজে বিস্তৃত হয়েছে। ভারতসংগীতকেও সত্যেন্দ্রনাথ মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করে অন্য প্রদেশের লোকের কাছে এর ভাবাদর্শ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী এই গানে প্রথম যে সুর বসিয়েছিলেন তা তেমন জোরালো ছিল না বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তা মনঃপূত হয় নি। পরে এটি পরিবর্তিত করে গাওয়া হতো।[৩৭]

বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে—'কি ভয় কি ভয়' অংশে উদ্দীপনা জাগাতো তা ইন্দিরা দেবীর কণ্ঠেও ব্যক্ত হয়েছে।[৩৮] বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়— '৺সত্যেন্দ্রবাবু আর কিছু লিখুন বা নাই না-ই লিখুন এই গানটিতে তিনি বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন। এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র

গীত হউক, হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা, যমুনা সিন্ধু, গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। * * *

'এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সংগে বাজিতে থাকুক।' (বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৭৯)।

১. আমার জ্যাঠা মহাশয়রা সকলেই দেশভক্ত ছিলেন।···তখনকার দিনে ভারতীয় আই. সি. এস-রা উগ্ররকমের সাহেব বনে যেতেন। মেজ জ্যাঠামহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ তাদের অগ্রণী ছিলেন ছিলেন, তবু তাঁর মধ্যে সাহেবিয়ানা মোটেই ছিল না। তিনিই প্রথম ভারতের জাতীয় সংগীত লেখেন। পিতৃস্মৃতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃ. ৯৫।

২. তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃ-ভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল। জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্র-রচনাবলী—সপ্তম খণ্ড) পৃ. ৩৪৮।

৩. নামান্তর—জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভা।

৪. 'ব্রাহ্ম বিবাহ' আইন যখন বিধিবদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল তখন যাঁরা আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য সিমলায় পাহাড়ে প্রেরিত হন, নবগোপালবাবু তাঁদের মুখপাত্র ছিলেন।' আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃ. ৫৫ ; বৈতানিক প্রকাশনী।

অপিচ

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নবগোপাল মিত্র আদি ব্রাহ্ম-সমাজ কর্তৃক শ্রীযুক্ত স্টিফেন সাহেবকে (ব্যবস্থা সচিব) প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ দিবার জন্য সিমলায় প্রেরিত হন।'—রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত ; পৃ. ২০০।

৫. 'ব্রাহ্মদিগের নামে বিবাহ সম্বন্ধীয় কোনও রাজবিধি প্রণীত হয়, আদি সমাজ ইহার বিরোধী হওয়াতে, ব্রাহ্মবিবাহ বিধি এই নামে ত্যাগ

করিয়া ১৮৭২ সালের তিন আইন নাম দিয়া একটি সিবিল বিবাহ বিধি প্রচারিত হয়।'—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বংগসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃ. ২৪৬।

৬. ১৮৭২ সালে...যখন সিবিল ম্যারেজ আইন পাস হয় (এ আইন ব্রাহ্ম বিবাহ আইন বলে পাশ হয় নি...) তখন...জাতীয় সভার উদ্যোগে ১২৭৯ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে...রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নামে এই যুগান্তকারী বক্তৃতা করেন।'—মুক্তির সন্ধানে ভারত : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ৩য় সং ; পৃ. ৮২।

৭. My country : in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow
And worshipped as a deity thou wast—
where is thy glory, where that reverence now ?

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এর এরূপ অনুবাদ করেছেন—

স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
—মুক্তির সন্ধানে ভারত : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ; পৃ. ২৪।

৮. To My Students

'Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds...'

হেনরী ডিরোজিও—'কবি ও প্রাবন্ধিক' পল্লব সেনগুপ্ত। পৃ. ৩১।

৯. 'উপরে কে এয়েছে জানিস—সেকাল একাল এয়েছে'।
—আত্মচরিত : রাজনারায়ণ বসু— পৃ. ১১।

১০. সেকাল আর একাল : রাজনারায়ণ বসু ; পৃ. ৯৬। বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত।

১১. "It is to be feared that the tide of revolution may sweep away whatever good we have inherited from our ancestors. So prevent this catastrophe and to give a national

shape to reforms, it is proposed that a Society be established by the influential members of native Society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal."—Prospectus of a Society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal : Raj Narayan Bose.

—যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত।

১২. 'জাতীয় মেলার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নবগোপাল বাবু। তিনি হিন্দু স্কুলে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, স্কুল ছেড়ে আমাদের সহকর্মী হলেন; আমাদের মধ্যে প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ল, তিনি আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করতে লাগলেন। * * * Indian Mirror পত্র যখন আমার পিতৃদেবের হাত হতে হস্তান্তর হল, সেই পত্রের প্রতিযোগী 'National Paper' পত্র আমাদের বাড়ী থেকে বেরোতে লাগল, নবগোপাল বাবু তার সম্পাদক হয়েছিলেন।' আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৫১। ৩য় বৈতানিক সংস্করণ, ১৯৮৩।

১৩. আমার বাল্যকথা—পৃ. ৪৮।

১৪. রমানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীলকমল মুখোপাধ্যায়, যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ইত্যাদি।

১৫. আত্মচরিত : রাজনারায়ণ বসু। পৃ. ২২৭।

১৬. হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত : যোগেশচন্দ্র বাগল।

১৭. সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭০) পাঠে জানা যায় যে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট চড়ক পূজায় পিঠ ফোঁড়া প্রভৃতি...তুলিয়া দিলে এই সময় হইতে তদ্বিনিময়ে চৈত্রমেলার সূত্রপাত হয়। এই পত্রিকা লেখেন...'যখন চড়কপর্ব্বের বিনিময়ে চৈত্রমেলার সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ঐ বৎসর একেবারে তাহার নাম ও দিন পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলা কোন ক্রমেই যুক্তিসংগত হয় নাই। লোকের কষ্ট

বলিয়া শাস্ত্রসংগত পর্ব্বদিন পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না।' হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত : যোগেশচন্দ্র বাগল ; পৃ. ১৯।

১৮. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় : হিন্দু মেলা ও ভারতচিন্তা প্রবন্ধ। দেশ ; সাহিত্যসংখ্যা বৈশাখ, ১৩৭৪ ; ১০৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৯. বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা ও ভারতবোধ প্রবন্ধ : বিনয় ঘোষ। সাহিত্য সংখ্যা—দেশ. বৈশাখ, ১৩৭৪।

২০. নাটকে ভারতচিন্তা : সুকুমার সেন। দেশ সাহিত্যসংখ্যা—বৈশাখ, ১৩৭৪।

২১. "We despise race distinctions. It should be our object to raise up a vast nationality in India composed of Christian, Hindoo, Parsee and Mohomedan governed by one interest, and one faith *viz.* faith in the supremacy of human love and charity.'

—National Paper. 1868, 1st April.

২২. নবযুগের বাংলা : বিপিনচন্দ্র পাল। পৃ. ১৪১-১৪২।

২৩. হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত : যোগেশচন্দ্র বাগল। চতুর্থ কার্যবিবরণীতে উদ্ধৃত।

২৪. 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওনাবধি এদেশে যত কিছু উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রায় রাজপুরুষগণ অথবা অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্ত্তক। কিন্তু এই চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান'। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের (১৮৬৮) প্রধান বক্তা মনোমোহন বসুর বক্তৃতা : যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে—পৃ. ১০-১১ মুদ্রিত।

২৫. 'ঐক্যনামা মহাবীজ...স্বদেশ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া...একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক।...তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে।' (ঐ বক্তৃতা)

২৬. '১৮৬৮ সালে বেলগাছিয়ার সাত পুকুরের বাগানে মহাসমারোহে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেইদিন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সংগীত 'গাও ভারতের জয়' সুগায়কদিগের দ্বারা গীত হয়, আমরা কয়েকজন জাতীয় ভাবের উদ্দীপক কবিতা পাঠ করি।' রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃ. ২৩১।

২৭. প্রায় প্রতিবারের অধিবেশনের আরম্ভে গীত হ'ত ভারতবাসীর সুবিখ্যাত জাতীয়সংগীত—'গাও ভারতের জয়'। রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাসে এর স্থান সুনির্দিষ্ট—মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ. ৮৬।

২৮. রবীন্দ্রচিন্তায় ভারতবর্ষ : প্রবোধচন্দ্র সেন। সাহিত্যসংখ্যা দেশ ১৩৭৪ পৃ. ১১৯।

২৯. দ্র. …১নং পাদটীকা।

৩০. আজকাল অনেকেই স্বদেশী গান রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু মেজদাদাই এই যুগে সর্বপ্রথম স্বদেশী গান রচনা করেন—'মিলে সবে ভারত সন্তান'।—সাহিত্য স্রোত : স্বর্ণকুমারী দেবী। ১ম ভাগ, পৃ. ৩৫৯।

৩১. দ্বিজেন্দ্রনাথ : মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি…
গণেন্দ্রনাথ : লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে…

৩২. "হিন্দুমেলা উপলক্ষে আমাদের দেশে প্রথম যে ভারত-সংগীতটি রচিত হয়, তাহাতে মুখ্য দেশানুরাগের লক্ষণটি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।…এমন হইতে পারিত যে, গীতরচয়িতা ইংলণ্ড বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া ভারতভূমিকে তাহার পদানুবর্তী হইতে বলিছেন, কিন্তু তাহা হইবে কেন ? গীত রচয়িতার হৃদয়ে যখন ভারতভূমির মহান আদর্শ জ্বলজ্বল করিতেছে, তখন তিনি কোন প্রাণে তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া অন্যত্র অবলোকন করিবেন।"—'বর্তমান হিন্দু সমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ।'—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ; বৈশাখ ১৭৯৯ শক। লেখকের নাম অমুদ্রিত।

৩৩. সরলা দেবী রচিত 'শতগান'এ (৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৩৯) সামান্য

পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। 'নিধান' স্থলে—নিদান ও পতিরতা স্থলে পতিব্রতা।

৩৪. 'আহা, আবার কবে গঙ্গানদীর শুভ্র উদার মূর্তি দেখিয়া প্রফুল্লিত হইব?…এদেশের স্বভাবের কীর্তি ভারতভূমির গৌরব কিছুই স্মরণ করিয়া দেয় না। এখানে বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মত গগন স্পর্শ পর্বত নাই—গঙ্গার মত নদী নাই—শাল অশ্বত্থ বটের মত দিক্‌বিদিক প্রসারিত বৃক্ষ নাই। মনুষ্যের কৃত্রিম হস্ত সর্বস্থানে স্বভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।'—গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র। ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৩।

৩৫. 'হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) কবিতাটি পঠিত হয়'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : সুশীল রায়—পৃ. ৫৪।

৩৬. দ্র. রবীন্দ্রচিন্তায় ভারতবর্ষ : প্রবোধচন্দ্র সেন। সাহিত্যসংখ্যা দেশ, বৈশাখ ১৩৭৪, পৃ. ১২৩।

৩৭. বাংলা সংগীত ও ভারতচিন্তা : রাজ্যেশ্বর মিত্র; সাহিত্যসংখ্যা দেশ, বৈশাখ, ১৩৭৪। পৃ. ১২৯।

৩৮. দ্র. এই গবেষণার শিল্পী-সত্তা অধ্যায় : সত্যেন্দ্রনাথের গান।

ইতিহাসচেতনা

সত্যেন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনার স্বরূপ

সত্যেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক রচনাবলীর মধ্যে ইতিহাসের এক একনিষ্ঠ পাঠককে খুঁজে পাওয়া যায়। ইতিহাসকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করা বা ইতিহাসের পটভূমিকায় নিজের মনোমত কাহিনী সৃষ্টি করার দিকে তাঁর কোন প্রবণতা নেই। শুধু ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের বিচিত্রময় ঘটনাগুলি বিবৃতিমূলক ঢঙে পরিবেশন করেছেন ও বিবৃতিগুলির প্রামাণিকতা প্রতিপাদনে যথেষ্ট আগ্রহশীল হয়েছেন। ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে রসসৃষ্টি করতে তিনি যাননি, তবে যুদ্ধবর্ণনাসংকুল নীরস বর্ণনায় পাঠকের যাতে ক্লান্তি না আসে সেদিকে তিনি দৃষ্টি রেখেছেন। কয়েকটি সরস মন্তব্যের চকিত আবির্ভাবে রচনা একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি, এখানেই সত্যেন্দ্রনাথের ইতিহাস বর্ণনার সার্থকতা।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই শিখ রাজপুত ও মারাঠা জাতির অপূর্ব বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ইতিকথার সংগে শিক্ষিত বাঙালীর বিশেষভাবে পরিচয় ঘটে। পরবর্তীকালে স্বাজাত্যবোধের উদ্বোধনে এঁদের নিয়েই স্বদেশ-প্রেমী বাঙালীরা লেখনী ধারণ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো 'পুরুবিক্রম'[১] ও 'সরোজিনী'[২] রচনা না করলেও অনুজেরা ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহে নিঃসন্দেহে অভিনিবিষ্ট পাঠক সত্যেন্দ্রনাথের কাছে কিছু না কিছু উপকৃত হয়েছেন বলে ধারণা করা অন্যায় নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তির আগে স্বল্পকথনে পেশোয়া কাহিনী বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট।[৩]

ইতিহাসের পটে ঐতিহাসিক রসসৃষ্টির দিকে তাঁর মন ধাবিত না হলেও, অতীত গৌরবের সাক্ষ্য নিয়ে আজও যে সকল ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরের অস্তিত্ব রয়েছে, সেখানে বিচারকের কার্যভার নিয়ে এলেও সে সকল স্থানের প্রাচীন ইতিহাস-অন্বেষণে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন।

ইংরেজ আগমনের পূর্বে সে সকল স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণ, ইংরেজদের আগমন ও সংঘর্ষ ও 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনী সংযত ও সংহতরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

তাঁর 'বোম্বাইচিত্র' গ্রন্থে এ সকল ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলির মধ্যে একদিকে গভীর অভিনিবেশপূর্ণ অধ্যয়নের নিদর্শন রয়েছে অন্যদিকে লোকপ্রচলিত কিংবদন্তীগুলির সত্যরূপ উদ্ঘাটনের কিছু প্রচেষ্টাও লক্ষিত হয়। হয়তো ভ্রমণপিপাসুর দৃষ্টি নিয়ে অতীত মাহাত্ম্যের নিদর্শন দেখেই তিনি তৃপ্ত থাকতেন। এতটা সচেতনভাবে ইতিহাসের অন্বেষী হতেন না। কিন্তু তাঁর সামনে ছিল 'ভারতী' ও 'বালক'-এর পাঠক সম্প্রদায়। 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় যশোবৃদ্ধি ও পাঠকদের তুষ্টিবিধান ছিল তাঁর সকল প্রেরণার উৎস। ভাষায় সাহায্যে বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন ছবি আঁকতে গিয়েই সে সকল দেশের ইতিহাস না বললে অপূর্ণতা থাকবে—এই ভাব থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ সে সকল স্থানের অতীত কাহিনীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। এ হচ্ছে ইতিহাসরসসন্ধিৎসুর দৃষ্টি ও অনুভূতির প্রগাঢ়তা—যার সন্ধানী আলোয় বিস্মৃত অতীত মুখর হয়ে ওঠে।

ইতিহাস চেতনার উৎস

সত্যেন্দ্রনাথ 'বোম্বাই চিত্র' শুরু করেছিলেন পত্রের ঢঙে। 'প্রবাসপত্র' রূপেই 'বোম্বাই চিত্রে' এগুলি উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমে কোথা থেকে আরম্ভ করবেন কিভাবেই বা শেষ করবেন নিজেই বুঝে উঠতে পারেন নি।[৪] কোন বিষয় নির্বাচন করলে বালক ও প্রাপ্তবয়স্ক সকলেরই উপযোগী হয় এ নিয়ে অনেক ভেবেছেন। শেষটায় বোম্বে গেজেটিয়ারকেই তিনি কাঠামো করেছেন। গেজেটিয়ার-এ মোটামুটিভাবে একটা ভৌগোলিক অবস্থা ও প্রাচীন ইতিহাসের পরিচিত, কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক অবস্থা, বিচার ও প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতিগত বৈচিত্র্য দ্রষ্টব্য স্থান সবকিছুরই আভাস থাকে। সত্যেন্দ্রনাথ গেজেটিয়ার পাঠ করে কিভাবে বোম্বাই কাহিনী লিখবেন তার ধারণা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনা হুবহু গেজেটিয়ারের অনুকরণ নয়। যেখানে যেখানে গেজেটিয়ার থেকে ভাষান্তরে উদ্ধৃত করেছেন সেখানে পাদ-

টীকায় স্পষ্ট করেই ঋণ স্বীকার করেছেন। এছাড়াও আরও বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এসকলের মধ্যে—

Marshman's History of India
Elphinstone's History of India
Cunningham's Ancient Geography of India
Dosabhal Framji's History of Parsees
Haug's Essays on the Parsis
Wheeler's History of India vol 4, Part—I.

প্রভৃতি উল্লেখ্য গ্রন্থ।

বোম্বাইয়ের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিবরণ দিতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থ থেকে প্রচুর সহায়তা লাভ করেছেন। মনিয়র উইলিয়মস্ কৃত Religious life and thought of India—গ্রন্থ থেকেও তিনি যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় প্রসঙ্গে সাহায্য নিয়েছেন তার উল্লেখ নিজেই করেছেন। বোম্বাইয়ের বিভিন্ন জাতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বোম্বে গেজেটিয়ার-এর হুবহু বর্ণনা তুলেই তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। তাঁর প্রবল জ্ঞানৈষণা পারসী ইতিহাসের দিকে তাঁকে টেনে নিয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী উপকরণ সংগ্রহ করেছেন Maclean's *Guide to Bombay'* গ্রন্থ থেকে। 'বালক পত্রিকায় নিজেই তার উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে যাঁরাই বোম্বাই প্রসঙ্গে লিখেছেন তাঁরা এ গ্রন্থকে আদর্শ করেছেন। এছাড়াও আরেকটি পুস্তকের প্রভাব থাকা খুবই সম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ যখন বোম্বাই-এর বর্ণনা লিখছেন তার আগেই ১৮৮৩ সালে James Douglas-এর *A Book of Bombay* প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির বিষয়বস্তুর আভাস বোম্বাই-এর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতির প্রতি গ্রন্থকারের মমতার নিদর্শন উৎসর্গ পত্রেই রয়েছে।[৫] গ্রন্থখানির ভূমিকায় বোম্বাই প্রসঙ্গে ছড়ানো-ছিটানো কথাগুলিকে এক জায়গায় গাঁথতে গিয়ে Douglas, "Sketches of Bombay"[৬] কথাটির প্রয়োগ করেছেন। এই Sketches of Bombay কথাটির ছায়া সত্যেন্দ্রনাথের 'বোম্বাইচিত্র' নামকরণে লক্ষিত হয়। Douglas-এর গ্রন্থখানি যে বোম্বাই অঞ্চলে বহুল প্রচারিত হয়েছিল তার আভাসও গ্রন্থের ভূমিকায় আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ যেমন বোম্বাই চিত্রের বিজ্ঞাপনে তাঁর লেখাগুলি 'আমার

বোম্বাই প্রবাস সঙ্গিনী লেখনী হইতে অবসর মতে প্রসূত' বলেছেন, অনুরূপ প্রতিধ্বনি James Douglas-এর গ্রন্থের ভূমিকায়ও দৃষ্ট হয়। 'They are the work of an unprofessional pen during intervals of leisure.' কোন বিশেষ তত্ত্ব বা ঐতিহাসিক কোন রহস্যজালকে উন্মোচন করা Douglas -এর উদ্দেশ্য নয়। জনতার জানা কথাকেই একজায়গায় তিনি সাজিয়েছেন। সবিনয়ে তার উল্লেখ করে লিখেছেন—'They don't aspire to the dignity, the philosophy or even the rigid accuracy of History, and pretend to no special sources of information but what are open to the public'.

প্রাচ্যের বিশিষ্ট বন্দর বোম্বাই-এ ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনের বিবরণ হিসাবেই গ্রন্থটির কিছু মূল্যায়ন হতে পারে এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করেই Douglas তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—They presume, however by way of endeavour, to illustrate one of the noblest episodes in the colonial History of England, the rise and growth amid many difficulties, of a great city on the shores of Asia…

সত্যেন্দ্রনাথও বোম্বাই-এর ইতিহাস বর্ণনায় ইংরেজদের রাজ্যস্থাপনের অধ্যায় টুকুই বিশেষ করে বেছে নিয়ে লিখেছেন—'যখন ইংরেজেরা বোম্বাই অধিকার করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে…তখন চতুর্দিকে বিভীষিকা, পদে পদে বিঘ্ন-বাধা…এই কঠোর অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই শহর ক্রমে পশ্চিম ভারতবর্ষের রাজধানী হইয়া ইংরাজ-রাজ-মুকুটের অত্যুজ্জ্বল মণিরূপে শোভাপাইতে লাগিল।' (পৃ. ৩৩৬, বোম্বাইচিত্র)। বোম্বাই-এর ভৌগোলিক পরিবেশে প্রসঙ্গে Douglas উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করে বলেছেন—"For beauty of situation it is 'the joy of whole earth' unrivalled, at all events, in the Eastern dominion of Queen Victoria."[৭] সত্যেন্দ্রনাথের উক্তিতেও এর সমর্থন রয়েছে—'বোম্বাই যে কি অমূল্য রত্ন তাহা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।' (পৃ. ৪০০, বোম্বাইচিত্র)

Douglas-এর 'Book of Bombay' গ্রন্থের কতিপয় অধ্যায়ের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বোম্বাই, মহারাষ্ট্র ও বিজাপুরের ইতিহাস বর্ণনায় বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।[৮]

ইংরেজদের এদেশে রাজ্যস্থাপনের ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়ার কারণ বিশ্লেষণে সত্যেন্দ্রনাথ এদেশীয়দের ধর্মব্যবস্থায় ইংরেজদের হস্তক্ষেপ না করার বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছেন। (পৃ. ৩৩২ বোম্বাইচিত্র)। আধুনিক কালের গবেষণার বিশ্লেষণেও সত্যেন্দ্রনাথের সংগে সমতা লক্ষিত হয়। প্রসঙ্গতঃ, অধ্যাপক M. D. David-এর বিশ্লেষণ উল্লেখ করা যেতে পারে—'The policy of religious toleration adopted by the company was deliberate and was meant to strengthen their roots in the soil and to extend their power.' [*History of Bombay* :—(1661-1708) by Dr. M. D. David. p. 144.]

James Douglas তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে 'Bombay Marriage Treaty' দিয়েই শুরু করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিবাহ-চুক্তিকে বাদ দিয়ে বোম্বাইয়ের প্রাথমিক ইতিহাস রচিত হতে পারে না। সত্যেন্দ্রনাথ 'বোম্বাই চিত্রে' লিখেছেন—'দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ-যৌতুক স্বরূপে বোম্বাই ইংরাজের হস্তাধীন হইল। ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ ও পর্তুগীজ রাজার মধ্যে যে বিবাহ সন্ধি সম্বন্ধ হয় তাহা হইতেই বোম্বায়ে ব্রিটিশ অধিকারের সূত্রপাত ...(পৃ. ৩০০, বোম্বাই চিত্র)।

আধুনিক কালে অধ্যাপক M. D. David তাঁর গবেষণা গ্রন্থে এই বিবাহ চুক্তি যে রাজনৈতিক কারণেই সাধিত হয়েছিল এ বিষয়ে অন্যান্যদের উদ্ধৃতি সহ আলোচনা করে লিখেছেন—"Bombay came as a gift from the Portuguese to the English king Charles II on his marriage to the Portuguese Princess, the Infanta Catherine of Eraganza.... Not romance, but the political interest of the two nations formed the basis of this marriage treaty. It was 'a long and intricate document'." (Ibid. p. 29.)

বোম্বাই নামের উৎপত্তি প্রসংগে সত্যেন্দ্রনাথ যে সকল উপাদান সংগ্রহ করেছেন সাম্প্রতিক কালে গবেষণায় ও এর চেয়ে খুব বেশী নূতন তথ্য পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, M. D. David-এর গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'এ নামের উৎপত্তি বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে অনেকের মত এই যে পর্তুগীজেরা বোম্বায়ের সুন্দর

উপসাগর (Bombay) দেখিয়া এই দ্বীপের নামকরণ করে।' (পৃ. ৩২৯) বোম্বাই চিত্র Dr. David তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন :

"According to some it is derived from the Portuguese words '*Bom*' meaning 'good' and '*B'ahia*' meaning 'bay' or 'harbour'. এখানে নৃতনত্বের দিক থেকে শুধুমাত্র পর্তুগীজ শব্দের বিশ্লেষণ পাওয়া যাচ্ছে।

মুসলমান রাজামুবারক থেকেও বোম্বাই নাম হতে পারে বলে M. D. David তথ্য প্রদান করেছেন : যদিও তিনি মুম্বাদেবী থেকে বোম্বাই নামের উৎপত্তি প্রসংগে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'কেহ কেহ বলেন যে মুম্বাদেবীর মন্দির হইতে এই নামের সৃষ্টি হইয়াছে।... কুলীদের উপাস্য দেবতা 'মুঞ্জা' ব্রাহ্মণ হস্তে পড়িয়া মুম্বা' নাম ধারণ করিলেন।' (পৃ. ৩১৯, বোম্বাই চিত্র) এ বিষয়ে Dr. D. avid বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন :

'However it is now settled beyond dispute that the name Bombay is derived from the name of the goddess Mumba Devi, a goddess of the Koli fisherfolk, who brought this deity along with them to this island during the prehistoric period.' (*Ibid* p. 6)

ঐতিহাসিক গবেষকদের মতো বিভিন্ন মতবাদগুলিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সত্যেন্দ্রনাথ ক্লান্তি বোধ করেন নি।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ থেকেই 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার ১২৮৪ সালের ভাদ্র সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ গুজরাটের কৃষিদল 'কড়ুয়া কণবী'-দের বিবরণ ও কার্তিক সংখ্যায় 'গুজরাটের নামকরণ' লেখেন। এই সালেরই অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন এই চার মাসে 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ১২৯১ বংগাব্দে 'বোম্বাই চিত্র' গ্রন্থে এটি পুনর্মুদ্রিত হয় ও ১৩১৮ বংগাব্দে (১৯০৮) স্বতন্ত্র পুস্তিকা রূপে প্রকাশিত হয়। ১২৮৪ সালের চৈত্র সংখ্যা থেকে 'বোম্বাইরায়ত' লিখতে শুরু করেন। ১২৮৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'বোম্বাইরায়ত' সম্পর্কে আরো বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যা থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ 'তুকারামের জীবনী ও অভংগ' লিখতে শুরু

করেন। ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে তুকারামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। এই সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'বোম্বাই রায়ত' দ্বিতীয় ভাগ ও আশ্বিন সংখ্যায় 'বোম্বাইরায়ত' তৃতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়।

গুজরাটের 'কণবী' জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্যে যে কোন যুক্তিসংগত উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় না এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ পূর্ণ সচেতন হয়েও, নিছক কিংবদন্তীকে এক উপভোগ্য কাহিনীর মূল্য দিয়েই পরিবেশন করেছেন। এ যেন শুধু গল্প বলা, যার মূলে রয়েছে সেই সমাজের লোকেদের প্রবল আনুগত্য।[১০]

গুজরাটের নামকরণে মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, ও বাংলা ভাষার সম্বন্ধসূচক নামের তালিকার মাধ্যমে এই তিন ভাষার সৌসাদৃশ্য প্রতিপন্ন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ'-এ এদেশীয় ইংরেজদের মনোভাব, ইংরেজভক্ত ও ইংরেজবিরোধী সত্যেন্দ্রনাথের দুই বন্ধুর মতামত ও সত্যেন্দ্রনাথের সমালোচনা, প্রসংগত ইংরেজদের আহার বিহার ও বিবাহাদি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথের অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় সুস্পষ্ট। সুতরাং সুতরাং দেখা যাচ্ছে তিনি দ্বিতীয়বার আমেদাবাদ থাকার সময়েই 'Lands and People'-এর ঢঙে গুজরাটের কণবীদের কাহিনী হাতে নিয়েছেন। লেখাগুলো তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের আলোকেই রচিত। 'গুজরাটের-নামকরণে' মহারাষ্ট্রী ও গুজরাটী ভাষায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার ফলে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে এই ভাষার কিছুটা আভাস দিয়ে তিনি তৃপ্তি অনুভব করেছেন। 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' রচনাটি ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সংগে প্রতিদিনের সংযোগের প্রতিচ্ছবি। রেভিনিউ কাজের সংগে জড়িত থাকার ফলে 'বোম্বাইরায়ত'-এর উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাঁর অন্যত্র অন্বেষণের প্রয়োজন হয়নি। রাজকাজের অভিজ্ঞতাই তাঁকে এই সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখার মালমশলা যুগিয়েছে। প্রসংগত, আইন ঘটিত নানা সমস্যা সম্পর্কে তিনি যে পূর্ণ অবহিত ছিলেন সে সম্পর্কে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

'বালক' (১২৯২) পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় 'বোম্বায়ের গানবাজনা' লেখার সময়েও তিনি নিজে বিভিন্ন স্থানে দেখেশুনে যে ধারণা লাভ করেছেন, তাই দিয়েই সহজভাবে বোম্বাই অঞ্চলের গানবাজনা ও নৃত্যের বিবরণ দিয়েছেন। প্রসংগত কলকাতার সংগে কিছু তুলনাও এসেছে। ১২৯২, শ্রাবণ সংখ্যা

'বালক'-এ 'বোম্বাই-সহর' সম্পর্কে লেখার সময়েই তিনি বিষয়বস্তুকে সুপরিবেশিত করার জন্য অন্যত্র উপাদান সংগ্রহে আগ্রহী হয়েছেন বলে ধারণা করা যায়। 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২) শ্রাবণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত বোম্বাই নামের উৎপত্তি, বোম্বাই-এর ইতিহাস, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বোম্বাই-এর জাতি-বৈচিত্র্য, পুরশ্রী, সৌধাবলী, বিভিন্ন উৎসব এলিফেণ্টা গুহার বিবরণ দিয়ে বোম্বাই-এর বর্ণনা শেষ করেছেন। পরবর্তীকালে 'বোম্বাই চিত্রে' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কোন কোন অধ্যায় পরিবর্ধিত হয়েছে ও অধ্যায়গুলিকে যথাসম্ভব বিষয়ানুসারী করা হয়েছে। বোম্বাই-এর বাণিজ্য প্রসঙ্গে পৃথক্ অধ্যায় রচিত হয়েছে (৭ম পরিচ্ছেদ বোম্বাই চিত্র)। বোম্বাই-এর সৌধাবলী থেকে পৃথক্ করে শুধু 'মন্দির'গুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (৯ম পরি :, বোম্বাই চিত্র পৃ. ৪৬৮)। এছাড়া, উৎসব অধ্যায় থেকে পৃথক্ করে এলিফেণ্টার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে একাদশ অধ্যায় (বোম্বাই চিত্র পৃ. ৪৮২) রচিত হয়েছে। এ বিভাগ সমীচীনই হয়েছে। কারণ উৎসব প্রসঙ্গে এলিফেণ্টা গুহার সকল কথা বলা সম্ভব হয় না। সুতরাং, প্রথমে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে লিখতে শুরু করলেও, পরবর্তীকালে বহু দেশী ও বিদেশী লেখকদের রচনা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন।

উপকরণ বিচার ও পরিবেশনার কৃতিত্ব

ভারতের দক্ষিণ ভূভাগে ইংরেজদের রাজ্যস্থাপন ও তৎপূর্ববর্তী ইতিহাসের বিবরণ সত্যেন্দ্রনাথ সাধারণের বোধগম্য ভাষায় পরিবেশন করেছেন। এই প্রসঙ্গে সিন্ধুদেশ, বিরাজপুর, মহারাষ্ট্রে শিবাজীর রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, শিবাজীর পরবর্তী সময়ে পুণায় পেশোয়া বংশের প্রতিষ্ঠা, মহাদাজী সিন্ধে ও যশোবন্তরাও হোলকর-এর উত্থান ও ধীরে ধীরে ইংরেজদের রাজ্য অধিকারের কাহিনী 'বোম্বাই চিত্রে' বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজদের সঙ্গে এদেশীয়দের যে সকল সন্ধি হয়েছে, সংক্ষেপে সত্যেন্দ্রনাথ তারও আভাস দিয়েছেন। রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে একটি অন্তরঙ্গ সুর ধ্বনিত হয়। পাঠকের দৃষ্টি যেন অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ করতে চেয়েছেন,—'ইংরাজদের আগমন কালে ভারতবর্ষের অবস্থার প্রতি একবার মনোনিবেশ কর; করিলে সহজে বুঝিতে পারিবে ইংরাজরাজ্য এদেশে কি রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।' (পৃ. ৩৩৯, বোম্বাই-

চিত্র)। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের গভীর যোগসূত্র রয়েছে বলেই বর্তমানে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠার কারণগুলো অতীতের গর্ভেই সত্যেন্দ্রনাথ অনুসন্ধান করেছেন। অনেক সময় ঘটনার গুরুত্বে কোন কোন অংশ যে বিস্তৃত হয়েছে, কোথাও বা বিষয়ান্তরে চলে গেছেন সে সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ সচেতন হয়েই লিখেছেন—'যতদূর পারা যায় সংক্ষেপে সমালোচনাই আমার উদ্দেশ্য কিন্তু ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে প্রকৃত প্রস্তাব ছাড়িয়া যদি একটুকু দূরে গিয়া পড়ি তাহা হইলে কিছু মনে করিওনা।' (পৃ. ৩৩৯, বোম্বাইচিত্র)। পরবর্তী-কালে 'আমার বোম্বাই প্রবাস'-এ (পৃ. ১৯৮) আরো স্পষ্ট করে বলেছেন "হাজার সংক্ষেপ করিলেও তাহা দুই তিন অধ্যায়ের কমে সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। পাঠকের যদি ভাল না লাগে, তবে এ ভাগ ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারেন।' অতএব, পাঠকদের মনস্তুষ্টি তথা—স্বল্পকথনের দিকে সত্যেন্দ্র-নাথের প্রখর দৃষ্টি ছিল।

ইংরেজদের রাজ্যস্থাপনের প্রাক্‌কথন হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে আলাউদ্দিন-এর[১১] 'বাহমণী' রাজবংশ স্থাপন ও তার ভস্মাবশেষ থেকে বিজাপুর, আহমদনগর, গোলকোণ্ডা ইত্যাদি পঞ্চ মুসলমান রাজ্যস্থাপনের। পূর্ববর্তী কাহিনীরও তিনি আভাস দিয়েছেন। আহমদনগরের ইতিহাসের আলোচনায় বীরাঙ্গনা চাঁদবিবির মাহাত্ম্য বর্ণনে সত্যেন্দ্রনাথ কিছুটা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। চাঁদবিবির প্রসঙ্গ কিছুটা বিস্তৃত ভাবেই আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, চাঁদবিবির ভ্রাতুষ্পুত্র বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম চাঁদবিবির যে স্তুতিগান রচনা করেছেন সত্যেন্দ্র-নাথ তা ভাষান্তরে পরিবেশন করেছেন। ভাষান্তর হলেও চাঁদবিবির প্রতি সুলতান ইব্রাহিমের গভীর আবেগ কবিতাটির মর্মে মর্মে অনুরণিত হয়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচনা সত্যেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক চিন্তার মধ্যেই সীমায়িত হলেও এই অপূর্ব সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন তাঁর ঐতিহাসিক আলোচনার প্রসঙ্গেই পরিবেশিত হয়েছে বলে এখানে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন হোল।

'সুর-কাননে অপ্সরা
আছে নানা,
নর-ভবনে রূপবতী
কত আছে।

বিজাপুরের রাণী চাঁদ
সুলতানা
রূপে সবাই হার মানে
তাঁর কাছে ॥

যিনি জননী সম স্নেহে
স্বভবনে,
মোরে বিদেশে পালিলেন
সযতনে।
আমি দ্বিতীয় ইব্রাহিম
স্মরি সে কথা,
তাঁর চরণে সঁপিলাম
স্মরণ-গাথা ॥'

(পৃ. ৩৪৩-৩৪৪ বোম্বাই চিত্র)

কবিতাটিতে বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম বারে বারেই আবেগের বশে চাঁদ সুলতানাকে বিজাপুরের সুলতানা বলে উল্লেখ করেছেন ও শৈশবে তাঁর জননী-সম যত্নের কথা সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করেছেন। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ায় স্পষ্টই লেখা আছে—Ali 'Adil Shah, who was childless, made Ibrahim, the son of his brother···his heir···his education ···became the charge of Chand Bibi, the widow of Ali I and sister of Murtaza Nizam Shah. (P. 458, vol. III)

পিতৃরাজ্য আহমদনগরে নিজে মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হয়েই তিনি ইতিহাসে বীরাঙ্গনার গৌরব লাভ করেছেন। বোম্বাইচিত্রের ৩৪২ পৃষ্ঠায় ইব্রাহিমকে 'চাঁদ সুলতানার ভ্রাতুষ্পুত্র' আবার ৩১৩ পৃষ্ঠায় ইব্রাহিমকে আলি আদিল সাহের ভ্রাতুষ্পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দুরকম কথায় পাঠকের মনে সংশয় জাগা অস্বাভাবিক নয়। কেম্ব্রিজ ইতিহাস অবলম্বনে সকল সংশয়ের নিরসন হয়। স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র হিসাবেই সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাইচিত্রে ৩৪২ পৃষ্ঠায় ইব্রাহিমকে চাঁদসুলতানারও ভ্রাতুষ্পুত্র বলেছেন বলে ধারণা করা যায়।

বোম্বাই-এ যখন ইংরেজ অধিকার স্থাপিত হয় তখনও বিজাপুর গোলকোণ্ডা স্বাধীন ছিল সম্রাট ঔরংগজেব অনেক চেষ্টায় এই রাজ্যদুটিকে অধিকার করেন। ১৬১৫ অব্দে বিজাপুর অধিকার ও তার বছর খানেক পর গোলকোণ্ডা অধিকারের কাহিনী সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। ১৫৬৫ অব্দে 'তালিকোটে'র যুদ্ধে দলবদ্ধ মুসলমান রাজাদের আক্রমণে বিজয়নগরের হিন্দু রাজার পরাজয় ও দাক্ষিণাত্যে মুসলমান একাধিপত্যের কাহিনী বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথ বিরত থাকেন নি। পঞ্চ[১২] মুসলমান রাজ্যের মধ্যে বিশেষ করে বিজাপুরের কথা সত্যেন্দ্রনাথ অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। বিজাপুরের বর্ণনার অধিকাংশ উপকরণই যে '*Bombay Gazetteer* Vol 23, Bijapur' ও 'Wheeler's *History of India* Vol. 4, part 1' থেকে সংগৃহীত হয়েছে তা 'বোম্বাই চিত্রের' ৩২৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে। বিজাপুরের আলোচনায় প্রথম ভাগে 'শহরের' বর্ণনা, দ্বিতীয় ভাগে বিজাপুরের 'ইতিহাস' ও তৃতীয় ভাগে 'ইতিহাসের উপসংহার' বর্ণিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ সোলাপুর-এ জজ থাকাকালীন বিজাপুর তাঁরই এলাকার অধীনে ছিল; শুধুমাত্র এর কালেক্টার পৃথক ছিল।

সোলাপুর থেকে মাত্র ষাট মাইল দক্ষিণে ভীমা ও কৃষ্ণা নদীর অধিত্যকায় বিজাপুর অবস্থিত। বিজাপুরের অতীত গৌরব ও আদিলশাহী সুলতানদের সমৃদ্ধির ইতিহাস সত্যেন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত ও সহজতর করে পরিবেশন করেছেন। তাঁর কথায়—'ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর অগ্রপশ্চাৎ প্রায় দুই শত বৎসর বিজাপুর দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর ও আদিল শাহী বাদসাদের রাজধানী রূপে প্রখ্যাত ছিল।' (আমার বোম্বাইপ্রবাস পৃ. ১৪৬)। 'বোম্বাইচিত্র' পৃ. ২৭৯-এ) 'বাদসা' স্থলে রাজা উল্লিখিত। সময়সীমা আরও স্পষ্ট করে দেওয়া আছে (১৪৯০-১৬৮৬ খ্রী.)। বিজাপুরের ঐতিহাসিক সমৃদ্ধির বিবরণ দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় অদেখা স্থানগুলিও পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে যেমন—'রেলগাড়িতে যাইতে যাইতে দূর হইতে বিজাপুরের দূত স্বরূপ "গোল গম্বুজ" ইমারতখানি পথিকের নয়ন আকর্ষণ করে—ক্রমে তাহার বিবৃদ্ধ আকার দক্ষিণ আকাশ ব্যাপিয়া দৃশ্যপটে উদ্ভাসিত হয়।' (পৃ. ২৭৯ বোম্বাই চিত্র) লেখকের বর্ণনার সংগে সংগে পাঠকের মনোরাজ্যেও ছবি আঁকার কাজ চলে। তিন ক্রোশ ব্যাপী প্রাচীর ও পরিখায়

বেষ্টিত, বুরুজে সুরক্ষিত বিজাপুরের ছবি পাঠকের মনের দর্পণে ছায়াপাত করে। বিজাপুরের এক মাইল পরিধিবিশিষ্ট গোলাকৃতি আর্ক'কেল্লা দুর্গ তার মধ্যে সাততলা প্রাসাদ—'সাতমজলী', দরবারশালা—'আনন্দ মহল,' বিহার বন —'গগন মহল,' মক্কা মসজিদ, কেল্লার বড় রাস্তার দুধারে 'দুবোন' নামে দুই মসজিদ, 'দুইবোনে'র পাশে ফাঁসিবৃক্ষ—'গোরখইমলি,' অনতিদূরে ঔরংগজেবের মহিষীর সমাধি, কেল্লার বাইরে 'আসারমহল,' ইব্রাহিম বাদসার গোর ও মসজিদ—'ইব্রাহিম রোজা,' জুম্মা মসজিদ, ছাদ নির্মাণের অপূর্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন—'মেহতরমহল' ইত্যাদি অতীতের স্মৃতিবিজড়িত ইমারত-গুলির সংগে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে সত্যেন্দ্রনাথ সফলকাম হয়েছেন। এদের অনেকগুলিরই দুষ্প্রাপ্য চিত্র সংগ্রহ করে পরিবেশিত করাতে পাঠকদের পক্ষে আরও সুবিধা হয়েছে। দুষ্প্রাপ্য বস্তুসংগ্রহে সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহের পরিচয় এতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত। আফজলপুরে সপ্তসপ্ততি বেগমের গোর প্রসংগে আফজল খাঁ কর্তৃক যুদ্ধের প্রাক্‌কালে পুষ্করিণীতে সপ্তসপ্ততি বেগমের যে নিষ্ঠুর হত্যার কাহিনী প্রচলিত আছে সত্যেন্দ্রনাথ একে নিছক কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। তাঁর মতে—'সরোবরতীরে এক লাইনে সাতটি গোর এমন ১১ লাইন…গল্পটা সত্য কিনা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু একই ধরণের এতগুলি সারি সারি স্ত্রীলোকের গোর দেখিয়া ইহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।' (পৃ. ২৯৯, বোম্বাইচিত্র।)

বিজাপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যুসফ আদিল সা-র তুরস্ক থেকে ভারতে আগমন, 'বাহমনী' রাজ্যে আশ্রয়লাভ ও তাঁর বিচিত্র উত্থানের কাহিনী সত্যেন্দ্রনাথ সরসভাবে উপস্থাপিত করেছেন। বিজাপুরে দুশো বছরের মধ্যে ন'জন রাজার কথা সংক্ষিপ্তভাবে তিনি আলোচনা করেছেন। যুসফের মারাঠী মহিষীর পুত্র ইস্মায়ল-এর সময় সিয়াসুন্নীর ঘোর সংঘর্ষ, ইস্মায়লের পুত্র মল্লুর রাজ্যশাসনে অযোগ্যতা তৎস্থলে ইব্রাহিমের রাজ্যলাভ, ইব্রাহিমের পরবর্তী সুলতান আলি আদিল সা-র সময়ে তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগর অধিকার, পরবর্তী ষষ্ঠ সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিমের সিংহাসনলাভের ঘটনা সত্যেন্দ্রনাথ সহজবোধ্য ভাষায় পরিবেশন করেছেন। শিল্প ও স্থাপত্যে উৎসাহী পরবর্তী সুলতান মাহমুদ আদিল সা-র সময়ে শিবাজীর তোরণা দুর্গ অধিকার (১৬৪৬) ও দ্বিতীয় আদিল সা-র সময়ে শিবাজী কর্তৃক ঔরংগজেবের কাছ

থেকে সনদ আদায়ে শিবাজীর প্রতাপবৃদ্ধির ফলে বিজাপুরের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের কাহিনী চমকপ্রদভাবে সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থাপিত করেছেন। ১৬৮৬-তে ঔরংগজেবের বিজাপুর অধিকার ও পুরবাসীর অজস্র বিলাপধ্বনির মাঝে হতভাগ্য শেষ সুলতান সেকন্দর আদিল সা-র ঔরংগজেবের কাছে আত্মসমর্পণের কাহিনীতে সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণনা যেমন মর্মস্পর্শী তেমন ইতিহাসানুগ।—'অভাগা সেকেন্দর বিজিত রাজার ন্যায় সম্মানিত হওয়া দূরে থাকুক, বন্দীকৃত বিদ্রোহের ন্যায় রজত শৃংখলে সম্রাটের সমক্ষে আনীত হইলেন।' (পৃ. ৩২৫ বোম্বাই চিত্র)।

স্বাধীনতাহীন বিজাপুরের শ্রীসম্পদ সমস্তই ধীরে ধীরে বিনষ্ট হওয়ার বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথের খেদোক্তি পাঠকের হৃদয়ের স্পর্শ করে—'ফোয়ারা ভগ্ন, জলযন্ত্র শুষ্ক, ফলফুল বৃক্ষ সকল বনজংগলে আচ্ছাদিত, কোন কোন স্থানে হয়ত অযত্নসম্ভূত একটি জুঁইলতা ভগ্ন প্রাচীর বাহিয়া উঠিয়াছে। হায়! সেই জগদ্বিখ্যাত বিজাপুরের এই দুর্দশা।' (পৃ. ২৮৩, বোম্বাইচিত্র।)

মহারাষ্ট্রীয়দের অভ্যুত্থানের কাহিনী বর্ণনার পূর্বে ঔরংগজেবের রাজ্য বিস্তারের অদম্য পিপাসাই মারাঠী অভ্যুত্থানের সহায়ক হয়েছিল বলে সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে—"মুসলমানদের যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে মহারাষ্ট্রীরা মস্তক তুলিয়া উঠিবার সন্ধি পাইল। যদি দক্ষিণে মুসলমান রাজ্য-সকল অক্ষত থাকিত তাহা হইলে হিন্দু রাজ্য পুনর্জীবিত হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ—ভারতের ইতিহাস হয়ত আর এক ধরণে সংগঠিত হইত।" (পৃ. ৩৪৪, বোম্বাইচিত্র।)

মারাঠী অভ্যুত্থানের কাহিনীতে শিবাজীর চমকপ্রদ জীবনকথা বর্ণনায় অনেক স্থলেই যে গল্প বলার আগ্রহ দমিত করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর সে জন্য পাঠকদের কাছে আগেই নিবেদন করেছেন—'তাঁহার জীবনবৃত্ত উপন্যাসের মত মনোহারী। একটু বেশী করিয়া বলিলে ক্ষতি নাই, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে মহারাষ্ট্র ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে।' (পৃ. ৩৪৫, বোম্বাইচিত্র)।

বিজাপুর সুলতানের অধীনে জায়গীরদার শাহজী ভোঁসলার পুত্র শিবাজীর মাওলী সর্দারদের সাহায্যে বাহিনী গঠন, বিভিন্ন পার্বত্য দুর্গবিজয়, লুটের দ্রব্যে ভাণ্ডার পূরণ, লুকানো বাঘনখের সাহায্যে আফজল খাঁকে হত্যা ও প্রখর চাতুর্যে নবাব সায়েস্তা খাঁর পরাজয়, বাহকের ঝুড়িতে মোগল প্রাসাদ

থেকে আশ্চর্য পলায়ন ও ১৬৭৪-এ শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের কাহিনী সত্যেন্দ্রনাথ সবিস্তারে ব্যক্ত করেছেন।

শিবাজীর প্রতাপগড় দুর্গের কাছেই মহাবালেশ্বর পাহাড় থাকাতে এই পাহাড় যে বর্তমানে 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিহারভূমি' এ প্রসঙ্গে মহাবালেশ্বর সম্পর্কে কিছুটা বিষয়ান্তর বর্ণনা না করে পারেন নি। তবে সবশেষে পাঠকের মনকে মূল বিষয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসে আবার বলেছেন—'বিপণী বাংলা উদ্যান…শিবাজীর সময়ে এসব কিছুই ছিল না।…গাড়ী করিয়া পাহাড়ে চড়িবারও সুবিধা ছিল না—তখন তাহা দুর্গম তীর্থস্থান।' (পৃ. ৩৪৬ বোম্বাই চিত্র)।

সত্যেন্দ্রনাথের মনোমত বিষয়গুলির প্রসংগ এলেই ইতিহাস-গবেষণার ফাঁকে কাহিনীকথনের বর্ণনাত্মক ভংগী প্রবল হয়ে উঠেছে। অবশ্য এজন্য পূর্বেই তিনি পাঠককে অবহিত করেছেন।

বর্ণনাত্মক ভংগীর আর একটি গুণ নাটকীয়তা। উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক ঢঙে এই নাট্যরস সৃষ্টি হয়ে পাঠকের মনোরাজ্যে অতীত ইতিহাসের ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণিত শিবাজী-সায়েস্তা খাঁ পত্রালাপ-সংবাদ উপেক্ষণীয় নয়।[১৩] Dennis Kincaid এর লেখা '*The Grand Rebel*' গ্রন্থে শিবাজী ও সায়েস্তা খাঁর পত্রালাপের বর্ণনা থাকলেও পরিবেশনায় এমন নাট্যরস জমে ওঠে নি।[১৪]

শিবাজীর মৃত্যুর পর দুর্বল শম্ভুজী ও সাহুজীর দৃঢ়তার অভাবে পেশওয়ার সর্বময় কর্তৃত্বের প্রকাশ ও প্রথম পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ কর্তৃক পেশওয়া বংশের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সত্যেন্দ্রনাথ যথাসম্ভব সংক্ষেপেই পরিবেশন করেছেন। সে সময়ের প্রকৃত ছবি সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—'সাহু কেবল নামে ছত্রপতি—তাঁহার রাজ্যাধিকার গেল—স্বাধীনতা পর্যন্ত অপহৃত হইল…পেশওয়াই সর্বময় কর্ত্তা।' (পৃ. ৩৫৫, বোম্বাই চিত্র)

রাজমর্যাদার শেষ অবশিষ্ট রীতি নূতন পেশওয়ার অভিষেককালে অভিষেক-বসন মহারাজের কাছ থেকে নিয়ে আসার কথা অন্যান্য ঐতিহাসিক বর্ণনার সংগে মিল রেখে সত্যেন্দ্রনাথও উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পেশওয়া বাজিরাও-এর সময়ে (১৭৩৯) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার পেশওয়ার সংগে ইংরেজদের সন্ধি ও তৃতীয় পেশওয়া বালাজী বাজিরাও (নানা সাহেব)-এর সময়ে (১৭৪০-

৬৯) জলদস্যু আংগ্রে দমনে ইংরেজদের সহযোগিতার কথা সত্যেন্দ্রনাথ বাদ দেন নি। এ প্রসংগে আংগ্রে রাজ্যের ইতিহাস বর্ণনা করতেও তিনি বিরত থাকেন নি। চতুর্থ পেশওয়া মাধবরাও-এর সময়ে (১৭৬১-৭২) রাজ্যের সমৃদ্ধি, ন্যায়পরায়ণতার জন্য মাধবরাও-এর যশোবৃদ্ধি ও পিতৃব্য রাঘোবার কর্তৃত্ব অস্বীকার সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। পঞ্চম পেশওয়া (১৭৭২-৭৩) নারায়ণরাও-এর বিরুদ্ধে পিতৃব্য রাঘোবার চক্রান্ত, নারায়ণরাও-এর নিষ্ঠুর হত্যা, রাঘোবার প্রতি চরম ঘৃণায় পুণা দরবার থেকে রামশাস্ত্রীর পদত্যাগের কাহিনী বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথ অভিভূত হয়েছেন। বিচারক সত্যেন্দ্রনাথ ন্যায়নিষ্ঠ রামশাস্ত্রীকে—'পুণা দরবারে বশিষ্ঠ স্বরূপ' বলে উল্লেখ করেছেন। (পৃ. ৩৬২, বোম্বাই চিত্র)। ষষ্ঠ পেশওয়া রূপে রাঘোবা-র (১৭৭৩-৭৪) রাজ্যভার গ্রহণের পর থেকে পেশওয়া বংশের অবনতি সূচনা, দূরবর্তী সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা ও মহারাষ্ট্র রাজ্যে পঞ্চ শাখার উদ্ভব ইত্যাদি ঘটনার বিবরণ সত্যেন্দ্রনাথ যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রদান করেছেন। পেশওয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণেই এদের মধ্যে আত্মকর্তৃত্বের মোহের সঞ্চার হয়—সত্যেন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত ইতিহাসানুগ। সামান্য অবস্থা থেকে 'স্বভুজবলে' এঁদের রাজ্য স্থাপনের কাহিনী বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথ বলেন—'পেশওয়ার অধীনস্থ অপরাপর কর্ম্মচারীরাও প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে তৎপর হইল। ক্রমে মহারাষ্ট্র রাজে পঞ্চশাখা বিস্তৃত হইল। পেশওয়া তাহার মধ্যবিন্দু। তাঁহার রাজধানী পুণা। ভোসলার রাজধানী নাগপুর। সিন্দে গোওয়ালিয়রের আধিপত্য পাইলেন। হোলকর ইন্দোরে, বরদায় গাইকওয়াড় স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপন করিলেন।' (পৃ. ৩৬৪, বোম্বাই চিত্র)।

এই পঞ্চ রাজ্যর রাজাদের বংশগত মূল পরিচয়ের অন্বেষণেও সত্যেন্দ্রনাথ উৎসাহী হয়েছেন—'পেশওয়া চিতপাবন ব্রাহ্মণ, অন্যান্য সরদারগণ শূদ্রজাতীয় মহারাট্টা। মহলাররাও হোলকর হীনবর্ণ সেনা ছিলেন; রাণোজী সিন্দে পেশওয়ার পাদুকাধারী; পিলোজী গাইওয়াড় রাখালরাজ।' (পৃ. ৩৬৯, বোম্বাই চিত্র)।

রাঘোবাকে অস্বীকার করে প্রচণ্ড দলাদলির মধ্যে সপ্তম পেশওয়ারূপে মৃত নারায়ণরাও-এর চল্লিশ দিনের শিশুপুত্র সওয়াই[১৫] মাধবরাও-এর রাজ্যাভিষেক ও পেশওয়া পদের পুনঃপ্রাপ্তির আশায় রাঘোবা-র ইংরেজদের সংগে সন্ধি

স্থাপনের ফলেই ইংরেজ-মারাঠা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল বলে সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন।

প্রথম মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজদের দর্পচূর্ণ, অনন্যোপায় হয়ে ইংরেজদের বরগামের সন্ধি, সন্ধিপালনে বোম্বাই গবর্ণমেন্টের অনিচ্ছা, পুনরায় জেনারেল গডার্ড-এর নেতৃত্বে ইংরেজদের যুদ্ধ-সমাবেশ ও মারাঠীদের হাতে নিদারুণ পরাজয়ের পর সালবাই সন্ধির উল্লেখ তিনি সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইতিহাসের কালানুক্রমিকতা রক্ষা করে উপস্থাপন করেছেন।

সালবাই সন্ধিতে মারাঠী পক্ষে মহাদাজী সিন্দে ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। মহাদাজী সিন্দের কথা সত্যেন্দ্রনাথ একটু বিস্তৃতভাবেই ব্যক্ত করেছেন। মহাদাজী সিন্দে—সামান্য পাটেল (মোড়ল) থেকে মারাঠী সর্দারদের অধিনায়ক হয়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পর মহারাষ্ট্রে যে বিপুল কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেজন্য 'জাতীয় বীরের মধ্যে ইনি শিবাজীর নীচেই গণনীয়' বলে সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। মহাদাজী সিন্দের ন্যায়পরায়ণ, মমতাময় আচরণের কথা বাদশাহ শাহ আলমের শোকোচ্ছ্বাসময় কবিতা থেকে তিনি ভাষান্তরে উদ্ধৃত করেছেন। বাদশাহের উপর রোহিলা দলপতি গোলাম কাদরের প্রচণ্ড দৌরাত্ম্যের সময় সিন্দিয়া শাহ আলমকে রক্ষার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। সিন্দিয়ার প্রতি শাহ আলমের নির্ভরতা ও গভীর স্নেহ কবিতাটিতে ধ্বনিত হচ্ছে।

> 'পাঠান হানিয়া বাণ, রাজ্য মোর করে ছারখার
> তুমি বিনা আর, প্রভু হে আমার…
> আছে কেবা ত্রিভুবনে করিতে উদ্ধার।
> * * * * *
> না হয় মহাদাজী, পুত্রসম আজি
> প্রতিশোধ তুলি বীর বাঁচাবে আমায়।"

(পৃ. ৩৭৩, বোম্বাইচিত্র)

দিল্লী থেকে পেশওয়ার জন্য সিন্দিয়ার 'বাদশাহী উজীর' পদবী আদায় ও মহা সমারোহে পেশওয়ার হাতে সেই পদবী প্রদান সত্যেন্দ্রনাথ উপভোগ্যভাবে পরিবেশন করেছেন। আপাত বিনয়ে পেশওয়াকে বশীভূত করাই ছিল মহাদাজী সিন্ধের উদ্দেশ্য।

মহাদাজীর মৃত্যুর পর পুণা দরবারে নানা ফর্ণবীস্-এর প্রাধান্য অসহ্য হয়ে ওঠায় সওয়াই মাধবরাও-এর আত্মহত্যা ও পেশওয়া-সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে পুনরায় দলাদলির মধ্যে রাঘোবার জ্যেষ্ঠপুত্র বাজিরাও-এর সিংহাসন-প্রাপ্তির বিবরণ সত্যেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে বলেছেন, শেষ পেশওয়া বাজিরাও-এর (১৭৯৬-১৮১৭) প্রতি দূরদর্শী নানা ফর্ণবীস্-এর সুমন্ত্রণা ও ইংরেজদের ফাঁদ থেকে পেশওয়া বংশকে নিরাপদে রাখার কথা সত্যেন্দ্রনাথ নানা ফর্ণবীস্-এর চরিত্র আলোচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে নানা ফর্ণবীস্-এর মৃত্যুর পর নির্জীব অন্তঃসারশূন্য পেশওয়ার দুর্বল শাসনের সুযোগ নিয়ে অন্যান্য রাজ্যগুলির শক্তিবৃদ্ধির ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ মনোনিবেশ করেছেন।

১৮০১ খ্রীস্টাব্দে নূতন বীর যশোবন্ত হোলকর-এর সমরক্ষেত্রে অভ্যুদয়, হোলকর, বংশের ইতিহাস[১৬] ও অহল্যাবাই-এর শান্তিপূর্ণ সুশাসনের কথা তিনি সহজ ও সরসভাবে উপস্থাপিত করেছেন। যশোবন্ত হোলকর-এর পুণা আক্রমণে শেষ পেশওয়া বাজিরাও-এর পলায়ন ও বাসীন-এ ইংরেজ সাহায্য-ভিক্ষায় দেশের স্বাধীনতায় পূর্ণ জলাঞ্জলি দেওয়ার কথা সত্যেন্দ্রনাথ সখেদে ব্যক্ত করেছেন।

ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার কারণ বিশ্লেষণে সত্যেন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন— 'গৃহবিচ্ছেদই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। ইংরাজেরা আমাদের নিজের হাতিয়ার লইয়াই আমাদের উপর জয়যুক্ত হইলেন।' (পৃ. ৪০১, বোম্বাই চিত্র)।

সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে থাকাকালীন তাঁর কর্মক্ষেত্র দক্ষিণে কর্ণাটক থেকে উত্তরে সিন্ধুদেশে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণের ইতিহাস বর্ণনায় তাঁর যেমন নিরলস প্রয়াস লক্ষিত হয়, সিন্ধুদেশের ইতিহাস অন্বেষণেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর এই তিন ভাগে বিভক্ত তৎকালীন সিন্ধুদেশের উল্লেখ্য স্থানগুলিরও কিছু কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন। তালপুরের আমীরগণ কর্তৃক খেলাত সর্দারদের নিকট থেকে দক্ষিণের উল্লেখ্য স্থান 'করাচী' বন্দর অধিকার, মুসলমান আমলের সমৃদ্ধিপূর্ণ নগর—'ঠাট্টা', গোলাম-সা-কালুহোরা প্রতিষ্ঠিত মধ্য সিন্ধুর রাজধানী 'হাইদ্রাবাদ', ফকির

লাল শাঁ-বাজ-এর সমাধি সমন্বিত উত্তর সিন্ধুর পুণ্যস্থান—'সেওয়ান' ও জজ কালেক্‌টারের প্রধান মহল—'শিকারপুর'-এর মনোরম বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথের রচনা স্থানে স্থানে উপভোগ্য হয়েছে। Cunningham-এর *Ancient Geography of India* গ্রন্থ থেকে তিনি বেলাসিস্‌ আবিষ্কৃত সিন্ধুদেশের প্রাচীন প্রোথিত নগর 'ব্রাহ্মণাবাদ'-এর বিবরণ প্রদান করেছেন।

আদিম সিন্ধী, বলোচ, আফগান, কাফ্রী, শিখ ও 'আমীল'দের (হিন্দু) সংযোগে সিন্ধুদেশের জাতি-বৈচিত্র্যেরও তিনি আভাস দিয়েছেন 'ভারতবর্ষের মোহ্যড়ায়' অবস্থিত সিন্ধুদেশের উপর বারে বারে বৈদেশিক আক্রমণের উদ্যোগ সত্যেন্দ্রনাথ সহজ কথায় তুলে ধরেছেন। সেকন্দর বাদশার সিন্ধু আক্রমণ দিয়ে তিনি শুরু করেছেন। প্রসংগত সেকন্দর বাদশার সিন্ধু আক্রমণের যে কোন হিন্দুলেখ্য নেই, 'সবই গ্রীক ভাষায় রচিত' এ কথার মধ্যে তাঁর পুংখানুপুংখ অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। সেকন্দর বাদশার আক্রমনের পর রাজপুতবংশীয় পঞ্চরাহীদের সিন্ধুদেশে ১৪০ বছর রাজত্বের শেষে 'কচ্‌'-এর অন্যায়ভাবে সিংহাসনলাভ ও তাঁর পুত্র ডাহীরের রাজত্বকালে যবন সেনাদল কর্তৃক সিন্ধু আক্রমণের কথা সত্যেন্দ্রনাথ অল্প কথায় ব্যক্ত করেছেন।

আরবদের বাণিজ্য-জাহাজ 'দেওয়াল' বন্দরে ধৃত হওয়ার পর ডাহীরের নিকট প্রত্যর্পণের আবেদন ব্যর্থ হওয়ার ফলেই মুসলমানদের সংগে যুদ্ধের সূচনা ঘটে। এখানে সত্যেন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি স্থানের নাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম কত অভিনিবেশসহ অনুসন্ধান করেছেন তা 'বোম্বাইচিত্র' গ্রন্থের ২৪৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লিখিত। 'কচ্‌' নামের সম্ভাব্য আরেকটি উচ্চারণ 'চচ্‌'-সম্পর্কেও তিনি মতামত দিয়েছেন। দেওয়াল বন্দর যে করাচীর নিকটবর্তী কোন বন্দর ছিল এ সম্পর্কে Elphinstone সাহেবের মত উদ্ধৃত করেছেন।

মহম্মদ কাশিমের সংগে ডাহীরের প্রবল সংঘর্ষে কাশিমের জয়লাভ, ডাহীর কন্যাদ্বয়কে দামাস্কাসে কালিফ-এর নিকট প্রেরণের পর, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে বড় রাজকুমারীর অসাধারণ চাতুর্য ও কাশিম হত্যার কাহিনী তিনি Elphinstone সাহেবের বর্ণনানুসারে ব্যক্ত করেছেন। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া তৃতীয় খণ্ডে কাহিনীটিকে ভিত্তিহীন বলা হয়েছে।[১৭] কালিফ প্রতিনিধিদের তিনশো বছর সিন্ধু দেশে প্রবল প্রতাপে রাজত্বের শেষে 'সুমরা' ও 'সম্মা' রাজপুত-দের কয়েকশো বছর রাজ্যভোগের পর সম্রাট আকবর-এর

সময়ে মোগল সৈন্য কর্তৃক সিন্ধুবিজয়ের বিবরণ সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখ করতে বিরত হন নি। এরপর নাদের সা কর্তৃক সিন্ধুনদীর পশ্চিম প্রদেশ অধিকার ও পরবর্তীকালে আহমদ খাঁ দুরাণীর সিন্ধুদেশে আধিপত্য স্থাপনের কথা ব্যক্ত করে সত্যেন্দ্রনাথ ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন।

ইংরেজ অধিকারের পূর্বে সিন্ধুদেশে কালহোরা-দের বিতাড়নের পর তালপুর বংশীয় বলোচ আমীরগণের আধিপত্য সূচিত হয়। ক্রমে হাইদ্রাবাদ, মীরপুর ও খয়েরপুর-তালপুর আমীর বংশীয়দের তিন স্বতন্ত্র রাজ্যবিভাগের বিবরণও সত্যেন্দ্রনাথ প্রদান করেছেন।

১৮৩৯ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে ও আমীর-দের মধ্যে সন্ধিসূত্রে ইংরেজদের প্রবেশ, মেজর আউট্রাম-এর আমীরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৮৪২-এ স্যার চার্লস নেপিয়ার কর্তৃক সন্ধিভংগের অপরাধে আমীর-দের দোষী সাব্যস্তকরণ, আমীর-দের বৃদ্ধ 'রাইস'[১৮] রোস্তমকে দোষী প্রতিপন্ন ও গদিচ্যুত করে রাজ্যলাভে তার ভ্রাতা আলি মোরাদ-এর অপচেষ্টা ও ইংরেজদের সংগে সংযোগ, সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় খুব সংক্ষেপেই পাওয়া যায়।

হাইদ্রাবাদ সমিতিতে নেপিয়ার সন্নিধানে নিরপরাধ আমীরগণের প্রতি বিশেষত বৃদ্ধ রোস্তমের প্রতি অত্যাচারের সমালোচনার পর নূতন সন্ধিপত্র রচনায় ও বিক্ষুব্ধ বলোচ সৈন্যদল কর্তৃক নেপিয়ারকে আক্রমণের কথাও তিনি সহজ কথায় তুলে ধরেছেন। মিয়ানির যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে বলোচ সৈন্য দলের পরাজয়, আমিরগণের নির্বাসন ও কারাবরণের পর সিন্ধুদেশে ইংরেজদের পূর্ণ অধিকার স্থাপনের বিবরণ সত্যেন্দ্রনাথ ইতিহাসের সংগে সামঞ্জস্য রেখেই রচনা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সিন্ধুদেশ যে ইংরেজদেরদ্বারা অন্যায়ভাবে লব্ধ তার সমালোচনা করতে সত্যেন্দ্রনাথ বিরত হন নি। সে যুগে পদস্থ রাজকর্মচারীর পক্ষে ইতিহাসের প্রামাণ্য নজির তুলে ঐ ধরণের সমালোচনা করা নিতান্তই সাহসিকতার কাজ। তাঁর কথায়—'এইত ইংরাজদের সিন্ধুবিজয় কাহিনী। ইহাতে কি দেখা যায়? ইংরাজ রাজ্যলাভের মূলে যে ঘোর অন্যায় অত্যাচার তাহা কি ইহাতে প্রকাশ পায় না?' (পৃ. ২৬১, বোম্বাইচিত্র)।

মূলত সিন্ধুবিজয়ে যে অনেক অন্যায় পথ গৃহীত হয়েছে তা Marshmans *History of India* (ch. 18) থেকে নেপিয়ারের উক্তি ভাষান্তরে উদ্ধৃত

করেই সত্যেন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন। আমীরদের দমন করিবার জন্য আমরা কেবল একটা ছুতো চাই। যে রাজ্য দুর্বল সে শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক বলবানের গ্রাসে পতিত হইবেই হইবে। আমাদের সিন্ধু দেশ অধিকার যদিও অন্যায় কিন্তু এ অন্যায়েও বিস্তর লাভ ও উপকার—এ যে পেজমি এ ভদ্র পেজমি (a humane piece of rascality). (পৃ. ২৬১, বোম্বাইচিত্র)। সত্যেন্দ্রনাথ যে ঐতিহাসিক বিচারে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন, এখানে তার পরিচয় মেলে।

উপসংহার

এতক্ষণ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনার স্বরূপ, রচনার উৎস ও উপাদান পরিবেশনার কৃতিত্ব বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ইতিহাসের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল অনুরাগ তাঁকে নব নব অন্বেষণে উদ্বোধিত করেছে। কৈশোরেই প্রাচীন ভারতের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী নির্দেশে 'Heroism of Ancient India[১৯]-নামক রচনা লিখেছিলেন। এ ছাড়াও বাড়িতে সাপ্তাহিক ডিবেটিং ক্লাবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি', জুলিয়াস সিজার ও আলেকজাণ্ডার ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ বীরদের সম্পর্কে বক্তৃতায় তিনি কৈশোরেই নিয়মিত অংশ গ্রহন করতেন।[২০]

কৈশোরেই সতেন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক গিবনের লেখা থেকে রোমের রাষ্ট্র বিপ্লব ও রোম সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনী পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

সুতরাং অল্পবয়সেই ত্য মধ্যে ইতিহাস-চেতনার এক দৃঢ় বনিয়াদ রচিত হয়েছিল।

১৭৭৯ শকেই পৌষ সংখ্যায় (১৮৮৭) 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' সত্যেন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। সে সময় তার বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হয় নি। কিশোর সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় কৃষ্ণকুমারীর অসামান্য রূপ ও গুণের জন্য 'রাজস্থানের[২১] পুষ্প' আখ্যার সঙ্গেও টডৃ-এর বর্ণনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য পাত্রদের নামে সঙ্গেও টড্ বর্ণিত কৃষ্ণকুমারীর কাহিনির সঙ্গে কোন মিল নেই। সত্যেন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারীর যে ইতিহাস লিখেছেন তাতে পিতৃরাজ্যে সন্ধিস্থাপন উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ-উদ্যোগ

বিবিধ যুদ্ধবিগ্রহের পর 'সমরসী'র সংগে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহের শেষে মিলনাত্মক ভাবেই কাহিনীটি শেষ হয়েছে। 'সমরসী ও কৃষ্ণকুমারী সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন…' কিন্তু টড্-এর রাজস্থানে পিতার মর্যাদা ও রাজ্যরক্ষার্থে বিষপানে কৃষ্ণকুমারীর আত্মবলিদানের করুণ কাহিনী পাঠকের হৃদয়কে শোকাভিভূত করে। প্রসংগত মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে (১৮৬১) টড্-এর কাহিনী অবলম্বনে ট্র্যাজিক রসের সৃষ্টি করেছেন।

অল্পবয়সের রচনা হওয়াতে স্থান কালের ঐক্যের চেয়েও কল্পনাবিলাসের প্রতিই তিনি বেশী আকৃষ্ট হয়েছেন। পরবর্তীকালে পরিণত বয়সে ঐতিহাসিক রচনা সৃষ্টিতে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক্ রীতি গ্রহন করেছেন। সহজ অন্তরংগ ভাবে পত্রের ঢঙে যথাযথরূপে ইতিহাসের কথা লিখেছেন—তাতে কোন অতি রঞ্জন নেই। কর্মজীবনে ইংরেজদের আগমন প্রসংগে লিখতে গিয়ে, দক্ষিণাত্যের ইতিহাস বর্ণনায়, অন্যান্য ঐতিহাসিকের বর্ণিত বিষয়ের সংগে তার সম্পূর্ণ মিল দেখতে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিকে সংক্ষিপ্ত করার দিকে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল চেষ্টা লক্ষিত হয়। মোটামুটিভাবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার দিকে তাঁর ঝোঁক থাকলেও দীর্ঘ সময়সীমায় বিবিধ ঘটনাবহুল পরিবেশকে ক্ষুদ্র পরিসরে চিত্রিত করতে গিয়ে মাঝে মাঝে দু এক জায়গায় অস্পষ্টতা এসেছে। অবশ্য এ ধরণের ত্রুটি তাঁর রচনায় খুবই কম। পুংখানুপুংখরূপ সাল তারিখ উল্লেখ করে যতদূর সম্ভব রচনার স্পষ্টতা প্রতিপাদনে তাঁর নিরলস প্রয়াস নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবি রাখে।

১. পুরুবিক্রম (১৮৭৫) পুরু ও আলেকজাণ্ডারের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।
২. সরোজিনী (১৮৭৯) আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ কাহিনী অবলম্বনে।
৩. দ্রষ্টব্য—আবৃত্তি ও অভিনয় অধ্যায়।
৪. 'ভাই,—

তুমি আমাকে আমার বোম্বাই প্রবাসের বিবরণ লিখিতে অনুরোধ

করিয়াছি কিন্তু কি লিখি কোথায় আরম্ভ করি তাহা আমি ভাবিয়া পাই না।'

—বোম্বাই চিত্র ; (প্রবাস পত্র) পৃ. ৬১

৫. 'This
Book of Bombay
An attempt to illustrate
The History and Topography of that city And
Neighbourhood
is
Respectfully
Dedicated
To
The People of Bombay
of
Every Race and Creed
by the Author'

[From A *Book of Bombay* by James Douglas, 1883]

৬. We make no apology for presenting these sketches in a collected form to the reader. They have already been kindly received through the Press by the Bombay public ; and the Bombay Government and the Director of Public Instruction have generously awarded their patronage to the publication for which I thank them. (Preface : '*A Book of Bombay*')

৭. Preface : *A Book of Bombay* by James Douglas.

৮. Ch. I *Book of Bombay* Marriage Treaty তুলনীয় বোম্বাই চিত্র ; পৃ. ৩০০ ; বোম্বাই শহর : Ch. V. *Ibid*-Seevajee দ্র বোম্বাইচিত্র পৃ. ৩৪৫-৩৫৩ ; ইতিহাস অধ্যায় Ch. VI-Konojee Angria and the pirates of western India দ্র. বোম্বাইচিত্র

পৃ. ৩৫৮ জলদস্যু আংগ্রে ; Ch. XV Ibid—Poona and Peshwas দ্র. বোম্বাইচিত্র পৃ. ৩৫৫-৪০২।

৯. 'ভারতী'তে 'রায়ৎ' রূপেই আছে। পরবর্তীকালে 'বোম্বাই চিত্রে (১২৯৫) গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় 'বোম্বাই রায়ত' রূপে পাওয়া যাচ্ছে।

১০. বার বৎসর পরে মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উমার অনুরোধে সেই সকল পুত্তলীকে জীবনদান করত সচেতন করিলেন। তাহা হইতে কণবী জাতীর উৎপত্তি হইল। (পৃ. ১৭৪ বোম্বাইচিত্র)।

১১. পূর্বনাম হসন গাংগু। ব্রাহ্মনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবসে 'বামন' পদবী গ্রহন ও প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম 'বাহমণী'। দ্র. বোম্বাইচিত্র পৃ. ৩০৭ ও আমার বোম্বাই প্রবাস পৃ. ১৫৫।

Vide. (1) R. C. Majumdar and others An *Advance History of India.* 4th ed pp. 349-50

(2) Vincent A. Smith *The Oxford History of India.* 3rd ed. p. 281

১২. The Imad Shahi dynasty of Berar, the Nizam Shahi of Ahmadnagar the Adil Shahi of Bijapur ; the Barid Shahi of Bidar, the Qutab Shahi of Golkonda.' p. 292 *Oxford History of India* : Vincent A. Smith (3rd Ed.).
(five Sultanates of the Deccan and Khandesh from 1474 to 17th century).

১৩. সায়েস্তা খাঁ—তুমি মর্কট বানরের মত পাহাড়ের উপর বসে থাক।···
শিবাজী—আমি বানর সত্য কিন্তু সেই রাম সৈন্য বানরের জাত যারা রাবণ বধ করে লংকা জয় করেছিল···(পৃ. ৩৫৯ বোম্বাই চিত্র)

১৪. 'by sending him a furious Persian Couplet, taunting him with the cowardice of monkey'. *The Grand Rebel* : Dennis Kincaid. p. 146

১৫. সপ্তম পেশওয়া সওয়াই মাধবরাও (১৭৭৪-১৭৯৫)। জ্যেষ্ঠা অপেক্ষাও

বড় এই অর্থে "সওয়াই" মাধবরাও নামে শিশুর নামকরণ হইল। (পৃ. ৩৬৫ বোম্বাই চিত্র)।

১৫. 'হোলকর বংশ আসলে ধনগর গয়লা-জাতীয় মহারাট্টা' (পৃ. ৩৮৪ বোম্বাই চিত্র)

১৭. The romantic story of hi death, related by some chroniclers, has usually been repeated by European historians, but is devoid of foundation.' p. 7 *The Cambridge History of India* vol. II.

১৮. রাইস—কর্ত্তা।

১৯. 'Sir এর সাহায্যে আমি একটা Essay লিখেছিলুম Heroism of Ancient India. তাতে ভীমার্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ রঘুর দিগ্বিজয় এই সব কাহিনী বিবৃত হয়েছিল।' (পারিবারিক খাতার পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত, 'ছেলেবেলার কথা' অধ্যায়) পরিশিষ্ট-৯।

২০. আমাদের একটা debating club ছিল তাতে সপ্তাহের মধ্যে একদিন বক্তৃতাদি হইত। Nepoleon Bonaparte, Julius Caesar, Alexander এই সব Hero-দের নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাইত। (পারিবারিক খাতা, ঐ)

২১. Krishna Kumari Bae, the "Virgin Princess Krishna" was in her sixteenth year : ...she added beauty of face and person to an engaging demeanour, and was justly proclaimed the 'flower of Rajasthan'. (*Annals and Antiquities of Rajasthan by* Lt. Col. James Tod, p. 367)

'শাহপুর নগরে এক মহাবল পরাক্রান্ত শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। কৃষ্ণ কুমারী নাম্নী তাঁহার এক সুন্দরী কুমারী ছিল। কৃষ্ণকুমারী "রাজস্থানের পুষ্প" বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, এবং তাঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষে অনেক অস্ত্রধারণ করিতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন।' ... কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস' : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিবিধার্থসংগ্রহ-চতুর্থ পর্ব, ৪৫ খণ্ড শকাব্দ ১৭৭৯ পৌষ।

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্য সৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রনাথ

কাব্যানুবাদ

মেঘদূত গীতার উপক্রমণিকা ও পদ্যানুবাদ তুকারামের জীবনী ও অভঙ্গমালার অনুবাদ নবরত্নমালা

নাট্যানুবাদ

সুশীলা-বীরসিংহ (হ্যামলেট) [আংশিক] রাজার আত্মগ্লানি

গদ্যরচনা

বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ

(তাঁর রচিত বিখ্যাত দুইটি গদ্যগ্রন্থ—'বোম্বাই চিত্র' ও 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' সম্পর্কে পৃথক্ আলোচনা বাহুল্য ; কারণ সত্যেন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টিকর্মের সমস্তই ঐ দুটি গ্রন্থের আলোকে আলোচিত হয়েছে ।)

পদ্যানুবাদ : মেঘদূত

মেঘদূত অনুবাদ সংখ্যাধিক্য ও সার্থক অনুবাদের সমস্যা

মেঘদূত কাব্যে কালিদাস যে সৌন্দর্যের ছবি ও ভাবাবেগের বিচিত্র রস পরিবেশন করেছেন, কাব্যানুবাদে সেই রসধারাকে বাংলা সাহিত্যের খাতে বইয়ে দিতে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন।

এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য মনীষীর অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অ্যাসিসটেণ্ট সার্জেন ও এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক হোরেস হেম্যান উইলসন ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম ইংরেজিতে টীকা সহ মেঘদূতের অনুবাদ করেন। তাঁর ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে জার্মাণ কবি গ্যেটেও কালিদাসের অপূর্ব কাব্য প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ ও বিস্মিত হন।

তখন থেকেই প্রাচীন ভারতের রূপচিত্র অন্বেষণে ও কালিদাসের কাব্যে আলোচনায় একটি নূতন দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভারতের প্রাচীন জনপদ, নদীগিরি পুরাতাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে—অন্যদিকে সহজ বাংলায় এই কাব্যের রসধারা পরিবেশনেও অনেকেই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

আধুনিক যুগে বুদ্ধদেব বসু[১] প্রমুখ সাহিতিকেরা উইলসনের অনুবাদকে উচ্চমানের বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর টীকার সম্পর্কেও উচ্চধারণা পোষণ করেন নি। উইলসনের অনুবাদের একটু নমুনা[২] দেখেই বোঝা যাবে, তিনি পুরোপুরি আক্ষরিক অনুবাদ করতে পারেন নি। সেকথা গ্রন্থের ভূমিকাতেও[৩] লেখা আছে। তাঁর কৃতিত্ব এই যে—তাঁর অনুবাদ পাঠ করে এদেশীয়দের মধ্য দেশী ও বিদেশী ভাষায় মেঘদূত অনুবাদের প্রেরণা জেগেছে। পাঁচকড়ি ঘোষের মেঘদূত অনুবাদের ভূমিকা থেকে তা স্পষ্ট ভাবে জানা যায়।[৪]

প্রথম দিকে যাঁরা মেঘদূতের বাংলা অনুবাদ করেছেন—কবির ভাবাগত অর্থকে রূপান্তরিত করাকেই তাঁরা আসল কাজ ভেবেছেন। এর মাধ্যমে মূল গ্রন্থে পাঠে যদি কারো উৎসাহ জাগে অনেক নিজের প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করেছেন। প্রথম দিকের প্রখ্যাত অনুবাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় সবিনয়ে এ ধরণের কথাই বলেছেন।[৫]

নিজের অক্ষমতাকে মহাকবির নামের আড়ালে রেখে কেউ বা অনুবাদকে হাত পাকাবার বড় সহায় ভেবেছেন।[৬] প্রকৃতপক্ষে কাব্যানুবাদ যে একটি কঠিন কাজ সে সম্পর্কে প্রথম যুগে অনেকেই অবহিত ছিলেন না। গদ্যানুবাদের কাজ বরঞ্চ অনেকটা সহজ। সরল ভাষান্তরে মহাকবির অর্থ পরিস্ফুটনই সেখানে আসল কাজ। কিন্তু কাব্যানুবাদকদের কাছে আরও কিছু দাবি করার আছে। মূল কাব্যের বস্তুরূপ, ভাবরূপ ও ধ্বনিরূপ এই তিনটি, যে অনুবাদে অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিফলিত হবে সেটিই তত সার্থক কাব্যানুবাদ। মূলের রস সরাসরি ফুটিয়ে তোলার মাঝেই অনুবাদকের আসল কৃতিত্ব।

সংস্কৃত থেকে বাংলা—পদ্যানুবাদে এসব সমস্যার কথা চিন্তা করেই রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যধ্বনিময় গদ্যের' দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন। বাংলা পদ্যানুবাদে অর্থ পরিস্ফুটন ততটা দুরূহ নয়, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি-গৌরব রক্ষা করা যে দুঃসাধ্য একথা তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন।[৭]

প্রসংগত যে কোন ভাষান্তরের ক্ষেত্রেই ধ্বনির সমস্যা খুব বড় হয়ে দেখা দেয়। কবিতায় শব্দের অর্থের সংগে ধ্বনির যে অংগাংগী সম্পর্ক আছে, অনুবাদে যে তা কিছুতেই ফোটানো যায় না—একথা অধ্যাপক তারকনাথ সেনও পাশ্চাত্য মনীষীদের মতালোকে অনুবাদ প্রসংগে ব্যক্ত করেছেন।[৮] সুতরাং ধ্বনির সমস্যা সকল ভাষার অনুবাদেরই সমস্যা।

একই সংগে ধ্বনি ও অর্থের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে অনুবাদ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। ফলে ভাষান্তরের আস্বাদ অনেক সময়েই পৃথক্ হয়ে পড়ে। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন-এর মতে—'আজ পর্যন্ত বাংলায় মেঘদূতের বহু পদ্যানুবাদ হয়েছে।…এই বহু সংখ্যক অনুবাদের মধ্যে একখানিতেও মেঘদূতের বস্তু, রস ও ধ্বনি এই তিনের অ-বিকল প্রতিরূপ পাওয়া যায়, একথা বললে সাহসিকতা দেখানো হবে।[৯]

পূর্বসূরী, সমকালীন ও প্রসঙ্গত উত্তরসূরী

'ভারতী' পত্রিকায় ১২৯৮ বংগাব্দের আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূতের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।[১০] ১২৯৮ সালেই (১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ৩০ নবেম্বর অনুবাদটি গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়।[১১]

মেঘদূত অনুবাদ ধারায় সত্যেন্দ্রনাথের স্থান নির্ণয়ের প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্র-পূর্বসূরী ও তাঁর সমকালীন অনুবাদকেদের রচনাই—আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় হবে। বিংশ শতাব্দীতে মেঘদূত অনুবাদকদের বিচার আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় নয়। প্রসংগক্রমে এঁদের আভাসমাত্র দেওয়া হবে। নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় আধুনিক যুগে মেঘদূতের অনুবাদধারা অনেক এগিয়ে গেছে—তার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূত-অনুবাদ প্রকাশের প্রায় একত্রিশ বছর আগেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূত অনুবাদ প্রকাশিত হয়। (১৮৬০ খ্রী.) বড়দাদার অনুবাদের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের একটি বিশেষ মমত্ববোধ ছিল। তাঁর মতে দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনায় কম বয়সের অপকতা থাকলেও 'অমন সহজ সরল অনুবাদ দুর্লভ'। এই কারণেই নবরত্নমালায় নিজের লেখা মেঘদূত অনুবাদের সংগে বড়দাদার অনুবাদটিও পুনর্মুদ্রিত করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ আট ছয় মাত্রার সরল পয়ারে পূর্বমেঘের ও আট-আট-দশ মাত্রার ত্রিপদীবন্ধে উত্তরমেঘের অনুবাদ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সত্যেন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী যে কয়জন মেঘদূত-অনুবাদকের সন্ধান পাওয়া গেছে—তাঁরা প্রচলিত পয়ার ছন্দেই লিখেছেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ভূমিকায় যদিও বলেছেন, তাঁর রচনারীতি পৃথক্, তবু কোন উল্লেখ্য পরিবর্তন তাঁর রচনায় যে নেই—তা সত্যেন্দ্র পূর্বসূরীদের নমুনায় তালিকা।[১২] থেকেই বোঝা যাবে। নিজের মনোমত কাব্যাংশ জুড়ে দেওয়া, স্থানে স্থানে ভাষ্যকারের ভূমিকা নেওয়া ইত্যাদি ত্রুটি থেকে প্রথম যুগের অনুবাদকগণ মুক্ত হতে পারেন নি।

(দ্র. ১২ নং পাদটীকা—কিশোরী মোহন সেন, প্রাণনাথ পণ্ডিতের অনুবাদ।)

সত্যেন্দ্রনাথের প্রায় সমকালীন অনুবাদকদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বরদাচরণ মিত্র, রঘুনাথ সুকুল, কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখদের রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। ত্রিপদী ছাঁদে রঘুনাথ সুকুলের রচনায়, শব্দচয়নে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণ আছে। বরদাচরণ মিত্রের অনুবাদ সেকালে যে নাম করেছিলো, তা পাঁচকড়ি ঘোষের মেঘদূত-অনুবাদের ভূমিকা থেকে জানা যায়। ১২৯৭ সালে পাঁচকড়ি ঘোষ কিছুটা অনুবাদ শেষ করেও

'নব্যভারত' পত্রিকায় বরদাচরণ মিত্রের 'মনোজ্ঞ' অনুবাদ প্রকাশিত হতে দেখে নিজের অনুবাদ প্রকাশে দীর্ঘদিন বিরত থাকেন। এই পর্বে একমাত্র বরদাচরণ মিত্রের রচনাই উল্লেখ করার মতো। সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশের মাত্র এক বছর পরে বরদাচরণ মিত্রের অনুবাদ (১২৯৯) প্রকাশিত হয়েছে। ছন্দের দিকে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তেমনি প্রচলিত পয়ার ত্রিপদীর বন্ধন অতিক্রমণের প্রয়াস বরদাচরণ মিত্রের অনুবাদে দেখা যায়।[১৩] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী কালে বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশকে মেঘদূতের অনেক অনুবাদকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এঁদের রচনা গতানুগতিক বলে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ঐ সময় অনুবাদক অখিলচন্দ্র পালিতের রচনায় কিছুটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ে।[১৪] ১৯০৮এ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'যক্ষের নিবেদন'[১৫] কবিতায় সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা[১৬] ছন্দের বাংলা রূপায়ণে একটি নূতন দিক উদ্ভাসিত হলেও অনেকেই প্রথম দিকে ঐ ছন্দে অনুবাদ করতে সাহসী হন নি। যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরই ছাত্র প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের পরামর্শে সে পথ থেকে বিরত হন। তৎকালীন দেশী ও বিদেশী কবিতার প্রখ্যাত অনুবাদক হরিপদ ভট্টাচার্য তাঁর অনুবাদের ভূমিকাশ—'স্বল্প ভাব বিকাশে মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুসরণ' করেছেন বলে উল্লেখ করলেও—তাঁর অনুবাদ মূলত ত্রিপদী ছাঁদের। প্রতি পদের অন্তে মিল থাকতে মন্দাক্রান্তার লঘু গুরুর বৈচিত্র্য তাতে ফুটে ওঠে নি। সমস্ত কাব্যটি একটানা একরকম ছন্দে লিখলে একঘেয়েমি আসতে পারে এই বিবেচনা করেই কবি নরেন্দ্র দেব তিন রকম ছন্দেই সমগ্র কাব্যটির অনুবাদ করেছেন। ক্ষিতিনাথ ঘোষ, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য সরল কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মেঘদূতের সুললিত অনুবাদে যে পথ দেখিয়েছেন পরবর্তীকালে অসিতকুমার হালদার, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা ও আরও অনেকেই এই রীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য কারণ সাত মাত্রার দীর্ঘ পর্ব বিরচনে তাঁরই প্রাথমিক কৃতিত্ব।[১৭] এরকম দীর্ঘ পর্ব মন্থর চাল রক্ষা করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু বারে বারে সমমাত্রিক পর্বের পুনরাবৃত্তির ফলে এ রীতির অনুবাদে কিছুটা একঘেয়েমি না এসে পারে না। বুদ্ধদেব বসু প্রথম তিনটি পর্ব সাত মাত্রায় রেখে সর্বশেষ পর্বটিতে মাত্রা

সমতা ইচ্ছাকৃত ভাবেই একদম রক্ষা করেন নি পর্বগত যথামিল না থাকতে অনুবাদে অনেকটা গদ্য ঢঙ এসেছে। যদিও তাঁর অনুবাদও সকলের কাছে আদৃত হয় নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রদর্শিত মন্দাক্রান্তা ছন্দে আগাগোড়া মেঘদূত অনুবাদ করে যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার (১৩৭৫) যেমন সকলকে বিস্মিত করেছেন, তেমনি তাঁর অনুবাদেও কোন কোন অংশ মূলানুগ হতে পারে নি। তাঁর অনুবাদের 'হস্তে লীলাকমলমলকে' শ্লোকটি বিশ্লেষণ করে প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় যে শব্দগুলি বসালে মূলানুগ হতো বলে মন্তব্য করেছেন,[১৮] দীর্ঘদিন আগে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এ ধরণের খুঁটিয়ে দেখলে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদেও কিছু কিছু ত্রুটি চোখে পড়বেই কারণ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিখুঁত হওয়ার দাবি কেউই করতে পারেন না। আধুনিক পর্বে সকলের সঙ্গে তাঁর অনুবাদ মিলিয়ে দেখার সুযোগ যে এখানে নেই তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, তবে তাঁর অনুবাদ যে মূলানুসারী তা তাঁর রচনা বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গেই আরও স্পষ্ট ভাবে জানা যাবে।

আঠারো মাত্রার দীর্ঘ পয়ারকে প্রকাশের বাহন করায় সত্যেন্দ্রনাথ সুবিবেচনার কাজ করেছেন। কারণ এই ছন্দেই সংস্কৃতের ধ্বনি গাম্ভীর্য রক্ষার পক্ষে ও 'সংস্কৃত শব্দ সম্ভারকে অনেকাংশে আত্মসাৎ[১৯] করার পক্ষে কিছুটা সহায়ক হয়েছে। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন-এর মতে—'তিনি মন্দাক্রান্তার মাত্রা পরিমাণের বদলে তার অক্ষর সংখ্যাকেই তাঁর ছন্দের আদর্শ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন মন্দাক্রান্তার প্রতি পংক্তির তিন পদের অক্ষর সংখ্যা যথাক্রমে চার ছয়-সাত, মোট সতেরো। সত্যেন্দ্র-অনুসৃত দীর্ঘ পয়ারের মোট অক্ষর সংখ্যা আঠারো, অর্থাৎ মন্দাক্রান্তার খুব কাছাকাছি।'[২০]

দ্বিজেন্দ্রনাথের উত্তরমেঘের অনুবাদে—বনের মালতী জালে | উঠাইয়া প্রাত:কালে | সজল শীতল বায়ু দিয়া⋯প্রভৃতি পদের সহজ প্রকাশে পাঠককে মুগ্ধ করলেও মন্দাক্রান্তার 'উদাত্ত গাম্ভীর্য' ও 'গাঢ়বদ্ধতা' ঐ ত্রিপদীতে পরিস্ফুট হয় নি। সেদিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দই বেশি উপযোগী হয়েছে। তবে সত্যেন্দ্র-অনুসৃত দীর্ঘ পয়ারও মূলত দ্বিপদী-মন্দাক্রান্তার মতো ত্রিপদী নয়। তাই এই ছন্দেও মন্দাক্রান্তার 'কঠোরে-কোমলে বিমিশ্র' ধ্বনি তরঙ্গ উৎপাদন করা যে সম্ভব নয় সেদিকেও প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় আমাদের অবহিত করেছেন।[২১]

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের বৈশিষ্ট্য

সত্যেন্দ্রনাথের মূল-প্রবণতা আক্ষরিক অনুবাদের দিকে। তাঁর অন্যান্য অনুবাদেও এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। কালিদাসের সুপ্রযুক্ত শব্দগুলির যথাযথ আহরণে তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় অনুবাদে সুস্পষ্ট।

তৎসম শব্দ

বিরহবিশীর্ণ, দয়িতাজীবন-দায়িনী, অভ্রযোগে গর্ভাধান, আশাবৃন্তে করি ভর, সিদ্ধাংগনা উধ্বর্মুখী, রত্নপ্রভা-সমপ্রভাময়, স্ফুরিত-বিদ্যুন্মালা, শফরী-কটাক্ষবাণ আনন্দের অশ্রুজল, ক্রীড়ালোলা, আনন ভ্রুকুটিময়, দামিনী-বিচ্ছেদ ইত্যাদি তৎসম শব্দরাজির অবস্থানে তাঁর অনুবাদ রমণীয় হয়েছে।

তদ্ভব

তৎসম শব্দের পাশাপাশি তদ্ভব ও দেশজ শব্দের অবস্থানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর রচনায় একটি স্বচ্ছন্দ গতি এসেছে। যেমন—

আধো সুপ্তা, আধ্ ফোটা, ফুটন্ত কেতকে ঘেরা বিরহে ভবন-শিখী নিত্য সেথা পাখনা ভুলিয়া নাগর-নাগরী যথা শিলাগৃহে রসে মাতোয়ারা ইত্যাদি।

দেশী শব্দ

কোনো কোনো সময় দেশী শব্দের প্রয়োগে একদম ঘরোয়া ভাব অনুবাদে এসেছে। যেমন—দেউড়ী উপরি, ঝলঝলে, ঝিকি মিকি—যেয়ো পথময় ইত্যাদি।

সম্বোধন

মেঘের সংগে যক্ষের অন্তরংগ ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে—স্নেহের প্রকাশে যক্ষের মুখে 'তুই' সম্বোধনও তাঁর অনুবাদে আছে। 'দেখিবি অবশ্য তারে—এক পত্নী ভ্রাতৃজায়া তোর'।

শব্দদ্বৈত

সমগ্র অনুবাদটিতে শব্দদ্বৈতের ছড়াছড়ি। পাকা পাকা ফলে ভরা, বলি পর পর, বিলম্ব ঘটিবে পথি পথি, পাহাড়ে পাহাড়ে ফুলে ফুলে, ঝরণার ধারে ধারে, জীর্ণপত্র ঝরি ঝরি, গাঁয়ে গাঁয়ে বৃদ্ধ মুখে, সারারাত শ্বলি শ্বলি, ভাসি ভাসি করি সঞ্চরণ, সলিল পিয়ে পিয়ে, মিটি মিটি পরকাশি পরে, দুখে দুখে জর্জর শরীর ইত্যাদি। অনেক সময় ছন্দ মেলাতে শব্দদ্বৈতের প্রয়োজন হয়েছে আবার কোনো কোনো সময় এতে রচনার জোরও বেড়েছে। মূলে কালিদাসের রচনায়ও খিন্ন খিন্ন শিখরিষু...ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ' (পূর্বমেঘ ১৩) ইত্যাদি শব্দদ্বৈতের অনেক প্রয়োগ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ এই রীতিতে আকৃষ্ট হয়েছেন।

অলঙ্কার

মাঝে মাঝে অপূর্ব অলংকার মণ্ডিত পদও সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে চোখে পড়ে যেমন—মানস সরেও যেতে তোমা হেরি মানস না সরে (উত্তরমেঘ ১৫)।

নামধাতু ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ

নামধাতুর প্রয়োগে সকল পূর্বসংস্কার ত্যাগ করে নব নব উদ্ভাবনে সত্যেন্দ্রনাথ চেষ্টিত হয়েছেন। যেমন—চর্ব্বিয়া, তীরে দাঁড়াইয়া গর্জ্জি', অসমাপিকা ক্রিয়াপদেও কথ্য ভাষার প্রয়োগের প্রবণতা লক্ষিত হয়। যেমন—আঁকড়িয়া, ঝুঁকিয়া, রবিপথ আটকিয়া।

স্ত্রীবাচক শব্দ

কালিদাস স্ত্রীবাচক শব্দগুলির প্রয়োগে অনেক সময়েই শব্দগুলির বিশিষ্ট অর্থ রক্ষা করেন নি—এমন অভিযোগও যেমন শোনা গেছে[২২] তেমনি কালিদাসের কাব্যে শব্দগুলি 'নির্গলিত অর্থেই' রূপবৈচিত্র্য লাভ করেছে এমন অভিমতও পাওয়া গেছে।[২৩] এক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ নিষ্ঠার সঙ্গে কালিদাসকে অনুসরণ করেছেন—পাশাপাশি রাখলেই তা বোঝা যাবে।

দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী (পূর্বমেঘ ৪) —দয়িতাজীবনদায়িনী।

ত্বয্যুপেক্ষিত জায়াং (পূর্বমেঘ ৮)—বিরহিনী জায়া মেলে।

তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতি (পূর্বমেঘ ৩৪)—কেলি করে যুবতী যথায়।

মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্ (পূর্বমেঘ ৬৪)—কামিনী অলক পারা মেঘমাল বহে সদা ভালে।

সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্রনীপং বধূনাম (উত্তরমেঘ ২)—বর্ষার কদম্বফুল সীমান্তে ধারয়ে বধূগণ।

কোনো কোনো স্থলে সামান্য পরিবর্তনও দেখা যায় জনপদবধূ স্থলে কুলবধূ' 'দশপুরবধূ' স্থলে 'দশপুরনারী' শব্দের প্রয়োগে শব্দের বিশিষ্ট হানি হয় নি, তবে ১৯ পূর্বমেঘ শ্লোকে পৌরাঙ্গনা' স্থলে 'বালা' প্রয়োগে শব্দের বিশিষ্ট অর্থের কিছুটা হানি ঘটেছে। গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং এর অনুবাদে 'যোষিৎ' স্থলে 'রমণী' প্রয়োগে ভাবগত অর্থের হানি হয় নি, বরং অনুপ্রাসগত সৌন্দর্যে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ মনোহারী হয়েছে—

'রমণ বসতি চলে রমণীরা রজনী গভীর'।

আষাঢ়ে প্রথম মেঘদর্শনে উদ্‌গৃহীতালকান্তা পথিকবনিতার স্থলে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে 'অবলা' শব্দের প্রয়োগে বিরহিনীর অসহায়ত্ব ও প্রিয়মিলনের উৎকণ্ঠা মূর্ত হয়েছে—

তোমা হেরি জলধর যবে তুমি সঞ্চর আকাশে
অবলা আশ্বস্ত হিয়া, প্রণয়ী যাহার পরবাসে।

'ললিতাবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু'র অনুবাদে বনিতা স্থলে 'প্রমদা'র প্রয়োগে সৌকুমার্যের হানি হয় নি। বরং এখানেও ধ্বনিগত ঝঙ্কার উত্থিত হয়েছে—

'প্রমদার পদরাগ রাঙ্গা দাগ হেরি ঘরে ঘরে'।

রসবিচার

শব্দচয়নের পরেই মূল রসের পরিবেশনে তাঁর অনুবাদ কতটুকু সার্থক হয়েছে। তার বিচার চলে। মেঘদূত বিরহের কাব্য হলেও মিলনের আশ্বাসে ভরা। মেঘের প্রয়াণের পথে পথে 'কামনার কুঙ্কুমে রেবা, নির্বিন্ধ্যা, সিন্ধু, গম্ভীরা অভিষিক্ত। সুতরাং মেঘদূতকে Elegy বা শোকগাথা বলা যায় না—কারণ এটি নিরবচ্ছিন্ন বেদনার গান নয়—আবার এটি পুরোপুরি Monody নয়, কারণ এতে একটানা বিরহের করুণ প্রকাশ নেই।[২৪] কবির ভাবতন্ময়তার ফলে

তাঁর দেখা জগতই অপরূপ হয়ে ধরা দিয়েছে এই কাব্যে। এই সৌন্দর্যের দোলায় পাঠকচিত্ত আন্দোলিত হয়। সেজন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মেঘদূতকে শুধু খণ্ডকাব্য বলেই মেনে নিতে পারেননি। মধুরতার স্পর্শে এ কাব্য যথার্থই 'খণ্ড' অর্থাৎ খাঁড় জাতীয় অতীব মধুর।[২৫] মহাকবি যেমন মানবধর্মী করে জড়প্রকৃতিকে চৈতন্যময় করে চিত্রিত করেছেন—সহজ ভাষায় সেই প্রাণোচ্ছল চিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে সত্যেন্দ্রনাথও চেষ্টিত হয়েছেন। শুদ্ধ সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে বিচার করে যৌবনলীলার চিত্রগুলিকে অশ্লীল বলে তিনি দূরে সরিয়ে রাখেন নি। আবার অযথা প্রকট করে তোলার প্রবৃত্তিও তাঁর নেই। এখানে তাঁর ভূমিকা যে মুখ্যত অনুবাদকের সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। একটি নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে যথাযথ ভাষান্তরের প্রয়াস নিয়েছেন। শব্দার্থে ঠিক থাকলেও অনেক সময় প্রেমের উচ্ছল লীলাচিত্রগুলি তাঁর হাতে স্নিগ্ধতার প্রলেপ পেয়েছে।

'স্তনিতবিহগশ্রেণি কাঞ্চী' শোভিতা উচ্ছলা নির্বিন্ধ্যার রূপটি অনূদিত হয়েছে :

স্রোতোপরি ভাসি যায় হংসশ্রেণী রচে চন্দ্রাহার
ঘুরায় আবর্ত নাভী নাচি নাচি, মরি কি বাহার।

আবার—

প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থ:

শ্লোকটির পরিমার্জিত অনূদিত রূপ তাঁর লেখায় আছে :

পানতৃপ্ত অলসিত, শীঘ্র কি হে পারিবে ছাড়িতে ?
সে স্বাদ যে পায় সে কি সহজে তা পারে তেয়াগিতে ?

নীতিবচনে আগ্রহ

প্রেমের অজস্র রূপচিত্রণের মাঝে অত্যুজ্জ্বল মণির মতো যে সত্যবাণীগুলি মেঘদূতে দীপ্ত হয়ে আছে সেগুলি অনুবাদ করেই সত্যেন্দ্রনাথের শুধু তৃপ্তি হয় নি পরবর্তীকালে নবরত্নমালার নীতিবিষয়ক পদাবলীর মধ্যেও কয়েকটিকে স্থান দিয়েছেন। নবরত্নমালায় অনুবাদগুলি আরও স্পষ্ট হয়েছে। 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা' মেঘদূতের অনূদিত রূপ—আট-দশ এক

দীর্ঘ পয়ার বন্ধনে একটু সংক্ষিপ্ত— 'মহতে বিফল যাচ্ঞা সেও ভাল অধমে না কভু'। নবরত্নমালায় আট-আট ছয় ত্রিপদীতে অনুবাদটি আরও স্পষ্ট হয়েছে।[২৬]

কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ত তো বা

নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ—বাণীটির রূপান্তরে মেঘদূতের অনুবাদ অনেক মূলানুসারী হলেও নবরত্নমালায় রচনা সৌকর্য সাধিত হয়েছে।[২৭]

ত্রুটি

রচনাসৌকর্যের দিক থেকে কিছু কিছু দুর্বলতাও তাঁর অনুবাদে চোখে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথের গদ্য ঢঙে যেন আবেগাত্মক শব্দের প্রয়োগ আছে, তেমনি পদ্যাকারে লেখার সময় ও তাঁর এই প্রিয় রীতিকে কিছুতেই বাদ দিতে পারেন নি। যেমন—মরি মরি! বলিহারি! মরি কি বাহার! ইত্যাদি। ফলে অনেক সময় অনুবাদে সংস্কৃতের ভাবগাম্ভীর্য হ্রাস পেয়েছে।

অনুবাদকে মূলানুগ করার আপ্রাণ চেষ্টায় কতগুলি সমাসবদ্ধ ও তৎসম শব্দরাজি বাংলা বাতাবরণে এসে ঠিক ঠিক মিলে যায় নি। যেমন—

'মীন ক্ষোভ সচঞ্চল কমলের'; 'ভিন্নাঞ্জন স্নিগ্ধ শ্যাম', 'প্রাতঃ কুন্দ সম খিন্ন'; 'ধাতুরাগে শিলায়'; (ধাতুরাগ—নিচে টীকা নেই) 'কাশ্য ঘাতে ঘাড়ে অভাগিনী'…ইত্যাদি।

সংস্কৃত সাহিত্যের রসধারাকে বাংলার ঘরোয়া সুরে পরিবেশনের আত্যন্তিক প্রচেষ্টায় অনেক সময়েই কথ্য ঢঙের প্রয়োগে মূলের সৌন্দর্য অনেকটা তরল হয়ে পড়েছে; যেমন পাছুহটি, পিয়ে, আগু দাঁড়াইবে, গিরিসুতা বেড়ান বেড়িয়ে ইত্যাদি।

উপসংহার

এতক্ষণ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের যথাসম্ভব বিশ্লেষণের পর আমরা যদি অনুবাদটির সামগ্রিক ভাবের পরিচয় অন্বেষণ করি তাহলে এটি একান্ত মনোহারী হয়েছে এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছলেও, মূলানুসারিতার গৌরব যে অনুবাদটি যথার্থই প্রাপ্য, তা স্বীকার করতে হবে।

'সংস্কৃত কবিতার শ্লোকগুলি ধাতুময় কারুকার্যের ন্যায় অত্যন্ত সংহত ভাবে গঠিত' বাংলা অনুবাদে তা যে 'বিশ্লিষ্ট ও বিস্তীর্ণ' হয়ে পড়ে একথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন।[২৮] সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদে দু একটি শ্লোক ছাড়া প্রায় প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থ চার পংক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এত তাঁর শৈল্পিক পরিমিতি বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণনাসংযমে সমগ্র অনুবাদটি পরিচ্ছন্ন। আঠারোমাত্রিক দীর্ঘপয়ার বেছে নেওয়ায় সুষ্ঠু চরণগ্রন্থনের সহায়ক হয়েছে, কিন্তু এ ছন্দে যে মন্দাক্রান্তার ধ্বনিসংগীত থাকতে পারে না তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গত সাতাশমাত্রার মন্দাক্রান্তার বাংলা রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথ আট-সাত-সাত-পাঁচ মাত্রাবিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন। এই মাত্রামেলানো মন্দাক্রান্তার আদর্শ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতের অমিত্রাক্ষর রীতিতে ও বাংলা পদ্ধতিতে প্রথম দুই পদে ও অন্তে মিল রেখে নানাভাবে মেঘদূত অনুবাদের নমুনা[২৯] দেখিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন—এতে মূলের মর্যাদা থাকবে না', দুটি চারটি শ্লোক কোনোমতে বানানো যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য।[৩০]

অনুবাদকে সহজ বোধ্য করে তুলতে সত্যেন্দ্রনাথের নিষ্ঠার পরিচয় আমরা ইতোপূর্বেই কিছু কিছু পেয়েছি তাঁর পূর্বসূরী ও সমকালীন অনুবাদকদের চেয়ে তাঁর রচনা নিঃসন্দেহে উৎকর্ষের দাবি রাখে।

বিশ শতকের প্রায় দ্বিতীয় দশক থেকেই মেঘদূত-অনুবাদকগণ রবীন্দ্রনাথের ছায়ায় প্রভাবিত হয়েছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মন্দাক্রান্তা ছন্দে বাংলা রূপায়ণের মূলেও ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনা।[৩১] যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্যের অনুবাদের ভূমিকায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত স্পষ্টতই বলেছেন মেঘদূতের উপাদান নিয়ে নবীন সৃষ্টি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। অত্যাধুনিক যুগে বুদ্ধদেব বসুও তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় একথা স্বীকার না করে পারেন নি। যাঁদের সে ক্ষমতা নেই তাঁরা মেঘদূত পাঠের তৃপ্তি অনুবাদের মাধ্যমেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের[৩২] প্রভাব সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে কিছু কিছু আছে। তবে মন্থর চালে ও ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রকাশে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ এমনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে অত্যাধুনিক না হোক আধুনিক যুগের পাশাপাশি

রাখলেও তাঁর অনুবাদ অপাংক্তেয় হবে না। এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ দেওয়া চলে। শুধু একটির উল্লেখ করেই আমাদের এ আলোচনার সীমারেখা টানা যাচ্ছে। কবি নরেন্দ্র দেব (১৩৩৬) ছড়ার ছন্দকেও অনুবাদে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু শুরু করেছেন মন্থর চালে—'প্রণয় প্রমত্ত এক—কর্ম্মভীরু—যক্ষ—অভিশাপে····' এর পাশাপাশি সত্যেন্দ্রনাথের—'স্বকার্য্যে প্রমাদ গণি প্রভু দিলা ক্রোধে গুরু শাপ' কোনো ভাবেই বেসুরা শোনায় না।

১. 'স্বনামধন্য উইলসন মেঘদূতের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন; সেই অনুবাদ বিষয়ে কিছু না বলাই ভালো, কিন্তু তাঁর সুখপাঠ্য টীকা পড়ে বোঝা যায়, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ভারতের ভূগোল, জলবায়ু, পশুপাখি ও উদ্ভিদবিষয়ে জ্ঞানদান'···। কালিদাসের মেঘদূত : বুদ্ধদেব বসু। ভূমিকা, পৃ. ৪।

২. Where Ramagiri's shadowy woods extend.
And those pure streams where Sita bathed descend ;
Spoiled of his glories, severed from his wife,
A banished Yacsha passed his lonely life ;

৩. In the conversion of the Megha Duta into English the translator has in general endeavoured to avoid being licentious, without attempting to be literal...
Preface : *The Megha Duta* or Cloud Messengar by Horace Hayma Wilson (1813)

৪. '১২৯৭ সালে শিলঙে প্রবাসকালে প্রোফেসার উইলসন কৃত ইংরাজি অনুবাদ সমেত একখণ্ড মেঘদূত হস্তগত হওয়ায়, শৈশবের সেই সংস্কার-বশতঃ উহা পদ্যে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই।···কয়েক বৎসর হইল সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার M.A., M.R.A.S. মহোদয় তৎকৃত মেঘদূতের ইংরেজি অনুবাদ আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক উপহার দেন। ঐ অনুবাদের ভূমিকায় সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—

Wilson's translatiou was very liberal one. The present translator has…essayed a very literal rendering of the original.…বন্ধুবরের ইংগিতে আমাদিগের ধৃষ্টতা বাড়িল।' পাঁচকড়ি ঘোষ।

৫. আমার অভিপ্রায় এই যে, যদ্যপি আমার এই যৎসামান্য অনুবাদ পাঠ করিয়া কাহারো মন কালিদাসের মূলগ্রন্থ অবলোকনে উৎসুক হয় তাহা হইলেই আমি আপাততঃ কৃতকার্য্য হই।'—মেঘদূত অনুবাদের ভূমিকা : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬. "নূতন লেখকের প্রথমে অনুবাদ হস্তে সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত বিশেষ সুবিধা আছে।…এতৎ পাঠে যদি কেহ তৃপ্তি বোধ করেন তাহা হইলেও আমি যেমন গৌরব করিতে পারি না,…সেইরূপ ইহা সাধারণের অপ্রীতিকর হইলেও আমাকে বিশেষ লজ্জিত হইতে হইবে না'। —মেঘদূত : কিশোরীমোহন সেন। পূর্ব্বমেঘ (ভূমিকা)।

৭. 'সংস্কৃত কাব্য অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনিময় গদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যছন্দে তার গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়।… নিতান্ত সরল পয়ারে তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে ধ্বনিসংগীত মারা যায়, অথচ সংস্কৃত কাব্যে এই ধ্বনিসংগীত অর্থ সম্পদের চেয়ে বেশি বই কম নয়।' সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ :— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'উদয়ন' পত্রের ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত, পরে রবীন্দ্র-রচনাবলী একবিংশ খণ্ডে সংগৃহীত। ১৩ই মার্চ ১৯৩১-এ প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে 'অভাগা যক্ষ যবে করিল কাজে হেলা' অনুবাদটির সংগে লিখিত। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ৮৬, ১ম খণ্ড ৩য় সং ১৯৭৬। এ বিষয়ে শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রূপান্তর' পুস্তকের গ্রন্থপরিচয় পৃ. ২১০ দ্রষ্টব্য।

৮. A word in Poetry has not merely a meaning value but also a Söund value, not merely an appeal to the mind and understanding but also an appeal to the tongue and

the palate (as it is spoken); and in poetry two values, the Semantic and the Sonic, the logical and the Sensuous, are so closely integrated into each other as to be inseparable.

'*Traduttore-Traditore*' : Prof. Taraknath Sen. *Literary Miscellany*, 1972.

৯. অনুবাদে মেঘদূত : প্রবোধচন্দ্র সেন। যোগীন্দ্রনাথ মজুমদারের মন্দাক্রান্তা ছন্দে অনূদিত (১৩৭৫) মেঘদূতের ভূমিকা।

১০. ভারতী পত্রিকায় ১২৯৮ বংগাব্দের আষাঢ় সংখ্যা পৃ. ১৭৩-৭৭-এ ও ঐ বছরেই শ্রাবণ সংখ্যায় পৃ. ২১০-১৭ অনুবাদটি প্রকাশিত হয়। [শ্রীসুনীল দাস সংকলিত 'ভারতী-রচনাপঞ্জী'র পাণ্ডুলিপি পৃ. ৮৩৫ (বংগীয় সাহিত্য পরিষদ-এ প্রাপ্ত)।] অপিচ 'ভারতী ও বালক' ১২৯৮ সালের ভাদ্র সংখ্যায়-২৬৩-২৭১ পৃষ্ঠায় উত্তরমেঘ প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে প্রাপ্ত। (১২৯৩ সাল থেকে 'বালক' পত্রিকা 'ভারতী'র সংগে যুক্ত হয়)।

১১. বন্ধনীকৃত তারিখটি বেংগল লাইব্রেরী ক্যাটালগ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৬৭নং-এ উদ্ধৃত।
আখ্যা পত্র। মেঘদূত : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (ভারতী হইতে পুনর্মুদ্রিত) কলিকাতা ২নং গোয়াবাগান স্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত ১২৯৮ সাল।

১২. সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বসূরী :

(ক) কুবেরের অনুচর কোন যক্ষরাজ
কান্তা সনে ছিল সুখে ত্যজি কর্মকাজে
ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ
বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ।
—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৬ বংগাব্দ = ১৮৬০ খ্রী.

(খ) যথায় রাঘব গিরি নমেরু-কানন
তাপ ক্লান্ত পথিকের জুড়ায় জীবন

জনক তনয়া স্নানে ভূধর-দুহিতা
পেয়েছেন তদবধি চির পবিত্রতা
—প্রাণনাথ পণ্ডিত (সরস্বতী) ১২৭৯ বংগাব্দ = ১৮ ৭২ খ্রী.

(গ) কার্য্য ফেলি অন্যমনা যক্ষ একজন,
'কান্তা ছাড়ি দূরে গিয়া থাক সংবৎসর',
এ দারুণ প্রভুশাপে মহিমা আপন
হারাইয়া রহে গিয়া রামগিরি পর
—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (শর্মা) বংগাব্দ ১২৮৯ = ১৮৮২ খ্রী.

(ঘ) উজলি ভারত-হিয়া করিছে বিরাজ
রামগিরি-নামধারী খ্যাত নগরাজ
মন্দির-মাঝারে শোভা করয়ে ধারণ
যতনে গঠিত উচ্চ নৈবেদ্য যেমন
* * * * * * * *
একদা চতুর মতি যক্ষ-অধিপতি
কুপিত হইল এক অনুচর প্রতি
নিয়োগে ছিল না তাঁর তিলেক যতন
প্রণয়িনী পাশে সদা থাকিবারে মন
—কিশোরী মোহন সেন : বংগাব্দ ১২৯১ = ১৮৮৪ খ্রী.

(ঙ) সুশীতল রাম-গিরি আশ্রম কাননে
(মহাপুণ্যধাম তীর্থ সীতার গাহনে)
শাপ ভ্রষ্ট যক্ষ এক করিতে বসতি
কান্তার বিরহ তাপে সন্তাপিত অতি ।
—জগদীশ্বর গুপ্ত । ১২৯২ = ১৮৮৫ খ্রী.

১৩. সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন অনুবাদক

'জানকীর স্নানে যেথা পুণ্যবারি
নদী লুটে রাম গিরির পায়
বিরাজে আশ্রম তীরেতে তাহারি
ঘন নমেরুর শীতল ছায়' ।
—বরদাচরণ মিত্র ১২৯৯ = ১৮৯২ খ্রী.

১৪. অখিলচন্দ্র পালিতের অনুবাদ (১৯০৮)

কার্যে অবহেলা দোষের কারণ
কুবের যক্ষেরে দিলা এই শাপ,
'সহিবে হারায়ে মহিমা আপন
এক বর্ষ প্রিয়া বিরহের তাপ'।

১৫. পিংগল বিহ্বল | ব্যথিতনভতলে | কই গো কই মেঘ | উদয় হও | ।

৮ + ৮ + ৭ + ৫ = ১৭

যক্ষের নিবেদন। প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩১৫ আষাঢ়

১৬. মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মো ভনৌ গৌ যযুগ্মম—যার পাদগুলি ক্রমশ: ম, ভ,ন, দুটি গ, ও দুটি হ গণে গঠিত হয়। ম = (- - -) ভ = (- ⏑ ⏑) ন = (⏑ ⏑ ⏑) গ = (—একটি গুরু) য = (⏑ - -)।

ছন্দোমঞ্জরী : গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত পৃ. ১২৪।

ম ভ ন গ য য

ক শ্চি ৎ কা ন্তা | বি র হ গু রু ণা | স্বা ধি কার | প্র ম ত্তঃ |

৮ + ৭ + ১২ = ২৭

১৭. যক্ষ করে এক আপন কাজে হেলা, কুবের তারে দিলা কঠোর শাপ

—প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ।

১৮. জানাবেই সেই ঠাঁই শোভিছে বধূদের হস্তে সুন্দর লীলোৎপল,
নিত্যই কান্তার চিকুরে গাঁথা রয় কুন্দপুষ্পের কোরকদল।
কুন্তল মধ্যেই শোভিছে কুরুবক, লোধ্রপাণ্ডুর বদন তার,
কর্ণের সাজ তার সুচারু শিরীষেই, রয় সীমন্তেই কদমভার

মন্দাক্রান্তা ছন্দে যোগীন্দ্রনাথ মজুমদারের অনুবাদ

'…চিকুরের বদলে 'অলকে' এবং 'বদন' এর বদলে 'আনন' লিখে অনায়াসেই মূলানুগ করা যেত,…কান্তার শব্দটি 'বধূনাম্' কথার ব্যঞ্জনাকে ব্যবহৃত করছে,…'লোধ্রপাণ্ডুর' আর লোধ্রপ্রসবরজসা

পাণ্ডুতাং নীতা' একার্থক নয়, বহুত্ববোধক 'কদম্বভার' শব্দটি একবচনের 'নীপং' শব্দের সৌকুমার্যহানি ঘটিয়েছে।'

ঐ ভূমিকা : প্রবোধচন্দ্র সেন এর মন্তব্য।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে এই শ্লোকের অনুবাদ—

হাতে হাতে লীলাপদ্ম, বালকুন্দ অলকে গাঁথন
লোধ্রের পরাগ রাগে সুরঞ্জিত পাণ্ডুর আনন
নব কুরুবক কেশে, কর্ণে দোলে শিরীষ রতন
বর্ষার সীমন্তে ধারয়ে বধূগণ।

১৯. অনুবাদে মেঘদূত : প্রবোধচন্দ্র সেন। (যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার-কৃত মেঘদূত অনুবাদের ভূমিকা)

২০. প্রবোধচন্দ্র সেন : ঐ।

২১. ঐ ঐ।

২২. সংস্কৃত প্রতিশব্দসমূহ বিনিময়ধর্মী', তাদের মধ্যে অনায়াসে অদল-বদল-চলে। স্ত্রীজাতির কতিপয় প্রতিশব্দের সংজ্ঞার্থ মনিয়র উইলিয়মস্ এর অভিধান থেকে উদ্ধৃতি করি।...নারী ও স্ত্রী সাধারণ শব্দ...কিন্তু অন্য প্রত্যেকটির অভিপ্রায় ছিলো স্ত্রীজাতির মধ্যে বয়স, রূপ ও স্বভাবের প্রভেদ বোঝানো...এই শব্দগুলোর মূল অর্থ উপেক্ষা করে কবিরা তাদের নির্বিশেষে ব্যবহার করেছেন। কালিদাস যখন বলেন...তখন স্ত্রী, বধূ, কামিনী, যোষিৎ ও বনিতায় বিন্দুমাত্র অর্থভেদ সূচিত হয় না'—কালিদাসের মেঘদূত : বুদ্ধদেব বসু। ভূমিকা, পৃ. ৭-৮।

২৩. দ্র. মেঘদূত পরিচয় : পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। ভূমিকা, পৃ. ৬৩।

২৪. মেঘদূত পরিচয় : পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। ভূমিকা, পৃ. ১১।

২৫. মেঘদূত ব্যাখ্যা : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২৬. নবরত্নমালা : ধর্ম ও নীতিবিষয়ক পদাবলী : (অধমে যাচ্ঞা নয়)

মহতে যাচ্ঞা যদি নিরর্থক নিরবধি
সেও ভাল তবু
লাভ অধমের কাছে, প্রাণ যেন নাহি যাচে
হীন হয়ে কভু

২৭. মেঘদূতের অনূদিত রূপ—

কেহ বা অত্যন্ত সুখী, কেহ দুঃখ সহে বা বিষম
কভু উচ্চে কভু নীচে ভাগ্য ফেরে চক্র-নেমী ক্রম।

নবরত্ন ঐ সুখদুঃখ শিরোনামে প্রকাশিত।

কেহ বা অত্যন্ত সুখী, কেহ দুঃখে একান্ত অধীর
কভু উচ্চে কভু নীচে দশাচক্র নাহি রহে স্থির।

২৮. ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত : ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৪।

২৯. (ক) অভাগা যক্ষ কবে | করিল কাজে হেলা | কুবের তাই তারে | দিলেন শাপ'

(খ) কোনো এক যক্ষ সে
প্রভুর সেবা কাজে
প্রমাদ ঘটাইল
উন্মনা,
তাই দেবতার শাপে
অস্তগত হল
মহিমা সম্পদ
যত কিছু।

(গ) যক্ষ সে কোনো জনা | আছিল আনমনা—সেবার অপরাধে | প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয় গত | মহিমা ছিল যত | বরষ কাল যাপে | দুখতাপ

ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত। ৩য় সংস্করণে যথাক্রমে পৃ. ৮৭, ১৯৪ ও ১৩৫-এ মুদ্রিত।

৩০. ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃ. ৮৭, ৩য় সংস্করণ।

৩১. দ্র. আলোক রায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ সরস্বতী'-চতুর্থ প্রকাশ-পৃ. ২৬-২৭। যোগীন্দ্রনাথ মজুমদারের মেঘদূত অনুবাদের ভূমিকায় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন কর্তৃক পরিবেশিত। পৃ. ১৮।

৩২. দ্র. দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ (১৮৭৫ সাল) আঠারোমাত্রিক দীর্ঘ পয়ারে প্রয়োগ আছে। সত্যেন্দ্রনাথের আঠারোমাত্রিক পয়ারের প্রয়োগ সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুসৃতি। দ্বিজেন্দ্রনাথের মেঘদূত—'বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ' এর সংগে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ :— 'বর্ষেক ভুঞ্জিবি তুই কান্তা ছাড়ি প্রবাসের তাপ'-এ 'বর্ষেক,' প্রবাসের তাপ,' 'ভুঞ্জি' ইত্যাদি শব্দের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

গীতার উপক্রমণিকা ও পদ্যানুবাদ

রচনাকাল

১৩১১ বঙ্গাব্দের (১৯০৫ খ্রী.) সত্যেন্দ্রনাথের রচিত গীতার পদ্যানুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রায় উনিশ বছর বাদে তাঁর মৃত্যুর পরে [নববর্ষ ১৩৩০] ইন্দিরা দেবী কর্তৃক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত।

সত্যেন্দ্রনাথ গ্রন্থটি উপহার দিয়েছেন—'প্রাণাধিকা ইন্দিরাকে'। বালিগঞ্জ —২০, মে স্কেয়ার রোডে কন্যার আবাসে মৃত্যুর পূর্বে প্রায় এক বছর গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের পরিবর্ধন ও পরিশোধনের কাজে সত্যেন্দ্রনাথ কন্যাসহ ব্যাপৃত ছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি নিজেই যে দেখে যেতে পেরেছিলেন তা শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে ইন্দিরা দেবী ব্যক্ত করেছেন।[১]

প্রথম সংস্করণে সত্যেন্দ্রনাথের লিখিত ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, গীতার অন্যান্য পদ্যানুবাদকের সন্ধান তিনি প্রথমে পান নি। তাই গীতার কোন পদ্যানুবাদ নেই, এই ধারণা নিয়েই তিনি অনুবাদটি হাতে নিয়েছিলেন।

পরে মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নবীনচন্দ্র সেন ও কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়ের পদ্যানুবাদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। তবে ঐ অনুবাদগুলিকে তিনি সর্বাঙ্গসুন্দর মনে করেন নি সেজন্য তিনি পূর্বসূরীদের ত্রুটিগুলি পরিহার করার প্রয়াস করেছেন ও নিজের অনুবাদটি প্রকাশ করাই স্থির করেছেন।[২]

অনুবাদক ও ভাষ্যকারের পৃথক্ ভূমিকা

নানাতত্ত্বে সমন্বিত হয়ে গীতা একটি সুললিত পদ্যগ্রন্থ[৩], এও যেমন শোনা গেছে তেমনি তত্ত্বের সংমিশ্রণে গীতা দুর্বোধ্য গ্রন্থ এমন অভিমতও পাওয়া গেছে।[৪] সাধারণ পাঠকগণ কোন ভাষ্য ছাড়া গীতা পড়তে গেলেই কিছু না কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হবেন না বলে প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ও পদ্যানুবাদক দেবেন্দ্রবিজয় বসু মন্তব্য করেছেন।

গীতাব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন। বিভিন্ন সময়ে গীতার যে সকল টীকা-ভাষ্য রচিত হয়েছে, সেগুলিও এক একটি বিশেষ

বিশেষ তত্ত্বের পরিপোষণার্থেই রচিত হয়েছে।[৫] সুতরাং ঐ সকল ভাষ্য-গ্রন্থের কেবল একটিকে আশ্রয় করলেই গীতার নিরপেক্ষতা পাঠক হৃদয়ে জাগ্রত হয় না। প্রকৃতপক্ষে সকল মতবাদই গীতা-তীর্থে এসে মিলেছে। সেজন্য বিভিন্ন ভাষ্য সম্পর্কেই পাঠকের পরিচিতি হওয়া প্রয়োজন। নিরপেক্ষ ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন শ্লোকের বিশ্লেষণে ঐ সকল ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যার কিছু কিছু উল্লেখ করে বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে পাঠককে আভাস দিতে পারেন।

কঠিন তত্ত্বকে সহজ ভাষায় বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেওয়া ব্যাখ্যাকারের কাজ, আর ভাষান্তরে মূলের ভাব ও রসের পরিস্ফুটন করা অনুবাদকের কাজ। অনুবাদকের ক্ষেত্রে অনেকটা সীমিত—ভাষ্যকারদের ক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত। ভাষান্তরে মূলের বস্তু ও ভাব ঠিক রাখতে যেটুকু পরিসর পাওয়া যায় তার মধ্যেই অনুবাদকের কারুকৃতির কৌশল সীমায়িত রাখতে হয়। অন্যদিকে অতিব্যাপ্তি ভাষ্যকারদের পক্ষে দূষণীয় নয়। অনুবাদক যদি ভাষ্যকারের ভূমিকা নেন তাহলে অনুবাদ মাঠে মারা যাবে। বরঞ্চ অনুবাদ যথাযথ রেখে পৃথক্ ভাবে টীকা দেওয়ার পক্ষেই রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়েছেন।[৬]

গীতার উল্লেখ্য পদ্যানুবাদকগণ সহজ ভাষায় অনুবাদ করেও, এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে আরও যে সব কথা বলতে চেয়েছেন—তা গদ্যে পৃথক্ ভাবে পরিবেশন করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ গ্রন্থের উপক্রমণিকায় গীতা প্রসঙ্গে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন সেকথা প্রসঙ্গান্তরে ব্যক্ত হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে পৃথক্ ভাবে 'টিপ্পনী' দিয়েছেন।—অনুবাদের মধ্যেই ভাষ্যকারের ভূমিকা নিয়ে অনুবাদের সৌন্দর্যকে ব্যাহত করেন নি।

গীতার অন্যান্য পদ্যানুবাদক ও গীতাচর্চা

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর গীতার ভূমিকায় তিনজন পূর্বসূরীর উল্লেখ নিজেই করেছেন। এঁদের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেন ও কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ জনপ্রিয় হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর (১৩০২ সাল) অনুবাদে কোন উল্লেখযোগ্য রচনাবৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে গীতার পদ্যানুবাদ করে তাঁর আত্মপ্রসাদ লাভের ও প্রসঙ্গত তাঁর জনপ্রিয়তার আভাস দিয়েছেন।[৭] নবীনচন্দ্র সেন-এর অন্তরঙ্গ অক্ষয়চন্দ্র

সরকারের উক্তিতেও এর প্রমাণ রয়েছে।[৮] কুমারনাথের পদ্যানুবাদের প্রচার ও বিবিধ সংস্করণ, ভূতপূর্ব বঙ্গবন্ধু সম্পাদক—বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কুমারনাথের কাব্যপ্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, ও নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের সেবার জন্য কুমারনাথকে উপাধি প্রদানে তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বে আরও কয়েকজন গীতার পদ্যানুবাদকের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৩০৩ সালে রাধেশচন্দ্র শেঠের গীতাকৌমুদী (পদ্যানুবাদ) ১৩০৪ সালে শরদিন্দু মিত্রের 'চিদানন্দ ভগবদগীতা' (পদ্যানুবাদ) ও ১৩০৮ সালে শৈবলিনী দেবীর 'গীতাবাক্য' প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রবিজয় বসুর সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা সমেত পদ্যানুবাদ ১৩২০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও তার প্রায় ত্রিশ বছর আগেই দেবেন্দ্রবিজয় বসু গীতার পদ্যানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তা ভূমিকা থেকে জানা যায়। অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল সেকথা তিনি ভূমিকায় নিজেই বলেছেন। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে দেবেন্দ্রবিজয় বসুও সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বসূরীদের একজন। প্রসঙ্গত বাংলাদেশে কীভাবে গীতাচর্চা শুরু হলো তার একটি সুন্দর বিবরণ দেবেন্দ্রবিজয় বসুর ভূমিকা থেকে জানা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বাংলাদেশে গীতাচর্চায় শিক্ষিত বাঙালীদের আগ্রহের অভাব, একমাত্র নির্ভরযোগ্য সংস্করণ আদি ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হিতলাল মিশ্রের অনুবাদ সহ গীতা, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান কল্পে শশধর তর্কচূড়ামণি, কুমার কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের উদ্যোগ, 'প্রচার' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের গীতা ব্যাখ্যার প্রকাশ ও দৈনিক পত্রিকায় দেবেন্দ্রবিজয় বসু কর্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা, ধীরে ধীরে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে গীতাচর্চার আগ্রহের উন্মেষ ইত্যাদি প্রসঙ্গ ১৩২০ সালে প্রকাশিত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর ব্যাখ্যা সমেত পদ্যানুবাদের ভূমিকায় উল্লিখিত হয়েছে।

বাংলাভাষার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য সংস্কৃত অনুবাদে মূলের হুবহু প্রতিফলন করা যে দুঃসাধ্য এ সম্পর্কে রাধেশচন্দ্র শেঠ সচেতন ছিলেন। সেজন্যই তিনি তাঁর অনুবাদের নাম দিয়েছেন 'গীতাকৌমুদী'; সবিনয়ে

তিনি এটিকে ভাবানুবাদ বলেছেন। যশস্বী কবি নবীনচন্দ্র সেনের অনুবাদের পর রাধেশচন্দ্র শেঠ তাঁর অনুবাদ প্রকাশ করতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

১৩০৬ বংগাব্দে মদনমোহন ঘোষ সংকলিত গীতার পদ্যানুবাদ তাঁর পুত্র যাদবকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় প্রায় সপ্ততি বর্ষ পূর্বে মদনমোহন ঘোষ তাঁর বন্ধুর সাহায্যে গীতার এই অনুবাদটি করিয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের পরবর্তী কালে বাজারে গীতার অনেক পকেট সংস্করণ ও সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। সেগুলি আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নয়। এগুলির মধ্যে পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্নের 'গীতা-রত্নামৃত' খগেন্দ্র নারায়ণ মিত্রবর্মার 'গীতামঞ্জরী', নিতাই চরণ দে রচিত 'সরল পদ্যগীতা', ক্ষীরোদচন্দ্র গংগোপাধ্যায়ের 'অমিয়গীতা', শ্রীমতী ললিতা ঘোষ-এর 'ছন্দিতা গীতা' ও বিজয়াপদ সমাদ্দারের শ্রীধর স্বামীকৃত টীকা অনুসরণে পদ্যানুবাদ এর উল্লেখমাত্র করা গেল।

সমকালীন অনুবাদকদের সঙ্গে তুলনা

সত্যেন্দ্রনাথের রচনারীতির পূর্ণ বিশেষণের পূর্বে তাঁর পূর্বসূরী ও সমকালীন অনুবাদকদের সংগে একটু তুলনামূলক বিচার করলেই তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পয়ার ও ত্রিপদীতেই মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনুবাদ গ্রথিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের মতে মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনুবাদ যে ভাবার্থ অনুবাদ একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। (দ্রঃ ২নং পাদটীকা)। সত্যেন্দ্রনাথের রচনারীতির সংগে তুলনা করলে দেখা যায় মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর অনুবাদে সর্বজনবোধ্যতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন: কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ মূলের ভাব গাম্ভীর্য অনেক বেশি রক্ষিত হয়েছে। মেঘদূতের মতো এক্ষেত্রেও আঠারোমাত্রিক দীর্ঘ পয়ারের আশ্রয় গ্রহণ তাঁর প্রকাশের সহায়ক হয়েছে।[৭]

ষোড়শ মাত্রিক ছন্দের প্রয়োগও সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে আছে।

এই দেবী গুণময়ী মায়া মম সুদুস্তর

এ মায়া এড়ায় সাধু ভজি মোরে নিরন্তর—ইত্যাদি.

নবীনচন্দ্রের ষোড়শ মাত্রিক ছন্দের চেয়ে সত্যেন্দ্রনাথের হাতে এই ছন্দের

প্রয়োগ অনেক সৌষ্ঠবমণ্ডিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো সময় সরল পয়ারেও সত্যেন্দ্রনাথের রচনা স্বচ্ছন্দ হয়েছে। নবীনচন্দ্রের অনুবাদ সত্যেন্দ্র নাথের কাছে যে 'শব্দে ছন্দে সংস্কৃত ঘেঁষা' মনে হয়েছে—সে একটি তিনি সহজ বাংলায় লিখে দূর করার প্রয়াস করেছেন। নবীনচন্দ্রের যোড়শমাত্রিক ছন্দের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের চৌদ্দ মাত্রিক পয়ার ছন্দকে তুলনা করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।[১০] সত্যেন্দ্রনাথের হাতে দ্বিতীয় সংস্করণের পরিবর্তিত রূপটিতে রচনার গতি আরও স্বচ্ছন্দ হয়েছে।

কুমারনাথের অনুবাদ পদলালিতাপূর্ণ হলেও এতে সত্যেন্দ্রনাথ 'সংস্কৃতের গাম্ভীর্য ও ওজস্বিতার অভাব' অনুভব করেছেন (দ্রঃ ২নং পাদটীকা)। দুজনের অনুবাদ পাশাপাশি রাখলে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদটিই অধিক সুললিত মনে হয়।[১১]

রাধেশচন্দ্র শেঠের রচনা অনেক সময় বিশ্লিষ্টধর্মী হয়ে পড়েছে। তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ অনেক সংহত হয়েছে।[১২] ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র শৈবলিনী দেবীর 'গীতকাব্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫৫) এর ভূমিকায় বলেছেন—রচয়িত্রীর অনুভূতিলব্ধ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত হওয়ায় প্রত্যেকটি 'অনুবাদে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যার মূল্য আধ্যাত্মিক জগতে উপেক্ষণীয় নয়।[১৩] ছন্দের দিক থেকেও শৈবলিনী দেবীর অনুবাদ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথম ও তৃতীয় চরণে ও দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে অন্ত্যানুপ্রাস প্রায়শ আছে। শৈবলিনী দেবীর আট-আট ও আট-ছয় ছন্দে অনুবাদ সুললিত সন্দেহ নেই কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের হাতে চৌদ্দ মাত্রিক পয়ারেও ভাব আরও সহজভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[১৪] শরদিন্দু মিত্রের[১৫] অনুবাদে দ্বাদশাক্ষর পয়ার, ত্রিপদী ও সরল পয়ারের অনুসৃতি রয়েছে। মদনমোহন ঘোষের সংকলনে পয়ার ত্রিপদী ছাড়া, ছন্দে কোন উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের বৈশিষ্ট্য

সত্যেন্দ্রনাথের গীতার প্রথম সংস্করণে যে যে স্থানগুলিতে ভাবের অস্পষ্টতা রয়েছে বলে পরবর্তীকালে তাঁর মনে হয়েছে, সেগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্তিত হয়েছে। এর তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ হবে বলে মাত্র সামান্য কয়েকটির উল্লেখ করা গেল।

২ অঃ ২০ নং এ (১ম সং-এ ছিল) —'না ছিল না হয় পুন'
(২য় সং-এ হয়েছে) —ছিল চির রবে চির।

২ অঃ ৩১ নং (১ম সং-এ ছিল) —স্বধর্মে' বাঁধি যা লক্ষ্য ধর হে সাহস।
(২য় সং-এ হয়েছে) —হও হে নির্ভ'র চাহি স্বধর্মে'র পানে

২ অঃ ৩৫ নং (১ম সং-এ ছিল) —শত্রুরা ভাবিবে অপমান পাবে
(১ম সং-এ হয়েছে) —শত্রুরা ভাবিবে লাঞ্ছনা পাইবে। (এখানে সাধু চলিতের মিশ্রণ দূর হয়েছে।

২ অঃ ৬০ নং (১ম সং-এ হয়েছে) —প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ জোরে তবু হরে তার মন।
(২য় সং-এ হয়েছে) —প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ সবলে হরিয়া লয় মন।

৩য় অঃ ৬নং (১ম সং-এ ছিল) —করি মনে মনে'
(২য় সং-এ হয়েছে) —'যে করে স্মরণ'।

৩য় অঃ, ৮ নং (১ম সং ছিল) —কর্ম' বিনা দেহযাত্রা চলে কতক্ষণ।
(২য় সং হয়েছে) —কর্ম' বিনা দেহযাত্রা অসাধ্য কৌন্তেয়। (এখানে বক্তব্যে অনেক জোর এসেছে।)

৪ অঃ ১২ নং শ্লোঃ— ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভ'বতি কর্ম'জা—
(১ম সং অনূদিত হয়) —'ইহলোকে সিদ্ধি লাভ হয় তার করম যেমন'
(২য় সং-এ হয়েছে) —'শীঘ্র লভে সিদ্ধি সেই হেথা তার রকম যেমন'
(এখানে আগের চেয়ে অনেক মূলানুসারী হয়েছে।)

৮ অঃ ২৩ নং (১ম সং-এ অনূদিত হয়) —মোক্ষ পদ লাভ কোন পথ দিয়া

গিয়ে যেথা যোগী আর না আসে ফিরিয়া

কখন বা হয় তার পুনরাগমন

কহিব তোমার পার্থ করহ শ্রবণ

(২য় সং-এর অনূদিত রূপ) —কোন ক্ষণে হলে মৃত্যু যোগীদের পুনর্জন্ম হয়

কোন ক্ষণে নাহি হয়, কহি তাহা শুনে ধনঞ্জয়

৯ অঃ ৪নং (১ম সং-এ ছিল) —অতীন্দ্রিয়রূপে আমি চরাচর ব্যাপ্ত ভরপুর

সর্বভূত আমাতে সংস্থিত আমি দূর হৈতে দূর।

২য় সং-এ এটি আট-দশ মাত্রায় অনেক সংহত অথচ মূলানুগ রূপে অনূদিত হয়েছে—

অব্যক্ত রূপেতে আমি বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত রহি।

সর্বভূত আমাতে সংস্থিত, আমি তাহে লিপ্ত নহি।

১০ অঃ ২৭ নং (১ম সং-এ ছিল) —গজেন্দ্রে ঐরাবত।

(২য় সং-এ হয়েছে) —গজরাজ ঐরাবত।

আক্ষরিক অনুবাদ

সত্যেন্দ্রনাথের পুরোপুরি আক্ষরিক অনুবাদের নিদর্শন নিম্নের শ্লোক-গুলিতে পাওয়া যায়।

২ অঃ ৫১ নং-এ —পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ এর অনুবাদ—সেই পায় পদ নিরাময়।

৩ অঃ ১২ নং —ইষ্টান ভোগান হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ— অনূদিত হয়েছে—'যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণ ইষ্টবস্তু দিবেন সবারে।'

১০ অঃ ৪ ও ৫ নং শ্লোকে সমস্ত শব্দগুলিকে রেখে সাজানো অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।
নির্মোহ, বিবেকবুদ্ধি, আত্মজ্ঞান, প্রভাব, প্রলয়, ক্ষমা, সত্য, শম, দম, সুখ-দুঃখ ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা তুষ্টি, যশ, অপযশ, তপোদান, জীবভাব প্রভৃতি মূলের একটি শব্দও বাদ পড়ে নি।

৪ অঃ ৫ ন শ্লোকের —ন ত্বং বেত্থ—অনূদিত হয়েছে—'সে সব না জান তুমি'।

৪ অঃ ৬নং „ —সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া „ „ —জন্মি নিজ মায়া বলে।

৪ অঃ ৭ ও ৮ নং শ্লো —যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি···রূপান্তরিত হয়েছে সুললিত আক্ষরিক ভাষায়—

যখনি ধর্মের গ্লানি
ভারত যে, হয় এ ভারতে
অধর্মের জয় যবে
আপনারে সৃজি বিধিমতে
সাধু পরিত্রাণ হেতু
করিবারে দুর্জন সংহার
ধর্ম সংস্থাপন তরে
যুগে যুগে ধরি অবতার।

৬ষ্ঠ অঃ ১৭ নং শ্লোঃ —'যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু'র অনুবাদ যেমন মূলানুগ তেমনি সুখপাঠ্য হয়েছে।—

নিত্য নিয়মিত যাঁর আহার বিহার
নিদ্রা জাগরণে যেই হয় মিতাচার
সর্ব কর্ম চেষ্টা যাঁর নিত্য নিয়মিত
দুঃখহারী যোগ তাঁর হয় সুনিশ্চিত।

১২ অঃ ৩১ নং শ্লো· —অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম—এর অনুবাদ করেছেন—'নাহি

দ্বেষ কোন জনে ;—মৈত্রঃ=বাঁধে সবে মৈত্রীগুণে, করুণ=সর্বজীবে সকরুণ প্রাণে' রূপে অনূদিত হয়েছে।

১২ অঃ ১৪ নং শ্লোকের—

সন্তুষ্ট সততং-এর	অনুবাদে	—সতত সন্তুষ্ট
যোগী -	"	—যতী
যতাত্মা -	"	—সংযতাত্মা
দৃঢ়নিশ্চয় —	"	—আমা পরে স্থির মতি
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি	"	—আমাতেই বুদ্ধি মন
স মে প্রিয়ঃ—	"	আমার সে প্রিয়'—ইত্যাদি

আক্ষরিক অনুবাদের নিদর্শন।

১৩ অঃ নং-এ —অনুমন্তা, সাক্ষী, ভর্তা, ভোক্তা মহেশ্বর, পরমাত্মা, ইত্যাদি প্রায় সবগুলি শব্দই অপরিবর্তিত রূপে গৃহীত হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব রীতি

২ অঃ ২৩ নং —নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি···শ্লোকের—'ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো' অনূদিত হয়েছে—'জলে ক্লিন্ন নহে কভু'। 'ক্লিন্ন' শব্দের যেমন অর্থের সমতা রয়েছে তেমনি ধ্বনিমাধুর্যও রক্ষিত হয়েছে।

২ অঃ ৩৮ নং —'যুদ্ধায় যুজ্যস্ব' শব্দের অনুবাদে—কটিবদ্ধ হও যদি রণে

৩য় অঃ ২নং —'বুদ্ধিং মোহয়সীব মে'এর অনুবাদে মোর বুদ্ধি কলুষিত ভাবানুবাদের নিদর্শন।

৪ অঃ ২১ নং —'ন আপ্নোতি কিল্বিষম'—হুবহু অনূদিত হয় নি। এর রূপান্তর নাহি হন দোষ ভাগী—ভাবানুবাদ হলেও মনোরম হয়েছে।

বিচ্যুতি

৯ অঃ ১২ নং-এ মোঘাশা মোঘকর্মাণো শ্লোকের মোহিনীং কথাটি অনূদিত হয় নি ; ৯ অঃ ৩১ নং শ্লোকের 'প্রতিজানীহি' হুবহ অনূদিত হয় নি ; ৮ অঃ ১২ নং-এ মূর্ধ্ন্যা ধ্যায়ত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম[১৩] এর অনুবাদে—

'মূর্ধ্নি'' অর্থাৎ 'ভ্রূযুগলের মধ্যে' স্পষ্ট উল্লেখ নেই। মূর্ধ্নি অর্থাৎ 'মূর্ধাদেশে'' এই অর্থে অনুবাদ করেছেন—'মস্তকে নিবেশি প্রাণ ধ্যানে নিমগন'।

মূল থেকে আক্ষরিক এই সামান্য বিচ্যুতি থাকলেও এতে ভাবের কোন অস্পষ্টতা ঘটে নি।

শ্রুতি-সুখকর অনুবাদ

৭ অঃ ৭ শ্লো. এ প্রোতং সূত্রে মণি-গণা ইব'র অনুবাদে—গাঁথা যথা সূত্রে মণিহার' সুললিত অনুবাদের নিদর্শন।

১০ অঃ ১১ নং-এর—'নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'র অনুবাদে 'উজ্জ্বল প্রকাশে নাশি অজ্ঞান আঁধার' মাধুর্য মণ্ডিত হয়েছে।

১৫ অঃ ১২ নং—যদাদিত্য গতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্'...

শ্লোকটির অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথের হাতে কাব্যগুণসম্পন্ন হয়েছে।

আমিই প্রথম তেজ
আদিত্য আমার তেজে প্রকাশে ভুবন
শশাংকে আমার জ্যোতি
আমারি ধরিয়া তেজ জ্বলে হুতাশন।

যথাযথ রসের স্ফুরণ

গীতার প্রথম অধ্যায়ে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের অভিব্যক্তিকে অনেকেই কাব্যগুণ সম্পন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত গীতার প্রথম অধ্যায়ে কোন তত্ত্ব নেই—দুপক্ষের ব্যূহরচনা, যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অর্জুনের বিষাদ দিয়েই সমাপ্ত হয়েছে। বিষাদগ্রস্ত বিমূঢ় অর্জুনের মনোভাব যে রকম করুণভাবে মূল গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে—সত্যেন্দ্রনাথও তা অনুবাদে প্রবিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন—

আত্মীয় স্বজন হেরি
হে মুরারি, যুদ্ধে সম্মিলিত
শুকায় আনন মম
সর্ব অংগ হয় রোমাঞ্চিত।

উপসংহার

এতক্ষণ পর্যন্ত—সত্যেন্দ্রনাথ-রচিত গীতার পদ্যানুবাদের দুইটি সংস্করণের রচনাকাল, অনুবাদের গোড়ায় গীতার প্রথম পদ্যানুবাদক বলে তাঁর ধারণা, গীতার ব্যাখ্যকার ও অনুবাদকের ভূমিকা—সমকালীন অন্যান্য পদ্যানুবাদক এবং এঁদের রচনারীতির সংগে সত্যেন্দ্রনাথের তুলনামূলক বিচার ও সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা সংক্ষেপে করা গেল।

অনুষ্টুপ ছন্দে গ্রথিত গীতার ভাষান্তরে সত্যেন্দ্রনাথ আক্ষরিক রীতিরই অনুবর্তন করেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ের সংগে যে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও টিপ্পনী দিয়েছেন—তাতে সহজ ভাবে তত্ত্বগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে গীতার যুক্তাহার বিহারস্য···শ্লোকের বাণী ছিল সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে ধ্রুবতারার মতো মিতাচারী সত্যেন্দ্রনাথ যে সর্বথা তা পালন করতেন তা পালন করতেন তা ইন্দিরা দেবীর কথায় জানা যায়।[১৭]

উদার ধর্মচেতনালব্ধ সত্যেন্দ্রনাথ গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১১ নং শ্লোকটির মর্ম যথার্থই গ্রহণ করেছিলেন। অনেক ভাষণেও তিনি এই সমন্বয়ী সুরের শ্লোকটিকে উদ্ধৃত করেছেন।—

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
> মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ। (৪ অঃ ১১ নং)

গীতার অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ যে নবীনচন্দ্র সেন ও কুমারনাথের অনুবাদের মধ্যপথ অবলম্বন করেছেন তা তিনি ভূমিকায় নিজের মুখেই বলেছেন।[১৮] তাঁর পূর্বসূরীদের অনুবাদ পাঠে তিনি যে উপকৃত হয়েছেন অকুণ্ঠ চিত্তে সে কৃতজ্ঞতাও নিবেদন করেছেন।

গীতা অনুবাদের উপক্রমণিকায় সত্যেন্দ্রনাথের গদ্য আলোচনা সম্পর্কে সামান্য একটু উল্লেখ না করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। সেজন্য সবশেষে এ সম্পর্কে একটু আভাস দেওয়া চলে।

উপক্রমণিকা

গীতার কালনির্ণয়, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন এই তিন বিষয় নিয়ে আলোচনা

করতে গিয়ে তিনি সবিনয়ে বলেছেন—"আমার যাহা বক্তব্য তাহা উপক্রমণিকায় যতদূর সাধ্য বলিয়াছি।"

গীতার কালনির্ণয় প্রসংগে উপক্রমণিকায় গীতার প্রণেতা ব্যাসদেব, গীতা ঈশ্বরপ্রণীত নয়, গীতা কঠ প্রভৃতি উপনিষদের পরবর্তী, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরাবতারের সময় নিরূপণ, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে বর্ণিত মহাভারতের তিনটি স্তর, অথর্বোপনিষদের সংগে গীতার উপদেশের সাদৃশ্য, গীতার সময় সাংখ্যশাস্ত্র সূত্রাকারে গঠিত, পাতঞ্জলদর্শনের যোগসাধন প্রণালী গীতার অন্তর্ভুক্ত, শ্রীকৃষ্ণের বেদান্তকৃৎ বলে উল্লেখ, সর্বধর্মসমন্বয় সাধন, বুদ্ধপ্রসংগ, সৃষ্টিপ্রকরণ, বর্ণাশ্রমের কর্মবিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে গীতার সংগে মানুষ সাদৃশ্য, ভূতোপাসনা, সাকারবাদ ইত্যাদি প্রসংগ সহজ ভাবে আলোচিত হয়েছে।

গীতার কাল নির্ণয় প্রসংগে কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলংগ-এর সংগে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ একমত হতে পারেন নি। তেলংগ মহাশয় তাঁর গীতা অনুবাদের ভূমিকায় গীতার জন্মকাল অন্ততঃ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী বলে অনুমান করেছেন।

এই অনুমানের আভ্যন্তরিক প্রমাণ সংগ্রহে তেলংগ মহাশয় গীতার ভাষা ছন্দ, রচনাপ্রণালী, দর্শন, বেদ, যজ্ঞ, বর্ণাশ্রমরক্ষণ ইত্যাদি আশ্রয় করেছেন। বাহ্যপ্রমাণ সংগ্রহে তেলংগ গীতাকে শংকরাচার্যের পূর্বে (অষ্টম শতাব্দীর আগে) কাদম্বরী প্রণেতা বাণভট্টের আগে (৭ম শতাব্দীর পূর্বে (৫ম শতাব্দী) রচিত হয়েছে বলে প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। এ পর্যন্ত তেলংগ যা বলেছেন সত্যেন্দ্রনাথও তা মানতে রাজী আছেন। তবে তেলংগ গীতাকে বেদান্তসূত্র অপেক্ষাও প্রাচীন বলেছেন, একথা সত্যেন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। তেলংগ মহাশয়ের যুক্তি—গীতা বেদান্তসূত্রের আগে রচিত; কারণ বেদান্ত সূত্রে যে স্মৃতির কথা আছে সে স্মৃতি গীতাই। এ বিষয়ে অন্যান্য যাঁরা তাঁর সংগে একমত হয়েছেন তেলংগ তাঁদের কথাও উল্লেখ করেছেন।[১৯]

সত্যেন্দ্রনাথের মতে গীতাকে বেদান্তসূত্রের থেকে প্রাচীন বলে ধরে নেওয়া যায় না। কারণ বাদরায়ণের 'বেদান্তসূত্রে' যে স্মৃতির উল্লেখ আছে, সেটা যে গীতাই এ সম্পর্কে পোষক প্রমাণ নেই। বাদরায়ণের বেদান্তসূত্রে গীতার নাম উল্লেখ নেই—বরং গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে যা বেদান্তসূত্রেরই

অপর নাম বলে পরিচিত। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের উক্তি উল্লেখ করেছেন—"গীতায় ব্রহ্মসূত্র স্থলে বেদান্তসূত্রই বুঝতে হবে।"

সত্যেন্দ্রনাথ আরও বলেন—বেদান্ত সূত্রে যে স্মৃতির প্রমাণ কথিত আছে, তা গীতা ছাড়া অন্য কোন স্মৃতি হতে পারে—স্মৃতির মূল যে শ্রুতি তার বচনও হতে পারে। সুতরাং তেলংগ মহাশয় যে সময়সীমা নিরূপণ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ এর চেয়ে আরও উত্তরকালীন সম্ভাব্য সময়ের পক্ষে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের মতে মহাভারতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের গঠনকাল মোটের উপর গীতার রচনাকাল হিসাবে ধরা যায়। নিজের সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত একথা সদম্ভে প্রকাশ না করে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয়ের সংগেই বলেছেন—"বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মধ্যবর্তী-খ্রীস্টাব্দ প্রবর্তনের কিছুকাল অগ্রপশ্চাৎ উহার জন্ম বলাই সংগত। যাহা হউক, এ সকলই অনুমানের উপর নির্ভর, আমি এ বিষয়ে কোন অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি এ কথা বলিতে সাহস করি না।"

দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব

সহজবোধ্য ভাষায় সত্যেন্দ্রনাথ পাঠকর কাছে গীতার দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। গীতার মধ্যে একদিকে যেমন 'নিষ্কাম কর্ম', ইন্দ্রিয়সংযম, সমদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি সমন্বিত উপদেশমালা' রয়েছে তেমনি সাংখ্যের সপ্তবিংশতি তত্ত্ব, প্রকৃতি পুরুষতত্ত্ব, ত্রৈগুণ্যবিচার, যোগের শম দম ধ্যান সমাধি, বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রভৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।'—গীতার সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতি অনেকের মতো সত্যেন্দ্রনাথও আকৃষ্ট হয়েছেন। আপাতবিরোধী তত্ত্বগুলি একটি নিগূঢ় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত তা দ্বিজেন্দ্রনাথের বক্তব্যেও প্রতিভাত।[২০] গীতার দর্শন প্রসংগে সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব মীমাংসা ও বেদান্তের সংগে গীতার সম্বন্ধ, গীতায় ব্রহ্মবাদ ইত্যাদি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সরল ও সুষ্ঠু আলোচনা করেছেন। ধর্মতত্ত্ব প্রসংগে—জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ কর্মযোগ, পরকাল ও মুক্তি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে নতুন কিছু পরিবেশিত না হলেও সংক্ষিপ্ত ও সরল আলোচনাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। Neil Alexander কৃত

'Gita and the Gospel' গ্রন্থ থেকে ইনি সহায়তা পেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' গ্রন্থ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

নবরত্নমালায় সঙ্কলন

একই ভাবের সাদৃশ্যযুক্ত শ্লোক গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়িয়ে রয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ ভাবের সমতা রেখে গীতার বিভিন্ন অধ্যায় থেকে শ্লোক চয়ন করে এক একটি বিশিষ্ট শিরোনাম দিয়ে নবরত্নমালা গ্রন্থে শ্লোকগুলো সাজিয়েছেন। যেমন—ভক্তবৎসল ভগবান, সর্বভূতান্তরাত্মা, প্রাণস্য প্রাণং, গীতার আদর্শজ্ঞানী, জ্ঞান-সাত্ত্বিক-রাজসিক, নির্লিপ্তভাবে কর্মানুষ্ঠান, ঈশ্বরোদ্দেশে কর্তব্যসাধন, ত্যাগতত্ত্ব, যোগী, অশ্বত্থরূপী সংসার, দৈবাসুর সম্পদ, যজ্ঞবিধান, আত্মা অমর, প্রকৃতি পুরুষ যোগ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, সত্ত্ব, রজ, তম, নিস্ত্রৈগুণ্য, গীতায় অবতারবাদ, বর্ণাশ্রমধর্ম, গীতার অসাম্প্রদায়িকতা, সাকার-নিরাকার উপাসনা, সৃষ্টি ও প্রলয়, কামনা দুর্দ্ধর্ষ অরি, আত্মসংযম, বিষয়সুখ, মিথ্যাচারী ইত্যাদি। গীতার কোন একটি বিষয়সম্পর্কে পুরোপুরি জানার পক্ষে এ গ্রন্থনা বিশেষ উপযোগী হয়েছে।

সে যুগে ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে গীতা চর্চায় যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল তার পরিচয় আমরা পেয়েছি।

লোকহিতের জন্যই সহজ করে গীতার বাণী প্রচারে সত্যেন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়েছিলেন। তাঁর অনুবাদে মূল 'সংস্কৃতের রস সৌন্দর্য ও গরিমার অপচয় ও ব্যতিক্রম না ঘটে' অথচ 'বঙ্গভাষার প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্য ও লালিত্য রক্ষিত হয়' সেদিকে যে তিনি বিশেষ যত্নশীল হয়েছিলেন তা নিজের মুখেই ভূমিকায় বলেছেন। অব্যাপ্তি ও ক্লিষ্ট প্রয়োগ তাঁর অনুবাদে প্রায় নেই বললেই চলে।

'আমাদের কুটিরে বিনা তৈলে'[২১] প্রজ্বলিত ভগবদ্গীতার অনির্বাণ দীপশিখার স্নিগ্ধ আলোক ছটায় দেশ বিদেশের বহু মনীষীই আকৃষ্ট হয়েছেন। গীতা সম্পর্কে অনেক সারগর্ভ আলোচনা হয়েছে, নানা মতভেদও আছে। সে সম্পর্কে সচেতন থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ সবিনয়ে ১ম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন—"যদি আমার এই অনুবাদের কোন অংশে দোষ বা ত্রুটি হইয়া

থাকে, যদি ব্যাখ্যায় ভুল বা অসম্পূর্ণতা থাকে, পাঠকগণ ঔদার্য্য ও ক্ষমাগুণে দোষ মার্জ্জনা করিবেন।"

পরবর্তীকালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় তিনি অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার প্রয়াস নিয়েছেন। সুতরাং তৎকালীন গীতার পদ্যানুবাদের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের উল্লেখ্য অবদান অনস্বীকার্য।

১. প্রকাশকের নিবেদন—

প্রায় একবৎসর কাল পূজনীয় পিতৃদেবের সহিত তাঁহার দুই গ্রন্থ বৌদ্ধধর্ম এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ পুনর্মুদ্রণ কল্পে সংশোধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন, তারপর নিষ্ঠুর কালের আর সবুর সইল না। যে কাজ তাঁহার শেষ জীবনের ধ্যান জ্ঞান ছিল, তাহা আজ সমাপ্ত হইল বলিয়া তিনি যে লোকে যেখানেই থাকুন না কেন, আনন্দের কোন স্পন্দন কি সেখানে পেঁাছিবে না?

বালিগঞ্জ নববর্ষ ১৩৩০ শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

২. 'প্রথম যখন আমি এই অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন যে গীতার অন্যতর বাংগলা পদ্যানুবাদ আছে জানিতাম না। নাই বলিয়াই আমার ধারণা ছিল। পরে কয়েক খানি পদ্যানুবাদ আমার হস্তগত হয়, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি ভাবার্থ অনুবাদ, অন্যগুলি শব্দার্থ অনুবাদ। নবীনবাবুর অনুবাদ শব্দ ছন্দ সর্বপ্রকারে এত মূল সংস্কৃত ঘেঁসা যে স্থানে স্থানে তাহার অর্থবোধ দুরূহ হইয়া পড়ে। কুমারনাথের অনুবাদ সরল বাঙলায় অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে কিন্তু তাহাতে মূল সংস্কৃতের ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্যের অভাব বোধ হয়। এই সমস্ত পদ্যানুবাদ দেখিয়া আমার মনে হয়, আর একটী নূতন অনুবাদের স্থান এখনো সম্পূর্ণ

অধিকৃত হয় নাই। —শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পদ্যানুবাদ : বিজ্ঞাপন ; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১ম সংস্করণ।

৩. 'জার্মান মনীষী উইলিয়াম ভন হ্যামবোল্ট বলিয়াছেন— "গীতার মত সুললিত সত্য এবং সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ পদ্যগ্রন্থ সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নাই।" ' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। ভূমিকা ; নবম সংস্করণ ; পৃ. ১৩।

৪. 'গীতার ন্যায় এমন কঠিন এমন দুর্বোধ্য গ্রন্থ বুঝি আর নাই। ইহার ক্ষুদ্রআয়তন মধ্যে একাধারে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব, সমুদায় দার্শনিক তত্ত্ব, সমুদায় উপনিষদের সারতত্ত্ব সংক্ষেপে প্রায়ই সূত্রাকারে কি বৃত্তিরূপে গ্রথিত হইয়াছে। ...যাহারা গীতার কোন ভাষ্য বা ব্যাখ্যা না পড়িয়া নিজের জ্ঞানবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া গীতার অর্থ বুঝিতে চাহেন—তাঁহারা ত পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হন।' গীতার পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা : দেবেন্দ্রবিজয় বসু।

৫. The various commentaries on the *Gita* were written by the teachers in support of their own traditions (*Sampradays*) are in refutation of those of others. *The Bhagavadgita* : Dr. S. Radhakrisnan. Introductory Essay. p. 16

৬. চারুচন্দ্র বসু রচিত ধর্ম্মপদের অনুবাদ প্রসঙ্গে ব্যক্ত। দ্র. প্রাচীন-সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ।

৭. 'গীতা পাঠ করিয়া আমি যেন এক নূতন জীবন লাভ করিলাম এবং স্ত্রীকে পড়াইবার জন্য উহার বাংগালা অনুবাদ করিলাম। (১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে কানপুরে মহেন্দ্রনাথ গাংগুলির গৃহে আতিথ্য ও গীতা ব্যাখ্যার উল্লেখ আছে, তখনই তাঁর গীতার অনুবাদ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে।) বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত নবীন-চন্দ্র রচনাবলী : আমারজীবন (৪র্থ ভাগের প্রথমাংশ-পৃ ৪৯১)

৮. 'নবীনচন্দ্রের সানুবাদ গীতা পাওয়ার কিছুদিন পরে আমি তাহাকে যাহা লিখিয়াছিলাম নবীনচন্দ্র তাহাই সার্টিফিকেটের মত এই খণ্ডে উদ্ধৃত করিয়াছেন—"দাদা অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিলেন—তোমার গীতা তোমার বউ ঠাকুরাণীর কাছে তোমাপেক্ষাও আদরের হইয়াছে।

…গীতার প্রচার দিন দিন বাড়িতেছে ; তুমি অর্ধমূল্য করিয়া দিলে তোমার গীতারই ভূয় প্রচার হয়।" আমার জীবন ৪র্থ ভাগের সমালোচনা : অক্ষয়চন্দ্র সরকার। (ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটী কর্তৃক সম্পাদিত—নবীন-রচনাবলী ২য় খণ্ডে প্রকাশিত ; পৃ. ৫৭৭)।

৯.

শ্রীকৃষ্ণ কহেন পার্থ। এ যোগ অব্যয়
আদিত্য নিকটে পূর্বে অভিহিত হয়
মম মুখ হ'তে ইহা শুনি বিবস্বান
সন্তান মনুকে তিনি আপনি শুনান

মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনুবাদ ; পৃ. ৪৪।

প্রথমে এ যোগতত্ত্ব আদিত্যে শিখাই বিধিমতে
আদিত্য হইতে মনু, মনু পরে কহেন স্বসুতে

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ ; —১ম সং।

অব্যয় ও যোগতত্ত্ব শিখাইনু আদিত্য প্রবরে
আদিত্য হইতে মনু, মনু কহিলেন বংশধরে

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ—২য় সং।

১০.

স্বধর্ম্মেরো পানে চাহি ভীতি কর পরিহার
ধর্ম্ম যুদ্ধ হ'তে শ্রেয় ক্ষত্রিয়ের নাহি আর

নবীনচন্দ্রের অনুবাদ (২ অ. ৩১ শ্লোক)।

স্বধর্ম্মে বাঁধিয়া লক্ষ্য ধর হে সাহস
ধর্ম্মযুদ্ধ হতে কি সে ক্ষত্রিয়ের যশ

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ —১ম সং।

হও যে নির্ভয় চাহি স্বধর্ম্মের পানে
ধর্ম্ম হতে শ্রেয় ক্ষত্রিয় কি জানে ?

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ—২য় সং।

১১.

মায়ামুগ্ধ অর্জ্জুনের সজল নয়ন
স্বজন নিধন ভাবি বিষাদিত মন
নিরখিয়া নারায়ণ প্রবোধ বচনে
বুঝাইয়া বলিলেন কুন্তীর নন্দনে

নিন্দনীয়, ধর্ম্মহীন আর্য্য অনুচিত
হে মোহ, বিপদে হেন কেমনে উদিত ?
কাতরতা কেন ? এ ত তব যোগ্য নয়
তুচ্ছ দুর্ব্বলতা ত্যজি উঠ ধনঞ্জয় ।

কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়—২য় সং ।

হেরি ও করুণ মূর্তি, অশ্রুপূর্ণ আকুল লোচন
বিষণ্ণ অর্জ্জুনে তবে কহিলেন শ্রীমধুসূদন
কোথা হতে এ সংকটে
এল তব এই মোহ জ্বর
আর্য্য অনুচিত যাহা
কীর্তিহর, স্বর্গ বিঘ্নকর ।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ

১২. ভকতি সহিত জল পত্র পুষ্প কিম্বা ফল
যিনি যাহা করেন অর্পণ
কামনা বিহীন হয়ে সেই উপহার চয়ে
প্রীতি সহ করি হে গ্রহণ ।

রাধেশচন্দ্র শেঠের অনুবাদ—৯ অ. ২৬ শ্লোক

ভক্তি সহ যে যা দেয়
পত্র পুষ্প ফল জল আর
লই আমি সুসম্পন্ন
ভক্ত দত্ত সব উপহার ।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ

১৩. শৈবলিনী দেবীর গীতিকাব্য দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৬৫ বংগাব্দে প্রকাশিত । খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত অভিমতের তারিখ-চৈত্র ১৩৬৪ । গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয় ।

১৪. হও মমগতচিত্ত আমার প্রসাদে পার্থ ।
সংসারের মোহদুর্গ কর অতিক্রম

যদি অহংকারবশে অবহেলা কর মোরে
নিশ্চয় বিনষ্ট তুমি হবে অরিন্দম।

শৈবলিনী দেবী ১৮ অ. ৫৮ শ্লোক

আমাতে রাখিলে চিত্ত প্রসাদে আমার
এ ঘোর সংসার দুর্গ সুখে হবে পার ;
করিলে অনাস্থা ইথে ধরি অহংকার
অবশ্য হইবে তাহে বিনাশ তোমার

সত্যেন্দ্রনাথের ১ম সংস্করণের অনুবাদ

আমাতে রাখিলে চিত্ত প্রসাদে আমার
সংসার দুর্গতি ঘোর সুখে হবে পার
অহংকার বলে যদি নাহি শোন কথা
বিনষ্ট হইবে তাহে নাহিক অন্যথা।

সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সংস্করণের অনুবাদ

১৫. অশ্রু সমাকুল আকুল লোচন
করুণা মগন বিষাদিত মন
অর্জুন সদন শ্রীমধুসূদন
এরূপে তখন বলিলা বচন

শরদিন্দু মিত্রের অনুবাদ।

শরদিন্দু মিত্র। জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্যাটালগে মিত্র রূপে নির্দেশিত। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে কোন উপাধি দেওয়া নেই। শুধু শরদিন্দু লিখিত।

১৬. স্বামী জগদীশ্বরানন্দের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (নবম সং) পৃ. ১৯১। টীকায় প্রাপ্ত।

১৭. 'বস্তুতঃ বাবার সব বিষয় একটা মাত্রাজ্ঞান ছিল। কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি ছিল না। তাঁর প্রিয় গীতার উপদেশ—যুক্তাহারবিহার তিনি সর্বদা মেনে চলতেন।' সত্যেন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। বিশ্বভারতী পত্রিকা—শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২।

১৮. 'এ অনুবাদে আমি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছি।'

১৯. 'The next piece of external evidence is furnished by the

vedanta-sutras of Badarayana. In several of those *sutras*, reference are made to certain *Smrities* as authorities for the propositions laid down. The commentators Sankaracharya, Ramanuja, Madhva and Vallaba are unanimous in understanding the passage in Gita, Chaper XV stanza 7 (p. 112) to be the one there referred to by the words of the *Sutra*, which are, 'And it is said in a *Smriti*.

The Bhagavadgita : translated by Kasinath Trimbak Telang : Edited by F. Maxmuler in the Sacred Books of the East-vol. VIII, Second Edition 1908.

২০. 'আমি কপিলদর্শনকে বলিতেছি সাংখ্যের উপক্রমণিকা বা বীজ; যোগশাস্ত্রকে বলিতেছি সাংখ্যের উপসংহার বা ফল।' গীতাপাঠ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ. ১৪।

২১. দ্র. গীতাপাঠ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূমিকা।

তুকারামের জীবনী ও অভঙ্গমালার অনুবাদ

উপযুক্ত পরিবেশ রচনার আগ্রহ

মহারাষ্ট্র জনপদে দীর্ঘদিন থাকার ফলে সত্যেন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রের জাতীয় কবি সাধক তুকারামের জীবনী অন্বেষণে ও তাঁর মারাঠী অভংগমালার বংগানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

মহারাষ্ট্রে দীনের কুটীর থেকে রাজার প্রসাদ পর্যন্ত তুকারামের অভংগ গীত হয়ে থাকে। 'ব্রাহ্মণ-শূদ্র কথক শ্রাবক সকলেরই তা হৃদয়গ্রাহী'।[১] মাসের মধ্যে কয়েকবার নিয়মিতভাবে তুকারামের অভংগ আবৃত্তি সিন্দে হোলকরদেরও বংশের রীতি। আষাঢ় ও কার্তিকের পূর্ণিমায় পণ্ঢরপুর তীর্থ মেলায় যেতে বিশেষ ভক্ত 'বারকরী'[২] পদযাত্রীরা ধ্বজা উড়িয়ে বর্ষে সমস্বরে তুকারামের অভংগ গেয়েই পথ চলেন। ভীমা নদীর তীরে পণ্ঢরপুর তীর্থেই বিটবিহারী বিঠ্ঠলদেব বা 'বিঠোবা'র[৩] মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

বারকরীদের কণ্ঠে নিষ্ঠার সংগে তুকারামের অভংগগীত শুনে সত্যেন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রে এই সাধক কবির জনপ্রিয়তার পরিচয় পেয়েছেন। পশ্চিমবংগে চৈত্র সংক্রান্তির সময় তারকেশ্বরগামী তীর্থযাত্রীদের সংগে এদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। পুণার কাছেই তুকারামের জন্মভূমি দেহুতে যাবার সুযোগও তাঁর হয়েছে। 'দেহু'তে ইন্দ্রায়ণী নদীতীরে তুকারামের স্মৃতি লিপ্ত বিঠ্ঠলজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে—তুকারামেরই বংশের পূর্বপুরুষ বিশ্বম্ভর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ইন্দ্রায়ণী নদীতীরে ছোট মন্দির গড়ে বিঠ্ঠলজী ও রুকুমাই (রুক্মিণী) দেবীর এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাষ্ট্রে থাকার ফলেই মহারাষ্ট্রের সাধকদের সম্পর্কে বিশেষত তুকারাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ সত্যেন্দ্রনাথের মনে জাগে। এই ঔৎসুক্য নিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ বিভিন্ন গ্রন্থের অনুসন্ধান করেছেন ও বিভিন্ন স্থানে তথ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থের আলোকে তুকারামের নিজের কথা দিয়েই তাঁর জীবন ও ধর্মমতের পরিচয় উদ্ঘাটন করতে সত্যেন্দ্রনাথ বেশি চেষ্টিত হয়েছেন। এ বিষয়ে মারাঠি ভাষায় সত্যেন্দ্রনাথের দক্ষতা তাঁর কাজের পূর্ণ সহায়ক হয়েছে।

তুকারামের জীবন—সহনশীলতার প্রতিচ্ছবি। এই মহান জীবনের কথা ও তাঁর অভংগমালার সরল মহিমা শুধু নিজে উপলব্ধি করেই সত্যেন্দ্রনাথের তৃপ্তি হয় নি। অনুবাদের মাধ্যমে তা অন্যদের কাছে পরিবেশনের জন্যও তাঁর হৃদয়ে গভীর আকুলতা জেগেছে।

প্রকাশকাল

'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৫ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের রচিত তুকারামের জীবনী ও কবিতায় অভংগমালা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৯৫ সালে বোম্বাইচিত্র গ্রন্থের প্রথমেই তা পুনর্মুদ্রিত হয়। অবসরজীবনে ১৯০১এ সত্যেন্দ্রনাথ তুকারাম সম্পর্কে একটি ইংরেজিতে ভাষণ দেবার জন্য প্রস্তুত হন। ঐ সময় অভংগগুলির কিছু ইংরেজি অনুবাদও করেন। ভাষণটির 'টাইপস্ক্রিপ্ট' বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত।

১৩১৪ সালে (১৯০৭ খ্রী) নবরত্নমালা প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সময় বোম্বাই চিত্র থেকে সামান্য কাট-ছাঁট করে 'তুকারামের জীবনী ও অভংগ-মালা'ও সংযোজিত হয়। নবরত্নমালা দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩১৩।১৯২৫ খ্রী) প্রকাশের সময়ও এটি যথাস্থানে রক্ষিত হয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে সর্বমোট পাঁচ বার তুকারামের জীবনী ও অভংগমালা বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্বসূরীদের রচনা থেকে উপকরণ সংগ্রহ

তুকারামের জীবনবৃত্তান্ত অনুসরণে সকলেই মহারাষ্ট্রীয় কবি মহীপতিকৃত 'ভক্তলীলামৃত'-গ্রন্থের আশ্রয় করেছেন। তবে মহীপতির রচনায় যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না, একথা সত্যেন্দ্রনাথের মতো আরও অনেকেই মন্তব্য করেছেন।[৪]

খ্যাতনামা ডাক্তার মারে মিচেল (Dr. Mitchell) ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইএর এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে তুকারামের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন।

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে কর্টনাইটলি রিভিয়্যুতে স্যার আলেক্‌জাণ্ডার গ্রাণ্ট-এর

অনূদিত তুকারামের কয়েকটি অভঙ্গ প্রকাশিত হয়। তুকারাম সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের ইংরেজি ভাষণের ভূমিকায় স্যার আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট বার্ট এর রচনার স্বীকৃতি রয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি তুকারামের ভূমিকায় বিশেষ করে স্বর্গত জনার্দন সখারাম গ্যাডগিল এর ঋণ স্বীকার করেছেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত উপকরণগুলি পদ্যাকারে ছোট করে সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে।[৫]

উত্তরসূরীদের প্রেরণা লাভ

সত্যেন্দ্রনাথের লেখা পড়ে তুকারামের জীবন কথা বিরচনে ও কতিপয় অভঙ্গমালার অনুবাদে দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখেরা উৎসাহিত হন। সত্যেন্দ্রনাথের লেখা থেকেই যে যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রথম প্রেরণালাভ করেছিলেন তা তাঁর 'তুকারাম-চরিত' এর ভূমিকায় উল্লিখিত।[৬] দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ইনি প্রায় বারো বছর দক্ষিণ অঞ্চলে ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সত্যেন্দ্রনাথকে দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধ উৎসাহের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পাঠ করতে দেখা গেছে।[৭] ১৩০৩ সালে দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাধু তুকারামের জীবনচরিত' প্রকাশিত হয়। ১২৯২ সালে ইনিও তুকারামের জন্মভূমি থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তুকারামের জন্মসাল সম্পর্কে যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন—'তুকারামের জন্মবৎসর কোন স্থলেই স্পষ্টাক্ষরে নিরূপিত হয় নাই'। (তুকারাম চরিত, পৃ. ৪, পাদটীকা)

এক্ষেত্রে মহীপতির ভক্তলীলামৃত গ্রন্থের বিবরণ আশ্রয় করেই যোগীন্দ্রনাথ বসু '১৫২৯।৩০ শকাব্দ' (১৬০৭।১৬০৮ খ্রীস্টাব্দ) তুকারামের জন্মবর্ষ বলে নির্ধারণ করেছেন। দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৫৩০ শকাব্দে (১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে) তুকারামের জন্মসাল বলে উল্লেখ করেছেন। (সাধু তুকারামের জীবন চরিত পৃ. ৩)। রামগোপাল সান্যাল তাঁর 'Great men of India' গ্রন্থে পণ্ডিত বিষ্ণুরাম পরশুরাম শাস্ত্রীর অনুসরণে প্রায় ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দকেই তুকারামের জন্মসাল বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] সাম্প্রতিক কালে কোন কোন গ্রন্থে এর ব্যতিক্রমও চোখে পড়ে।[৯] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'তুকারামের অভঙ্গ প্রবন্ধে তুকারামকে শুধু শিবাজীর আমলের লোক বলেছেন।' সত্যেন্দ্রনাথের লিখিত

তুকারামের বাংলা-ইংরেজি দুই রচনার প্রথমেই শিবাজীর যময়ের উল্লেখ আছে। তবে বোম্বাই চিত্রে তুকারামের জন্মসাল ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ[10] উল্লিখিত হলেও পরবর্তী ইংরেজি রচনায় সময় ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দই তাঁর প্রকৃত জন্মসাল বলে নির্দেশ করেছেন।[11] সুতরাং সমস্যা ও মতভেদ থাকলেও ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের পক্ষেই অধিক সংখ্যক ব্যক্তি অভিমত দিয়েছেন।

প্রকাশিত অভঙ্গ

বোম্বাইচিত্র গ্রন্থে সর্বমোট ৬২ টি অভংগ প্রকাশিত হয়। অভংগ কথার অর্থ যে ভংগ নয় অর্থাৎ যা একটানা চলে তা দীর্ঘ অনুবাদগুলিকে দেখেই বোঝা যায় 'ভারতী' পত্রিকায়ও মোট ৬২টি অভংগই চোখে পড়ে। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সামান্য। ভারতীতে যেখানে অনুবাদগুলি একসাথে গ্রথিত হয়েছে—বোম্বাইচিত্রে সেখানে পৃথক করা হয়েছে—আবার বোম্বাই চিত্রে যেখানে একসাথে গ্রথিত হয়েছে ভারতীতে সেগুলি পৃথক করা হয়েছে। নীচের তালিকা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

বোম্বাইচিত্র গ্রন্থে পর পর প্রকাশিত অভংগের তালিকা ও ভারতীর সংগে পার্থক্য : সংখ্যা অনুল্লিখিত স্থানে কবিতার ১ম চরণ উদ্ধৃতি হলো।

১৩৩০-১৩৩১, ৫৬৬-৫৭২, ৩৭১, ১৩২১, ৩৫৫-৩৫৭, কি করি কোথা যাব, ২২৪২-২২৪৮ ১৭৫১, ১৮৮৪-১৮৯০, স্ত্রীলিংগ চাহি না (ভারতীতে এটি ৫২৩ নং) ৫২৪, ২৩১৫, ২৮৮২, ২৪৬০, ১৫৯০ (বিদায়—১-৫ (নম্রতা ও ভক্তি বিষয়ে)-১ ২, কথা অতি মিষ্ট, কি ফল পুজিয়ে বল, সন্তানে মায়ের হাতে, নিজ হতে বাক্য, লইনু সর্বতোভাবে, ওহে পতিত পাবন, এই বরদান মাগি, পতিত যে পাপী, (পৌত্তলিকতা ও ভক্তের লক্ষণ)—স্থানেতে আবদ্ধ করে, খণ্ডোবার ভিক্ষুক, সেই জন ভক্ত, (অনিত্যতা বিষয়ে—কোন জন দেখ জল বোয়ে মরে, (ধর্মনীতি বিষয়ে)—সেই পাপ মনে যদি, সন্তপ্ত পীড়িত জনে, সদুপায়ে ধনরাশি, সংসারের ধারি না ধারে, কৃপাময় যিনি, সবাই বলে গো দেব।

ভারতী	বোম্বাই চিত্রে
(ক) ৩৭১ ও ১৩২০নং পৃথক্	: একসাথে গ্রথিত
(খ) লইনু সর্বতোভাবে তোমার শরণ ওহে পতিত পাবন একসাথে গ্রথিত	: ঐ পৃথক্
(গ) পতিত যে পাপী ও এই দেব···পৃথক্	: ঐ একত্রে গ্রথিত
(ঘ) সদুপায়ে ধনরাশি, সংসারের ধারি না ধার—একসাথে গ্রথিত	: ঐ পৃথক্

তুকারামের অভঙ্গমালায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ

১২৮৫ সালে (১৮৭৮ খ্রী.) সত্যেন্দ্রনাথের তুকারামের জীবনী ও অভংগ-মালার অনুবাদ যখন ভারতীতে প্রকাশিত হয়, সে সময় রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রার পূর্বে আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন। (দ্র. এই গবেষণার জীবন কথা-১ম পর্ব-প্রথম ফার্লো)। ঐ সময় তুকারামের অভংগমালার কয়েকটি অনুবাদ যে রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন—তার প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। 'নবরত্নমালায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা' প্রবন্ধে শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সাতটি অভংগ রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ বলে নির্দেশ করেছেন।[১২]

ঐ প্রবন্ধে তিনি আরও বলেছেন—'আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার পুস্তক কবি নিজে তাঁহার কৃত অনুবাদগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন।' এই সাতটি নবরত্নমালা ১ম সংস্করণে প্রকাশিত ৫৬৬ থেকে ৫৭২ নং অভংগের অনুবাদ।

আমেদাবাদে বাসকালে কিশোর রবীন্দ্রনাথের লিখিত মালতী পুঁথির পাণ্ডুলিপিতেও এই সাতটি অনুবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সাতটি ছাড়া আরও আটটি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরেই মালতী পুঁথিতে দেখা গেছে।[১৩] পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত রূপান্তর গ্রন্থের পরিচয়েও (পৃ. ২১৮) এর উল্লেখ আছে।

পাঠভেদ

প্রকাশিত অভঙ্গগুলির সঙ্গে মালতী পুঁথির পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত অনুবাদ-গুলির কিছু কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা গেল।

	মালতী পুঁথির পাণ্ডুলিপিতে	প্রকাশিত অভঙ্গে
৫৬৬	: আমারি বেলায় উনি সংসারে বিরাগী (ভারতী বৈশাখ ১২৮৫ পৃ. ২৫ এই রূপেই মুদ্রিত।)	: আমারি বেলায় উনি যোগী (বোম্বাই চিত্র, নবরত্নমালা)
ঐ		
৪র্থ চরণ :	কত জ্বালা সহি বল আর	: আপদ সহিব কত আর।
ঐ		
৫ম চরণ :	ক্ষুধা ক্ষুধা কোরে রাতদিন	: অন্ন অন্ন কোরে রাতদিন
৫৬৭ নং		
৩য় চরণ :	কত জ্বালা সব আর	: কত দুঃখ সব আর।
৫২৯নং		
৭ম চ. :	তুকা বলে ধৈর্য্য ধর।	: তুকা বলে ধৈর্য্য ধর মনে
ঐ ৭ম চ. :	এখনি সকল ফুরায় নাই।	: এখনো সকল ফুরায় নাই।
৫৭০-৩য় চ :	বোকে বোকে দিনু এলে	: বোকে বোকে দিন্যু এলে। (বোম্বাইচিত্র, পৃ. ১০)
৫৭১-৪র্থ চ. :	খরতাল বাজাইত	: করতাল বাজাইতে
৫৭২-২য় চ. :	পৃথিবী মিলেছে মোর সাথে (ভারতী বৈ. ১২৮৫ পৃ. ২২ এই রূপেই মুদ্রিত)	: ব্রহ্মাণ্ড মিলেছে মোর সাথে
৩য় চ.	: দু চারিটা ভাল বাক্যে তাতে কি বা ক্ষতি বৃদ্ধি আছে। (ভারতী ঐ এই রূপেই মুদ্রিত)	: ভাল মুখে দু চারিটা কথা না জানি তাহে কি ক্ষতি আছে। (বোম্বাইচিত্র পৃ. ১১)
৩৭১নং ১ম চ. :	শুন দেব এ মনের বাসনা নিশ্চয় জীবনো সঁপিতে আমি নাহি	: শুন দেব, মনে যাহা করেছি নিশ্চয় জীবন সঁপিনু পদে

মালতী পুঁথির পাণ্ডুলিপিতে	প্রকাশিত অভঙ্গে
করি ভয়	হইয়ে নির্ভয়। (ভারতী ১২৮৫ বৈ পৃ. ২৭ বোম্বাই চিত্র পৃ. ১৪ এইরূপে মুদ্রিত)

১৩২০নং

৩য় চ.	: ছন্দ কহি দিলা মোরে আদেশিলা কিছু / বিঠলোকে লক্ষ্য কোরো লিখিবে যা কিছু	: ছন্দ কহি দিলা মোরে গম্ভীর/সে বাণী বিঠ্ঠলজী নিজ হস্তে ধরেন লেখনী (ভারতী পৃ. ২৮, বোম্বাই চিত্র পৃ. ১৫ এইরূপে মুদ্রিত।)
১৩২১	: নামদেবে মোর কাছে পাঠালে স্বপনে (ভারতী ১২৮৫ বৈশাখ পৃ. এইরূপে মুদ্রিত)	: নামদেবে তুকা কাছে পাঠালে স্বপনে
	এই অনুগ্রহ তব গাঁথা রোল মনে (ভারতী ঐ মুদ্রিত)	: তোমার প্রসাদ এই গাঁথা র'ল মনে। (বোম্বাইচিত্র পৃ. ১৫।)
তুকারামের বিদায় বিষয়ক	: (দাও) গো বিদায়	: প্রায় অপরিবর্তিত
	বাহিরে ও ঘরে মোর আছে যারা যারা	: "
	ধারায (পাণ্ডরী) আছে	: বিদায় ৪নং 'শঙ্খচক্র ধরি করে' স্তবকে অন্তর্ভুক্ত
	বন্ধুগণ শুন রামনাম কর সবে	: বিদায় ৪নং—'শঙ্খ চক্র ধরি করে, স্তবকের শেষাংশে গৃহীত।
	তুকার পরীক্ষা শেষ হয় তিন লোক লাগিল বিস্ময়	: তুকার পরীক্ষা হইল শেষ বিস্ময়ে পূরিল সকল দেশ।

এই অনুবাদগুলিতে মারাঠী অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথের সহায়তার কথা বিজনবিহারী ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন।[১৪] অভংগগুলির বাংলা অনুবাদের সময় তার ইংরেজি অনুবাদগুলিও রবীন্দ্রনাথের সামনে এনে ধরে দেওয়া সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে খুবই সম্ভব।[১৫] পাশাপাশি দুটো ভাষা রাখলে অনুবাদ করা যেমন সহজ হয় তেমনি ইংরেজিতে ভাল অনুবাদ পেলে তা সরাসরি ভাষান্তরেও মূলের মহিমা রক্ষা করা চলে।

আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট বার্ট এর রচিত তুকারামের বিদায় বিষয়ক Farewell কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের নিশ্চয় ভালো লেগেছিলো। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর তুকারামের ইংরেজি রচনার সময় এবিষয়ে নিজে পৃথক্ অনুবাদ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাঁর রচনায় ঐ কবিতাটিকেই উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং এই কবিতাটির সংগে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন তা ধারণা করা যায়। তবে বিদায় বিষয়ক বাংলা অনুবাদটি যে কিছুমাত্র বিশ্লিষ্ট হয় নি, তা farewell কবিতার সংগে তুলনা করলেই বোঝা যায়। বাংলা অনুবাদের— 'বাহিরে ও ঘরে মোর আছ যারা' স্তবকটির ভাব farewell—কবিতার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবক জুড়ে বিবৃত হয়েছে।

তুকারামের জীবনী প্রসঙ্গে

বোম্বাইচিত্র গ্রন্থে তিনটি পরিচ্ছেদে সত্যেন্দ্রনাথ তুকারামের জীবনী ও অভংগমালা পরিবেশন করেছেন। গদ্যাকারে জীবনীকার সংগে স্থানে পদ্যে অনূদিত অভংগগুলি প্রবিষ্ট হয়েছে।

তাঁর গদ্যে লেখা জীবনী অংশ ও অনূদিত অভংগগুলি তৎকালীন দিনে সকলের কাছে আদৃত হয়েছিলো। সত্যেন্দ্রনাথের লেখা থেকে তুকারামের জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাঠকের মনে জাগ্রত হয়।

লোকমুখে প্রচারিত অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন সাধক তুকারামের চেয়েও নিরাসক্ত মহামানব তুকারামের প্রতিই সত্যেন্দ্রনাথ বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন।

একজন মহাপুরুষের জীবনকথা বিরচনে উপযুক্ত তথ্য পাওয়া যে দুষ্কর এ সম্পর্কে তিনি তুকারাম সম্পর্কে তাঁর ইংরেজি ভাষণের প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছেন।[১৬] কিংবদন্তীগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন ও তাঁর বক্তব্যের প্রামাণিকতা প্রতিপাদনেও সচেষ্ট হয়েছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ—তুকারামের জন্মভূমি (দেহু) ও জন্মসাল, তাঁরা পুরুষানুক্রমে পণ্ডরপুরের বিঠ্‌ঠলজীর ভক্ত, পিতা বহেলাজী ও মাতা কণকাই-এর মধ্যমপুত্র, 'জাতিতে শূদ্র, ব্যবসায়ে বণিক্‌', দুই পত্নী রখুমাই ও জিজাই-এর মধ্যে জিজাই কর্কশস্বভাবা[১৭], দুর্ভিক্ষের দিনে প্রথমা পত্নী রখুমাই ও পুত্রে সন্তুর মৃত্যু, ব্যবসায়ে লোকসান, সংসারে বৈরাগ্য ও দেহুর বিঠোবা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ, ভাণ্ডার পাহাড়ে নির্জন তপস্যা তুকারামের জীবনের পূর্বার্ধ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর আত্মপরিচয় জ্ঞাপক (১৩৩৩নং) অভঙ্গটিও এই প্রসঙ্গে সরল অনুবাদের মাধ্যমে সত্যেন্দ্রনাথ পরিবেশন করেছেন। সংসার থেকে দূরে—ভজনপূজনে অতিবাহিত করায় জিজাই-এর ধিক্কার ও মনোবেদনা, ক্ষেতপাহারার কাজে অর্থাগম ও দেহুর বিঠোবা মন্দিরের সংস্কার সাধন, স্বপ্নে মন্ত্রপ্রাপ্তি, সকল সংশয়ের মুক্তি ও অভঙ্গ রচনার প্রথম আকুলতা দিয়েই প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে।

তুকারামের নামদেবের অবতাররূপে প্রচলিত বিশ্বাস, মহীপতির 'ভক্তলীলামৃত' গ্রন্থের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের মতানৈক্য,[১৮] কথকতায় তুকারামের জনপ্রিয়তা, মম্বাজীর প্রহার, রামেশ্বর ভট্টের শত্রুতা, ইন্দ্রায়ণী নদীতে তুকারামের অভঙ্গ নিক্ষেপ ও পুনঃপ্রাপ্তি, রামেশ্বরের অনুশোচনা ও বশ্যতা, তুকারামকে শিবাজীর আমন্ত্রণ ও তুকারামের সবিনয়ে প্রত্যাখান, অবশেষে তুকারাম সকাশে শিবাজীর আগমন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। শিবাজীকে লিখিত তুকারামের প্রত্যাখান লিপিতে শিবাজীর সময়ের রাজকর্মচারীদের উল্লেখ আছে। ইতিহাস অন্বেষী গবেষকের মন নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ পাদটীকায় সেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্ক বিশ্লেষণ করেছেন।

পরবর্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কামজয়ের (রমণী প্রত্যাখান) ক্রোধজয়ের (কাংস্যকার পত্নীর উষ্ণ জল ঢেলে অত্যাচার) ও বিদ্বেষ জয়ের (দাদাজী কোণ্ডদেবের সহায়তায় ব্রাহ্মণদের ঈর্ষার নিবৃত্তি) কয়েকটি ঘটনা, অলৌকিকত্ব, তুকারামের পাণ্ডুলিপি অনুসরণে অন্তর্ধানের সযৌক্তিক ব্যাখ্যা, ভক্তিমার্গের ধারাবাহী অনূদিত অভঙ্গগুলির পরিবেশন ও তাঁর ধর্মনীতির পরিচয় প্রদান করেই তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হয়েছে। মোটামুটিভাবে—প্রথম পরিচ্ছেদ—গৃহীজীবন ও অধ্যাত্ম ও জীবনের উন্মেষ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—অধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশও অভঙ্গরচনা তৃতীয় পরিচ্ছেদে—ধর্মনীতি—আলোচিত হয়েছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত—

তুকারামের অভংগ অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথের উপযুক্ত পরিবেশ লাভ, অনুবাদের প্রকাশ কাল তুকারাম সম্পর্কে অন্যান্যদের রচনার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ-কৃত কতিপয় অভংগের অনুবাদ মালতী পুঁথির পাণ্ডুলিপির সংগে পাঠভেদ ও সত্যেন্দ্রনাথ বর্ণিত তুকারামের জীবনকথা সংক্ষেপে আলোচিত হলো।

উপসংহার

বাংলাভাষায় অভংগগুলি প্রচারের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষ রূপে উল্লেখ্য। সাহিত্যরীতির দিক থেকে অনুবাদগুলি খুব একটা উন্নত মানের না হলেও সর্বজনবোধ্য সহজ কথায় তুকারামের জীবন ও তাঁর সাধনার পথ পরিস্ফুটনে সত্যেন্দ্রনাথ সিদ্ধকাম হয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ অন্যান্য অনুবাদে যেমন আক্ষরিক অনুবাদের প্রবণতা রয়েছে—এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। মূলত তুকারামের অভংগে—ভাবের গভীরতা যতটা অধিক—মণ্ডনকলার পারিপাট্যবোধ যে ততটা নেই তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'তুকারামের অভংগ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।[১৯] নমুনা-স্বরূপ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে অন্য কয়েকটি অভংগেরও অনুবাদ করেছেন। তুকারাম যেমন সহজ সরল ভাষায় ভক্তিপথের নির্দেশ দিয়েছেন তেমনি সত্যেন্দ্রনাথও মূলের ভাব ও রীতির যথার্থ অনুসরণ করেছেন।

নবরত্নমালার কতকগুলি বানানের পরিবর্তন চোখে পড়ে, যেমন বোম্বাই চিত্রের—'বেস বেস বড় ভাল' নবরত্নমালায় 'বেশ ভাল বেশ ভাল' করা হয়েছে। 'মায়ালু', অন্যায়ী, বিচারিয়া ইত্যাদি কাবিক্য শব্দের প্রয়োগও অনুবাদে আছে; আগাগোড়া পয়ার ত্রিপদী ছন্দেই অনুবাদ গ্রথিত হয়েছে, ত্রিপদী বন্ধে মাঝে মাঝে একটি পদে ভক্তহৃদয়ের আকুলতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নবরত্নমালার—

সেবকে করুণা কর বিচারিয়া বল হরি
আমি কি গো নহি তব দাস।'—পদটি উল্লেখ্য।

দীননাথ গংগোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ বসুর অনুবাদও পয়ার ভিত্তিক। সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে কোন নতুনতর বৈশিষ্ট্য এঁদের রচনায় চোখে পড়ে না। মূলের প্রতি পূর্ণ সচেতন থেকেও রচনাকে সংহত করার একটা প্রচেষ্টা

সত্যেন্দ্রনাথের ছিল। সেজন্য কোনো কোনো সময় তাঁকে ভাবানুবাদ করতে হয়েছে। সেই পদগুলি কম আকর্ষণীয় হয় নি, অন্যের পাশাপাশি রেখে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি অনুবাদ তুলে ধরা যায়।

রমণী প্রত্যাখানে তুকারামের মনোভাব ফুটিয়ে তুলতে দীননাথ যেখানে লিখেছেন—

এই যে আমার বপু শুষ্ক তরু প্রায়,
তপঃক্লেশে, শিলাসম হয়েছে কঠিন,
বিনতি তোমায় করি. দয়াময় !
করো না ইহার সহ নারীর মিলন।

—দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সাধু তুকারামের জীবনচরিত ; পৃ. ৫২।

সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যক্তিস্বরূপপূর্ণ সুরে লিখেছেন—

স্ত্রী-সঙ্গ চাহি না দেব শুষ্ক তরু এ যে
এ পাষাণ দেহ তাহে স্ত্রী সঙ্গ কি সাজে ?

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বোম্বাইচিত্র পৃ. ৫২।

তুকারামের অন্তর্ধান

তুকারামের জন্মসাল নিয়ে তাঁর চরিতকারগণ যেমন ভাবিত হয়েছেন, তেমনি তাঁর অন্তর্ধান নিয়েও চিন্তার অবধি নেই। বিষ্ণুর পুষ্পক রথে চড়ে তুকারামের সশরীরে স্বর্গারোহণের যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তার উৎস সন্ধানে গিয়ে মহীপতির বক্তব্য থেকে আধুনিক চরিতকারদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় নি। অন্তর্ধানের পূর্বে কথায় কথায় বৈকুণ্ঠে যাবার অভিলাষ, পত্নীকে সঙ্গে নেবার আমন্ত্রণ ও তাঁর অসম্মতি, চতুর্দশ শিষ্যসহ ইন্দ্রায়ণী নদীতীরে কীর্তনে বিভোর—তারপর তাঁর হঠাৎ অন্তর্ধান এখনও রহস্যে আবৃত। মহীপতির বর্ণিত পুষ্পক রথে চড়ে তুকারামের স্বর্গারোহণের যুক্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে পেতে আধুনিক চরিতকারগণ অনেক ভেবেছেন।

তুকারামের পাণ্ডুলিপি থেকে এবিষয়ে বঙ্গার্থ সহ মূল মারাঠীলিপি[২০] সত্যেন্দ্রনাথ পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। ফলে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। তিনি অভঙ্গ সংগ্রহের[২১] প্রারম্ভে গদ্যে লিখিত জীবনাংশে অনুসন্ধান করেও এর চেয়ে বেশি নূতন কিছু তিনি পান নি। তুকারামের জল সমাধি

গ্রহণের কথাও অনেকে ভেবেছেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু 'মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত জলসমাধি গ্রহণ'—তুকারামের মতো 'বীতরাগ পুরুষের পক্ষে' সম্ভব বলেই মনে করেছেন। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন—"গভীর জলের জন্যই হউক বা এই সকল জলজন্তু দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, তুকারামের দেহ আর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই বলিয়াই বোধহয় তুকারাম সশরীরে স্বর্গ গমন করিয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।"[২২] দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন—"তুকারামের জীবন কোথায় এবং কি প্রকারে শেষ হয় তাহার কোন যথার্থ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না"। কোন তীর্থক্ষেত্রে—নিভৃত স্থানে নির্বিকল্প সমাধিতে তাঁর বাকী জীবন অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে দেহু গ্রাম ত্যাগের কথা দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ধারণা করেছেন।[২৩] তুকারামের বংশধরদের সঙ্গে সঙ্গে যোগযোগ করে পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত তারিখটি যে 'দেহু' থেকে বিদায় নেওয়ার তারিখ—তিনি এ সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েছেন।[২৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে অন্তর্ধান বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের উত্তরসূরীরা বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা অধিক করলেও বক্তব্যে কোন নতুন তথ্য দিতে পারেন নি। এঁদের অনুসন্ধিৎসার পিছনে সত্যেন্দ্রনাথের অবদান যে বিস্মৃত হবার নয় তা এঁদেরই মধ্যে কারো কারো স্বীকৃতি দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।[২৫] কাজে কাজেই বাংলা সাহিত্যে তুকারাম সম্পর্কিত রচনার প্রাথমিক পর্বে গৌরবের আসন সত্যেন্দ্র-নাথেরই প্রাপ্য। তুকারামের অভঙ্গ অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ যে বিশেষ সাহিত্য-কর্মের কৃতিত্ব রেখে গেছেন তা বলা যায় না। কিন্তু বাংলাভাষায় সংকীর্ণ পরিসরকে বিস্তৃত করে অন্য প্রদেশীয় কবির রচনা বাঙালীর গোচরে আনার কাজটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার দিকে থেকে একেবারে অগ্রাহ্য করার মত নয়। পরবর্তী চেষ্টা যেমনই হোক প্রাথমিক চেষ্টার গুরুত্ব তাতে কমেনা। মহারাষ্ট্র ও বাংলার ভাবগত যোগ সাধনে তুকারামের অভঙ্গ অনুবাদ সেইদিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান প্রচেষ্টা।

১. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—তুকারামের জীবনী ও অভঙ্গমালা পৃ.।

২. একটি দল আসছে···খাটো শ্বেতবসন, গলায় তুলসী-মালা কপালে

চন্দন তিলক। প্রত্যেকের হাতে একজোড়া খঞ্জনী…কোন তীর্থে পেঁছিবে?

বারকরীর তীর্থে। বিট্ঠল তীর্থ পান্ধারপুরে।

আমরা নির্দিষ্ট সময়ে ঘর থেকে বার হয়ে আসি—তীর্থযাত্রা করি। এই ব্রত আমরা বারবার প্রতিবার পালন করি—তাই আমাদের নাম বারকরী।' বাণী বারকরী : নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। পৃ. ১১২।

৩. 'মহারাষ্ট্র ভাষায় ইঁটকে'বিট' বলে, 'বা' শব্দ গৌরবসূচক :— 'ইষ্টকোপরি বর্তমান পিতা পরমেশ' এই অর্থে বিঠোবা শব্দ ব্যবহৃত।' যোগীন্দ্রনাথ বসু : কবিতা প্রসঙ্গ—তৃতীয় ভাগ : তুকারাম-চরিত। পৃ. ৪৮ বিঠোবা সম্পর্কে দীর্ঘ পাদটীকায় প্রাপ্ত।' পণ্ডরপুর মাহাত্ম্য' গ্রন্থ অনুসরণে পুণ্ডরীকের দেবতাকে ইষ্টকাসন দেওয়ার কাহিনীটিও সেখানে ব্যক্ত হয়েছে।

অপিচ—

'বিঠোবা ও বিল নারায়ণের প্রতিমূর্তি' বলিয়া পূজা হয়, কিন্তু এই দুই দেবতার ভক্তেরা আপনাদিগকে বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।—বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ. ১।

৪. The life Tukarm, as portrayed by Mahipati in '*Bhakta Lilamrita* Chapters 25 to 40, presents many difficult problems for the Historian,...Mahipati wrote his account of Turkaram in 1774, 125 years after Tukaram's disappearance. Now Mahipati does not give the slightest hint either in the *Bhaktalilamrita*, or in the *Bhaktawijaya* written 12 year earlier, as to where he obtained his information reading Tukarm's life. ...One hundred and twenty-five years give ample time for legends to grow arround...

The Poet Saints of Maharashtra by Justin E. Abbott : No. 7 Preface. *Tukaram*. transtation from Mahipati's *Bhaktalilamrita*-ch. 25 to 40.

৫. 'The following sketch is founded on the life of Tukaram in English and Marathi, prefixed to his edition of the Poet by the Late Janardan Sankharam Gadgil. The original has been condensed, versified and thoroughly recast. I have also taken the liberty of touching up some of the specimens given in Part II and also the verses under the heading 'Farewell' which were translated by Sir Alexander Grant-Bart'. —*Tukaram*— The Sudra poet of Maharashtra by Satyendranath Tagore Preface.

৬. শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের ভারতীতে লিখিত প্রবন্ধ এবং তৎপরে তাঁহার রচিত বোম্বাইচিত্র হইতে ইহা অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রবাবুর লিখিত তুকারাম-চরিত আমাকে উক্ত মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনায় প্রণোদিত করে এবং আমি কৌতূহলী হইয়া, আমার অনুরাগভাজন ছাত্র, সুপ্রতিষ্ঠ শ্রীমান সখারাম গণেশ দেউস্করের সাহায্যে মূল মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে তাহা পাঠ করি'।—তুকারাম-চরিত ; যোগীন্দ্রনাথ বসু : ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

৭ এই গবেষণার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অবদান অধ্যায় দ্র.। দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত দাক্ষিণাত্যের পূজা ও ব্রত

৮. From the life of Tukaram prefixed to this edition we learn ...born at Dehu at about the year 1608, a little more than a hundred years later than the great Bengal reformer Chaitanya, whose doctrines he imbibed and propagated :'—p. 181.

—Great Men of India, vol. II.

* A complete collection of the Poems of Tukaram. edited by Vishnuram Parushram Shastri Pundit, Bombay, V-1 1869.

৯. 'সন্ত জ্ঞানেশ্বরের আবির্ভাবের তিন শতক পরে তুকারাম আবির্ভূত

হয়েছিলেন। মোটামুটি নির্ভুল ভাবে ধরা যায় ১৫২৮ খ্রী তাঁর জন্ম…। বাণী-বারকরী, নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : পৃ. ৮৭।

১০ ১৫১০ শকাব্দ (খ্রীষ্টাব্দ ১৫৮৮) পুণা নগরীর অনতিদূরে দেহু নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।—বোম্বাই চিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : পৃ. ১।

১১. The correct date of his birth appears to be the year of Christ 1608, though it has been placed by some in A. C. 1588.' *Tukaram—Sudra Poet of Maharastra* : Satyendranath Tagore : p. 3

১২ জগদীশ ভট্টাচার্য : নবরত্নমালায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা : প্রবাসী : ১৩৪৫ ভাদ্র

১৩ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত—

মালতী পুঁথির পৃ. ১৮তে প্রাপ্ত (১৫৬৬ নং) আমারি বেলায় উনি,

ঐ „ — (৫৬৭) বোধ হয় এ পাষণ্ড,

ঐ „ — (৫৬৮) ঘরে দুটা অন্ন এলে

ঐ পৃ. ১৭তে — (৫৬৯) খাবার কোথায় পাবি বাছা

ঐ „ — (৫৭০) গেছে সে আপদ গেছে।

ঐ „ — (৫৭১) ঘরে আর আসেনা সে।

ঐ পৃ. ১২তে — (৫৭২) হেথা কেন আসে লোকগুলো

[এই সাতটি জগদীশ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে নির্দেশিত।]

ঐ পৃ. ১২তে — (৩৭১) শুনদেব এ মনের বাসনা নিশ্চয়

মালতী পুঁথির পৃ. ১২তে প্রাপ্ত (১৩২০) নামদেব পাণ্ডুদেব লোয়ে সঙ্গে করে

ঐ „ (১৩২১) যদি মোরে স্থান দাও তব পদছায় !

ঐ পৃ. ১১ (বিদায়) (১) *…গো বিদায় এবে যাই নিজ ধামে

ঐ বিদায়

ঐ „ (২) বাহিরে ও ঘরে মোর আছ যারা যারা

ঐ „ (৩) তুকার পরীক্ষা শেষ হয়

ঐ „ (৪) ধরায়···আছে লোকদের তরে

ঐ „ (৫) বন্ধুগণ, শুন রামনাম কর সবে।

—তারকাচিহ্নিত স্থানে ১নং বিদায় কবিতায় বোম্বাইচিত্র পৃ. ৪৬-এ 'দাও' মুদ্রিত নবরত্নমালায়—'দেও'।

৪নং বিদায় কবিতায়—রূপান্তর গ্রন্থে—'পাণ্ডরী' সৃষ্ট হয়।

১৪. আহমদাবাদ বাসকালে বোধ হয় এই অনুবাদগুলি সত্যেন্দ্রনাথের সাহায্যে কৃত, মূল মারাঠির অর্থ সত্যেন্দ্রনাথ করিয়া দেওয়াতেই অনুবাদ করা সম্ভব হইয়াছিল।' রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ;—বিজনবিহারী ভট্টাচার্য পৃ. ২৪১।

১৫. রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যে দক্ষ করে তোলার আয়োজনও সত্যেন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন—একথা রবীন্দ্রনাথের কথা থেকেই জানা গেছে। দ্র: জীবনস্মৃতি : আমেদাবাদ ও এই গবেষণার পরিজন পরিবেশে অধ্যায়।

১৬. ...How difficult it is to compile Biographical notes of our leading poets and philosophers—the materials are so scanty...Even the dates of their birth and death are mostly mere matters of speculation. In the case of Tuk aram, however there is this advantage that we get the materials of his Biography from the poems themselves... : *Tukaram—The Sudra poet of Maharashtra*, Introduction —Satyendranath Tagore.

১৭. দীননাথ গংগোপাধ্যায় ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তুকারামের দ্বিতীয় পত্নীর নাম জিজাবাই বলেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ জিজাই ও যোগীন্দ্রনাথ বসু তাকে 'অবলাঈ' বলেছেন। দীননাথ গংগোপাধ্যায় তাঁর 'সাধু তুকারামের জীবনচরিত' (পৃ. ১১)-এ তুকারামের সংগে তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর আচরণ, সক্রেটিস-এর সংগে জানথিপ্পির আচরণের তুল্য মনে করেছেন। যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে পরিবেশের ফলেই তিনি কর্কশ

হয়েছিলেন। তুকারামকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করতে এঁর অবদান যথেষ্ট ছিল।

১৮. 'নামদেব ও তুকারামের সম্বন্ধে মহীপতি তাঁহার 'ভক্তলীলামৃত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে নামদেব শত কোটি অভঙ্গ রচনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া ৯৪ কোটি ৪৯ লক্ষ অভঙ্গ রচিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনিই নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করিবার উদ্দেশে তুকারাম হইয়া পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে তদনুসারে তুকারাম ৫ কোটি ১ লক্ষ ৪৪০০০ শ্লোক রচনা করেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তুকারাম-কৃত ৪, ৬০০ অধিক সংখ্যক অভঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।···ভজনের সময় তুকারাম হয়ত অগণ্য অগণ্য অভঙ্গ সদ্য সদ্য রচনা করিয়া গান করিতেন, তাহা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়া থাকিবে। এই সকল অভঙ্গ লিপিবদ্ধ হইলে ইহাদের সংখ্যা প্রবাস অনুযায়ী কোটি না হউক নিদান পক্ষে লক্ষেও পেঁছিতে পারিত।" বোম্বাইচিত্র ; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ১৬-১৭।

১৯. কবি অপেক্ষা সাধুপুরুষ বলিয়াই তুকারাম বেশি বিখ্যাত।···তিনি সুশিক্ষিত লোক ছিলেন না, তিনি কেবল তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা বশেই কবিতা সকল রচনা করিতেন। তেমন পদলালিত্য না থাকিলেও একটা অকৃত্রিম সবল সৌন্দর্য বেশ অনুভব করা যায়। অরণ্যের অযত্নলালিত তরুরাজির ন্যায়, তাঁহার কবিতায় না আছে শৃঙ্খলা— না আছে পারিপাট্য। হয় তো কোন স্থলে ডালপালার এত ঘেঁষাঘেঁসি ও জটিলতা যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য, হয় তো কোন স্থলে শাখা পল্লবের একেবারেই বিরলতা।···তাঁহার রচনাগুলি শিক্ষিত কবির রচনা হিসাবে না দেখিয়া একজন ভক্ত সাধুর অকৃত্রিম হৃদয়ের উচ্ছ্বাস—এই ভাবে দেখিলেই তাঁহার সুবিচার হয়। তুকারামের অভঙ্গ : প্রবন্ধমঞ্জরী ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ. ৪২৯।

২০. দেহুতে নদী হইতে উদ্ধৃত যে গ্রন্থখানি তুকার বংশজ মধ্যে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে তাহাতে তুকারামের মৃত্যু বিবয়ে এইমাত্র লিখিত আছে যে ১৫৭১ শকে বিরোধীনাম সংবৎসরে সীমগা (ফাল্গুন) বদ্য (কৃষ্ণপক্ষ) দ্বিতীয়া, বার সোমবার তে দিবসী প্রাপ্তঃ কালী

'তুকেবাণী' তীর্থাস প্রয়াণং কেলে শুভং ভবতু মংগলং অর্থাৎ ১৫৭১ শকে বিরোধী নাম সম্বৎসরে ফাল্গুন কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া সোমবার প্রাতঃকালে তুকারাম তীর্থ প্রয়াণ করিলেন'।—বোম্বাইচিত্র, পৃ. ৪৪-৪৫।

২১. In all the Ms. however, which have been collated for the edition to which the life is prefixed, there is a statement in prose that Tukaram 'disappeared in Shaka year 1571, the year named Virodhi, on the 2nd of the dark half of Phalgun, in the first quarter of the day'. Nothing is spoken of the car of Vishnu or his ascent to Heaven. *Sudra Poet of Maharastra* by Satyendranath Tagore. pp. 33-34

২২. তুকারাম চরিত : যোগীন্দ্রনাথ বসু। পৃ. ৫৩।

২৩. সাধু তুকারামের জীবনচরিত : দীননাথ গংগোপাধ্যায়। পৃ. ৬৩।

২৪. 'তুকারামের বর্তমান বংশধর আমাদের কাছে এই দিনেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন'। দীননাথ গংগোপাধ্যায় : সাধু তুকারামের জীবনচরিত—পৃ. ৬৪।

২৫. সত্যেন্দ্রনাথ প্রসংগে যোগীন্দ্রনাথ বসুর উক্তি : ৬নং পাদটীকা দ্রঃ।

নবরত্নমালা

সার্থকনামা সঙ্কলন

নবরত্নমালা গ্রন্থ সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যানুবাদের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গ্রন্থটির নামকরণে তৎকালীন নীতিবিষয়ক শ্লোক-সংকলন গ্রন্থের প্রভাব দেখা যায়। এ ধরণের নীতিবিষয়ক সংকলন গ্রন্থগুলির নামকরণে সে-সময় প্রায়ই মালা, হার, রত্ন, রত্নাকর, সাগর ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হতে দেখা যায়।[১] সংস্কৃত সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রচনা সম্ভার ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ মালার সংকলন হিসাবে নবরত্নমালা নামটি সত্যেন্দ্রনাথের উপযুক্ত বলে মনে হয়েছে। প্রথিতযশা নৃপতি বিক্রমাদিত্যের রাজসভা অলংকৃত করে যে ন'জন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার জন্য তাঁরা নবরত্নের সংগেই তুলনীয় হতেন।[২] রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রশ্নের উত্তরে সভায় বসেই মুখে মুখে অনেক উৎকৃষ্ট শ্লোক এই নবরত্নের দ্বারা রচিত হয়েছে।[৩] রাজা ও প্রজা সকলের পক্ষেই পালনীয় অনেক নীতিশ্লোক এই নবরত্নসভায় সৃষ্ট হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে ঐ শ্লোকগুলির কয়েকটি অনূদিত হয়েছে। সেজন্য নবরত্নমালা নামটি গ্রহণে তাঁর আগ্রহ জেগে থাকতে পারে। আবার নবরত্নসভায় ছিলেন না এমনও অনেক কবি ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞের রচনা এই গ্রন্থে অনূদিত হয়েছে—যেমন বাল্মীকি, ভবভূতি, হলায়ুধ, জয়দেব, চাণক্য, বিষ্ণুশর্মা প্রভৃতি। ভারত-রত্নাকরে তাঁরাও এক একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন।[৪] এঁদের লেখনী থেকে যে দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছিল তা নবঅনুবাদে গেঁথে সত্যেন্দ্রনাথ পাঠকবর্গকে উপহার দিয়েছেন। নবরত্নমালা গ্রন্থটির (দ্বিতীয় সংস্করণ) নীলাভ প্রচ্ছদপটে একটি নবরত্নের অংগুরীয় শোভা পেয়েছে। এটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়, যেন নীলসাগর থেকে আহরণ করা বিবিধ রত্নের একটি অংগুরীয়—যা ধারণে অর্থাৎ অনুসরণে মানুষের জীবন নন্দিত ও সুশোভিত হতে পারে।

প্রকাশ

১৩১৪ সালে নবরত্নমালা প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে ১৩১১ সালে বংগীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে (২৪শে পৌষ)

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনূদিত উদ্ভট কবিতা পাঠ করেন। এই গ্রন্থভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের রচনা তত্ত্ববোধিনী, ভারতী ইত্যাদি পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। নবরত্নমালার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩১ সালে (১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে) প্রিয়ম্বদা দেবীর সম্পাদনায় সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও গ্রন্থের সম্পাদনাকার্যে প্রিয়ম্বদা দেবীর সঙ্গে তিনি যে প্রভূত পরিশ্রম করেছেন তা ঐ সংস্করণের ভূমিকা থেকেই জানা যায়।[৫] সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর দুবছর পরে তাঁর দ্বিতীয়বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে ঠাকুর বাড়ির অনেককেই প্রিয়ম্বদা দেবী নিজহাতে 'সত্যেন্দ্র স্মরণে' লিখে গ্রন্থটি উপহার দিয়েছিলেন। বর্তমান গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে।

জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর তিনটি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ভার তিনজনকে দিয়ে যান। প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ কার্যভার দিলে কাজটি সুসম্পন্ন হবে অথচ কারো উপরেই অধিক চাপ থাকবে না, সম্ভবত সেজন্যই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ প্রমথ চৌধুরীকে, গীতা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে ও নবরত্নমালার ভার প্রিয়ম্বদা দেবীকে দিয়ে যান, সত্যেন্দ্রনাথের দূরদর্শিতার এটি একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মৃত্যুর পূর্বে তিনজনকে কাজগুলি গুছিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তিনটি পুস্তক তাঁর স্মরণার্থে এক একটি বিশেষ দিন প্রকাশিত হয়েছে। সবুজপত্র যে ছাপাখানায় ছাপা হতো সেখান থেকেই গ্রন্থ তিনটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

গঠন

নবরত্নমালা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে আছে ধর্ম ও নীতিবিষয়ক পদাবলী; দ্বিতীয়ভাগে ঋগ্বেদ, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র থেকে বচনসংগ্রহ; তৃতীয়ভাগে কবি ও কাব্য—এখানে মেঘদূতের দুটি অনুবাদ আছে, একটি দ্বিজেন্দ্রনাথের, অন্যটি, সত্যেন্দ্রনাথের; এছাড়াও বিভিন্ন কবি-প্রশস্তির অনুবাদ, বাল্মীকি, ভবভূতি ও কালিদাসের রচনার অনুবাদ ইত্যাদি আছে। চতুর্থ ভাগে আছে বিবিধ কবিতা—এখানে উদ্ভট শ্লোকের অনুবাদের সঙ্গে আবার উত্তরচরিত, শকুন্তলা ও রামায়ণের শ্লোক অনূদিত হয়েছে। Ch. Mackay রচিত The Circassian Girl অনুসরণে লেখা 'কমল কুঁয়রের কারামুক্তি' কবিতাটি এই অংশেই আছে। হ্যামলেটের

Act III, Scene III অবলম্বনে 'রাজার আত্মগ্লানি' নামে অনুবাদটি এই অংশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সবশেষে আছে 'পারসীদিগের ভারতে আগমন—গুজরাটের 'সঞ্জামে' যাদু রাণার কাছে শরণাগত পারসীদের রীতিনীতির অনুবাদ। পঞ্চম ভাগে তুকারামের জীবনী ও অভঙ্গমালা।

সমগ্র নবরত্নমালা পদ্যে লেখা। শুধু তুকারামের জীবনী অংশ ও 'পারসীদিগের ভারতে আগমন' গদ্যে লেখা। এই গ্রন্থভুক্ত মেঘদূত, গীতা তুকারামের মারাঠী অভঙ্গের অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তির উজ্জ্বল নিদর্শন। এগুলি পৃথক্ ভাবে আলোচনা না করলে সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-কীর্তির প্রকৃত মূল্যায়ন হবে না। সেজন্য সেগুলি পৃথক্ ভাবে আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থের অধ্যায়গুলিকে যে নাম দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে সেই নামানুসারে অধ্যায়গুলিকে পুরোপুরি পৃথক্ করা যায় না। যেমন, দ্বিতীয়ভাগে আছে ভগবদ্গীতার রচনাসংগ্রহ, অথচ প্রথম ভাগের মধ্যেও গীতামাহাত্ম্যের শ্লোকও অধ্যায়ের 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো' 'সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোক দুটি উদ্ধৃত করে সেগুলির অনুবাদ করা হয়েছে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই শ্লোক দুটি ৬৫-৬৬ নং শ্লোক। মুদ্রণপ্রমাদে নবরত্নমালায় ৫৫-৫৬ হয়েছে। তৃতীয় ভাগে কবি ও কাব্য প্রসঙ্গে কালিদাসের কাব্য ও পঞ্চম ভাগে তুকারামের অভঙ্গ সংকলিত হলেও, প্রথমভাগে নীতিবিষয়ক রচনায় শকুন্তলা ও তুকারাম থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। জীবনের চলার পথে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে নম্রতা নামক গুণটির প্রয়োজন। নম্রতা চরিত্রের ভূষণ স্বরূপ। তাই পরোপকারী বিনম্র মানুষের উপমা দিতে গিয়ে প্রথমভাগেও শকুন্তলা ও তুকারামের অভঙ্গ থেকে তুলনীয় শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে।[৬] সম্পূর্ণ মেঘদূতের অনুবাদ তৃতীয়ভাগে মুদ্রিত হলেও, প্রথমভাগে মেঘদূত থেকে 'যাচঞা মোঘা বরমধিগুণে' ইত্যাদি শ্লোক তুলেছেন। কোন কোন সময় একই শ্লোক দুই ভাগেই পরিবেশিত হয়েছে। কারণ, এই গ্রন্থের প্রথম ও চতুর্থভাগ বিষয় অনুসারে ও দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চমভাগ গ্রন্থানুসারে বিভক্ত করার প্রচেষ্টা থাকলেও প্রথম ও চতুর্থ ভাগে বিষয়ানুসারী সংকলনের দিকে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল ঝোঁক থাকায় অন্য তিনটি ভাগের গ্রন্থ থেকেও ঐ দুটি ভাগে মনোমত

বিষয়ানুসারী শ্লোক সংযোজিত হয়েছে। ফলে সারা সংকলনেই বিভিন্ন ভাগের শ্লোক রয়েছে, পুরোপুরি গ্রন্থানুসারী হতে পারেনি। গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণানুক্রমিক সূচী না থাকায় কোন বিশেষ শ্লোকের অনুবাদ খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট হয়, অথচ শুধু অধ্যায়ের নাম ধরে খুঁজে পাওয়াও কষ্টকর।

বস্তু পরিচয়

এই গ্রন্থে জীবনপথের মূল নীতিগুলি নির্দেশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের অমর কবিদের রচনাংশের সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করার প্রচেষ্টা রয়েছে—সর্বোপরি আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে স্থিরপ্রজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। মহাসৃষ্টির বুকে প্রতিটি মানুষের জীবন এক একটি বুদ্বুদের মতো। এই ভাবটিকে মনে রেখে জীবনের ক্ষণিক মুহূর্তগুলিকে চরিত্র-মাধুর্যে ভরে তুলতে হবে। শীলতাই শ্রেষ্ঠ ভূষণ—নবরত্নমালার বিবিধ শ্লোকে এই নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। এই ভারতের তপোবনেই সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের অন্তরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও সেই সঙ্গে আত্মার স্বরূপ-নির্ণয়ে আকুলতা জেগেছিল। গীতা ও বিবিধ উপনিষদে আত্মার স্বরূপ, সুখে দুঃখে অবিচলিত অবস্থা ও ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মবাদের জয় ঘোষিত হয়েছে। গৃহীজীবন আশ্রয় করলেও গৃহীকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানী হতে হবে। মহর্ষির পথই ছিল—'যদ্ যৎকর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ' সত্যেন্দ্রনাথ কায়মনোবাক্যে এটি চাইতেন বলেই ব্রহ্মধর্ম ও গীতা থেকে প্রাসঙ্গিক শ্লোকগুলো সংকলন করে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

সংসারের দুঃখ ভুলতে কাব্যামৃতপান ও সজ্জন সঙ্গম-রূপ দুটি মধুর আশ্রয়ের কথা সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। সত্যেন্দ্রনাথ তা সাগ্রহে চয়ন করেছেন।[৭] তবে যারা কাব্যের ক্ষেত্রে অরসিক কিন্তু জীবনপথের পথিক তাদের জন্যও কিছু পাথেয় এনে দেয়ার বাসনা সত্যেন্দ্রনাথের ছিল। সাধারণ জীবনগুলো যাতে সুন্দর হতে পারে—অভ্যাসের ফলে মনের অনেক বিষ-বাষ্প উড়ে যেতে পারে সে সম্পর্কে সাধারণ পাঠককে সচেতন করেছেন। এমনকি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরমায়ু লাভের নির্দেশও এই গ্রন্থে আছে। সুনিয়মে স্বাস্থ্যকে গঠিত করলে বৈদ্য অনেক দূরে থাকেন—এ সম্পর্কেও গ্রন্থের শেষ দিকে

কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন।[৮] নীতিসংকলনের মাঝে স্বাস্থ্যনীতি পরিবেশনায় সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে। আহারে-বিহারে চলনে-বচনে মানুষের জীবন যতই পরিমার্জিত ও পরিশীলিত হবে, ততই বিবাদের ছায়া দূরে থাকবে। ভবভূতির রচিত গুণরত্নমের একটি শ্লোকে নিরাসক্তি ও কর্মোদ্যম পাশাপাশি চলেছে।[৯] সেজন্যই সত্যেন্দ্রনাথ এই শ্লোকটিকে চয়ন করেছেন। অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথের কতখানি দক্ষতা ছিল তা পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগরের উক্ত শ্লোকের অনুবাদের সংগে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে। এ ক্ষেত্রে "ধরেছে চুলের ঝুঁটি এসে যেন যম"-এর স্থলে "মৃত্যু আসি যেন কেশ ধরিছে কর্ষণ" অনেক সুললিত। 'কর্ষণ' কথাটির প্রয়োগও অভিনব।[১০]

কাব্যরসাস্বাদনে কিছুক্ষণের জন্য হলেও পাঠকের মনের দর্পণে একটি সৃষ্টির কাজ চলতে থাকে, ফলে ছোটো-খাটো নিন্দাবন্দনার উর্ধ্বে মানুষের চিত্ত প্রসারতা লাভ করে। সেজন্যই সত্যেন্দ্রনাথ অমর কবি কালিদাসের মেঘদূত, শকুন্তলা, রঘুবংশ ও কুমার-সম্ভবের আংশিক বঙ্গানুবাদ করে দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যসুধার সংগে পাঠককে কিছুটা পরিচিত করতে চেয়েছেন। Coleridge-এর কথায় Yet it is a good work to give a little to those who have neither time nor means to get more.[১১]

সুতরাং নবরত্নমালায় মূলত দুটি পথের নির্দেশ আছে। সংসারী হও, কারণ জটাধারণ করলেই মুনি হওয়া যায় না; নির্বৈর হও, ধনোপার্জনে উদ্যোগী হও, কিন্তু দানের হাতটি যেন প্রসারিত থাকে। অন্যটি, বিদ্যাকে জীবনের ভূষণ কর। দুটি পথ আবার গিয়ে মিলেছে একই লক্ষ্যে, বিশ্ব-বিধাতার কাছে সবকিছু উৎসর্গের মধ্যে তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। সত্যেন্দ্রনাথ আশৈশব পিতার কাছে যে নীতিগুলির অনুশীলন দেখেছেন, সেগুলি মনে রেখেই নবরত্নমালা গ্রথিত করেছেন।

প্রথমভাগে নীতিবিষয়ক পদাবলী গ্রন্থনায় জয়দেবের গীতগোবিন্দ, হলায়ুধ বিরচিত ধর্মবিবেক, চাণক্যশ্লোক, ভর্তৃহরি রচিত নীতিশতক, শৃংগারশতক ও বৈরাগ্যশতক, বিষ্ণুশর্মা-রচিত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ, কালিদাসের শকুন্তলা ও মেঘদূত, মারাঠী কবি তুকারামের অভংগ, ভবভূতি-রচিত গুণরত্নম্‌ কবিভট্টকৃত পদ্যসংগ্রহ, ঘটকর্পর বিরচিত নীতিসার, কুসুমদেব

রচিত দৃষ্টান্ত-শতক, বেতালভট্ট বিরচিত নীতিপ্রদীপ ও মহর্ষি সংকলিত ব্রাহ্মধর্ম থেকে বিভিন্ন শ্লোকের অনুবাদ করেছেন।

চতুর্থভাগে পূব-চাতকাষ্টক, ভ্রমরাষ্টক, অমরুশতক ও নবরত্নের শ্লোক ছাড়া বাকি সবগুলি শ্লোকই পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি থেকে আহৃত। নতুন গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করলেও চতুর্থভাগের মূলভাবটি নীতিমহিমাজ্ঞাপক। যেমন 'পয়োদ হে বারি…'শ্লোকটির অনুবাদে একনিষ্ঠতার মহিমা ব্যক্ত হয়েছে: চাতক জলদের কাছেই জল ভিক্ষা করে, পিপাসায় প্রাণ গেলেও সে অন্যের উপাসনা হেয় মনে করে। অনূদিত শ্লোকটির নাম দিয়েছেন 'পরোপাসনা'।[১২]

নীতিবিষয়ক শ্লোক ছাড়াও কয়েকটি হাস্যরসাত্মক শ্লোক চতুর্থভাগে স্থান পেয়েছে।[১৩] সেজন্য চতুর্থভাগের নাম দিয়েছেন বিবিধ কবিতা।

উদ্ভটশ্লোক: নবরত্নমালা প্রথম সংস্করণের (১৩১৪) লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের ভূমিকা থেকে জানা যায়, এই সংকলনের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে সংস্কৃত কাব্য ও উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ থেকে। উদ্ভট শ্লোকগুলি এত সুমধুর ও জ্ঞানগর্ভ যে দীর্ঘকাল সেগুলি পণ্ডিতদের মুখে চলে এসেছে। অনেক বিদেশী মনীষীরাও উদ্ভট শ্লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর উল্লেখ করেছেন।[১৪] উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহে পূর্ণচন্দ্র দে আনন্দ ও যশ দুইই লাভ করেছেন।[১৫] সত্যেন্দ্রনাথের সময়ে উদ্ভট শ্লোক পণ্ডিতসমাজ অতি আদরের বস্তু ছিল—একথা পূর্ণচন্দ্রদের 'উদ্ভট সাগর'-গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায়। তৎকালীন বিদ্বজ্জন সম্মেলনে বিষয়োপযোগী উদ্ভট শ্লোকের প্রয়োগে পাণ্ডিত্যের মান নির্ণীত হতো।

প্রসংগত উদ্ভট নামের উৎস সম্পর্কে সামান্য আলোচনা এখানে করা প্রয়োজন। সাধারণ বাংলা কথায়, উদ্ভট নামটি যেভাবে প্রচলিত, তার সংগে তার সংগে সংস্কৃত প্রয়োগার্থের আমূল পার্থক্য আছে। বাংলাদেশের পণ্ডিত্য মণ্ডলী অতি সমাদরে যাকে উদ্ভট কবিতা বলেন, ভারতবর্ষের ভিন্ন স্থানের পণ্ডিতগণ সেগুলিকে 'সুবচন', 'সুভাষিত' 'সূক্তি' বা 'সদুক্তি' নামে অভিহিত করেন। পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর 'উদ্ভট' কথার প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন—"হেমচন্দ্র স্বীয় সংস্কৃত 'অভিধান-চিন্তামণি' গ্রন্থে 'উদ্ভট' শব্দের অর্থ 'মহাশয়' অর্থাৎ 'মহাত্মা' বলিয়া গিয়াছেন। 'মহাশয়' অর্থাৎ মহাত্মা লোকের রচিত যে কবিতা তাহাই 'উদ্ভট কবিতা'।"

'উৎপলমালা' নামে আর একটি সংস্কৃত অভিধানে পূর্ণচন্দ্র দে পেয়েছেন—"উদ্ভট' শব্দ বিশেষ্য হইলে ইহার অর্থ 'কচ্ছপ' ও 'সূর্য্য' এবং বিশেষণ হইলে ইহার অর্থ প্রকৃষ্ট' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট। সুতরাং 'উদ্ভট' কবিতা শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট কবিতা।[১৬] 'উদ্ভট' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণের পর এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবরণও পূর্ণচন্দ্র দে প্রদান করেছেন। "কবি কহ্লনকৃত কাশ্মীরের নৃপতিগণের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে আছে যে জয়াপীড় নামক এক রাজা ৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজসভায় ভট্টোদ্ভট, দামোদর গুপ্ত, মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক, সন্ধিমান, বামন ও ক্ষীর—এই কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে ভট্টোদ্ভট সর্বপ্রধান ছিলেন। ইঁহার আরও দুইটি নাম আছে—উদ্ভট ভট্ট ও উদ্ভটাচার্য্য। উদ্ভট কবি এরূপ সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন যে তিনি মহারাজ জয়াপীড়কে স্বরচিত কবিতা শুনাইয়া প্রত্যহ একলক্ষ দীনার (বত্রিশ রতি পরিমিত স্বর্ণ মুদ্রা) প্রাপ্ত হইতেন। (রাজতরঙ্গিনী-৪।৪৯৪-৪৯৬)"।[১৭] উদ্ভটাচার্য্য প্রণীত 'কাব্যালংকার সার-সংগ্রহ'-এর সম্পাদক নারায়ণ দাস বানহাট্টী উদ্ভট ভট্টকে ভামহ ও আনন্দবর্ধনের মাঝামাঝি কবি বলে নির্দেশ করেছেন।[১৮] ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্টই উল্লিখিত আছে, উদ্ভটাচার্য কাশ্মীরের লোক ছিলেন।[১৯]

কাব্যসংগ্রহ ও নীতিসংকলনে পূর্বসূরীদের অবদান

নবরত্নমালা গ্রন্থের পূর্বে রচিত কাব্য ও নীতি-সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে যোহন্ হেবর্লিন্-এর 'কাব্য-সংগ্রহ' (১৮৪৭) সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সংকলিত একটি অমূল্য রচনাসম্ভার। আমেদাবাদের শাহিবাগের বাড়িতে সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থটি কত যত্নে রক্ষিত হত তা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র সূত্রে জানা যায়। জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত পত্রে দেখা যাচ্ছে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর এই বইটি কলকাতা থেকে পাঠাতে লিখেছেন।[২০] এ থেকে ধারণা করা যায় বইটি তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। 'রূপান্তর' গ্রন্থের সম্পাদক পুলিনবিহারী সেন হেবর্লিনের এই 'কাব্যসংগ্রহ' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"এই সংগ্রহ উত্তরকালে বহু কাব্যসংগ্রাহক ও সম্পাদকের বিশেষ উপজীব্য হইয়া রহিয়াছে।" (পৃ. ২১৪)। ধরে নেয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথও

এই 'কাব্যসংগ্রহ' থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। হেবর্লিনের আগেই সংক্ষিপ্ত আকারে নীলরত্ন শর্ম্মা (হালদার) 'কবিতা রত্নাকর' সংকলন করে যশস্বী হয়েছিলেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ইংরেজি অনুবাদ সহ J. C. M. কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সংস্করণ গ্রন্থকারের নিজের প্রচেষ্টায় প্রাইভেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় ও জনপ্রিয়তা লাভ করে—একথা J. C. M. লিখিত ভূমিকা জানা যায়।[২১]

সমসাময়িক কালে গৌরমোহন বিদ্যালংকার সংকলিত বালকদের নীতি-শিক্ষার উপযোগী 'কবিতামৃত কূপ' (১৮২৬), কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের 'নীতি সংকলন' (১৮৩১), বাগেশ্বর বিদ্যালংকারের সটীক বংগানুবাদসহ ভর্তৃহরির 'বৈরাগ্যশতক' (১৮৫৫), নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় জেমস্ লঙ্-এর ৩০০০ প্রচলন সম্বলিত 'প্রবাদমালা' (১৮৭২), ঈশানচন্দ্র বসুর 'নীতি-কবিতাবলী' (১৮৮০), নীলমণি বিদ্যালংকার রচিত 'উদ্ভট কবিতা কৌমুদী' (১৮৯০) ও মাতংগীচরণ গোস্বামীর 'উদ্ভট শ্লোকমালা' (১৮৯২) প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে নীতিবিষয়ক কয়েকটি গদ্যগ্রন্থেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। লর্ড বেকনের 'Advancement of Learning' অবলম্বনে দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণের 'সুবুদ্ধি ব্যবহার' (১২৬৭ সাল) ও বালকদের নীতিশিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 'নীতিসার' (১৮৭৭ খ্রী. ১২৮৪ সাল) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ থেকে আংশিক সাহায্য নিয়ে কোন এক হরকুমারের কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বনে শ্রীনাথ গুপ্তের 'নীতিরত্নাকর' (১৮৬৮) রচিত হয়।

নবরত্নমালা প্রকাশের পূর্বে 'উদ্ভট' শ্লোকের দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। প্রথমটি চন্দ্রমোহন তর্করত্নের 'উদ্ভটচন্দ্রিকা'। এর প্রথম ভাগ, ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হওয়ার পর, সুধীজনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করে। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ভাগ ও ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখনও দ্বিতীয় উল্লেখ্য গ্রন্থ পূর্ণচন্দ্রের 'উদ্ভট শ্লোকমালা' প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু 'উদ্ভট-চন্দ্রিকা'র দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে পূর্ণচন্দ্র দেব সংগৃহীত কয়েকটি উদ্ভট শ্লোকের পদ্যানুবাদ সংযোজিত হয়েছিল। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'উদ্ভট-শ্লোকমালা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'নবরত্নমালা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর তাঁর 'উদ্ভটসাগর'

সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'নবরত্নমালা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর তাঁর 'উদ্ভট-সাগর' (দেবনাগরীতে) ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ও 'উদ্ভটসমুদ্র (বাংলা হরফে) ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বসূরীদের মধ্যে 'নীতি-কুসুমাঞ্জলি'-রচয়িতা রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।

নীতিরচনার শ্রেষ্ঠ দুই দিকপাল চাণক্য ও বিষ্ণুশর্মার নাতিবচন সংগ্রহেও সে সময় অনেক অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের এই সংকলনের অনেক শ্লোক এই দুজনের লেখা থেকে গৃহীত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য 'হিতোপদেশ' কত সাদরে গৃহীত হয়েছিল তা cole Brookes সাহেবের ভূমিকা থেকে জানা যায়—

> To promote and facilitate the study of the ancient and learned language of India, in the college of Fort William, it has been judged requisite to print a few short and easy composition in the original Sanskrit. The first work chosen for this purpose and inserted in the present volume under its title of *Hitopadesa* or 'Salutory Instruction'.…

'হিতোপদেশ' রচনা করার পূর্বে বিষ্ণুশর্মা 'পঞ্চতন্ত্র' রচনা করেন। দক্ষিণাত্যে মিথিলারোপ্য (পাঠান্তর মহিলারোপ্য) নগরের রাজা অমরশক্তির দুর্বিনীত তিন পুত্রকে শান্ত ও সুশিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুশর্মা 'পঞ্চতন্ত্র' ও পরবর্তী কালে ভাগীরথী তীরে পাটলীপুত্র নগরের সুদর্শন রাজার বিপথগামী পুত্রদের শিক্ষার জন্য 'হিতোপদেশ' রচনা করেন। 'হিতোপদেশ' গ্রন্থে যে সমস্ত শ্লোক আছে তা পঞ্চতন্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আহৃত হয়েছে।[২২] পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ'—এই দুই গ্রন্থের বিষয়বস্তু যে প্রায় একতা তারাকুমার কবিরত্নের 'হিতোপদেশ'-এর ভূমিকা থেকে জানা যায়।[২৩]

মূল 'হিতোপদেশ' গ্রন্থ ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্তৃক ও ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে তারাকুমার কবিরত্ন কর্তৃক বংগানুবাদসহ প্রকাশিত হয়।

পঞ্চনদের অন্তর্গত তক্ষশীলা নগরী চাণক্যের জন্মভূমি। চাণক্যের পিতার নাম চণক। চণকবংশে জন্ম বলে তিনি চাণক্য আখ্যা লাভ করেছেন। তবে বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য আরও বিভিন্ন নামে তিনি যে আখ্যাত হতেন

তা ভুবনচাঁদ দত্ত অনূদিত 'বোধিচাণক্যং' গ্রন্থের ভূমিকায় পাওয়া যায়।[২৪] চাণক্য সহস্র শ্লোকে রাজনীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। সম্ভবত কোন সংগ্রাহক ঐ বৃহৎ গ্রন্থ থেকে শ্লোক বেছে নিয়ে 'বৃদ্ধচাণক্য' সংকলন করেন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরের কেরি সাহেবের প্রধান পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার 'বৃদ্ধচানক্য' থেকে সারসংগ্রহ করে ১০৮টি শ্লোক ও একটি ফলশ্রুতি শ্লোকসমেত মোট ১০৯টি শ্লোক সমন্বিত 'লঘুচাণক্য' সংকলন করেন।[২৫] এই 'লঘুচাণক্য' অষ্টোত্তর শতশ্লোকী চাণক্য বলে কথিত। পরবর্তী কালে বিভিন্নজন এই অষ্টোত্তর শতশ্লোকী সংগ্রহের অনুবাদ করেছেন।

এ ছাড়াও তিব্বত ভুটান ও নেপাল অঞ্চলে 'বোধিচাণক্যং গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায়। নিমতলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশের শ্রীনাথ দত্তের প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি সংগৃহীত হয় ও ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে ভুবনচাঁদ দত্ত কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়।[২৬]

চাণক্যশ্লোক এদেশে যে কত আগ্রহে গৃহীত হয়েছে তা বিভিন্ন অনুবাদকের নব নব সংস্করণ থেকে জানা যায়। শৈশবে পিতামহ পৌত্রকে কোলে বসিয়ে চাণক্যশ্লোকে কণ্ঠস্থ করাতেন। কোন কোন পাঠশালায় এখনো চাণক্যশ্লোক পঠনের রেওয়াজ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ 'নবরত্নমালার'র প্রথম ও চতুর্থ ভাগে যে সমস্ত চাণক্যশ্লোক সংগ্রহ করেছেন এই অধ্যায়ের শেষে সংযোজিত 'মূলের সন্ধান' তালিকায় তা পাওয়া যাবে।

নবরত্নমালার বৈশিষ্ট্য

নবরত্নমালা প্রথম ভাগে ধর্ম ও নীতিবিষয়ক পদাবলী গ্রন্থনে প্রথমেই 'ইব্রাহিম ও অগ্নিউপাসক' কবিতাটি গ্রথিত হয়েছে। প্রচলিত সংকলন গ্রন্থের থেকে এখানেই সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য যে প্রথমেই পারসী কবিতার অনুবাদ করে গ্রন্থটির সূচনা করেছেন। আর ভিন্ন হলেও সাধনা এক, সব পথ মিলেছে গিয়ে সেই একের মাঝে। সুতরাং পরম ধর্ম। এটিই এই কবিতার মূল ভাব। কাহিনীটি নিয়েছেন পারস্যের মরমিয়া সুফী কবি সাদীর[২৭] জগৎ বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ বোস্তাঁ[২৮] থেকে। মেজর ম্যাকিননকৃত 'বোস্তাঁ'র ইংরেজি অনুবাদ 'Flowers from the *Bustan*'-এর সংগে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মেজর ম্যাকিননু লিখেছেন,

I've heard that for a week no traveller came

To taste the hospitality of Abraham ;

The saint in eating could no pleasure feel

Unless some weary wanderer shared the meal

Major W. C. Mackinnon · Flowers from the *Bustan*. p. 17.

S.A. Ranking, *Bustan* Book II-তে অনুবাদ করেছেন এভাবে :

I heard that for a whole week a single way-farer

Did not come to the Guest-house of Khalil··· (p. 4.)

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদটি ১৮২৪ শকের পৌষ সংখ্যা 'তত্ত্বোধিনী'তে ইব্রাহিম ও অগ্নিউপাসক' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে নবরত্নমালায় এটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

"দিন যায় সপ্তাহখানেক চলে যায়
অতিথির দেখা নাই অতিথিশালায়
ইব্রাহিম মহামতি ভাবিয়া অধীর
আমার আশ্রমে কেন না আসে ফকীর।"

সত্যেন্দ্রনাথ।

'Flowers from the *Bustan*'-এ-মেজর ম্যাকিনন্ এর অনুবাদে আছে :

" · bent with care

The snow of age upon his head and hair. p. 27".

সত্যেন্দ্রনাথ এখানে অনুবাদ করেছেন,

'ক্লিষ্ট ক্লান্ত শীর্ণকায় শুভ্র কেশপাশ।"

আবার মেজর ম্যাকিনন যেখানে লিখেছেন,

From all around responsive thanks are heard

The old men silent uttered not a word. p. 28.

সত্যেন্দ্রনাথ এখানে সহজ করে অনুবাদ করছেন,

"ভোজনের আগে সবে আল্লা নাম লয়
হেনকালে বৃদ্ধ খালি মৌনভাবে রয়।"

George S. A. Ranking '*Bustan*, Book II-তে যে অনুবাদ করেছেন তা থেকে মেজর ম্যাকিননের অনুবাদের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের মিল

বেশি তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তবে এখানে র‍্যাঙ্কিং-এর অনুবাদে "bism-Illah" শব্দের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের "আল্লা নাম লয়" অনুবাদটির সাদৃশ্য অধিক লক্ষিত হয়। Ranking-এর অনুবাদে এখানে আছে,—

When all of them began to pronounce the 'bism-Illah'
He did not hear from the old man the traditional saying.

Bustan, Book II, p. 5.

পারসীভাষায় সত্যেন্দ্রনাথের যে গভীর অনুরাগ ছিল তার প্রমাণ নানাভাবেই পাওয়া যায় ১৮২৭ শক তত্ত্ববোধিনী থেকে জানা যায়, মহর্ষি'র তিরোধানের পর ৩রা জ্যৈষ্ঠ তাঁর জন্মতিথি পালন উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা করেন ও মহর্ষি'র প্রিয়গ্রন্থ হাফেজ থেকে কয়েকটি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ করেছিলেন। তবে 'ইব্রাহিম ও অগ্নিউপাসক' কবিতাটি অনুবাদ করার সময় তিনি ইংরেজি অনুবাদগুলি থেকেই বেশি সাহায্য নিয়েছেন বলে মনে হয়।

নীতিবিষয়ক ২নং পারস্যের কবিতাটি এডুইন আরণল্ড রচিত With Sa'di in the Garden or The Book of Love—গ্রন্থের *Hatim Tai* অংশটির অনুসরণে রচিত। কবিতাটির নাম সত্যেন্দ্রনাথ দিয়েছেন "হাতেম তাই ও তাঁর দুলদুল ঘোড়া"। কবিতাটির শেষে লেখকের নাম দিয়েছেন এডুইন আরণল্ড। তবে কোন বই থেকে উৎকলিত তা না লেখায় আরণল্ডের বিবিধগ্রন্থ অনুসন্ধান করতে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদটি শুরু করেছেন একটি প্রচলিত নীতিবচন দিয়ে—

অর্ধরুটি যদি খায় ঈশ্বরের জন
তাহার অর্ধেক করে অন্যে বিতরণ।

এই নীতিবচনটি তিনি শৈশবে দেবেন্দ্রসভার বিদূষক নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছেন।[২১] এই শ্লোকটির মধ্যে যে স্বার্থত্যাগের মহত্ত্ব আছে তাতে সত্যেন্দ্রনাথ শৈশবেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নির্জন মরুপ্রান্তরে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতে অতিথিসৎকারের উদ্দেশ্যে হাতেম তাই-এর প্রিয় ঘোড়া দুলদুলের জীবনাবসানের করুণ কাহিনী পার্থিব ঐশ্বর্য ত্যাগের চেয়ে অনেক মহত্তর ও কষ্টসাধ্য।

দুর্যোগের রাতে দূরে-আলোকিত হাতেমের তাঁবু দেখে যে আনন্দ তা পিপাসার্ত পথিকের জিন্দা নদীর তীরে আসার তুল্য। আরণল্ড-এর অনুবাদে তা প্রকাশিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে জিন্দানদীর উপমা স্থান পায়নি।

আরণল্ড লিখেছেন,

> So to the Tribe of Tai the envoy went
> With ten to guard him, and at Hatim's camp
> ... ...
> As glad as who comes parched to 'Zinda's Banks'

Edwin Arnold : *With Sadi in the Garden* or 'The Book of Love' .p. 72.

সত্যেন্দ্রনাথ এখানে অনুবাদ করেছেন,—

> অতঃপর সম্রাট-সম্বাদবাহী দূত,
> দশজন সুসজ্জিত রক্ষক সহায়,
> বহুপথ অতিক্রমি, ঝড়বৃষ্টি বাতে,
> বিষম দুর্যোগ মাঝে উত্তরিল তথা
> হাতেমের ভাইবন্ধু নিবসে যেথায়।

নবরত্নমালা : পৃ. ৫।

এ ধরণের সামান্য পার্থক্য থাকলেও সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ আরণল্ড-অনুসারী হযেছে।

নবরত্নমালায় প্রথম ভাগের ৩নং কবিতাটি Longfellow র রচিত ***Psalm of Life***-এর সত্যেন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ। কবিতাটি ১৭৮৯ শকে বৈশাখ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী তে 'জীবনের জয়কীর্ত্তন' নামে প্রকাশিত হয়। এরপর সত্যেন্দ্রনাথের 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটকের শেষে ১৯৪২ সম্বতে কবিতাটি 'মনুষ্য-জীবন' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। নবরত্নমালায় প্রথম সংস্করণে (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) কবিতাটির নামের আবার পরিবর্তন হয় 'জীবনসংগীত'। কবিতাংশেও কিছু পরিবর্তন হয়।

যেমন ৬নং স্তবকে 'জীবনসংগীত'-এ 'বর্ত্তমান কার্যে সদা', 'জীবনের জয়কীর্ত্তন'এ ছিল—'উপস্থিত কার্যে সদা'। অষ্টম স্তবকে 'জীবনসংগীত' এ আছে—"ভগ্নহৃদয় অতি"; সম্ভবত আট মাত্রার পূর্ণ পর্ব বিরচনের জন্য এই পরিবর্তনটুকু করেছেন; নবম স্তবকে 'জীবনসংগীত'-এ আছে :

হবার যা হোক তাহা নাহি তাহে ডর
প্রাণপণে সাধ নিজ জীবনের কর্ম্ম।

"জীবনের জয়কীর্ত্তন"-এ ছিল :

যা হোক না কেন নাহি তাতে ডর
উঠে পড়ে সাধ নিজ জীবনের কর্ম্ম।

হেমচন্দ্রও 'জীবনসংগীত' নাম দিয়ে এই কবিতাটির অনুবাদ করেছেন। তবে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ যে অনেক মূলানুসারী হয়েছে তা দুজনের অনুবাদ পাশাপাশি রাখলেই বোঝা যায়। Longfellow-র নিম্নলিখিত স্তবকটির উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

Trust no future, howe'er pleasant !,
Let the dead past bury its dead !
Act-act in the living Present !
Heart within, and God O'erhead !

(*Psalm of Life*. p. 3).

হেমচন্দ্রের অনুবাদ :

মনোহর মূর্ত্তি হেরে ওহে জীব অন্ধকারে
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর
অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা করে হয়ো না কাতর। (জীবনসংগীত)।

সত্যেন্দ্রনাথ এই স্তবকের আরও আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন :

ভবিষ্য সুখের আশে হয়ো না চঞ্চল,
গতানুশোচনা ছাড় নাহি তাহে ফল

বর্ত্তমান কার্য্যে সদা থাকহ তৎপর
অন্তরে ভরসা রাখি উপরে ঈশ্বর। (জীবনসংগীত)।

নবরত্নমালায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা

নবরত্নমালা গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের অনূদিত দুটি কবিতার নীচে 'র' অক্ষরটি মুদ্রিত আছে। এই দুটি কবিতার একটি ন্যায়পথ—"নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা অথবা স্তবন" (প্রথম ভাগ ২য় সংস্করণ, ১৯নং কবিতা, পৃ. ১৯), অন্যটি শকুন্তলা সম্পর্কে গ্যেটের উক্তির ইস্টউইক-কৃত ইংরেজি অনুবাদের বাংলা রূপান্তর—

নব বৎসরের কুঁড়ি তারি এক পাতে
বরষ শেষের পক ফল[৩০]

শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ছন্দের দিক থেকে বিচার করে এই গ্রন্থে আরও কতকগুলি রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদের নিদর্শন পান ও রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করেন।[৩১] মাত্রাবৃত্ত ছন্দে :

"গর্জ্জিছ মেঘ নাহি বর্ষিছ জল…"
(নবরত্নমালা, ২য় সং, ৪র্থ ভাগ, ১০নং শ্লোক, পৃ. ৩৪৭।)
"উঠে যদি ভানু পশ্চিম দিকে…" (১ম ভাগ, ৭৬নং শ্লোক, পৃ. ৪৭।)
"সতের বচন লীলায় কথিত…" (৭৭নং শ্লোক, পৃ. ৪৭।)
"জলেতে কমল জল কমলে…" (৪র্থ ভাগ ৩২নং শ্লোক, পৃ. ৩৫৭।)

প্রচলিত পয়ার ছন্দের আট ছয় মাত্রার রীতির পরিবর্তে ছয় আট মাত্রার পর্ব বিন্যাসে রচিত :

"মনেও আনিনি তব অপ্রিয় কভু…"
(নঃ মাঃ ২য় সং, ৩য় ভাগ, ৫২নং শ্লোক, পৃ. ৩১৫।)
"কুসুমে খচিত কুঞ্চিত কালো কেশে…" (৫৩নং শ্লোক)
"হে প্রেয়সি, তবে উচিত তোমার ক্ষমা… (৫৪নং শ্লোক, ঐ।)
"ও মুখে অলক দোলে[৩২] মারুত ভরে…" (নঃ মাঃ ৩য় ভাগ, ৫৫নং শ্লোক)
"শর্ব্বরী পুন ফিরে পায় শশধরে…" (২য় ৫৬নং শ্লোক, ঐ।)
"সমসুখদুখ তব সঙ্গিনীজন…" (৬৫ নং শ্লোক, ঐ।)

"ধৃতি হল দূর, রতি শুধু স্মৃতিলীন…" (৬৬নং শ্লোক পৃ. ৩১৮।)
"গৃহিনী সচিব, রহস্য সখী মম…" (৬৭নং শ্লোক, ঐ।)
"তোমা বিনা আজ রাজসম্পদ ধনে…" (৬৮নং শ্লোক, পৃ. ৩১৯।)

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত :

"উদ্যোগী পুরুষসিংহ তারি জানি কমলা সদয়…"[৩৩] (১ম ভাগ, ৮৬নং শ্লোক),
"এক হাতে তালি নাহি বাজে…" (১০৮নং শ্লোক, পৃ ৫৯।)
"প্রিয় বাক্য সহ দান, জ্ঞানগর্ব্বহীন দান সহ ধন…" (১৩৮নং শ্লোক, পৃ. ৭১।)
"অর্থপরে বাক্য সরে লৌকিক যে সাধুগণ তাঁদের কথায়"

(নঃ মাঃ ২য় সং, ৩য় ভাগ, ৩নং শ্লোক, পৃ. ৩০১।)

"বাক্য আর অর্থসম সম্মিলিত শিব পার্ব্বতীরে" (১-১০নং শ্লোক, পৃ. ৩১০।)
"অসম্ভাব্য না কহিবে মনে মনে রাখিদিবে প্রত্যক্ষ যদিও তাহা হয়"

(৪র্থ ভাগ, ৫নং শ্লোক, পৃ. ৩৪৫।)

"কমল শেয়ালা মাখা তবু মনোহর…"[৩৪] (১ম সং, ঐ, পৃ ১৩৪।)
"আরম্ভে দেখায় গুরু ক্রমে হয় ক্ষীণকায়া…"

(২য় সং, ঐ, ৩৫নং শ্লোক,পৃ. ৩৫৮।)

উপযুক্ত অনুবাদগুলির তালিকা শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে[৩৫] পাওয়া যায়। কিন্তু 'রূপান্তর' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-কৃত আরও কয়েকটি অনুবাদের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি নবরত্নমালায় মুদ্রিত হয়েছে।

'সুখং বা যদি বা দুঃখং'—মহাভারতের এই শ্লোকের রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ

সুখ বা হোক দুখ বা হোক,
প্রিয় বা অপ্রিয়,
অপরাজিত হৃদয়ে সব
বরণ করিয়া নিয়ো।[৩৬]

নবরত্নমালায় সামান্য পাঠভেদ আছে—'দুখ' স্থলে 'দুঃখ', 'হৃদয়ে' স্থলে 'চিত্তে,' 'করিয়া' স্থলে 'করি'।

নবরত্নমালার তৃতীয় ভাগে ৭নং কবিতা ভবভূতির মালতী-মাধব-প্রস্তাবনায়

একটি শ্লোকের রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ। এই অনুবাদটি 'রূপান্তর' গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। "কী জানি মিলিতে পারে…"।

নবরত্নমালার ৩৪৬ পৃষ্ঠায় বররুচির নীতিরত্নমের "ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং" শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ 'রূপান্তর' গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

ভালোই করেছ, পিক,
চুপ করে রয়েছ আষাঢ়।
মৌনই সেথায় শোভে
ভেকেরা যেথায় ডাক ছাড়ে।

'নবরত্নমালা'য় সামান্য পাঠভেদ চোখে পড়ে—'করেছ' স্থলে 'করেছে', 'রয়েছ' স্থলে 'রয়েছে'।

নবরত্নমালা'য় গ্রথিত ভর্তৃহরির 'প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ…' শ্লোকটির অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ-কৃত বলে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন যুক্তিসংগত অভিমত দিয়েছেন[৩৭] ও রূপান্তরে অনুবাদটি নিম্নলিখিত ভাবে উদ্ধৃত করেছেন।

না হয় অসীম পেলে সম্পদ
তাতেই বা হল কী?…

নবরত্নমালায় সামান্য পাঠভেদ দৃষ্ট হয়—'কী' স্থলে 'কি'।

এই গ্রন্থে ৩০৮ পৃষ্ঠায় শকুন্তলার শ্লোকচতুষ্টয়ে 'বধূর প্রতি উপদেশ' অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে 'রূপান্তর' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।[৩৮] "সেবা কোরো গুরুজনে সপত্নীরে জেনো সখীসম," (রূপান্তর, পৃ. ৭৫)।

নবরত্নমালার দ্বিতীয় ভাগে প্রথম শ্লোকগুচ্ছে ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল, ১২১ সূক্তের যে অনুবাদটি সংকলিত হয়েছে, সেটি রবীন্দ্রনাথের রচিত বলেই 'রূপান্তর' গ্রন্থে সম্পাদক পুলিনবিহারী সেন প্রণিধানযোগ্য তথ্য পরিবেশন করেছেন।[৩৯] অনুবাদটির প্রথম পংক্তি :

"আত্মদা বলদা যিনি, সর্ববিশ্ব সকল দেবতা"…

নবরত্নমালার তৃতীয় ভাগে কুমারসম্ভবের 'ভুজংগমোন্নদ্ধজটাকলাপং' শ্লোকের বাংলায় অনূদিত রূপ পাওয়া যাচ্ছে

জড়ানো জটাকলাপে ভুজগ-বন্ধন
অক্ষমালা দুই ফের কাণেতে বেষ্টন

গ্রন্থিযুক্ত কৃষ্ণাজিন পরিধান গায়,
হয়েছে বিশেষ নীল কণ্ঠের প্রভায়।

মালতী পুঁথিতে রবীন্দ্রনাথকৃত এই শ্লোকের অনুবাদ আছে :

বদ্ধ তাঁর জটাজাল ভুজংগ বন্ধনে
কর্ণে তাঁর অক্ষসূত্র রয়েছে জড়িত
গ্রন্থিবদ্ধ কৃষ্ণসার হরিণ-অজিন
ধরিয়াছে নীলবর্ণ কণ্ঠের প্রভায় ॥

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে অন্তে মিল নেই, কিন্তু নবরত্নমালার অনুবাদে অন্ত্যানুপ্রাস আছে। 'কর্ণাবসক্ত দ্বিগুণাক্ষসূত্রং' পদটির অনূদিত রূপ নবরত্নমালায় আছে—'অক্ষমালা দুই ফের কাণেতে বেষ্টন'। সত্যেন্দ্রনাথের সতীর্থ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'কুমারসম্ভব' গদ্যানুবাদেও 'দুইফের' কথাটি পাওয়া যায়। এখানে, 'জটাকলাপ', 'অক্ষমালা', 'কৃষ্ণাজিন' ইত্যাদি তৎসম শব্দের মধ্যে 'দুই ফের' কথাটি একটু বেসুরো লাগলেও, অনুবাদকের মূলের প্রতি নিষ্ঠার এবং চলতি শব্দ প্রয়োগের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়।

মালতী পুঁথিতে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথকৃত 'কুমারসম্ভব'-এর অনুবাদের সঙ্গে নবরত্নমালার অনুবাদের কয়েকটি শব্দগুচ্ছের গভীর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেমন : 'লতাগৃহ দ্বারে নন্দী করি আগমন'—দুই অনুবাদেই এক।

নবরত্নমালা—'নিকম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর'

মালতী পুঁথির জীর্ণতাবশত আনুমানিক পাঠ বন্ধনী মধ্যে আছে—'[অমনি] নিষ্কম্প বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর।'

নবরত্নমালায়	মালতীপুঁথিতে
'নিবাত নিষ্কম্প শিখা, দীপ সম স্থির'	'নির্বাত নিষ্কম্প অগ্নি শিখার সমান'।
'আহা যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা'	'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মতো'। (৫৪)।
'যাঁর রূপরাশি হেরি লাজে মরে রতি'	'যাঁর রূপরাশি হেরি রতি লজ্জা পায়'।

'অকলঙ্ক সে উষারে নিরখিয়া তথি' 'অকলঙ্ক সে উষারে করি নিরীক্ষণ'।

'জিতেন্দ্রিয় শূলী-পরে স্বকার্য্য সাধিতে' 'জিতেন্দ্রিয় শূলীরেও বাণ সন্ধানিতে'। ৫৭নং।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কুমারসম্ভব'-এর অনুবাদের সংগে নবরত্নমালার অনুবাদের অনুরূপ সাদৃশ্য কোন কোন স্থানে দেখা যায়। যেমন নবরত্নমালায়—'তৃতীয় নয়ন হ'তে বহ্নি সহসা ছুটিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ—'তৃতীয় নয়ন হ'তে বহ্নিশিখা অমনি ছুটিল'।[৪০]

নবরত্নমালা দ্বিতীয় ভাগে দ্বিজেন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ

ব্রাহ্মধর্মের শ্লোকগুলিকে স্বল্পপরিসরে ভাবের সাদৃশ্য রেখে সজ্জিত করায় সত্যেন্দ্রনাথের সংকলনের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। নবরত্নমালা দ্বিতীয় ভাগে উপনিষদের বচনসংগ্রহে প্রথমাংশের ২ থেকে ২৬নং শ্লোক 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ প্রথম ভাগ থেকে ও দ্বিতীয়াংশে ১ থেকে ২১নং শ্লোক, ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 'অনুশাসনম্' থেকে উৎকলিত হয়েছে। ২ থেকে ২৬নং শ্লোকগুচ্ছে ৫নং মুদ্রিত হয়নি। দ্বিতীয়াংশে ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ-উৎকলিত প্রতিটি শ্লোককেই তিনি পৃথক্ শিরোনাম দিয়ে সাজিয়েছেন। যেমন, ২নং—'আত্মপ্রসাদ', ৩নং-'সাধনা' ৪নং-'কল্যাণব্রত', ৫নং-ঈর্ষা অনন্ত ব্যাধি', ৬নং—নির্বৈর', ১৩নং—'কৃতজ্ঞ. কৃতঘ্ন', ১৯নং –'অনুতাপ' ইত্যাদি।

উপনিষদের অমর বাণীগুলির মধ্যে যেখানে গুরু শিষ্যের কাছে ব্রহ্মের স্বরূপ, তাঁর নীরব শাসন ও সমগ্র বিশ্বময় তাঁরই প্রকাশ বর্ণনা করেছেন, সেই বাণীগুলির মধ্যে মহর্ষি তাঁর আপন হৃদয়ের কথা খুঁজে পেয়েছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা ছিল উপনিষদের এই অমরবাণীগুলির মর্ম উপলব্ধি করা ও তাঁর সাধনালব্ধ আনন্দের সংগে অন্যকেও পরিচিত করা। এই আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের ছায়ায় তাঁর পুত্রগণ বর্ধিত হয়েছিলেন বলেই এই মন্ত্রগুলির মর্ম অনুধাবনে অন্যকেও অনুপ্রাণিত করতে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থটি তাঁর 'কাব্যমালা' গ্রন্থে ১৩২৭ সালে সম্পাদক দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুনর্মুদ্রিত করেন। 'কাব্যমালা' গ্রন্থের প্রথমে

'প্রকাশকের নিবেদন'-এ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পষ্টই বলেছেন—"'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম'' পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদেশে মূল সংস্কৃত 'ব্রাহ্মধর্ম'' হইতে অনুবাদ করা হয়েছিল। উপনিষদের গভীর বাণীর এমন প্রাঞ্জল ও মধুর অনুবাদ দুর্লভ জানিয়া উহাও এই গ্রন্থভুক্ত করা হইল।"

'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম'' (১৩০৫) গ্রন্থখানি দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতা দেবেন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশে পিতৃপ্রভাবের কথাও উৎসর্গ পত্রে সুস্পষ্ট।

'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম'' থেকে শ্লোকচয়নে সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ উৎসাহ ছিল; কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনার অন্যতম রসগ্রাহী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনাগুলি যাতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় সেজন্য সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ ইচ্ছা ছিল। এ ব্যাপারে সম্পাদনার যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে তিনি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে করেছেন।[৪১]

'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম'' থেকে প্রায় শ্লোকেরই অনুবাদ নবরত্নমালায় হুবহু গৃহীত হয়েছে। কোন কোন স্থানে সামান্য পরিবর্তন চোখে পড়ে। কয়েকটি পরিবর্তন চোখে পড়ে। কয়েকটি পরিবর্তন দু এক স্থানে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ উল্লেখ করা হলো।

'পদ্যে ব্রহ্মধর্ম' গ্রন্থে		'নবরত্নমালা'য়
শব্দগুচ্ছের পরিবর্তন :—		
জ্ঞান তিনি ব্রহ্ম তিনি অনাদিঅনন্ত[৪২]	:	সত্যং জ্ঞানময় ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত
ওঁ বলিতে বুঝায় ব্রহ্ম যিনি সর্ব মূলাধার।[৪৩]	:	ওংকার ব্রহ্মনাম, ব্রহ্ম যিনি সর্ব মূলাধার।
সর্ব হৃদে নিবসেন দেখে যে সে দেখে।[৪৪]	:	সর্ব হৃদে নিবসেন—পরখি প্রত্যেক।
আলোক দেখিয়া তার খুলি যায় চোক।[৪৫]	:	প্রভুর প্রসাদে তার খুলি যায় চোক।
		উপনিষদের শ্লোকের 'প্রসাদাত্মহিমানমীশম্'[৪৬]-এই শব্দরাজির অনুবাদে 'প্রভুর প্রসাদে' শব্দের প্রয়োগ মূলানুসারী হয়েছে।

'পদ্যে ব্রহ্মধর্ম' গ্রন্থে	'নবরত্নমালা'য়
আত্মাতে দেখাই সার ভাবের কর্ণধার[৪৭]	: একান্ত প্রত্যয় সার ভবের কর্ণধার
সকল অধীশ্বর পালিছেন চরাচর লোকপুঞ্জ যতেক নিখিলে[৪৮]	: 'সকলের অধীশ্বর…'এই পরিবর্তনের : ফলে ত্রিপদীর ৮ মাত্রা আরও সুষ্ঠুতর : হয়েছে।
ঝাড়িয়া ফেলিয়া দুঃখ শোকে[৪৯]	: দূরে মেলি যত দুঃখ শোকে
গভীর গুহায় লীন দরশন সুকঠিন[৫০]	: …দরশনে সুকঠিন।
অনিল সলিল জ্যোতি, অশ্চরিজ তিনি[৫১]	: 'আশ্চরিজ' স্থানে 'আশ্চরজ'
ব্রহ্ম তিনি সারাৎসার সরব-মূলাধার[৫২]	: 'সকল মূলাধার'
একাকী দেখেন তিনি যাহার যা চাই[৫৩] বিধান করেন আর সেই অনু-যাই।	: 'অনুযাই' স্থলে 'অনুযায়ী' হয়েছে। এখানে শব্দ প্রয়োগ সার্থক হলেও, পয়ার ছন্দে 'অনুযাই' শব্দে অধিক মিল ছিল।
'মহান পুরুষ তিনি তুল্য তাঁর নাই[৫৪]	: 'তুল্য স্থানে 'তুলা' শব্দ প্রযুক্ত হয়ে ছন্দোগত ত্রুটি দূর করলেও শ্রুতি-সুখকর হয় নি।
মর্ত্য লোক ছাড়ি, মৃত্যু ফেলে ঝাড়ি[৫৫] অমৃত করিয়া পান।	: ছাড়ি মর্ত্য লোক কাটি মৃত্যুশোক : অমৃত করয়ে পান।

উপরের কমাচিহ্নের বিলুপ্তি

বাক্যেরে জাগা'ন যিনি অন্তর হইতে[৫৬]	: বাক্যেরে জাগান যিনি অন্তর হইতে।
দূর হইতে দূরে তিনি ছাড়া'য়ে আকাশ[৫৭]	: দূর হইতে দূরে তিনি ছাড়ায়ে আকাশ।
ব্রহ্মজ্ঞ সবা'র মাঝে তিনিই প্রধান।[৫৮]	: ব্রহ্মজ্ঞ সবার মাঝে তিনিই প্রধান।

ছন্দোগত পরিবর্তন

দ্বিপদী-একপদীতে।	অনাদিতে অনন্ত···
অনাদি অনন্ত যিনি মহান তিনিই সুখস্বরূপ।[৫৯]	সবাই করিছে···নবরত্নমালা অংশে ১ লাইনে অনাদি অনন্ত যিনি মহান তিনিই সুখস্বরূপ;
সবাই করিছে তাঁহার কাজ মহত্তর তিনি উদ্যত বাজে।[৬০]	সবাই করিছে তাঁহার কাজ মহত্তর তিনি উদ্যত বাজে।

পয়ার ছন্দকে ত্রিপদীর মতো সাজানো

পুত্র হতে প্রিয় ইনি বিত্ত হ'তে প্রিয়[৬১] নিখিল ভবসংসারে যত রমণীয়।	পুত্র হতে প্রিয় ইনি বিত্ত হতে প্রিয় নিখিল ভবসংসারে যত রমণীয়।

বানানে পরিবর্তন

আত্মারে দেখা চাই বিশ্বে মেলি আঁখি[৬২] : 'আত্মারে'······।'

মনোমাঝে ভাবা চাই তাঁরে অহরহ[৬৩] : 'মনমাঝে······।'

পাতাল গহ্বরে[৬৪] : পাতার গহ্বরে।

দেশজ শব্দের অনুসৃতি

তাঁরে ডিঙায় কারো সাধ্য নাই।[৬৫] : 'ডিঙায়' শব্দ সহ হুবহু রক্ষিত।

উপনিষদের বাণী চয়নের প্রথমাংশে—ব্রাহ্মস্তোত্র—'নমস্তে সতেতে জগৎকারণায়' দিয়ে শেষ হয়েছে। এই স্তোত্রের যে অনুবাদ গ্রথিত হয়েছে তা সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই করেছেন।[৬৬]

উপনিষদের বচন সংগ্রহের দ্বিতীয়াংশেও 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সংকলিত হয়েছে। কিছু কিছু পরিবর্তন ও হুবহু অনুসৃতি এই অংশে আছে।

'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে		'নবরত্নমালা'য়
সুখের প্রবাহ বহে লোভ তেয়াগিয়ে[৬৭]	:	'তেয়াগিলে'
কলেবর না করিয়া ক্ষীণ[৬৮]	:	যোগে তনু না করিয়া ক্ষীণ— ইত্যাদি।

কথ্য শব্দের অনুসৃতি

বাঁটিয়া খায়, দিতে থুতে ভালবাসে, ঠিক ঠাক বলিব, ইন্দ্রিয়ের পাছু পাছু, খাবার ধায় ইত্যাদি হুবহু রক্ষিত।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা সত্যেন্দ্রনাথের খুবই ভালো লাগত, সেজন্য যথাসম্ভব স্বল্প পরিবর্তন করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অনুবাদগুলি তিনি নবরত্নমালায় গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থের ১ম ভাগে নীতিবিষয়ক পদাবলীতেও 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ থেকে বহু অনুবাদ উদ্ধৃত হয়েছে। পরিবর্তন যা করেছেন, তার মধ্যে ছন্দসৌকর্য, ভাষার লালিত্য ও আধুনিকতার প্রতি তাঁর অনুরাগ দেখা যায়।

উপসংহার

নবরত্নমালা সংকলনে সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন শাস্ত্রতত্ত্ব ও নীতিবাক্যগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলা। সেজন্য বিভিন্ন ভ্রাতাদের অনূদিত যে শ্লোকগুলি তাঁর উৎকৃষ্ট বলে মনে হয়েছে—সেগুলি তিনি এই সংকলনে গেঁথেছেন। সকলের প্রতিটি রচনাকে নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়তো তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নি; কারণ গ্রন্থের ভূমিকাতেই অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে নবরত্নমালা সমৃদ্ধ, সেকথা নিজেই ব্যক্ত করেছেন। অনুজদের রচনার ছায়ায় আত্মপ্রচারের তাঁর কোন বাসনা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রচারে সত্যেন্দ্রনাথ একজন বড় অগ্রণী ছিলেন।[৬৯] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা অত্যন্ত স্নেহ মধুর।[৭০] 'বোম্বাই চিত্র' গ্রন্থের মতো বৃহৎ রচনা প্রকাশের পরেও সত্যেন্দ্রনাথের মনে বিন্দু মাত্র অহমিকা স্থান পায় নি। 'বোম্বাই চিত্র' রচনার প্রেরণাদাতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথকেই তিনি পরম মূল্য দিয়েছেন। এমন কি গ্রন্থটির স্থানে স্থানে যে রবীন্দ্রনাথের 'হস্তচিহ্ন' বর্তমান

সেকথাও উৎসর্গপত্রে স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেছেন। স্বীকৃতি প্রকাশে তিনি যে কতো অকুণ্ঠ ছিলেন এর দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়।

এই গ্রন্থের বিষয় বৈচিত্র্য, নামকরণ, সমকালীন নীতিবিষয়ক ও উদ্ভট শ্লোক সংকলনে সত্যেন্দ্রনাথের একটি সাহিত্যানুরাগী পরিশীলিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ও ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা গ্রন্থটিকে সুসমৃদ্ধ করেছে। সমকালীন সংকলন গ্রন্থগুলির তুলনায় নবরত্নমালা একটি সুচিন্তিত বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

---

১. মালা—মণিরত্নমালা, কাব্যমালা প্রবাদমালা, ব্রতমালা, উৎপলমালা।
হার—নীতিরত্নহার রত্ন—নীতিরত্ন সাগর—উদ্ভটসাগর।
রত্নাকর—পদ্যরত্নাকর কবিতারত্নাকর ইত্যাদি।

২. ধন্বন্তরি ক্ষপণকামর সিংহশঙ্কু।
বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নববিক্রমস্য।'—নবরত্নানি। হেবরলিন কাব্য-সংগ্রহে প্রাপ্ত পৃ. ১।

৩. পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর প্রণীত 'উদ্ভটসমুদ্র'; পৃ. ২৯।

৪. "ভারতভূমি প্রকৃতই একটি রত্নাকর।...এক একটি কবি এই রত্নাকরের এক একটি মহোজ্জ্বল ও মহামূল্য রত্ন।"—উদ্ভট শ্লোকমালাঃ পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর—ভূমিকা।

৫. পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেজদাদা তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে নবরত্নমালার পরিবর্তন ও সংশোধন কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে বেলা নয়টা হইতে দশটা পর্যন্ত নিয়মিত একত্রে আমার সহিত এ কাজটি করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহার জীবদ্দশায় ইহা সমাগত করিয়া পুনঃপ্রকাশের ভার আমাকে দিয়া যান। আজ আমি তাঁহার দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে তাহা সমাধা করিয়া তাঁহারি শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। প্রণতা
তারাবাস, বালীগঞ্জ, জানুয়ারী ১৯২৫। শ্রীমতী প্রিয়ংবদা দেবী।

৬. প্রথম ভাগ : শকুন্তলা থেকে ১৮ (নম্রতা) ৪৭ (পরোপকার), ৬০ (উদয়াস্ত)। তুকারামের অভঙ্গ থেকে নম্রতা (১৮ নং) বিষয়ের দুটি শ্লোক)।

৭. সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমশ্চাপি সজ্জনৈঃ ॥

৮. চতুর্থ ভাগঃ ৭৪নং শ্লোক—ঔষধাদি, ৭৫নং—জ্বরহর, ৭৬নং—বারি, ৭৭নং—বৈদ্যের কি প্রয়োজন,

৯. অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ ॥

১০. অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ ॥

অজর অমর জ্ঞান করি আপনারে বিদ্যা আর অর্থ যবে করে উপার্জ্জন
বিজ্ঞজন বিদ্যা অর্থ চিন্তিবে সংসারে স্বয়ং অমর ভাবে বুদ্ধিমান জন।
মৃত্যু আসি যেন কেশ করিছে কর্ষণ ধরেছে চুলের ঝুঁটি এসে যেন যম
ইহা ভাবি করিবে সে ধর্ম আচরণ। ধর্মকার্য্য হেতু তাঁর ইহাই নিয়ম ॥

নবরত্নমালা : সত্যেন্দ্রনাথ—। পৃ ৪৪। উদ্ভট সমুদ্র : পূর্ণচন্দ্র দে—। পৃ. ১১০।

১১. সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্—কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব সম্পাদিত আখ্যাপত্রে মুদ্রিত কোলরিজের উক্তি।

১২. চতুর্থ ভাগ ১১নং…"পয়োদ হে…"।

১৩. যেমন—"উষ্ট্রাণাংচ বিবাহেষু গীতং গায়ন্তি গর্দভাঃ।" ১নং ৪র্থ ভাগে
"অসার খলু সংসারে সারং শ্বশুর মন্দিরম্।" ৭৮ নং ঐ ইত্যাদি।

১৪. "ইউরোপীয়গণের মধ্যে ৺কাশীধামস্থ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এ. ভিনিস সাহেব, কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সী কলেজের

প্রিন্সিপ্যাল পি. টনি সাহেব, বোম্বাই এলফিন্‌ষ্টোন্‌ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পি. পিটার্স'ন সাহেব এবং লণ্ডননগরস্থ জে. বি. চেম্বারলেন সাহেবের সহিত 'উদ্ভট কবিতা' সম্বন্ধে আমার অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছিল। তাঁহাদের সংস্কৃতভাষায় জ্ঞান যেরূপ অধিক ছিল, উদ্ভটকবিতার প্রতি অনুরাগ তদপেক্ষা অধিক ছিল।"—'উদ্ভট শ্লোকমালা'—পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর—ভূমিকা।

১৫. "প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও পরম ভক্তিভাজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের···নিকট হইতে প্রথমত প্রায় ২৫০টী উদ্ভট কবিতা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তৎপরে মহারাজ বাহাদুর স্যার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর মহোদয়ের স্বর্গীয়া জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে সমাগত অধ্যাপকগণের নিকট হইতে প্রায় ২৫০০ উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ করি। অদ্যাবধি প্রায় ৪২০০০ (বিয়াল্লিশ সহস্র) উদ্ভট কবিতা···আমার হস্তগত হইয়াছে।"—'উদ্ভট সমুদ্র' পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর—ভূমিকা।

১৬. ভূমিকা—পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর সংকলিত 'উদ্ভট-শ্লোক-মালা' ও 'উদ্ভটসাগর' (দেবনাগরীতে) লিখিত।

১৭. ভূমিকা—'উদ্ভট শ্লোকমালা' ও 'উদ্ভটসাগর' (দেবনাগরী) উক্ত তথ্যের সমর্থনে তিনি বুলার সাহেবের গ্রন্থসূত্র নির্দেশ করেছেন—"বুলার সাহেব মহাশয়ও 'কাশ্মীর রিপোর্ট'' নামক গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন উদ্ভট ভট্ট কাশ্মীরাধিপতি জয়পীড়ের নিকট হইতে প্রত্যহ একলক্ষ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রাপ্ত হইতেন।"—ভূমিকা: উদ্ভট-শ্লোক-মালা।

১৯. "Udbhata came after Bhamaha and preceded Ananda-bardhan."—Introduction : 'কাব্যালংকার সার সংগ্রহ', উদ্ভটাচার্য প্রণীতঃ।

১৯. "Udbhata was evidently a born Kashmirian as his name clearly shews".—(G· Buhler's report of a tour in Kashmir : J. P. B. R. A. S. Extra No. of 1877 p. 64-65). —নারায়ণ দাস বানহাট্টী সম্পাদিত 'কাব্যালংকার সারসংগ্রহ'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২০. পুরাতনী—৭৭নং পত্র।

২১. "This compilation of Sanskrit proverbs which have grown into popular use among the natives of Bengal was made by Baboo Neelratna Haldar, and an edition printed at his own private press. A second edition appearing desirable, I have inserted a translation of them into English with the hope of aiding the researches of our countrymen, into the popular language of Bengal." J. C. M. Serampore March 1233.—কবিতা রত্নাকর ১২৭৯ সাল, ৩য় সংস্করণের সঙ্গে মুদ্রিত।

২২.

Pañcatantrāt	*tathā*	*anyasmāt*	*granthat*	*a-kriśha*	
from the panchatantra	and like wise	from another	book	having drawn	
					likhyate is written

Max Muller : The First Book of the Hitopodesa. p.3

২৩. "পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি তন্ত্র অর্থাৎ পরিচ্ছেদ—(১) মিত্রভেদ, (২) মিত্রপ্রাপ্তি, (৩) কাকলূকীয়, (৪) লব্ধপ্রণাশ, (অপরীক্ষিত-কারক। হিতোপদেশের চারিটি পরিচ্ছেদ, যথা (১) মিত্রলাভ, (২) সুহৃদ্ভেদ, (৩) বিগ্রহ, (৪) সন্ধি।

পঞ্চতন্ত্রের 'মিত্রভেদ' হইতে হিতোপদেশের 'সুহৃদ্‌ভেদ'···পঞ্চতন্ত্রের 'মিত্রপ্রাপ্তি' হইতে হিতোপদেশের 'মিত্রলাভ' সংকলিত। হিতোপদেশের 'বিগ্রহ'ও 'সন্ধি' এবং আনুষাংগিক অন্যান্য গল্প পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি তন্ত্র হইতেই আবশ্যকমত সংকলিত হইয়াছে।"—তারাকুমার কবিরত্ন—ভূমিকা : 'হিতোপদেশ'।

২৪. বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ
দ্রাবিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽংগুলশ্চ সঃ।

Preface—বোধিচাণক্যং।

২৫. "সুপ্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত ৺জয়গোপাল তর্কালংকার মহাশয় এই গ্রন্থ-

খানির (লঘুচাণক্য) সংকলয়িতা। ইনিই শ্রীরামপুরে কেরীসাহেবের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।"—চাণক্যশ্লোক'—পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর ২য় সংস্করণ—প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

২৬. Bengali transcript of the same was obtained from Tirhutian recension by the late Baboo Srinath Dutt, the venerable head of the Nimtolah Dutt family.—preface: বোধিচাণক্যং।

২৭. "Shaikh Muslihu-D-Din Sadi Shirazi was born in Shiraz about the year 571 H (A. D. 1175-1176)…entered the Nizāmiya College of Baghdad. His teachers were Abul Faraj bin Jauzi and Shihābuddin Suhrawardi… under their influence he became a Sufi." - George S. A. Ranking—Preface: Bustan, Book II. (Eng. translation)

২৮. সত্যেন্দ্রনাথ 'নবরত্নমালা'য় 'ইব্রাহিম ও অগ্নিউপাসক' কবিতাটির উৎসের সন্ধান দিয়েছেন 'সাদী-বোস্তন'। জাতীয় গ্রন্থাগারের পার্সিয়ান ডিপার্টমেণ্টের কর্মাধ্যক্ষের মতে উচ্চারণটি হবে 'বোস্তা'।

২৯. আমার বাল্যকথা, পৃ. ১৫। বৈতানিক প্রকাশনী।

৩০. সত্যেন্দ্রনাথ নবরত্নমালায় গোটের উক্তির ইংরেজি ও সংস্কৃত অনুবাদ দুটি উদ্ধৃত করেছেন :—

"Wouldst thou the young years blossoms…"—ইস্ট উইক্।

"বাসন্তং মুকুলং ফলঞ্চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্বং চ তৎ…"

—তারাকুমার ন্যায়রত্ন (নবরত্নমালা, ৩য় ভাগ, কবি ও কাব্য, পৃষ্ঠা ৩০৪-৩০৫, ১০নং কবিতা)।

৩১. "মুলক্ত ছন্দের উপর নির্ভর করিয়া, নবরত্নমালায় কোন্ কোন্ কবিতা রবীন্দ্রনাথের হইতে পারে তৎসম্পর্কে আমি এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি। সেই প্রবন্ধও নবরত্নমালা গ্রন্থখানি আমি বিশ্বভারতীর সহকারী কর্ম-সচিব শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সাঁতরা মহাশয়ের হাতে কবির নিকট পাঠাইয়া দিই। আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার পুস্তকে কবি নিজে

তাঁহার কৃত অনুবাদগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন।" শ্রীজগদীশ—ভট্টাচার্য্য : 'নবরত্নমালায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা'—প্রবাসী, ১৩৫৪ ভাদ্র।

৩২. নবরত্নমালা ১ম সংস্করণে পাঠান্তর—

"ও মুখে অলক দোলে যে মারুতভরে"

পুলিনবিহারী সেন সংকলিত "রূপান্তর" গ্রন্থে এই পাঠই পাওয়া যাচ্ছে। (দ্র পৃ. ৬১)

'রূপান্তর' গ্রন্থপরিচয় তিনি সন্ধান দিয়েছে, রঘুবংশের অন্যান্য শ্লোকসহ এই শ্লোকের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ১৩১২ পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। স্বাক্ষরবিহীন এই অনুবাদগুলিকে তিনি সম্পাদককৃত বলে অনুমান করেছেন এবং উক্ত মত প্রতিষ্ঠায় শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য লিখিত বৈজয়ন্তী পত্রিকায় ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ ও পৌষসংখ্যায় প্রকাশিত "কয়েকটি অনুবাদ" প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। ১৩১২ সালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশের পর ১৩১৪ সালে নবরত্নমালা ১ম সংস্করণে ঐ পাঠ মুদ্রিত হয়।

৩৩. ঘটকর্পর বিরচিত 'নীতিসার' থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন। নবরত্নমালার এই অনুবাদটি ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই শ্লোকের আরও তিনটি অনুবাদ রূপান্তর গ্রন্থে (পৃ. ৮৪-৮৫) পাওয়া যায় :—

"সেই তো পুরুষ সিংহ উদ্যোগী যে জন"—শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩২ কার্তিক সংখ্যা।

"লক্ষ্মী সে পুরুষসিংহে করেন ভজন…"—পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত।

"উদ্যোগী পুরুষ বলবান…"—বুধবার পত্রিকা, ১৩২৯, ৫ই পৌষ সংখ্যা। (গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ২১৫)।

৩৪. দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম পংক্তিতে পাঠান্তর দৃষ্ট হয় :—

"কমল শৈবালবিদ্ধ তবু মনোহর"; অন্য পংক্তিগুলি হুবহু এক আছে। 'রূপান্তর' (পৃ. ৭১)-এ রবীন্দ্রনাথের এই শ্লোকের অনুবাদ ১ম সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে আর একটি পাঠান্তরও আছে।

৩৫. 'নবরত্নমালায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা'। প্রবাসী, ১৩৪৫ ভাদ্র।

৩৬. 'রূপান্তর', পুলিনবিহারী সেন পৃ. ৪১।
গ্রন্থপরিচয়ে শ্রীসেন জানিয়েছেন—শ্লোকটি "মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত ৯ই কার্তিক ১৩১১ পত্রের অন্তর্গত ;...১৩৪৮ সনে পত্রপ্রাপক-কর্তৃক স্মৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।"—রূপান্তর, পৃ. ২০৭।

৩৭. রূপান্তর, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ২২৭।

৩৮. এই অনুবাদ বৈজয়ন্তী পত্রের পৌষ সংখ্যা হইতে গৃহীত। নবরত্ন-মালাতেও (১৩১৪) আছে।—রূপান্তর, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ২২১।

৩৯. রূপান্তর, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ২০৫—"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮১৫ শক (খ্রী. ১৮৯৪) ফাল্গুন সংখ্যায় ইহা বিনা নামে প্রকাশিত হইলেও সূচীপত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম আছে। নবরত্নমালায় বিনা স্বাক্ষরে পুনর্মুদ্রিত। দ্রষ্টব্য শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" প্রবন্ধ, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৯।"

৪০. বসুমতী সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর পরিশিষ্টে 'কুমারসম্ভব' তৃতীয় সর্গের অনুবাদ থেকে প্রাপ্ত।

৪১. বড়দার এই লেখাগুলি উদ্ধার হয় আমার অনেক দিনের সাধ...দুটি লোক আমার মনে হচ্ছে—তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান সুধীন্দ্রনাথ এবং পৌত্র শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ, এরাই ভারগ্রহণের অধিকারী। আমার বাল্যকথা, পৃ. ৪৬—

৪২. পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

৪৩. ঐ ঐ ১০ম অধ্যায়।

৪৪. ঐ ঐ ৮ম অধ্যায়।

৪৫. ঐ ঐ ৮ম অধ্যায়।

৪৬. অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্...শ্লোকের অন্তর্গত। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ ১ম খণ্ড, ৮ম অধ্যায়ে উৎকলিত। শ্লোকটির মূল শ্বেতাশ্বেতর উপনিষৎ ৩।২, অপিচ কঠোপনিষৎ দ্বিতীয় বল্লীর ২০নং শ্লোক (সামান্য পৃথক্)।

৪৭. পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম ১ম খণ্ড, ৯ম অধ্যায়।

৪৮. ঐ ঐ, ৭ম „ ।

৪৯. পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম ১ম খণ্ড, ১২শ অধ্যায়।

৫০. ঐ ঐ , ৭ম অধ্যায় ।
৫১. ঐ ঐ , ৮ম অধ্যায় ।
৫২. ঐ ঐ , ঐ ।
৫৩. ঐ ঐ , ঐ ।
৫৪. ঐ ঐ , ঐ ।
৫৫. ঐ ঐ , ৪র্থ অধ্যায় ।
৫৬. ঐ ঐ , ঐ ।
৫৭. ঐ ঐ , ৬ষ্ঠ অধ্যায় ।
৫৮. ঐ ঐ , ঐ ।
৫৯. পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম ১ম খণ্ড, ১৪শ অধ্যায় ।
৬০. ঐ ঐ ৩য় অধ্যায় ।
৬১. ঐ ঐ ৯ম অধ্যায় ।
৬২. ঐ ঐ ৯ম অধ্যায় ।
৬৩. ঐ ঐ ৯ম অধ্যায় ।
৬৪. ঐ ঐ ১৪শ অধ্যায় ।
৬৫. ঐ ঐ ৯ম অধ্যায় ।
৬৬. সাধারণ ব্রহ্মোপাসনার ছন্দানুবাদ—শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ।
৬৭. টীকা—পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম ২য় খণ্ড, ১০ম অধ্যায় ।
৬৮. ঐ পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম ঐ ১৪শ অধ্যায় ।
৬৯. দ্র. এই গবেষণার শিল্পী-সত্তা অধ্যায় : আবৃত্তি ।
৭০. দ্র. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অবদান ।

নবরত্নমালার শ্লোকাবলীর মূলের সন্ধান
ও বিবিধ সঙ্কলন গ্রন্থের সূত্র

১ম ভাগ

১	ইব্রাহিম ও অগ্নি উপাসক	:	*Flowers from the Bustan* : W. C. Mackinnon.
২	হাতেমতাই ও তাঁহার দুল-দুল ঘোড়া	:	With Sa'di in the garden or *The Book of Love* : Edwin Arnold.
৩	জীবনসংগীত	:	*The Psalm of Life* : Longfellow.
৪	জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ	:	মহাভারত : উদ্যোগ পর্ব
৫	সর্বোপনিষদো গাবো	:	গীতামাহাত্ম্য : শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা
৬	মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ	:	গীতা : অষ্টাদশ অধ্যায় (মুদ্রণ প্রমাদে নবরত্নমালায় ৬৫, ৬৬ নং শ্লোক ৫৫, ৫৬ হয়েছে ।)
৭	নিন্দসি যজ্ঞ বিধে	:	গীতগোবিন্দ : জয়দেব ।
৮	অনেক জাতি সংসারং	:	বুদ্ধত্বলাভে বুদ্ধদেবের উক্তি ।
৯	দেখ গো মগধরাজ্য হল ছারখার	:	বুদ্ধদেবের প্রতি ব্রহ্মার নিবেদন । 'বৌদ্ধধর্ম'-গ্রন্থ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
১০	শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি	:	বেদান্তসার : শংকরাচার্য ।
১১	জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি	:	বৃদ্ধ চাণক্য : পণ্ডিত শ্রীরামশাস্ত্রী প্রণীত ৩২২ পৃষ্ঠায় পাঠভেদ দৃষ্ট হয়—কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন' ।
১২	ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং	:	গীতা : অষ্টাদশ অধ্যায় : ৬১ শ্লো
১৩	তৃষ্ণাং ছিন্ধি, ভজ ক্ষমাং	:	হেবরলিন্-কাব্যসংগ্রহ পৃ. ২৪৪এ

			উদ্ধৃত—নীতিশতকম্‌ ভর্তৃহরি ৫০ শ্লোক।
১৪	ক্ষান্তিতুল্যং তপোনাস্তি	:	চাণক্য শ্লোক। পাঠান্তর আছে—'শান্তিতুল্যং'।
১৫	কো নরকঃ পরবশতা	:	হিতোপদেশ।
১৬	ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ	:	হেবরলিন-কাব্যসংগ্রহ। শান্তিশতকম ৩নং শ্লো. শুকাণ্টকম্‌ ১নং শ্লো. পরমহংস শুকদেব বিরচিতম্‌। পৃ. ২৪
১৭	ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং	:	উদ্ভটসমুদ্র : পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর পৃ. ১৪।
১৮	ভবন্তি নম্রস্তরবঃ ফলোদ্গমৈঃ	:	অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌ ৫।১২
	ক নম্রতা প্রভুর দান	:	তুকারামের অভংগ।
	খ দীনতা নম্রতা দেহ গো	:	ঐ
১৯	নিন্দন্তু নীতিনিপুণা	:	ভর্তৃহরি নীতিশতকম। (রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ)
২০	ভোগ রোগভয়ং	:	উদ্ভটসমুদ্র : পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর : অষ্টরত্নম্‌ অধ্যায় পৃ. ২৯
২১	অবশ্যং যাতার শ্চিরতর	:	কাব্যসংগ্রহ : বিষয়পরিত্যাগ। বিড়ম্বনা। বৈরাগ্যশতকম্‌ ভর্তৃহরি বিরচিত।
২২	ধনানি জীবিতং চৈব	:	হিতোপদেশ।
২৩	প্রাপ্তা শ্রিয়ঃ···	:	ভর্তৃহরি, বৈরাগ্যশতকম্‌—যতি-নৃপতি সংবাদ।
২৪	ঐশ্বর্য তিমিরং চক্ষু		
২৫	জরামরণ দুঃখেষু	:	
২৬	ভিক্ষাশনং তদপি নীরস	:	ভর্তৃহরিঃ বৈরাগ্যশতকম ১৬ শ্লো. শান্তিশতকম ২৩ শ্লোক।
২৭	ভোগান ভোক্তা বয়মেব ভুক্ত	:	বাক্যসংগ্রহ পৃ. ২৫৪ ভর্তৃহরি

রচিত বৈরাগ্যশতকম্ থেকে উদ্ধৃত।

২৮ ব্রহ্মজ্ঞান বিবেক নির্মলধিয়ঃ : বৈরাগ্য শতকম্ : ভর্তৃহরি। ৬৩ শ্লোক 'বিষয়পরিত্যাগ বিড়ম্বনা।' সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

২৯ বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি : শান্তিশতকম্। বিবেকোদয় নাম ২য় পরিচ্ছেদ ৩০নং শ্লোক। সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্।

ক ন জাতু কামঃ কামানামুপ-ভোগেন শাম্যতি : মনুসংহিতা ২।৯৪

খ যে পাপানি ন কুর্বন্তি মনো-বাক্-কর্ম-বুদ্ধিভিঃ : মহাভারত, বনপর্ব ১৯৯।৯৮

৩০ ধৈর্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী : শ্লোকমালা, অঘোরনাথ ভট্টাচার্য পৃ. ৩৪

৩১ অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষাং : হেবর্লিন কাব্যসংগ্রহ। পৃ. ২৬৩ ভর্তৃহরি রচিত বৈরাগ্যশতকম যতি নৃপতি সম্বাদঃ ৫৫নং শ্লোক।

৩২ বেদান্ত বাক্যেষু সদারমন্তো : যতিপঞ্চকম্—শংকরাচার্য।

৩৩ ভূঃ পর্যংকো নিজভুজলতা : বৈরাগ্যশতকম্ : ভর্তৃহরি (অবধূত চর্যা)।

৩৪ আশানাম নদী মনোরথজলা : হেবরলিন কাব্যসংগ্রহ। পৃ. ২৫৪তে প্রাপ্ত ভর্তৃহরি রচিত বৈরাগ্য শতকম্ তৃষ্ণাদূষণম অধ্যায়, শ্লোক নং ২১

৩৫ প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা : সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম পৃ. ১৬৯

৩৬ কশ্চিৎ পুমান্ ক্ষিপতি : শান্তিশতকম্ কর্তব্যোপদেশ নাম ৩য় পরিচ্ছেদ।

৩৭ মন্নিন্দয়া যদি জনঃ পরিতোষ- : ঐ

৩৮	সুখ্যং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে	মনুসংহিতা ২।১৬৩
৩৯	ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং	সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্ ৫৩ পৃ. ২২৯ শ্লোক, সজ্জন-প্রশংসাঃ ভট্টবাণস্য।
৪০	অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি	মনুসংহিতা, ৪।১৭৪
৪১	যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা	মেঘদূত : পূর্বমেঘ ৬
৪২	বরমসিধারা তরুতলবাসো	কবিভট্টকৃত পদ্যসংগ্রহ।
৪৩	প্রিয়া ন্যায্যা বৃত্তি	হেবরলিন কাব্যসংগ্রহ—পৃ. ২৫৮-এ প্রাপ্ত নীতিশতকম—ভর্তৃহরি ১৩ শ্লো. (সামান্য পাঠভেদ আছে)
৪৪	বহ্নিস্তস্য জলায়তে	ঐ কাব্যসংগ্রহ—পৃ. ২৪৯—নীতিশতকম্ ভর্তৃহরি।
৪৫	আধি ব্যাধিশতৈর্জনস্য	বৈরাগ্যশতক : বাগেশ্বর বিদ্যালংকার—পৃ. ২০ অপিচ—সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারের পরিশিষ্ট পৃ. ৩০০ 'ভূমিধরস্য' বলে উল্লিখিত।
৪৬	বয়মিহ পরিতুষ্টা বল্কলৈস্ত্বং দুকূলৈঃ	বৈরাগ্যশতক : ভর্তৃহরি। (যতি নৃপতি সংবাদ)
ক	সর্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসং	হিতোপদেশ : (মিত্রলাভঃ) তারাকুমার কবিরত্ন সংকলিত পৃ. ৫৯
খ	শতং দদ্যান্নবিবদেৎ	হিতোপদেশ (বিগ্রহঃ) তারাকুমার কবিরত্ন সংকলিত। শ্লোক নং ৩৪ পৃ. ১৭৫

৪৬ ১মং সংস্করণে মুদ্রণ প্রমাদে '৪৪' হয়েছে। ২য় সং পৃ. ৩২এ ৪৫, ৪৬নং দুবার ছাপা হয়েছে। নম্বর মেলাবার জন্য ৪৬, ৪৬ক, ৪৬খ করা গেল।

৪৭	স্ব সুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ	অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৫।৭
৪৮	তে তে সৎপুরুষা পরার্থ ঘটকাঃ	পূর্ণচন্দ্র দে রচিত। উদ্ভটসাগর (নাগরী) পৃ. ১০৪ দুর্জন নিন্দা।
[২]৪৯	প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন	সুভাষিত-রত্নখণ্ড-মঞ্জুষায় পাঠভেদ দৃষ্ট হয়।
৫০	অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং	চাণক্য শ্লোকঃ পণ্ডিত জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত পৃ. ৪৬।
৫১	মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু	চাণক্য শ্লোক—পণ্ডিত জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত পৃ. ৩ চাণক্যশ্লোক, পণ্ডিত রামপদ ভট্টাচার্য সংকলিত পৃ. ১৫। ব্রাহ্মধর্মঃ গ্রন্থ দশম সং দ্বিতীয় খণ্ড, একাদশ অধ্যায় ৯৫ নং শ্লোক। সামান্য পাঠভেদ আছে। মূল—আপস্তম্ব সংহিতা ১০।১১
	ক যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা	দক্ষসংহিতা ৩ ২০। দ্র. ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ পৃ. ২৪৯ দশম সং।
৫২	ক্ষণঃ বালোভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ	বৈরাগ্য-শতকম : ভর্তৃহরি (যাজ্ঞা দৈন্যদূষণম্)।
৫৩	ব্যাঘ্রীবতিষ্ঠতি জরা	বৈরাগ্যশতকম্ : ভর্তৃহরি ঐ
৫৪	ভেকোধাবতি তং চ ধাবতি ফণী	পূর্ণচন্দ্র দে রচিত উদ্ভটসাগর (নাগরী) 'কালচরিত্রম' অধ্যায় পৃ. ১৩০।
৫৫	বয়ং যেভ্যোজাতাশ্চির পরিগতা	বৈরাগ্যশতক : বাণেশ্বর বিদ্যালংকার পৃ. ৩১ শ্লোক ৪৫।

২ ১ম সংস্করণে প্রমাদে ৪৯ স্থলে ৫৯ হয়েছে।

৫৬	আকাশমুৎপততু গচ্ছতু বা	:	শান্তিশতকম, কর্তব্যোপদেশঃ
৫৭	যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং	:	হিতোপদেশ : তারাকুমার কবিরত্ন
৫৮	আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতি-দিনং	:	উদ্ভটচন্দ্রিকা : চন্দ্রমোহন তর্করত্ন পৃ. ৬৫ অপরাধভঞ্জন স্তোত্রম, শংকরাচার্য
৫৯	প্রিয়ো ভবতি দানেন প্রিয়-বাদেন চাপর	:	প্রথমার্দ্ধ মহাভারত উদ্যোগ ৩৮।৩ক, শান্তিপর্ব ১২৮।১৫২ক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ উদ্যোগ ৩৬।১৫খ
৬০	যাত্যেকতোহস্ত শিখরং	:	অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ : কালিদাস ৪।২
৬১	নয়াত্মানং বহুবিগণয়ন্নাত্মনৈবা-বলম্বে	:	মেঘদূত : উত্তরমেঘ। ৪৮
	ক সুখদুঃখং হি পুরুষ পর্য্যায়েণোপসেবতে	:	মহাভারত, বনপর্ব ২৫৮।১৩খ প্রথমার্দ্ধ ২৫৮।১৫খ দ্বিতীয়ার্দ্ধ
	খ সুখং বা যদি বা দুঃখং	:	মহাভারত, শান্তি, ২৫।২৬ ; ১৭৪।৪১
	গ প্রিয়েনাতিভৃশং	:	মহাভারত বনপর্ব ২০৬।৪২খ প্রথমার্দ্ধ ২০৬।৪৩ক দ্বিতীয়ার্দ্ধ
৬২	মৌনান্ন সমুনির্ভবতি নারণ্য-বসনান্মুনি	:	মহাভারত, উদ্যোগ ৪২।৫৯
৬৩	সর্বং পরবশং দুঃখং	:	মনু ৪।১৬০
৬৪	শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ	:	কঠোপনিষদ ২।২। : ২।১
৬৫	অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং	:	মহাভারত উদ্যোগ ৩৮।৭৩
৬৬	একঃ প্রজায়েতে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে	:	মনুসংহিতা ৪।২৪০
৬৭	যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে	:	চাণক্যনীতিচয়ন : শম্ভুদাসচট্টো- পৃ. ৯
৬৮	করস্থমুদকং ত্যক্ত্বা ঘনস্থমভি-বাঞ্ছতি	:	অবতরণিকা, হিতোপদেশ
৬৯	অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চঃ চিন্তয়েৎ	:	ভবভূতিরচিত গুণরত্নম্। উদ্ভট-সমুদ্রঃ পূর্ণচন্দ্র দে ; পৃ. ১০৯

৭০	প্রথমে নার্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জিতং ধনং	চাণক্য শ্লোক, পণ্ডিত জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত পৃ. ২০
৭১	পূর্বং বয়সি তৎ কুর্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ	মহাভারত উদ্যোগ, ৩৪।৬৯
৭২.	কেয়ূরা ন বিভূষয়ন্তি পুরুষং	ভর্তৃহরিঃ নীতিশতকম্ : কাব্য-সংগ্রহ পৃ. ২৫২তে প্রাপ্ত
৭৩	প্রিয়বাক্য প্রদানেন সর্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ	চাণক্যশ্লোক : পণ্ডিত জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত পৃ. ২৩
৭৪	যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি	সুভাষিতরত্নভাণ্ডগার ৫ম সং-এ সামান্য পাঠভেদ সহ আছে পৃ. ১৫৯
৭৫	সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্	মনুসংহিতা ৪।১৩৮
৭৬	উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে	কবিভট্টকৃত পদ্যসংগ্রহ ৭
৭৭	সন্তিস্তু লীলয়া প্রোক্তং	সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্ (রূপান্তর গ্রন্থ পৃ. ৮৬তে উক্ত)
৭৮	অনুষ্ঠিতং তু যৎ দেবৈ ঋষিভির্যদনুষ্ঠিতং	
৭৯	পরোপদেশ পাণ্ডিত্যং সর্বেষাং সুকরং নৃণাং	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ ৫ম সং পৃ. ৪৭ (সামান্য পাঠভেদ)
৮০	গর্জতি শরদি ন বর্ষতি বর্ষতি	সুভাষিত-রত্নভাণ্ডাগারম্ পৃ. ৪৯, ৫ম সং
৮১	যথা চিত্তে তথা বাচি	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম পৃ. ৪৭ শ্লো ৩৬
৮২	গত শোকো ন কর্তব্যো	বৃদ্ধচাণক্য : পণ্ডিত রাম শাস্ত্রী সম্পাদিত পৃ. ২৭৮
৮৩	প্রবিচার্যোত্তরং দেয়ং	
৮৪	শুভং ব্রূয়াৎ শুভং ধ্যায়েৎ	

৮৫	তৃণং ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গস্তৃণং	:	চাণক্যশ্লোক : পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর সংকলিত পৃ. ৫৫
৮৬	উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী	:	ঘটকর্পর : নীতিসার ১৩
৮৭	বিজেতব্যা লংকা চরণতরণীয়া জলনিধিঃ	:	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম পৃ. ৫৪, ২৫০নং শ্লোকে প্রথমার্দ্ধের মিল আছে। দণ্ডিনঃ উল্লিখিত।
	ক বিপক্ষঃ শ্রীকণ্ঠো জড়-তনুরমাত্যঃ	:	পৃ. ১৩৬ উদ্ভটচন্দ্রিকা : ২য় ভাগ চন্দ্রমোহন তর্করত্ন।
৮৮	পাত্রে ত্যাগী গুণে রাগী	:	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ : রাজনীতি অধ্যায় ৫ম সং পৃ. ১৪৮-এ সামান্য পাঠভেদ সহ আছে।
৮৯	করে শ্লাঘ্যস্ত্যাগঃ শিরসি গুরু-পদে প্রণয়িতা	:	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম : মাঘস্য : সজ্জনপ্রশংসা : পৃ. ৫৪
৯০	কান্তাকটাক্ষবিশাখা ন খনন্তি যস্য	:	ভর্তৃহরি : নীতিশতকম : কাব্য-সংগ্রহ পৃ. ২৪৮-এ প্রাপ্ত।
৯১	বিপদি ধৈর্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা	:	ভর্তৃহরি : নীতিশতকম্ তারা-কুমার কবিরত্ন সংকলিত হিতোপদেশ পৃ. ২০তেও শ্লোকটি উৎকলিত হয়েছে।
৯২	বদনং প্রসাদসদনং হৃদয়ঃ সদয়ং সুধাময়ো বাচঃ	:	চন্দ্রমোহন তর্করত্ন সংকলিত-উদ্ভট-চন্দ্রিকা ২য় ভাগ পৃ. ৫৮
৯৩	বরং মৌনং কার্য্যং ন চ বচন মুক্তং	:	কবিভট্টকৃত : পদ্যসংগ্রহ ; উদ্ভট-সমুদ্র : পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর—পৃ. ১৩১
৯৪	অশ্বস্য লক্ষণং বেগো মত্তং মাতঙ্গ লক্ষণং	:	
৯৫	আজীবনান্তাৎ প্রণয়াঃ	:	চাণক্যশ্লোক, পণ্ডিত জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত, পৃ. ৪২। উদ্ভট-

		সমুদ্র : পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর সংকলিত—পৃ. ৪২
৯৬	পাপেহপ্য-পাপঃ পরুষেহভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ	: বৃদ্ধচাণক্য : পণ্ডিত রামশাস্ত্রী সম্পাদিত নীতিসার।
৯৭	চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং	: ঘটকর্পর : নীতিসারঃ।
৯৮	অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং	: পঞ্চতন্ত্রম্, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংকলিত, পৃ. ৩
৯৯	যদা কিঞ্চিজ্‌-জ্ঞোহহং দ্বিপইব মদান্ধঃ সমাভবম্	: সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্-কুপণ্ডিত-নিন্দা অধ্যায়
১০০	জ্ঞাতাভিবর্ণ্ট্যতে নৈব চৌরে-ণাপি ন নীযতে	: উদ্ভটসমুদ্র : পূর্ণচন্দ্র দে, পৃ. ১০০
১০১	অনেক সংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনং	: হিতোপদেশ : কথারম্ভ। তারাকুমার কবিরত্ন সংকলিত পৃ. ৩। চাণক্য শ্লোক জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত—পৃ. ৪০
১০২	যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্র তস্য করোতি কিং	: বৃদ্ধচাণক্য : পণ্ডিত রামশাস্ত্রী সম্পাদিত—পৃ. ২৬৮
১০৩	অজ্ঞ সুখমারাধ্যঃ সুখতর-মারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ	: ভর্তৃহরি : নীতিশতকম, কাব্য-সংগ্রহ পৃ. ২৩৫-এ প্রাপ্ত।
১০৪	ক্রেতৌ বিবাহে ব্যসনে রিপুক্ষয়ে	: হিতোপদেশ : তারাকুমার কবিরত্ন সংকলিত পৃ. ২১২। উদ্ভটসমুদ্র : পূর্ণচন্দ্র দে সংকলিত পৃ. ১৬১
১০৫	যস্তু সঞ্চরতে দেশান যস্তু সেবেত পণ্ডিতান্	:
১০৬	পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্ত গতং ধনং	: চাণক্যশ্লোক : পণ্ডিত জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ. ১৯

১০৭	তুষ্টে সতি ন লাভায় রুষ্টে নাশায় নৈব চ	:	
১০৮	যথৈকেন ন হস্তেন তালিকা সংপ্রপদ্যতে	:	
১০৯	মনসৈবঃ কৃতং পাপং	:	সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্—৫ম সং পৃ. ১৭৪ শ্রীহর্ষদেবস্য।
১১০	একং হন্যাদ্‌নহন্যাদ্বা	:	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ পৃ. ১৫১। পাঠভেদ আছে।
১১১	মন্ত্রিণাং ভিন্ন সন্ধানে ভিষজাং সন্নিপাতকে	:	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্। সামান্য-নীতিঃ অধ্যায় পৃ. ১৭১
১১২	কলহান্তানি হর্ম্যাণি কুবাক্যান্তং চ সৌহৃদং	:	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম। সামান্য নীতি অধ্যায়।
১১৩	নির্গুণস্য হতং রূপং	:	বৃদ্ধচাণক্য পণ্ডিত রামশাস্ত্রী সম্পাদিত পৃ. ২৬০।
১১৪.	দৌর্মন্ত্র্যান্নৃপতি র্বিনশ্যতি	:	ভর্তৃহরি : নীতিশতকম্।
১১৫	দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং	:	চাণক্যশ্লোক : জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ২৬
১১৬	স্বভাব সুন্দরং বস্তু ন সংস্কার-মপেক্ষতে	:	দৃষ্টান্তশতকম্ : কুসুমদেব : কাব্য-সংগ্রহ পৃ. ২৩০-এ প্রাপ্ত।
১১৭	সমায়াতি যদা লক্ষ্মীর্নারিকেল ফলাম্বুবৎ	:	বেতালভট্ট বিরচিত, নীতি প্রদীপ। উদ্ভটসমুদ্র : পূর্ণচন্দ্র দে—পৃ. ৮৪
১১৮	বৈদ্যং পানরতং নটং	:	উদ্ভটসমুদ্র পূর্ণচন্দ্র দে সংকলিত পৃ. ১৪ পঞ্চতন্ত্রম্ থেকে আহৃত।
১১৯	রূপং জরা সর্বসুখানি তৃষ্ণা	:	বানরাষ্টকম্। উদ্ভটসমুদ্র পূর্ণচন্দ্র দে, পৃ. ১৬৩তে উদ্ধৃত।
১২০	মাত্রা সমং নাস্তি শরীরপোষণং	:	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ : ভগব-ত্তোব্যাসস্য পৃ. ১৮১। সামান্যনীতি অধ্যায়। পাঠভেদ আছে।

১২১	জ্যোতিং জলদে মিথ্যা	:
১২২	কোঽতিভার : সমর্থানাং	: সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্, সামান্য-নীতি অধ্যায়
১২৩	পরিক্ষীণ কশ্চিৎ স্পৃহয়তি	: সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্। ৫ম সং পৃ. ৬৮
১২৪	পাপান্নিবারয়তি যোজয়তে হিতায়	: ভর্তৃহরি নীতিশতকম্, কাব্যসংগ্রহ পৃ. ২৪১-এ প্রাপ্ত।
১২৫	মিত্রং প্রীতিরসায়নং	: সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্, সুমিত্র-প্রশংসা অধ্যায়।
১২৬	গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদা	: ঘটকর্পর বিরচিত নীতিসার:।
১২৭	প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা-গৃহদীপ্তয়ঃ	: মনুসংহিতা ৯ ২৬
১২৮	যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি	: মনুসংহিতা ৯।২২
	ক সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্তা ভার্য্যা তথৈব চ	: মনুসংহিতা ৩।৬০
১২৯	অক্ষিরতা গৃহে রুদ্ধা পুরুষৈ-রাপ্তাকারিভি	: মনুসংহিতা ৯।১২
১৩০	অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতি-সেবনাম্	: মহানির্বাণ ৮।১০৫
১৩১	ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান গৃহ্ণীয়াৎ শুল্কমণ্বপি	: মনুসংহিতা ৩।৫১
১৩২	অনর্ঘমপি মাণিক্যং হেমাশ্রয় মপেক্ষতে	: সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্, ৫ম সং সামান্য নীতি। অধ্যায় পৃ. ১৬৬
১৩৩	বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং অমেধ্যা-দপি কাঞ্চনং	: চাণক্য শ্লোক : পণ্ডিত জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত। পৃ. ১৪
১৩৪	সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিণঃ	: বোধিচাণক্য : ভুবনচাঁদ দত্ত সংকলিত পৃ. ৪৯। চাণক্যশ্লোক : পূর্ণচন্দ্র দে পৃ. ৬১

১৩৫	সম্মিত্রং সধনং স্বযোষিত	:	
১৩৬	শিশুর্বা শিষ্যর্বা যদপি স মম : তিষ্ঠতু তথা		উত্তরচরিত।
১৩৭	বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়	:	ভবভূতিঃ গুণরত্নম্
১৩৮.	দানং প্রিয়বাক্যসহিতং	:	হিতোপদেশ : নারায়ণ পণ্ডিত। 'রূপান্তর' গ্রন্থ পৃ. ১০০তে উক্ত
১৩৯	দৃশ্যান্তে ভূরি ভূরি : নিশ্বতরবঃ কুত্রাপি তে চন্দনাঃ		সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম পৃ. ৫৫ সজ্জনপ্রশংসা।
১৪০	যাবন্ন তপতি ভানুস্তাদৃক্ : সন্তপতি বালুকানিকরঃ		কবিতামৃতকূপ : গৌরমোহন বিদ্যালংকার পৃ. ১৬তে উদ্ধৃত।
১৪১	ধনেন কিং যো ন দদাতি : নোশ্নুতে		সপ্তরত্নম্, উদ্ভটসমুদ্র, পূর্ণচন্দ্র দে কৃত। পৃ. ২৬-এ সামান্য পাঠভেদ সহ উদ্ধৃত।
১৪২	নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানং	:	বেতালভট্ট : নীতিপ্রদীপ।
১৪৩	নৌকাং বৈ ভজতে তাবৎ যাবৎ : পরংনগচ্ছতি		বোধিচাণক্য, ভুবনচাঁদ দত্ত। পৃ. ১৫
১৪৪	ন কূপখননং যুক্তং প্রদীপ্তে : বহ্নিনা গৃহে		সুভাষিতরত্নাভাণ্ডাগারম্, সামান্য নীতিঃ
১৪৫	যত্র বিদ্বজ্জনোনাস্তি শ্লাঘ্য- : স্তত্রাল্পধীরপি		সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্, পৃ. ৩৯। হিতোপদেশ, তারাকুমার কবিরত্ন সংকলিত—পৃ. ৩৪
১৪৬	অয়ং রত্নাকরোঽম্ভোধিমিত্য- : সেবি ধনাশয়া		সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্, পৃ. ২২৬
১৪৭	অতিদর্পে হতালংকা অতি- : মানে চ কৌরবাঃ		চাণক্যশ্লোক—পণ্ডিত জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত পৃ. ২৯
১৪৮	অতি পরিচয়াদবজ্ঞা	:	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্, সামান্য-নীতি ;
১৪৯	মৌনাত্মকঃ প্রবচন	:	ভর্তৃহরিঃ নীতিশতকম্, কাব্য-সংগ্রহ, পৃ. ২৪২এ প্রাপ্ত।

১৫০	যথা দেশস্তথা ভাষা যথা রাজা তথা প্রজাঃ	'সুভাষিত-রত্নখণ্ড-মঞ্জুষা', সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্‌এর পরিশিষ্টে প্রাপ্ত পৃ. ২০
১৫১	রাজন দুধুক্ষসি যদি ক্ষিতি-ধেনু মেতাং	ভর্তৃহরি : নীতিশতকম্‌, কাব্য-সংগ্রহ পৃ. ২৪৭-এ প্রাপ্ত।
১৫২	নরপতিহিতকর্তা দ্বেষ্যতাং যাতি লোকে	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্‌ পৃ. ১৫৮ পঞ্চতন্ত্রম্‌ : জীবানন্দ বিদ্যাসাগর পৃ. ২৯।
১৫৩	বহবোহবিনয়ান্নষ্টারাজনঃ সপরিচ্ছদা	মনুসংহিতা ৭।৪০
১৫৪	ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং	মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৩৩ অধ্যায়, ৫০নং শ্লোক আর্যশাস্ত্র সংস্করণ।

দ্বিতীয় ভাগ

দ্বিতীয় ভাগের সমস্ত শ্লোক ঋগ্বেদ, উপনিষদ ও ভগবদ্গীতা থেকে সংগৃহীত। এই গবেষণায় 'গীতা' সম্পর্কে পৃথক্‌ আলোচনা রয়েছে। উপনিষদের শ্লোকাবলী 'ব্রাহ্মধর্ম্মঃ' গ্রন্থ থেকে উৎকলিত।

তৃতীয় ভাগ

১	সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে	বররুচি : নীতিরত্নম্‌
২	জয়ন্তি তে সুকৃতিনো রস-বৈদ্যাঃ কবীশ্বরাঃ	ভর্তৃহরিঃ নীতিশতকম। কাব্য-সংগ্রহ পৃ. ২৪৭।
৩	লৌকিকানাং হি সাধুনামর্থং বাগানুবর্ততে	উত্তররামচরিত।
৪	সদূষণাপি নির্দোষা সখারপি সুকোমলা	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্‌, বিশিষ্ট-কবি প্রশংসা।
৫	মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ	অনুষ্টুপ ছন্দে বাল্মীকির প্রথম উক্তি

৬	উপমাকালিদাসস্য ভারবেরর্থ-গৌরবম্	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ পৃ. ৩৯ 'কবিবৃন্দম্'।
৭	উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা	মালতীমাধব প্রস্তাবনা, ভবভূতি
৮	ভবভূতেঃ সম্বন্ধাদ্ ভূধর-ভূরেব ভারতী ভাতি	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ পৃ. ৩৭ বিশিষ্ট-কবি প্রশংসা।
৯	একো রসঃ করুণ এব নিমিত্ত ভেদাৎ	উত্তররামচরিত
১০	Wouldst thou the young year's blossoms.	গ্যেটের উক্তির 'ইস্টউইক' কৃত ইংরেজি অনুবাদ।
	ক বাসন্তং মুকুলং ফলঞ্চ যুগপদ্	ঐ সংস্কৃত অনুবাদ, পণ্ডিত তারাকুমার ন্যায়রত্ন
	খ নব বৎসরের কুঁড়ি	ঐ বাংলা অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথ
	গ কাব্যেষু নাটকং রম্যাং	
	ঘ শকুন্তলা ৪র্থ অংকের চারটি শ্লোক	
	১ তনয়াবিচ্ছেদযাপ্যত্যদা শকুন্তলেতি	
	২ বিদায় পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি	
	৩ রাজার প্রতি উপদেশ—	অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য
	৪ বধূর প্রতি উপদেশঃ শুশ্রূষস্ব গুরূন্	
১১	চন্দ্রস্য সাচিব্যমিবাস্য কুর্বন	রামায়ণ
১২	বাগর্থাবিব সংপৃক্তো বাগর্থ	রঘুবংশম্ ১-১০
১৩	অজবিলাপ—(২০টি শ্লোক)	ঐ
১৪	মদনভস্ম—(২৯টি শ্লোক)	কুমারসম্ভব। মদনদহনো নামে তৃতীয় সর্গঃ
১৫	রতিবিলাপ (২৭টি শ্লোক)	ঐ রতিবিলাপো নাম চতুর্থ সর্গঃ

চতুর্থ ভাগ, বিবিধ কবিতা

১	উষ্ট্রাণাং চ বিবাহেষু	:	
২	ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে	:	বৃদ্ধচাণক্য—পৃ. ২০৭ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সংকলিত নীতিরত্ন, পৃ. ৭৫ প্রবাদমালা—জেম্‌সলঙ্‌ ও নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃ. ১৫৭
৩	এক দেবঃ কেশবো	:	ভর্তৃহরি : নীতিশতকম্‌
৪	পাদপ্যাদাং ভয়ং বাতাৎ	:	চাণক্য শ্লোক [পৃ. ৫৮ পূর্ণচন্দ্র দে সংকলিত] চাণক্য শতকম্‌-৮৪ শ্লোঃ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংকলিত ও কাব্যসংগ্রহঃ ২য় ভা. পৃ. ৪০৬
৫	অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং	:	চাণক্যশতক—৮৯ : [রূপান্তর গ্রন্থ পৃ. ১০০তে উক্ত] জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংকলিত-কাব্যসংগ্রহ ২য় ভাগে প্রাপ্ত। পৃ. ৪০৭ (তৃতীয় সং ১৮৮৮)
৬	ক্ষণে তুষ্টঃ ক্ষণে রুষ্ট	:	উদ্ভট শ্লোকমালা : পূর্ণচন্দ্র দে সংকলিত পৃ. ১১৩
৭	দৃষ্টবা যাতির্যাতিং সদ্যো : বৈদ্যো বৈদ্যং নটং নটঃ		
৮	ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং : কোকিলৈর্জলদাগমে		বররুচি নীতিরত্নম্‌ ১১
৯	অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্যাঘ্রং : নৈব নৈব চ		সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্‌, সামান্য-নীতিঃ
১০	গর্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং :		পূর্বচাতকাষ্টক। ৪
১১	পয়োদ হে বারি সদাসি বানবা :		উত্তরচাতকাষ্টক।
১২	নদেভ্যোঽপি হ্রদেভ্যোঽপি	:	পূর্বচাতকাষ্টক। পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-

		সাগরকৃত অনুবাদ উদ্ভটসমুদ্র, পৃ. ১৭৪-এ আছে।
১৩	গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা	: ভ্রমরাষ্টকম্।
১৪	রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাতম্	: ভ্রমরাষ্টকম্
১৫	কান্তং ব্যক্তি কপোতি- কাকুলতয়া	: হলায়ুধঃ ধর্মবিবেকঃ, উদ্ভটসমুদ্র, পৃ. ১৫৫
১৬	বিদ্বান সংসদি পাক্ষিকঃ	: নবরত্নম্, উদ্ভটসমুদ্র পৃ. ৩৮-এ উৎকালত।
১৭	নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতিনখ-লিখনং	: অষ্টরত্নম, উদ্ভটসমুদ্র পৃ. ২৮-এ উৎকলিত। (মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্নের উত্তর)
১৮	কাকঃ কৃষ্ণঃ পিক কৃষ্ণঃ	: বররুচিঃ নীতিরত্নম্।
১৯	ব্যালং বালমৃণালতন্তুভিরসৌ	: ভর্তৃহরি : নীতিশতকম্, কাব্য-সংগ্রহ পৃ. ২৫০-এ প্রাপ্ত।
২০	খল্লীটো দিবসেশ্বরস্য কিরণৈঃ সন্তাপিত মস্তকে	: ভর্তৃহরি : নীতিশতকম্, কাব্য-সংগ্রহধৃত পাঠে পৃ. ২৪২এ সামান্য পাঠভেদ আছে।
২১	একা ভার্যা প্রকৃতি মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া	: ঘটকর্পর বিরচিত নীতিসারঃ।
২২	সদা বক্রং সদা রুষ্ট সদা পূজা-মপেক্ষতে	: উদ্ভটসমুদ্র পৃ. ৮-এ উদ্ধৃত। 'চতুরত্নম' থেকে। বিক্রমাদিত্যের প্রশ্নের উত্তর।
২৩	লোভাবিষ্টবর্ণরোবিত্তং বীক্ষতে নৈব চাপদং	: সুভাষিত-রত্নভাণ্ডাগারম্, লোভ-নিন্দা দ্র.
২৪	ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়ম	: উত্তররামচরিত। ভবভূতি।
২৫	ত্বয়াসহ নিবিৎস্যামি	: ঐ
২৬	অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যো	: ঐ

২৭ সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং : অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

২৮ক সতি প্রদীপে সত্যগ্নৌ : *Bhartihari* : Three Centuries of verses, p. 27. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংকলিত কাব্যসংগ্রহ-২য় ভাগ পৃ.৫৯-এ প্রাপ্ত। ভর্তৃহরি : শৃংগার শতকম্ ১৫ শ্লোক।

২৮খ বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা : অমরুশতক ৬০ (রূপান্তর পৃ. ৯৪), কাব্যসংগ্রহ-২য় ভাগ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংকলিত—পৃ. ৩১।

২৯ ভো ভো বৃক্ষা পর্বতস্থা : রামায়ণ

৩০ বিরহোঽপি সংগম খলু : পরস্পরং সংগতং মনোযেষাং

৩১ যাং চিন্তায়ামি সততং : উদ্ভটচন্দ্রিকা ১ম ভাগ [চন্দ্রমোহন তর্করত্নসংকলিত পৃ. ১০৫-এ উদ্ধৃত] জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংকলিত কাব্যসংগ্রহ-২য় ভাগ পৃ. ৯৭ ভর্তৃহরি : শৃংগারশতকম্-১০০শ্লো

৩২ পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ : শীলাভট্টারিকাবিরচিত—নীতিদশকম্ পূর্ণচন্দ্র দে দংকলিত উদ্ভটসাগর (নাগরী) ১৮৫১ শকে মুদ্রিত পৃ. ৬৫, তৃতীয় প্রবাহ—'রাজসভা' স্তোত্র।

৩৩ বক্রেঽপি পংকজনিতোঽপি :

৩৪ একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে : উদ্ভটসাগর (নাগরী) পৃ. ৪২ পাঠভেদ দৃষ্ট হয়, 'দারিদ্র্য-নিন্দা' অধ্যায়।

৩৫ আরম্ভগুর্বী ক্ষয়িণী ক্রমেণ : ভর্তৃহরি, নীতিশতক ৭৮ (রূপান্তর গ্রন্থ পৃ. ৮৮] জীবানন্দ

		বিদ্যাসাগর (সং) কাব্যসংগ্রহ-২য় ভাগ, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৫৯ ঐ, ৭৭ নং শ্লোক।
৩৬	ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিনী গৃহমুচ্যতে	শার্ংগধরস্য সতীবর্ণনম, সুভাষিত-রত্নভাণ্ডাগারম্—পৃ. ৩৬৬, ৫ম সং
৩৭	লাভে ন হর্ষয়েৎ যন্তু	
৩৮	আদৌ নম্রাঃ পুনর্বক্রা	সুভাষিতাবলিঃবল্লভদেব (পাঠ-ভেদ প্রচুর)
৩৯	কুদেশমাসাদ্য কুতোঽর্থ সঞ্চয়	গুরুনাথ সেনগুপ্ত। সুনীতিসার পৃ. ৩৮
৪০	পিণ্ডে পিণ্ডে মতিভির্ন্না	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম, গোপাল-দেবানাম্।
৪১	অহোঽতিনির্মোহি জনস্য চিত্রং	
৪২	মনিং বহতি পাদাগ্রে	কবিতারত্নাকর : নীলরত্নশর্ম (হালদার) সংকলিত পৃ. ২৯-এ হিতোপদেশ বলে উল্লিখিত।
৪৩	খলঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ দুর্জননিন্দা অধ্যায়।
৪৪	তক্ষকস্য বিষং দন্তে মক্ষিকায়াশ্চ মস্তকে	দুর্জনাষ্টকম : নিবিড়নিতম্বা-বিরচিতম্ উদ্ভটসমুদ্র পৃ. ৪০ বৃদ্ধচাণক্য : শ্রীরামশাস্ত্রী সংকলিত পৃ. ৩৩৮এ পাঠভেদ সহ আছে।
৪৫	দুর্জন দূষিত মনসাং :	সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্ : দুর্জন-নিন্দা অধ্যায় চাণক্যস্য।
৪৬ক	দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়াঽপি	[উদ্ভটকবিতাকৌমুদী : নীলমণি বিদ্যালঙ্কার সংকলিত পৃ. ১২-তে উদ্ধৃত] জীবানন্দ বিদ্যাসাগর

			(সং) কাব্যসংগ্রহ—২য়ভাগ, ৩য়সং পৃ. ১৩৮, ভর্তৃহরি, নীতিশতকম্- ২৯ শ্লো.
৪৬খ	দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈত-দ্বিশ্বাসকারণম্	:	চাণক্যশ্লোক : পণ্ডিত জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ. ১৫
৪৭	পরোক্ষে কার্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্	:	চাণক্যশ্লোক : পণ্ডিত জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত—পৃ. ১৪
৪৮	পরান্নং পরবস্ত্রং চ পরশয্যাঃ পরস্ত্রিয়ঃ	:	বোধিচাণক্যং—ভুবনচাঁদ দত্ত পৃ. ৪৭
৪৯	কুগ্রামবাসং কুজনস্য সেবা	:	কবিভট্টকৃত পদ্যসংগ্রহঃ
৫০	অন্তপুরে পিতৃতুল্যং		বোধিচাণক্য : ভুবনচাঁদ দত্ত সংকলিত, পৃ. ৯৫
৫১	দানং ভোগোনাশস্তি	:	সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্। দানপ্রশংসা পৃ. ৭২
৫২	উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে	:	চাণক্যনীতিচয়ন : শম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায় (১৩২৬) পৃ. ৯
৫৩	ইতরতাপশতানি যদৃচ্ছয়া	:	বররুচি : নীতিরত্নম্ ২, 'রূপান্তর' গ্রন্থ, পৃ. ৮০তে পাঠভেদ
৫৪	বিবাহোজন্মমরণং যদা যত্র চ যেন চ		
৫৫	গগনং গগনাকারং	:	কবিরত্নাকর নীলরত্ন শর্ম (হালদার) সংকলিত পৃ. ৩১
৫৬	কুসুমস্তবকস্যেব দ্বে বৃত্তীতু মনস্বিনাম্	:	ভর্তৃহরি : নীতিশতকম। কাব্য-সংগ্রহ পৃ. ২৪২-এ প্রাপ্ত। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সং)—ঐ-২য় ভাগ পৃ. ১৪২-৩৮ শ্লো.
৫৭	কিং করিষ্যন্তি বক্তারঃ	:	চাণক্যশতকম্। কাব্যসংগ্রহে প্রাপ্ত
৫৮	চিন্তা চিন্তা সমাযুক্তা বিন্দু-মাত্র বিশেষতঃ	:	নীলরত্ন শর্ম (হালদার) সংকলিত 'কবিতা রত্নাকর' পৃ. ৭৮এ পাঠভেদ

সহ আছে। চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে
চিন্তা নাম গরীয়সী
চিতা দহতি নির্জীবং
চিন্তা প্রাণসহং বপুঃ

৫৯ জানন্তি পশবো গন্ধাৎ : সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম : সামান্য-নীতি। পৃ. ১৫৯

৬০ ন দেবায় ন ধর্মায় : সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ দুর্জননিন্দা অধ্যায়

৬১ অধীরত্য চতুরো বেদান : সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ পৃ. ৩৯২

৬২ দরিদ্রতা ধীরতয়া বিরাজতে : শীলাভট্টারিকা, নীতিদশকম্ উদ্ভট-সমুদ্র, পূর্ণচন্দ্র দে (পৃ. ৭৪)

৬৩ ধনৈর্নিকুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি : ঘটকর্পর : নীতিসারঃ

৬৪ কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং তথা : ঘটকর্পর : নীতিসার (উদ্ভটসমুদ্র) পৃ. ১০১

৬৫ ব্যালং বালমৃণালতন্তুভিরসৌ : ৪র্থ ভাগ ১৯নং এ এই শ্লোকই উৎকলিত হয়েছে।

৬৬ সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফল ছায়া সমন্বিতঃ : চাণক্যনীতি-চয়ন ও শম্ভু দাস চট্টোপাধ্যায় পৃ. ৫১

৬৭ সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রকারাবরণং গৃহং : চাণক্যশ্লোক ৭৬নং শ্লোকে। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সং) কাব্যসংগ্রহ—২য় ভাগ, ৩য় সং-পৃ. ৪০৪।

৬৮ অগাধজলসঞ্চারী ন গর্বং যাতি রোহিতঃ : বররুচি নীতিরত্নম্—উদ্ভটসমুদ্র-পৃ. ৮৮)

৬৯ অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষ-মপি দৃশ্যতে : ৪র্থ ভাগ ৫নংএ এই শ্লোকটিই আছে।

৭০ পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ম : ৪র্থ ভাগ ৪নংএ এই শ্লোকটি আছে।

৭১ ক্ষণে তুষ্টঃ ক্ষণে রুষ্ট স্তুষ্টো-রুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে : ৪র্থ ভাগ ৬নং-এ।

৭২	ব্যাধেস্তত্ত্ব পরিজ্ঞানং	:	
৭৩	শরীরে জর্জরীভূতে	:	
৭৪	হরীতকীং ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজন	:	দ্রব্যগুণদর্পণ, নারায়ণ কবিরাজ পৃ. ১০৭ আয়ুর্বেদসম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা —২য় প্রবন্ধ কবিরাজ কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়—পৃ. ৩৫
৭৫	জ্বরাদৌ লংঘনং প্রোক্তং	:	
৭৬	অজীর্ণে ভেষজং বারি	:	বৃদ্ধচাণক্য, পণ্ডিত রামশাস্ত্রী সংকলিত 'জলপান-বিধি' অধ্যায়।
৭৭	দিনান্তে চ পিবেৎ দুগ্ধং	:	
৭৮	অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরং	:	হলায়ুধঃ ধর্মবিবেক।
৭৯	কমল কুঁয়রের করামুক্তি	:	The Circassian Girl, Ch. Mackay.
৮০	রাজার আত্মগ্লানি	:	Hamlet Act III, Sc. III. (আংশিক অনুবাদ) দ্র. পৃথক্ আলোচনা, ৩য় অ.

৫ম ভাগ

তুকারামের জীবনী ও অভংগ-মালা	:	এই গবেষণায় এ সম্পর্কে পৃথক্ আলোচনা করা হয়েছে। (তৃতীয় অধ্যায় দ্র.)

নাট্যানুবাদ—সুশীলা-বীরসিংহ

সত্যেন্দ্রনাথের 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটক (সম্বৎ ১৯২৪) ২রা মার্চ, ১৮৬৮-তে প্রকাশিত হয়। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের[১] অব্যবহিত পূর্বেই গ্রন্থখানি সুধীজনের হাতে আসে। ১৩৮৫-র শারদীয়া 'হিমাদ্রি' পত্রিকায় সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী তাঁর 'অপ্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সুশীলা উপন্যাসের'[২] উল্লেখ করেছেন। তথ্যটি বিভ্রান্তিকর। বস্তুত, এটি উপন্যাস নয়। এটি আমাদের আলোচ্য নাটক যার সম্পূর্ণ নাম 'সুশীলা-বীরসিংহ'—শেক্সপীয়রের 'সিম্বেলিন' নাটকের অনুবাদ। সত্যেন্দ্রনাথ অনেক চিঠিতেই গ্রন্থটিকে সংক্ষেপে 'সুশীলা' বলে উল্লেখ করেছেন। অমিতাভ চৌধুরী তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত ঠাকুর পরিবারের পত্র-সংগ্রহ থেকে সত্যেন্দ্রনাথের ১৮৬৭-র ৪ঠা সেপ্টেম্বরে গণেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রের উল্লেখে গ্রন্থটিকে উপন্যাস বলে নির্দেশ করেছেন।[৩]

পত্রটি অনুধাবন করলে দেখা যায় প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথ সুশীলা বলে লিখলেও চিঠির পরের লাইনেই 'first Act' কথাটি দিয়ে গ্রন্থটি যে নাটক সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি। তাঁর এই পত্রের হুবহু উদ্ধৃতির সাহায্যে সকল সংশয়ের নিরসন হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

Ahmedabad

"My dear Mejdada, 4th Sept. 1867

...Thank for the arrangements you have made for the printing of my *Susila* I hope to see the first Act soon out... I have fever twice, Joti also had an attack of fever.. " (ইটালিক্স আমরা দিয়েছি)।

এই পত্রটি ছাড়াও ঠাকুর পরিবারের পত্র-সংগ্রহে গণেন্দ্রনাথকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের ১৮৬৭-র ১৪ই এপ্রিলে লেখা চিঠির নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই

চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করেই 'সুশীলা-বীরসিংহ'কে নাটক বলেই উল্লেখ করেছেন।

"I send you the first instalment of our *Susila Virsinha Natuk*…" (Ahmedabad, 14th April, 1867). গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশনায় গণেন্দ্রনাথের প্রভূত অবদান রয়েছে। কর্মক্ষেত্র থেকে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি গণেন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে ছাপা বিষয়ে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিশোধনের জন্যও তিনি গণেন্দ্রনাথের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সেজন্যই চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ 'our' কথাটি লিখেছেন।

১৮৬৭-র ১১ই মের চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন সেখানেও drama কথাটির উল্লেখ আছে—'Many thanks for the trouble you have been taking in looking over my drama…' (11th May, 1867, Ahmedabad). কাজেই, গ্রন্থটি যে নাটক সে সম্পর্কে আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বস্তুত, নাটকটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের মধ্যে এখনো আছে। এমনকি নাটকটির অভিনয় প্রস্তুতিরও প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঐ গ্রন্থটির টাইটেল পেজ-এর পরপৃষ্ঠায়—নাটকের পাত্র-পাত্রীদের নামের পাশে অভিনেতাদের নাম হাতে লেখা রয়েছে। গ্রন্থটি 'সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার' থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত।

কর্মক্ষেত্রে যোগ দেবার কিছু পরে সত্যেন্দ্রনাথ পর পর দুবার অসুখের জন্য ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। ১৮৬৬-র ২৮শে অক্টোবর থেকে ১৮৬৭-র ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম ছুটি নিয়েছিলেন। একটু সুস্থ হয়ে কর্মে যোগদান করে প্রায় সাত মাস পর আবার তাঁকে ১৮৬৭-র ১৬ই অক্টোবর থেকে ১৮৬৮-র ১৫ই জুন পর্যন্ত ছুটি নিতে হয়। দুই ছুটির মধ্যবর্তী যে সময়টুকুতে সত্যেন্দ্রনাথ কর্মক্ষেত্র আমেদাবাদে ছিলেন সে সময় গণেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর অনেকগুলি চিঠি থেকে 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটক প্রসঙ্গে অনেক কথা জানতে পারা যায়। প্রথম ছুটির শেষে আমেদাবাদে ফিরে গিয়ে ১৪ই এপ্রিল (১৮৬৭) 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটকের প্রথম অঙ্কের পরিবর্তিত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই যে বাকি চারটি অঙ্কের

পাণ্ডুলিপিও পাঠাচ্ছেন সে কথার উল্লেখ করেছেন। কাজটি যত সহজ হবে বলে প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল, হাতে কলমে লিখতে গিয়ে তত সহজ আর মনে হয় নি। সেজন্যই রচনার অনেক স্থান বারে বারে পরিবর্তন ও পরিশোধন করেও তিনি তৃপ্ত হতে পারছিলেন না। তিনি স্পষ্টই লিখেছেন—"I had not the slightest idea in the beginning that the thing would give me so much trouble, as I have been put to. I have rewritten the whole piece, of which you will receive the first Act, the remaining four will be sent to you in a few days." (Ahmedadad, 14th April, 1867)

১৮৬৭-র ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর প্রথম ছুটি ছিল আর পূর্বোক্ত ১৪ই এপ্রিলের পত্রে সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি পরিশোধিত করে পাঠাচ্ছেন—একথা স্পষ্টই উল্লিখিত। সুতরাং প্রথম ছুটির সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটকটি লেখার কাজ হাতে নিয়ে প্রায় শেষ করে এনেছিলেন, এটি ধরে নিতে পারা যায়। প্রথম ছুটির শেষে আমেদাবাদের কর্মস্থলে পুনরায় যোগদান করে গ্রন্থটি ছাপার আগে পরিশোধনের কাজ হাতে নিয়েছেন। এ কাজে তাঁর সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছিলেন গণেন্দ্রনাথ সে-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, দ্বিজেন্দ্রনাথের সহযোগিতার কথাও সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি থেকে জানা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিগুলি থেকে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কথাগুলি তুলে ধরলেই গ্রন্থ প্রকাশের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আহরণ করা যায়।

গ্রন্থটির ছাপার ভার সম্পূর্ণভাবে গণেন্দ্রনাথের উপর দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। দূরে থেকে কিছু কিছু পরিবর্তন-পরিশোধনের ভারও তিনি গণেন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন। সেজন্য গ্রন্থপ্রকাশে সবচেয়ে বড় দান রয়েছে গণেন্দ্রনাথের। গণেন্দ্রনাথকে স্পষ্টই লিখেছেন—"As to corrections, alterations etc., I leave them to you entirely. I can confidently rely on your taste and judgement and so I shall not put you to the trouble of sending over to me the revised manuscript again." (Ahmedabad, 14th April, 1867).

অনুবাদটি যাতে অন্যের বোধগম্য হয় সে সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথের অভিমত জেনে নিঃসংশয় হতে চেয়েছেন। লেখার মধ্যে যদি কোন

স্থান গণেন্দ্রনাথের দুর্বোধ্য ঠেকে, তাহলে তা সত্যেন্দ্রনাথকে জানাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। এমনকি প্রয়োজন হল 'সিম্বেলিন' নাটকের সংগে মিলিয়ে দু একটা ফাঁক জুড়ে দেওয়ার স্বাধীনতাও তিনি গণেন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন—"I only fear lest you should find any portion of my writing unintelligible, in that case, you must write to me··· Besides there is the original before you can always fill up a little gap here and there. You are, as I have said at perfect liberty to make any additions and alterations in the prose part."—(Ahmedabad, 14th April, 18 ,7)

নাটকটির গদ্য সংলাপের কিছু কিছু পরিবর্তনে গণেন্দ্রনাথের উপর ভার রাখলেও অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিশোধনের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের উপরই সত্যেন্দ্রনাথের গভীর আস্থা ছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনাগুলি গণেন্দ্রনাথ গভীর মনোযোগের সংগে দেখে যদি কোন ভুল দেখেন বা কোন স্থানে পরিবর্তন করা উচিত মনে করেন সেগুলি যেন দ্বিজেন্দ্রনাথকে দিয়েই করিয়ে নেন—সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিতে এরকম নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে

"You must look over the blank verses with more care." (14th April, 1867) "Those parts of the blank verse you find fault with or don't approve of, please correct with Bordada's assistance if possible." (Ahmedabad, 2nd Jun, 1867)

ঐ সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ তত্ত্ববিদ্যা লিখতে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। দার্শনিক তত্ত্বচিন্তার গভীর সাগর থেকে ছন্দের পাদপূরণের জগতে ফিরে আসতে তাঁর চিন্তার স্রোত যে ব্যাহত হতে পারে এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ চিন্তিত ছিলেন। সুতরাং সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখার সময় দ্বিজেন্দ্রনাথের হবে না, এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তথাপি গণেন্দ্রনাথ যদি শুধুমাত্র ত্রুটিপূর্ণ অমিত্রাক্ষর ছন্দগুলির দিকে দ্বিজেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাহলে তাঁর নির্দেশ অনুবাদটি পরিশুদ্ধ ও যথাযথ হবে বলেই সত্যেন্দ্রনাথ আশা করে লিখেছেন—"I don't expect that Bordada will have the patience to go through it all, now that he is immersed in the unfathomable depths of his metaphysics, but possible he may spare an

"hour or so in correcting a line here and there, which you will point out to him." (Ahmedabad, 2nd Nune, 1867)

নাটকটির গদ্য সংলাপে চলতি রীতির বানান সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের অভিমত চিঠিতে জানা যায়। তৎকালীন নাট্যকারের পাত্রপাত্রীর সংলাপে যে যে নির্দিষ্ট কোন চলতি বানান অনুসরণ করেন নি সেটিও সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন—"One hint as to spelling. I see that no fixed standard of spelling has been adopted by our dramatic writers—for instances করিতেছি is written as কচ্ছি, কচ্যি করছি etc. Now I should like to see the corruptions conform to the originals, as much as they can be made to do, for instance in writing the word করিতেছি in the colloquial form, I see no reason why'র' should be eluded and'ছ' made into'চ' so that the proper form would be করছি and not কচ্যি. So in general, the ছ-ending need not be changed into 'চ'…"(Ahmedabed, 14th April 1867)

দর্শকের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য নাটকটিতে মাঝে মাঝে কিছু হাস্যরস পরিবেশনের প্রয়োজনীয়তা সত্যেন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন। নির্বোধ আস্ফালনকারী ভীমকেতুর সংলাপে হাস্যরসের সৃষ্টি, এছাড়া কারাগার দৃশ্য ও সুশীলা চরিত্রে কিছু কিছু পরিবর্তনের কথা সত্যেন্দ্রনাথ ভেবেছেন—

"The play seems to be very much deficient in touches of wit and humour—which must be introduced to make it more attractive. The character of ভীমকেতু might be more drawn out, and the prison scene towards the end made more lively, also requires some touches." (Ahmedabad, 15th April, 1867)

নাটকের প্রথম অংকের শেষ দৃশ্য সুশীলা জনার্দনের কথোপকথন গণেন্দ্র-নাথের কেমন লেগেছে তা জানতে তিনি উৎসুক ছিলেন।

'সুশীলা' চরিত্রটি 'ইমোজেন' এর সমধর্মী হলো কি না এই নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছেন। চরিত্রটিতে সামান্য প্রলেপের প্রয়োজন, একথা তিনি গণেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তিনি যেভাবে এঁকেছেন ঠিক সেভাবে রাখার জন্যই গণেন্দ্রনাথকে জোর দিয়ে লিখেছেন—"I think

you had better send the first Act to press. I consent to *Sushila* being turned into a Bengalee purda girl, it is better to leave her as she is." (Ahmedabad, 11th May, 1967)

মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথের ১৪-ই এপ্রিলের (১৮৬৭) চিঠিতে 'সুশীলা also requires some touches' একথার উত্তরেই সম্ভবত গণেন্দ্রনাথ প্রমুখেরা সুশীলার আবরু প্রসংগে কোন মন্তব্য করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের সে মন্তব্য মনঃপূত না হওয়াতেই সুশীলাকে যে তিনি পর্দানশীন বাঙালী মেয়ে করতে চান নি তা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

তাই দেখা যাচ্ছে নাটকের গদ্যসংলাপ ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিশোধনের ভার অন্যকে দিলেও নিতান্ত অবাস্তব না হলে চরিত্রগুলিকে তিনি অবিকৃত রাখার পক্ষেই ছিলেন। গণেন্দ্রনাথকে স্পষ্টতই লিখেছেন—"I shall not trouble you to touch up any of the characters if you think that it is impracticable." (Ahmedabad, 2nd June, 1867)

গ্রন্থমুদ্রণের প্রুফশীট দেখায় অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর সহায়তার কথা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র থেকে জানা যায়। অযোধ্যানাথ পাকাড়াশী যদি গ্রন্থটিতে কোন কিছু পরিবর্তন করেন, তাহলে যেন সেটি গণেন্দ্রনাথের গোচরীভূত হয়, কারণ প্রেসে যাবার পূর্বে গণেন্দ্রনাথের অনুমোদনই সত্যেন্দ্রনাথের কাম্য ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্যবোধে পাকড়াশী মহাশয়কেও ধন্যবাদ জানাতে ভোলেন নি। গণেন্দ্রনাথকে লিখেছেন—"Kindly look over the proof-sheets carefully, with the assistance of পাকড়াশী মহাশয় to whom give my best thanks..." (Ahmedabad 11th May, 1867)

ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে গণেন্দ্রনাথ বইটি ছাপাবার ব্যবস্থা করায় সত্যেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন। ছাপাখানার কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়কে, বইটির প্রচ্ছদ সম্পর্কে অধিকতর যত্ন নেবার জন্য, গণেন্দ্রনাথ যেন নির্দেশ দেন, একথাও সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিতে আছে—'You are right in selecting the Brahmo Samaj Press for printing it, only you must instruct the manager to to take a little care in the 'get up' of the book when published.' —(Ahmedabad, 2nd Jun, 1867)

পূর্বোক্ত ১৮৬৭-র ৪ঠা সেপ্টেম্বরের চিঠি থেকে সত্যেন্দ্রনাথ অধীর আগ্রহে যে নাটকটির ১ম অংকের মুদ্রিত রূপ দেখার জন্য প্রতীক্ষা করছেন তা জানা যায়। এরপর আর এই নাটক প্রসংগে গণেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর কোন চিঠি পাওয়া যায় নি। ইতোমধ্যে তিনি নিজে ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অসুস্থবোধ করায় ১৮৬৭-র অক্টোবর থেকে আবার আট মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। তিনি কলকাতা আসার প্রায় মাস চারেক পর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

তৎকালীন বাংলায় শেক্সপীয়র চর্চা ও সুশীলা বীরসিংহ

'বাংলায় শেক্সপীয়র চর্চা' প্রবন্ধে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"সিম্বেলিন অবলম্বনে ১৮৬৮ সালে দুটি নাটক লেখা হয়েছিল। একটি চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুমকুমারী' নাটক অন্যটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটক। এছাড়া অনুবাদ করেছেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়"[৪] তিনি আরও বলেন যে সকল ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলাভাষাতেই শেক্সপীয়র চর্চা সবচেয়ে বেশী হয়েছে। তবে ইংরেজি-অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে শেক্স-পীয়রের অপরিচিত জগতের দ্বারা উন্মুক্ত করতে গিয়ে তৎকালীন অনুবাদকগণ দেশীয়করণের উপরেই জোর দিয়েছেন। তাঁদের মনে হয়েছিল এই নূতন জগতের বাহিক্য বাধাগুলি অপসারিত করলে সাধারণ দর্শকদের রসাস্বাদনের পথ প্রশস্ততর হবে। তাই শেক্সপীয়রের ভাব ও কাহিনীটুকু নিয়ে ভারতীয় পরিবেশনের পটভূমিকায় সেকালের অনুবাদগুলি রচিত হয়েছিল। সেজন্যই ঘটনাস্থল ও পাত্রপাত্রীদের নামকরণে ভারতীয়করণের প্রবণতা লক্ষিত হয়। এই দুয়ের মিলনপ্রচেষ্টা কম বেশি মাত্রায় শেক্সপীয়র-আশ্রিত প্রায় সকল নাটকেই অনুসৃত হয়েছে। তৎকালীন শেক্সপীয়র চর্চার এটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন কোন ক্ষেত্রে রূপান্তর এমনভাবে হয়েছে যে নামকরণ ও পরিবেশ থেকে বোঝাই যায় না, যে তা শেক্সপীয়রের রচনাকে আশ্রয় করে লেখা। এ প্রসংগে সত্যেন্দ্রনাথের সুশীলা-বীরসিংহ নামকরণটি উল্লেখ্য। 'সিম্বেলিন' নামের কোন ছায়া নেই 'সুশীলা-বীরসিংহে'। ঠিক তেমনি চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুমকুমারী' নাম থেকে মনেই হয় না, যে এটি 'সিম্বেলিন' অবলম্বনে রচিত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর রচিত 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর (১৮৬৯) ভূমিকায়

ভারতীয় পটভূমিকায় শেক্সপীয়রের অনুবাদ করার পক্ষেই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।—

—"বাংগলা পুস্তকে ইয়ুরোপীয় নাম সুশ্রাব্য হয় না, বিশেষতঃ যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বিরক্তিকর হইয়া ওঠে। এই দোষের পরিহার বাসনায়, ভ্রান্তিবিলাসে সেই সেই নামের স্থলে এতদ্দেশীয় নাম নিবেশিত হইয়াছে। উপাখ্যানে এবংবিধ প্রণালী অবলম্বন করা কোনও অংশে হানিকর বা দোষাবহ হইতে পারে না।'[৫]

অনুরূপ যুক্তি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ও 'রোমিও জুলিয়েটে' (১৮৯৫) ভূমিকায় দিয়েছেন —"বাংগালা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকৃতিগত এত প্রভেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজি নাটকের কেবল অনুবাদ করিলে তাহাতে কাব্যের রস কি মাধুর্য কিছুই থাকে না, এবং দেশাচার লোকাচার ও ধর্মভাবাদির বিভিন্নতা প্রযুক্ত এরূপ শ্রুতিকঠোর ও দৃশ্যকঠোর হয় যে তাহা বাংগালী পাঠক ও দর্শকদিগের পক্ষে একেবারে অরুচিকর হইয়া উঠে। সেইজন্য আমি রোমিও জুলিয়েটের কেবল ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি প্রকাশ করিলাম"

বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদের প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরণের সমন্বিত প্রচেষ্টা যে ভবিষ্যতে সুফলপ্রসূ হবে এ প্রসংগে পূর্বোক্ত ভূমিকায় হেমচন্দ্রের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিদেশীয় নাটক কবিতাদির অবিকল অনুবাদে বাংগালা সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ কিছুকাল এই প্রণালী অনুসরণ করা অপরিহার্য বলিয়াই আমার ধারণা।"[৬]

সত্যেন্দ্রনাথের সুশীলা-বীরসিংহ নাটকের বিশ্লেষণে আসার আগে সমকালীন শেক্সপীয়র চর্চার সামান্য আভাস দেওয়া গেল। এবারে সত্যেন্দ্র-নাথের একমাত্র পূর্বসূরী হরচন্দ্র ঘোষের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পটভূমিকা হিসাবে বোধ করি অপ্রাসংগিক হবে না। হরচন্দ্র ঘোষের দুটি অনুবাদ 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস', ১৮৫৩-তে (মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস) ও 'চারুমুখ-চিত্তহরা', ১৮৬৪তে, (রোমিও জুলিয়েট) সত্যেন্দ্রনাথের 'সুশীলা-বীরসিংহের' অনেক আগেই প্রকাশিত। ভানুমতী-চিত্তবিলাস প্রসংগে অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত বলেন—"নাটকটি শেক্সপীয়রের 'Merchant of Venice'-এর

মুক্ত অনুবাদ। কিন্তু ইংরেজি নাটকের অনুবাদ করতে বসেও তিনি সংস্কৃত নাটকসুলভ নান্দী-সূত্রধরের মোহ পরিত্যাগ করতে পারেন নি।"[৭]

ভানুমতি-চিত্তবিলাসের ভূমিকায় হরচন্দ্র ঘোষ নিজেই বলেছেন—আনুপূর্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয়না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান মহাশয় উল্লেখিত কাব্যের আখ্যানের মর্মমাত্র গ্রহণপূর্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্ত দান করেন।" কাজেই অনুবাদের সংগে মূল নাটকের অনেক স্থানেই পার্থক্য চোখে পড়ে। 'দেশীয় মহাশয়দিগের অবকাশকালে গ্রন্থ পাঠামোদের আনুকূল্য বিবেচনা' করেই তিনি তা করেছেন একথা তাঁর ভূমিকায় স্পষ্ট ঘোষিত। অনেকেই হরচন্দ্র ঘোষকে শেক্সপীয়রের নাটকের ব্যর্থ অনুবাদক বলেছেন। তবে 'এইটুকুই হরচন্দ্র ঘোষের একমাত্র দান স্বীকার্য' যে বাংলা সাহিত্যে শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদের তিনিই সূচনা করেন '[৮]

শেক্সপীয়রের নাটকের দেশীয়করণের এই প্রবণতা উনবিংশ শতাব্দী মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ভারতীয়করণের যুক্তিতে অনেক অক্ষম নাট্যকার শেক্সপীয়রের নাটককে বিবৃতও করেছেন।

আমাদের আলোচ্য অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দেশীয় পটভূমিকায় শেক্সপীয়রের রচনাকে মূলানুগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অনুবাদের মাধ্যমে প্রকৃত সাহিত্যিক গুণ ফুটিয়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এ কাজ হাতে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যে কত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তা তাঁর পূর্বোক্ত পত্রগুলি থেকে জানা যায়। ভারতীয় পরিবেশে রূপান্তরিত শেক্সপীয়রের নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্য প্রথমে চোখে পড়ে তা সত্যেন্দ্রনাথের নাটকেও অনুসৃত। যেমন ঘটনাস্থল বাংলাদেশের বাইরে। চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় মনে করেন—'কাহিনীর নাটকীয়তাকে সম্ভাব্য করবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় অপরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।'[৯]

'সুশীলা-বীরসিংহের' একই বছরে প্রকাশিত (১৮৬৮) 'সিম্বেলিন'-এর এন্য অনুবাদ 'কুসুমকুমারী' নাটকের ভূমিকা থেকে অনুবাদ চন্দ্রকালী ঘোষ হুবহু অনুবাদ না করে শেক্সপীয়রের নাটককে বাংলা ভাষায় অভিনয়ের উপযোগী করে রচনার বিশেষ প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন এ কথা জানা যায়—

"শোভাবাজারস্থ গোপনীয় নাট্যসভায় যৎকালীন কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, সেই সময় উক্ত সভার কয়েকজন সভ্য আমাকে সেক্সপিয়ারের আভাস লইয়া বংগীয় সাধুভাষায় একখানি নাটক প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন, আমি সেই অনুরোধে মহাকবি সেক্সপিয়ার প্রণীত সিম্বেলিনের গল্পকে মনোনীত করিয়া তাহার আভাসে এই কুসুমকুমারী নাটক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু কুসুমকুমারী সিম্বেলিনের অবিকল অনুবাদ নহে, ইহাতে কেবল সেক্সপিয়ারের স্থূল ভাবটি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং যাহাতে অংক সকল আর নায়ক নায়িকার সংখ্যা অল্প হয় এইরূপ প্রণালীতে এই পুস্তক রচনা করা হইয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের যাহাতে বিশ্রাম হয়, সে বিষয়েও বিশেষ যত্ন করা গিয়াছে, ফলে বর্তমানের বংগভাষার নাট্যাভিনয়ের যে যে নিয়ম আছে, সেই সকলকে অবলম্বন করিয়া আমি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি।"[১০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটি বিশেষ নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয়-চাহিদা মেটাতে সিম্বেলিনের হুবহু পরিবেশন করা চন্দ্রকালী ঘোষের পক্ষে সম্ভব হয় নি। মূল নাটকের দৃশ্যবিভাগ ও পাত্রপাত্রীর সংখ্যা কিছু কমাতে হয়েছে। দেশীয়করণের উদ্দেশ্যে ব্রিটেন ও রোম, ইন্দোর ও সিন্ধুদেশে রূপান্তরিত হয়েছে। Cloten চরিত্র এখানে সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। সে সময় অবরোধপ্রথা থাকায় মূল নাটকের Iachimo-র চরিত্রেরও হুবহু প্রতিফলন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। শুধুমাত্র অভিনয়ের উদ্দেশ্য নিয়েই সত্যেন্দ্র-নাথ অনুবাদ করেন নি। শেক্সপীয়রের রচনাকে মূলানুগ পরিবেশন করাই তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্যই 'সুশীলা-বীরসিংহে' আগাগোড়া অংক ও দৃশ্যবিভাগ সিম্বেলিন-এর সংগে সমান তালেই রক্ষিত হয়েছে। পাত্রপাত্রীদের রূপায়ণেও কোন কার্পণ্য ঘটে নি।

'সুশীলা-বীরসিংহে' নাটকের কাহিনী

জয়পুরের রাজা জয়সিংহের একমাত্র কন্যা সুশীলা ছিলেন ভবিষ্যৎ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী। কারণ রাজা জয়সিংহ একবার এক রাজসভাসদের প্রতি অকারণে নির্বাসনের আদেশ দিলে, প্রতিশোধ নিতে তিনি রাজার দুই পুত্রকে হরণ করেন। সুশীলার বিমাতার একান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁরই মাসতুতো

ভাই নির্বোধ ভীমকেতুর সংগে সুশীলার পরিণয় ঘটিয়ে ভবিষ্যতে রাজ্যশাসনে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। পত্নীর প্ররোচন-য় জয়সিংহেরও এ বিবাহে পূর্ণ সমর্থন ছিল। এদিকে সমস্ত পরিকল্পনা বিনষ্ট করে দিয়ে সুশীলা বীরকুলোদ্ভব, লোকপ্রিয় এক সামান্য সভাসদ বীরসিংহকে গোপনে পতিত্বে বরণ করেন। ক্রুদ্ধ জয়সিংহ বীরসিংহকে রাজ্য ছেড়ে যাবার আদেশ দেন।

যাবার আগে বীরসিংহ সুশীলাকে তার প্রেমের অভিজ্ঞান স্বর্ণবলয় পরিয়ে দেন, সুশীলাও স্মরণচিহ্ন রূপে বীরসিংহকে পরিয়ে দেন হীরক অংগুরী।

মহারাষ্ট্রের সেতারা নগরে বীরসিংহের পিতৃবন্ধু নরোত্তম শ্রেষ্ঠীর আশ্রয়ে বিরহক্লিষ্ট বীরসিংহ যখন সুশীলার স্মৃতিতে মগ্ন—এমন সময় সেখানে কয়েকজন বণিক সতীত্বের ক্ষেত্রে আপন আপন স্ত্রীদের শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করে। বীরসিংহের পক্ষে তা মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পঠে—কারণ রাজপুত রমণী সুশীলার একানিষ্ঠ প্রেমের স্মৃতি-ধারায় তখন তাঁর সমগ্র অন্তর স্নাত। সবশেষে ধূর্ত বণিক জনার্দন সুশীলার প্রেমের ক্ষণভংগুরতা প্রতিপন্ন করতে বীরসিংহের সংগে বাজি ধরে। বাজির শর্ত থাকে, ব্যর্থ হলে বীরসিংহের জনার্দনের মৃত্যু—নাহলে তাঁর হাতের হীরক অংগুরীয় লাভ।

ধূর্ত জনার্দন জয়পুরে এসে সুকৌশলে নিদ্রিতা সুশীলার শয়নঘরে প্রবেশ করে ও তাঁর হাতের স্বর্ণবলয় চুরি করে আনে। সে কক্ষের গৃহশয্যা ও অন্যান্য বিবরণ জনার্দন এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে যে বীরসিংহের সমস্ত বিশ্বাস এক মুহূর্তেই চূর্ণ হয়ে যায়; জনার্দনের হীন ছলনারই জয় হয়। বিশ্বাসভংগের বেদনায় উন্মত্তপ্রায় বীরসিংহ জয়পুরে তাঁর প্রিয় অনুচর ভোলা-নাথকে সুশীলা-হত্যার নির্দেশ পাঠান। মমতাময়ী সুশীলা ভোলানাথেরও প্রিয় ছিলেন। বিদেশে কোন দুষ্কৃতকারীর হীন প্রচেষ্টায় বীরসিংহের মন বিষাক্ত হয়েছে এই দৃঢ় ধারণা নিয়েই সুশীলাকে পুরুষের বেশে ভোলানাথ ইন্দোরের পথে ছেড়ে দিয়ে আসে ও সুশীলা হত হয়েছেন এই মিথ্যা সংবাদ বীরসিংহকে পাঠায়।

যাত্রাপথে ক্লান্ত অবসন্ন পুরুষবেশী সুশীলা বিন্ধ্যাচলে পর্বতগুহায় এক বৃদ্ধ ও দুই তরুণ কুমারের দেখা পান। এদের আতিথ্য ও মমতায় সুশীলা মুগ্ধ হন। কেউ কারো প্রকৃত পরিচয় জানেন না অথচ এই দুই পুত্র রাজা জয়সিংহের অপহৃত সন্তান আর বৃদ্ধ সেই নির্বাসিত রাজসভাসদ। সকলে

শিকারে চলে গেলে পরদিন ক্লান্তিতে অবসন্ন সুশীলা বল ফিরে পেতে ভোলানাথের দেওয়া ওষুধ খান যা এক আশ্চর্য 'বলকারক মহৌষধি' বলে রাণী ভোলানাথকে দিয়েছিলেন; আসলে তা এমন বিষ যা খেলে জীবনের স্পন্দন কিছু সময় থেমে যায়, ভোলানাথের এটি জানা ছিল না গুহায় ফিরে এসে দুই কুমার নিরথ নিস্পন্দ সুশীলার দেহ দেখে শোকে আকুল হয়ে ওঠে, ও সুশীলার দেহ পুষ্পাভরণে সাজিয়ে প্রকৃতির কোলে তৃণশয্যায় তাঁকে শেষবারের মতো শায়িত করে ফিরে আসে। সেদিনই শিকারের সময় বড় কুমারের হাতে দুর্বিনীত ভীমকেতুর মৃত্যু ঘটে। বীরসিংহেরই পোশাক পরে ভীমকেতু সুশীলার সন্ধানে ঐ পথ দিয়েই যাচ্ছিল। শত্রু হলেও তার উপযুক্ত সৎকার করতে তারা বিস্মৃত হয় নি। ভীমকেতুর মুণ্ডহীন শব যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণ করে সুশীলার পাশেই রেখে তারা ফিরে আসে। ইতিমধ্যে চেতনা ফিরে পেয়ে বীরসিংহের পোশাকে আচ্ছাদিত শবদেহ দেখে সুশীলা আর্তনাদ করে ওঠেন। মহারাষ্ট্র সেনাপতি শম্ভুজী ঐ পথেই জয়পুর যাচ্ছিলেন। তরুণ 'শশীন্দ্র'রূপী সুশীলাকে দেখে তাঁর মায়া হয় ও অনুচর করে তাঁকে জয়পুরে নিয়ে আসেন।

এদিকে জয়পুরের আসন্ন সংকট। রণদামামার নির্ঘোষ, বিপুল উৎসাহে, মহারাষ্ট্রসেনা এগিয়ে আসে। চারিদিকে যুদ্ধের হুংকার—বনচর দুই কুমারের দেহে ক্ষত্রতেজ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। জয়পুরের পক্ষ নিয়ে বৃদ্ধসহ তারা সমরক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুশীলার হত্যার সংবাদে অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত বীরসিংহ প্রিয়ার স্মৃতিবিজড়িত জন্মভূমি জয়পুরের পক্ষেই কৃষকের বেশে যুদ্ধে যোগদান করেন। এঁদেরই অক্লান্ত চেষ্টায় শত্রুর হাত থেকে জয়পুর রক্ষিত হয়। সুশীলার শোকে আকুল বীরসিংহের কাছে জীবন আসক্তিহীন। তাই মহারাষ্ট্রীয় বলে আত্মপরিচয় দিয়ে নির্বিকার চিত্তে কারাবরণেও তাঁর কোন খেদ নেই।

শেষ দৃশ্যে রাজসভাসদ ও বন্দীদের উপস্থিতিতে সকলের আসল পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। বন্দী শম্ভুজী শশীন্দ্রকে জয়সিংহের হাতে সমর্পণ করেন। বিন্ধ্যাচল গুহায় যে শশীন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে তার অবিকল আকৃতি দেখে দুই কুমারের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। শশীন্দ্র জনার্দনের হাতের হীরক অঙ্গুরীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে অনুতপ্ত জনার্দন তার দুষ্কৃতির ইতিহাস ব্যক্ত করে ও

বীরসিংহের মার্জনা ভিক্ষা করে। এবারে ভোলানাথ দেয় শশীন্দ্রের আসল পরিচয়। তারই ফলে সুশীলার সংগে বীরসিংহের পুনর্মিলন ঘটে। পূর্বের প্রতিহিংসা ভুলে বৃদ্ধ ভরত তার আপন সন্তানসম দুই কুমারকে রাজা জয়সিংহেরই কুমার বলে ফিরিয়ে দেন। দুষ্কৃতকারিণী রাণীরও মৃত্যু-সংবাদ আসে। পুত্রদ্বয় ও কন্যাকে ফিরে পেয়ে রাজার আনন্দের আর সীমা থাকে না। নূতন জয়যাত্রা ও নবমিলনের সুরেই নাটকটির সমাপ্তি ঘটেছে।

সিম্বেলিন-এর আলোক 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটকের বিশ্লেষণ

শেক্সপীয়রের 'সিম্বেলিন' নাটকের যাথযথ অনুসরণে সত্যেন্দ্রনাথ সুশীলা-বীরসিংহ নাটকে পঞ্চাংক বিভাগ রক্ষা করেছেন। সংস্কৃত নাটকের মতো নান্দী-সূত্রধরের রীতি অনুসরণ করেন নি। শেক্সপীয়রের মতোই সাধারণ কথাবার্তার স্থানে গদ্য ও আবেগাত্মক অংশে পদ্য ব্যবহার করেছেন। তৎকালীন দিনের শেক্সপীয়রের অন্যান্য নাট্যানুবাদকদের মতো পাত্রপাত্রীদের নামের দেশীয়করণ তাঁর রচনাতেও পাওয়া যায়। 'সিম্বেলিন'-এর ব্রিটেন ও রোম 'সুশীলা-বীরসিংহে' জয়পুর ও সেতারা হয়েছে। Imogen ও Posthumus সুশীলা ও বীরসিংহে রূপান্তরিত হয়েছে। Cloten ভীমকেতু ও Iachimo জনার্দনরূপে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে—Cymbeline জয়সিংহ, Belarius ভরত, Lucius শম্ভুজী ও Pisanio—কে ভোলানাথ করা হয়েছে। ইমোজেনের হাতে tale of Tercus গল্পটি দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সুশীলার হাতে 'নল-দময়ন্তী' গ্রন্থে রূপান্তরিত হওয়ায় অনুবাদটি দেশীয়করণে সহায়ক হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই সিম্বেলিন-এর জুপিটার সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে ত্রিশূলধারী মহাদেব রূপান্তরিত হয়েছেন।

আক্ষরিক অনুবাদে সার্থকতা

প্রথমে সিম্বেলিন নাটকের সংগে 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটকের সাদৃশ্যগুলি আলোচনার পর সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে স্বকীয়তার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। শেক্সপীয়রের ভাষার গাম্ভীর্য, উচ্ছ্বাসময় সংলাপ ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশ 'সুশীলা-বীরসিংহে' যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। নিদ্রিতা সুশীলার কক্ষমধ্যে জনার্দন যেখানে বলছে—

'সকলি প্রশান্ত এবে জীবজন্তু গণ
নিদ্রায় নিঝুম হয়ে করে শ্রান্তি দূর।
একি দেখি হায় শরতের শশী
গগন হইতে খসে পড়েছে ভূতলে
সুকোমলা কমলিনী ফুটেছে হেথায়
নিঃশ্বাস সৌরভে দশদিক্ আমোদিত
দীপশিখা নতশিরে পূজে সুন্দরীরে ;...

সেখানে ইয়াসিমোর কণ্ঠেও শোনা যাচ্ছে—

'The crickets sing, and man's o'er—laboui'd sense
Repairs itself by rest.....

How bravely thou becomest tny bed ; fresh lily :
And whiter than the sheets ;...
... ... 'Tis her breathing that
perfumes the chamber thus ; the fiame o' the taper
Bows toward her,...' [Act II, Sc. II]

প্রভাতে সুশীলার মনোরঞ্জনের জন্য নির্বোধ ভীমকেতুর গায়কদের দ্বারা সংগীতের আয়োজনে যে গীতটি সুশীলা-বীরসিংহে পরিবেশিত হয়েছে তা মূলের সংগে সম্পূর্ণ মিল রেখে রচিত। মূলত সিম্বেলিন নাটকে এই সংগীতটির প্রথম অংশে Lyly রচিত Alexander and Campaspe নাটকের প্রভাব রয়েছে।[১১] সত্যেন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের রচনাকে পুরোপুরি অনুসরণ করেও ভারতীয়করণের উদ্দেশ্যে সংগীতটির আলংকারিক সৌন্দর্য সর্বত্র রাখতে পারেন নি। সংগীত দুটি পাশাপাশি রাখলেই তা চোখে পড়ে। সিম্বেলিন নাটকে রয়েছে—

Hark hark ; the lark at heaven's gate sings,
And Phoebus gins arise,
His steeds to water at those syrings
On chaliced flowers that lies ;

And winking Mary-buds begin
To ope their golden eyes :
With every thing that pretty is,
My lady sweet, arise ;
Arise, arise : [Act II, Sc. III]

সত্যেন্দ্রনাথ এখানে লিখেছেন—

'নিশা গেল নিশানাথ মলিন বরণ
উঠ উঠ মেলে প্রিয়ে কমল নয়ন।
ঐ শুনা যায় পিকধ্বনি, উঠ উঠ সুবদনি
উঠিতেছে দিনমণি উজলি গগন
বহিতেছে পরিমল, সমীরণ সুশীতল
বিকশিত শতদল সরসীরঞ্জন।
এবে উষা সুকুমারী খেলে রূপের মাধুরী
তোমা বিনে, হে সুন্দরি, বিরস বদন।
ফুলে ফুলে অশ্রুজল, ঝরে দেখ অবিরল,
তোমার বিরহে হল আকুল ভুবন।
কত আর রবে প্রিয়ে মুদিয়ে নয়ন।'

এখানি ধ্বনি-মধুর 'বিকশিত শতদল সরসীরঞ্জন' ও 'Lark'-এর বদলে পিকধ্বনি প্রয়োগ করায় দেশীয়করণের সার্থক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তবে "And Phoebus gins arise·· that lies" অংশে সূর্যদেবের শিশিরপানের কল্পনায় যে অতুলনীয় কাব্যসৌন্দর্য রয়েছে তা 'সুশীলা বীরসিংহে' অননুদিত।

নায়িকাকে পুরুষবেশে সাজানোতে শেক্সপীয়রের এক প্রবল অনুরাগ ছিল। অন্যান্য অনেক নায়িকার মতো সিম্বেলিন নাটকেও মিলফোর্ড হ্যাভেন যাত্রাপত্রে ইমোজেনকে পুরুষবেশে সাজিয়েছেন। এখানে ইমোজেনকে পিশানিও যেমন বলছে—

'What shall I need tc draw my sword? The paper Hath cut her throat already.' [Act III, Sc. IV]

ঠিক তেমনি ভোলানাথও সুশীলাকে বলছে—

'তলবার খুলিবার নাহি প্রয়োজন
বুকে ছুরী মারিতেছে এ বিষম লিপি।'

এই একটি উক্তির মাধ্যমে ভোলানাথের চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সুঅনূদিত সংলাপের বৈশিষ্ট্য এখানে চোখে পড়ে। তৃতীয় অংকের ষষ্ঠ গর্ভাংকে, বিন্ধ্যাচল গুহার সম্মুখে পুরুষবেশী সুশীলার উক্তি—সভ্য ভব্য বন্য যেই হও সাড়া দেও'—এর সংগে ইমোজেনের উক্তি—

'...Ho : who's here ? If any thing that's civil speak ; if savage, Take or lend...'—এর হুবহু প্রতিরূপ না হলেও দুটি উক্তির ভাবসাদৃশ্যের কোন অভাব ঘটে নি। মূলত নানা ষড়যন্ত্রের পর গুহার দৃশ্যে এসে স্নেহরসের এক অপূর্ব ধারায় দর্শকমন পরিতৃপ্ত হয়। সমালোচক Frederick S. Boas. শেক্সপীয়রের এই দৃশ্যগুলি সম্পর্কে শিশিরস্নাত এই মন্তব্য করেছেন।[১২] অনুরূপ মন্তব্য সুশীলা-বীরসিংহের গুহাদৃশ্যের প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে।

কারাগার দৃশ্যে সুশীলা-বীরসিংহ নাটকের প্রথম রক্ষীর—'তবে এসখানেই বসো বসো ঘাস কাট' ও দ্বিতীয় রক্ষীর—'আর ক্ষুধা পেলে খেয়েও নিও' ইত্যাদি ব্যংগোক্তির সংগে সিম্বেলিন নাটকের কারারক্ষীদের বিদ্রূপাত্মক উক্তির সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়।

First gaol—...So graze as you find pasture.

Second gaol— Ay, or a stomach. [Act V, Sc. IV]

কারারক্ষীদের সংলাপে সত্যেন্দ্রনাথ চলতি ভাষা প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছেন বেশি। নাটকের একঘেয়েমি দূর করতে এই দৃশ্যটিকে নিয়ে যে তিনি অনেক ভেবেছেন তা তাঁর পত্রের মাধ্যমে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

আক্ষরিক অনুবাদে ব্যর্থতা

অনেক সময় আক্ষরিক অনুবাদ করতে গিয়েও সংলাপ স্থানে স্থানে শ্রুতিকটু হয়ে উঠেছে। সিম্বেলিন-এ ইমোজেন যেখানে নিজের প্রাণ সঁপে দিয়ে বলেছেন—"The lamb entreats the butcher : where's thy knife ?" (Act III, Sc. IV). সেখানে সুশীলার কণ্ঠেও অনুরূপ মিনতি

শোনা যাচ্ছে—'কপালে সাধিছে ছাগী দেও গলে ছুরী'। মূলের প্রতি আনুগত্য রক্ষার প্রবল প্রচেষ্টায় সংলাপটি করুণার বদলে হাস্যোদ্রেকই করে।

ভাবানুবাদ

কোন কোন ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ হলেও অনুবাদ সার্থক হয়েছে। 'Why, one that rode to's execution, man, could never go so slow: [Act III, Sc. II]—ইমোজেনের এই উক্তির সাদৃশ্য নিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ সুশীলাকে দিয়ে বলিয়েছেন—'নদী যাবে চলে সিন্ধুপানে কার সাধ্য আটকে তাহায়।' আক্ষরিক না হলেও ইমোজেন চরিত্রের দৃঢ়তা সুশীলা চরিত্র সার্থক প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এখানে সুশীলার উক্তিতে মাইকেল মধুসূদনের প্রমীলা চরিত্রের প্রভাব দেখা যায়।[১৩]

'সিম্বেলিন' নাটকে জুপিটারের ভবিষ্যৎলিখন 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটকেও ব্যর্থ ভাষায় মহাদেবের ভূর্জপত্র লিখনে অনুসৃত। ভূর্জপত্রের বাণীটি নিম্নোক্ত ভাষায় সুশীলা-বীরসিংহে পাওয়া যাচ্ছে—

'সিংহের শাবক এক প্রবল প্রতাপ
প্রিয়ারে হারায়ে তার করে পরিতাপ
বিনা যত্ন পরিশ্রমে বিনা অন্বেষণ
দুখিনী হরিণী এক পাইবে যখন।...(৫ম অংক, ৪র্থ গর্ভাংক)

সিম্বেলিন-এ পাওয়া যাচ্ছে—

'Whenas a lion's whelp shall, to himself unknown, without seeking find, and be embraced by a piece of tender air :...'

এখানে 'a piece of tender air'এর ভাবের সংগেই মিল রেখে 'দুখিনী হরিণী'-র প্রয়োগ করেছেন।

ভাষা প্রয়োগে বৈশিষ্ট্য

নাটকটিতে সংলাপ স্বাভাবিক করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম্য চলিত শব্দের প্রয়োগও সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে পাওয়া যাচ্ছে। ধূর্ত

জনার্দনের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে যে ভাষা তিনি জনার্দনের মুখে দিয়েছেন তা আক্ষরিক হলেও আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

জনার্দন—

'... এ বালার সোনা

আর এই অংগুরীর হীরা—দুয়ে বিয়া

দিতে বড় সাধ মোর।' (২য় অংক ৪র্থ গর্ভাংক)

গুহার দৃশ্যে শশীন্দ্ররূপী সুশীলার মৃত্যুতে ছোটকুমার ভূপেন্দ্রের মুখে বিলাপ দিয়েছেন—'আহা হা যে পাখিটিকে এত যত্ন করে রেখেছিনু, মরে গেল সিটি।' এখানে 'সিটি' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা নগর থেকে দূরে, গুহায় পালিত, রাজকুমারদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য প্রতিদানে সত্যেন্দ্রনাথ সচেষ্ট হয়েছেন। এই দৃশ্যেই বড়কুমারের মুখে যে আবেগের ভাষা দিয়েছেন তাতে তারা অন্তরের সারল্যই প্রতি ধ্বনিত হচ্ছে—

কত ভালবাসি | শশীন্দ্র তোমারে আমি নাহি তার তুলা'

(৪র্থ অংক ১ম গর্ভাংক)

সত্যেন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মতো 'কষ্টে স্রষ্টে' শব্দটির প্রয়োগ এখানেও পাওয়া যায়। আঞ্চলিক বাচনভংগী ও উচ্চারণ অনুসরণে কতগুলি শব্দের ব্যবহার সত্যেন্দ্রনাথের আলোচ্য অনুবাদে দেখা যায়।—যেমন— 'আগু-পাছু', 'বলো্য', 'পর্য্যে', 'কর্য্যে', 'বস্যে,' 'পড়্যে' 'ভয়ের' ইত্যাদি।

স্বকীয়তা

পুরোপুরি আক্ষরিক অনুবাদ করতে চাইলেও সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় স্বকীয়তা পরিস্ফুট। সংস্কৃত প্রবচনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের নিদর্শন এই নাটকেও পাওয়া যায়। বীরসিংহের প্রসংগে সুশীলার কাছে জনার্দনের মিথ্যা উক্তিতে জোর দেওয়ার জন্য 'বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ' এই সংস্কৃত প্রবচনটি দিয়েই আবার বাংলায় তার ভাবানুবাদ দিয়েছেন।

শেষ দৃশ্যে জনার্দনের প্রতি বীরসিংহের মার্জনায় ক্ষমাগুণের মহাত্ম্যসূচক সংস্কৃত শ্লোক সত্যেন্দ্রনাথ আচার্যকে দিয়ে পরিবেশন করেছেন—

'ক্ষমা বশীকৃত লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং।

ক্ষমাগুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা॥'

সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটকের অন্যান্য রীতি গ্রহণ না করলেও তৎকালীন দিনের উপযোগী করে সবশেষে ভরতবাক্যটি প্রয়োগ করেছেন।

হোন রাজা প্রকৃতিরঞ্জন
প্রজা রাজভক্তিপরায়ণ—ইত্যাদি

কারাগার দৃশ্যে ভূতগণের সংগীতটি সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব সংযোজন। মূল নাটক 'সিম্বেলিন'-এ এটি নেই। উক্ত সংগীতে যে শব্দগুলি প্রয়োগ করেছেন তা ভূতগণের উপযুক্তই হয়েছে।

'শিব শিব, শম্ভো শম্ভো…বরখবান্ বরখবান্ বরবান্ বরবান ত্রিশূল কপর লিয়ে লিয়ে লিয়ে ভুঁই ভুঁই শংকর শংকর।'

পঞ্চম অংকের দ্বিতীয় গর্ভাংকে সমরক্ষেত্রে বডকুমার মহেন্দ্রের মুখে—"কি ভয় কি ভয়' কথা দিয়েছেন। দেশের পরাধীনতা মোচনে এই উদ্দীপনাময় বাণীটি সত্যেন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সমকালে রচিত ভারত সংগীতেরও এটি মুখ্য ভাব।

উপসংহার

সিম্বেলিন নাটকটি মূলত ইমোজেনর গল্পকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। একটি বাজির ওপর নাটকটির ভিত্তি। আধুনিক দৃষ্টিতে এই বাজির কাহিনীকে রুচি বিগর্হিত মনে হলেও শেক্সপীয়রীয় যুগে এ ধরণের কাহিনী বোধ করি নিতান্ত অচল ছিল না। শেক্সপীয়র Boccaccio-র *Decameron* গ্রন্থ থেকে এই বাজির কাহিনীটি নিয়েছিলেন। বাংলাদেশে তৎকালীন অবরোধপ্রথা হেতু দৃশ্যটির দেশীয়করণে অনুবাদকগণও অনেক ভাবিত হয়েছেন।

চরিত্র ও ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে যে স্বতঃস্ফূর্ত নাটকীয়তার সৃষ্টি হয় সিম্বেলিন নাটকেই তার অভাব রয়েছে। স্থানে স্থানে নাটকটিতে কৃত্রিমতা ও সুকৌশলে সৃষ্ট ঘটনার জটিলতা দেখা যায়। বলা বাহুল্য মূলের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করার ফলে এ ধরণের জটিলতা ও কৃত্রিমতা থেকে সুশীলা-বীরসিংহও মুক্ত নয়। একান্ত মূলানুসারী করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সিম্বেলিন নাটকের Exposition, growth of action, climax ইত্যাদি

যথাযথ রক্ষা করেছেন। সিম্বেলিন-এর অনেক ক্ষেত্রেই পাত্রপাত্রীদের মুখে দীর্ঘ সংলাপ উচ্ছ্বাসময় স্বগতোক্তিতে পরিণত হয়েছে।—

আরে রে শোণিত সিক্ত প্রিয়ার বসন…

বীরসিংহের এই স্বগতোক্তিতে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস অনুবাদেও ধরা পড়ে।

অনেক স্থানে নাটকের সংলাপ দর্শকদের গল্প শোনানোর মতো করে রচিত হয়েছে। অনুবাদেও তার ব্যতিক্রম হয় নি অভিনয় প্রস্তুতিতে অনেক সংলাপ যে বাদ দিতে হয়েছে তা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্ত পূর্বোক্ত 'stage copy' থেকে জানা যায়।

সিম্বেলিন নাটকে সম্পর্কে যেমন মন্তব্য পাওয়া গেছে—the fiction foolish, the events impossible, the conduct absurd…(Johnson) তেমনি তেমনি সিম্বেলিনকে কেউ কেউ উৎকৃষ্টও বলেছেন। ইমোজেনের সঙ্গে পোসথিউমাসের পুনর্মিলন নাটকটির মুখ্য কাহিনী হওয়াতে সিম্বেলিন-এর পরিবর্তে 'সুশীলা-বীরসিংহ' নামটি অধিক সংগত হয়েছে। 'সুশীলা' ও 'বীরসিংহ' এই দুটি নামকরণের মধ্যেও অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ নায়ক নায়িকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। Leonatus-এর সঙ্গে সংগতি রেখেই বীরসিংহ নামটি সুঅনূদিত হয়েছে। 'প্রখ্যাত সমালোচক'[১৪] এর চোখে ইমোজেন—যেমন কোমলতা ও সরলতার প্রতিমূর্তি, সুশীলার মধ্যেও সে ভাবের দ্যোতনা আছে। তবে 'সুশীলা' নাম টিতে শুধু 'কুসুম কোমলা' নারী মূর্তি বোঝায় না, এ নামে কোমলতার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের স্পর্শ আছে।

শেক্সপীয়রের রসভাণ্ডার বাঙ্গালী পাঠকের কাছে দেশভাষায় পরিবেশনের জন্য সত্যেন্দ্রনাথকে 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকায় সাধুবাদ দেওয়া হয় ;—'সুশীলা-বীরসিংহ নাটক। সেক্সপিয়র কৃত নাটক বিশেষ অবলম্বন করিয়া বিরচিত। এই গ্রন্থখানিও আমাদিগের বিশেষ উপাদেয়। ইহাতে ইউরোপীয় কালিদাস সেক্সপিয়রের অপূর্ব রসবর্ণের আভাস বাঙ্গালী পাঠকদিগের মোদনার্থে দেশ-ভাষায় প্রতিবিম্বিত করা হইয়াছে।'[১৫]

সাম্প্রতিক কালের বিচারে নাটকটিকে শিল্পমূল্যে খুব উৎকৃষ্ট বলে মনে না হলেও, উপরোক্ত মন্তব্যের আলোকে তৎকালীন দিনে শেক্সপীয়রের নাট্যানুবাদক সত্যেন্দ্রনাথের সার্থকতা অস্বীকার করা সুবিচার হয়না।

রাজার আত্মগ্লানি

'হ্যামলেট' নাটকের আংশিক অনুবাদ

১৮২৯ শকের বৈশাখ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথের 'ঈশ্বরের উপাসনা' ভাষণটির সংগে 'রাজার আত্মগ্লানি' মুদ্রিত হয়। নবরত্নমালা গ্রন্থেও এটি স্থান পেয়েছে। এটি হ্যামলেট নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত ক্লডিয়াসের স্বগতোক্তি।

হ্যামলেটের পিতৃব্য ক্লডিয়াস আপন ভ্রাতাকে বধ করে রাজ্য অধিকার করে আছেন—মৃত রাজার মহিষী আপন ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করে রাজত্ব করেছেন। রাজকুমার হ্যামলেটকে দেশান্তরে নির্বাসিত করবেন—মনে মনে ভাবছেন। সেসময় ক্লডিয়াসের অন্তরে যে বিবেকের দংশন শেক্সপীয়ার অনবদ্য ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন, সেটির বঙ্গানুবাদ 'ঈশ্বরের উপাসনা'য় সত্যেন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন।

অনুবাদটি আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। একটি স্থান মধুসূদনের প্রভাব চোখে পড়ে।[১]

রে প্রমত্ত মন মম, বিহঙ্গম যথা
পালাবার তরে করে যতই প্রয়াস
জালে তত পড়ে জড়াইয়া……

অনুবাদটিতে মূলের ভাব গাম্ভীর্য রক্ষার জন্য তৎসম শব্দের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়।

হায় কি বিষম পাপ দহিছে আমায়।
পূতিগন্ধ উঠে তার স্বর্গ অভিমুখে।
সৃষ্টির আদিমকালে পড়ে অভিশাপ
যার পরে ভ্রাতৃহত্যা, সেই মহাপাপ।
প্রভু পদে এ বেদনা চাহি নিবেদিতে…
কিন্তু নাহি পারি।

শেক্সপীয়ার এখানে বলেছেন—

O, my offence is rank, it smells to heaven.

১. 'রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাইবে রাতি'। মধুসূদন দত্ত। আত্মবিলাপ।

It hath the primal eldest curse opon't,

A brother's murder : Pray can I not,

কোন কোন স্থানে বর্ণনাকে স্বভাবজ করতে বাংলা কথ্য ঢঙের প্রয়োগে মূলের ভাবগাম্ভীর্য ব্যাহত হয়েছে। শেক্সপীয়ার যেখানে লিখেছেন—

And, like a man to double business bound,

I stand in pause where I shall first begin,

And both neglect.

সত্যেন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন—

দু নৌকায় পদক্ষেপে উভয় শংকট
উপস্থিত ! কোন দিকে যাই—নাহি জানি ;
কোন দিকে নাহি গতি—দাঁড়াই স্তম্ভিত !

অবশ্য অনুবাদটিকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করার জন্য তাঁর চেষ্টা প্রবল ছিল, পাশাপাশি রাখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

What if this cursed hand

were thicker than itself with brother's blood,

Is there not rain enough in the sweet heavens

To wash it white as snow ?

ভ্রাতৃরক্ত কলঙ্কিত এই পোড়া হাতে
পড়ে যদি আরো ঘোর কলংক কালিমা
কি তাহাতে ? নাহি কি রে স্বর্গের অমৃত
ধারা হেন. হয় যাহে কলংক মোচন ?
তুষার ধবল পুন ?

সামগ্রিক ভাবে নাট্যানুবাদটির বিচার করার উপায় নেই। আংশিক যতটুকু পাওয়া গেছে, তাতে মূলের মহিমা সর্বত্র প্রতিফলিত হয় নি। শেক্সপীয়ারের স্বগতোক্তিতে যে অসামান্য নাটকীয়তা আছে, যার দ্বারা আবৃত্তির গুণে দর্শককে মোহিত করে রাখা চলে তা সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে প্রায় নেই বললেই চলে। তবে প্রার্থনার সুফল প্রসংগে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রূপে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণে অনুবাদটি যথাযথ ও সুন্দর রূপে পরিবেশিত হয়েছে।

১. ১৮৬৮-র চৈত্র সংক্রান্তি—হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশন।

২. 'তিনি পদ্যানুবাদ করেন গীত ও মেঘদূত, আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস—আত্মজীবনী, উপন্যাস' অমিতাভ চৌধুরীর "অপ্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ"। (শারদীয়া হিমাদ্রি, ১৩৮৫ পৃ. ১২৭)।

৩. ১৮৬৭-সালের ৮ঠা সেপ্টেম্বর আমেদাবাদ থেকে আরেকখানা চিঠিতে সুশীলা উপন্যাস ছাপানো, নিজের ও ছোটভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খবরের উল্লেখ করেন।' ঐ, পৃ. ১২৯।

৪. বাংলায় শেক্সপীয়রের চর্চা : চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৭১)।

৫. চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়কৃত বাংলায় শেক্সপীয়র চর্চা প্রবন্ধে উদ্ধৃত। (বিশ্বভারতী পত্রিকা : শ্রাবণ আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৭১।

৬. ঐ

৭. আধুনিক বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস (৩৭৩)—ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃ. ৭৬।

৮. ঐ।

৯. চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় : বাংলায় শেক্সপীয়র চর্চা। বিশ্বভারতী পত্রিকা (শ্রাবণ আশ্বিন, ১৩৭১)।

১০. শ্রীমতী বীণা ঘোষ (পালিত) এর 'শেক্সপীয়রের বাংলা অনুবাদ-সমূহের বিশ্লেষণাত্মক বিচার'—(ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত) গবেষণা গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১১. 'Hark, hark ; the lark at heaven's gate sings, Shakespeare "lifted" this pretty touch form Lyly's play *Alexander and Campaspe.*' (*Cymbeline* edited by A. W. Verity, page. 137)।

১২. 'The idyllic scenes are bathed in the dewy freshness of the mountain side.'—'Shakespeare and His predecessors' by Frederick S. Boas. pp. 426-435

১৩. ১৮৬১ সালে রচিত মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলার উক্তি—

'... ... পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?' (তৃতীয় সর্গ)

১৪. 'Hazzlitt says : of all Shakespeare's women she is perhaps the most tender and the most artless.' [Introduction : *Cymbeline* : Edited by A. W. Verity, pp. xxii-iv]

১৫. রহস্যসন্দর্ভ পত্রিকা-চতুর্থ পর্ব (৪৭ খণ্ড) পৃ. ১৭৫ ।

'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থ

ভূমিকা

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের গভীর অনুসন্ধিৎসার নিদর্শন প্রথম যৌবনেই দৃষ্ট হয়। ১৭৮১ শকে পৌষ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত তাঁর সিংহল উপদ্বীপে ভ্রমণ বৃত্তান্তে সিংহলে বৌদ্ধধর্মের তৎকালীন অবস্থার চিত্র পরিবেশিত হয়েছে।

অল্পসময়ের এই ভ্রমণপর্বে অধ্যয়নের দ্বারা কোন বিশেষ তথ্য উদ্ঘাটন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি; তবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে যতটুকু সংগ্রহ করেছেন, তাতে সহজ কথায় সিংহলের বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে রচনাটি পাঠকমনে একটি ধারণা জাগায়।

সিংহলে জনগণের মধ্যে ভূতপ্রেতে বিশ্বাস, রোগশান্তির জন্য ভূতের নাচ, পরিবারে স্বামী-স্ত্রী-খ্রীস্টান ও বৌদ্ধ হলেও উভয়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, বুদ্ধের অহিংসাধর্মে জীবহত্যা নিষেধ হলেও অন্যের দ্বারা হত পশুর মাংস-ভোজনে নিষেধ নেই, সিংহলের শ্রেষ্ঠ জাতি বিম্বল—নামান্তরে ওখানে শূদ্র, অবিবাহিত থাকায় বৌদ্ধ পুরোহিতের পদ বংশ পরম্পরাগত নয়, প্রতিবছর মহাসমারোহে বুদ্ধের জন্মোৎসব পালন ইত্যাদি সুখপাঠ্য বর্ণনা উপযুক্ত রচনায় রয়েছে। সিংহলের দুটি প্রধান বৌদ্ধমন্দির তিনি দেখেছেন। একটিতে দুপাশে দুই মূর্তি সহ ১২ হাত উঁচু ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিমূর্তি রয়েছে। সেই মন্দিরের গাত্রে নরকের ভয়ানক ছবি দেখে সত্যেন্দ্রনাথের ভাল লাগেনি। অন্য মন্দিরটি পাহাড়ের উপর। সেখানে কোন নরকের ছবি নেই। শ্রীমণ্ডিত সুপরিচ্ছন্ন এই মন্দিরটি দেখে সত্যেন্দ্রনাথ তৃপ্ত হয়েছিলেন। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি 'ডাগোবা'[১] রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন; সেখানে বুদ্ধের দন্ত স্থাপিত।

বৌদ্ধচর্চায় বিদেশীদের অবদান

সিংহল দেশ—বৌদ্ধ জ্ঞানৈষণার এক প্রধান ক্ষেত্র। মহেন্দ্র ও বুদ্ধঘোষের[২] নানা নিদর্শন এখানে ছড়িয়ে আছে। পালি ভাষায় লেখা বৌদ্ধধর্মের মূল

পুঁথিগুলির সন্ধানও এখানে মিলেছে। বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্বেষণেই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিংহলের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য।—"সিংহলেই সর্ব প্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়, আর পণ্ডিত সমাজে অদ্যাবধি এই সিংহলী বৌদ্ধধর্মই স্বয়ং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম বলেই গ্রাহ্য। সিংহলের মঠে মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত বৌদ্ধধর্মের আদি গ্রন্থগুলি সিংহলী ভাষায় লিখিত।"[৩]

বিদেশী পণ্ডিতেরা সিংহলে এসে প্রথমেই সিংহলী ও পালি ভাষা আয়ত্ত করেছেন। টার্নার সাহেবের 'মহাবংশ' প্রকাশ বৌদ্ধ চিন্তার জগতে এক বিস্ময়কর পদক্ষেপ।[৪] অনেক অসুবিধার মধ্যে কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফজ্‌বোল ধম্মপদের ল্যাটিন অনুবাদ করেন ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে।[৫] সকলেই পালিভাষায় একটি অভিধানের অভাব বোধ করেন। সে অভাব, দূর করলেন চাইল্ডার্স সাহেব দু খণ্ড পালি অভিধান লিখে।[৬] এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য মনিয়ার উইলিয়ামস্‌ তাঁর প্রতি যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন[৭] তেমনি বৌদ্ধপণ্ডিত রিস্‌ ডেভিডস্‌ও[৮] তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মতে সিংহলী শাস্ত্রই হচ্ছে এ যুগের ইউরোপীয় বৌদ্ধশাস্ত্রীদের মতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, অতএব সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য দলিল।"[৯]

বিশপ বিগাণ্ডেট রচিত 'The Life and legend of Goutama' ও স্যামুয়েল বীল রচিত 'Romantic Legends of Sakya Buddha' জনপ্রিয় হয়েছিলো। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে 'সোসাইটি ফর প্রোমোটিং ক্রিশ্চিয়ান নলেজ' এর আহূত সভায় অধ্যাপক রিস ডেভিডস্‌ বুদ্ধের জীবনী ও ধর্মমতের আলোচনা করেন। বুদ্ধ-জীবনীর 'Legendary' অংশের চেয়ে প্রামাণ্য বস্তু ও মূল গ্রন্থ অন্বেষণের প্রয়োজন অনেক বেশি, এ সম্পর্কে রিস্‌ ডেভিডস্‌ জনগণকে অবহিত করেছেন। রিস্‌ ডেভিডস এর অন্বেষণ বৌদ্ধ চিন্তার জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার ঢেউ বাংলাদেশেও এসে লাগে। তৎকালীন তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত 'নির্বাণ' প্রবন্ধটি রিস্‌ ডেভিডস এর রচনার অনুবাদ।[১০]

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ভাষণটি Buddhism—A Sketch of the Life and Teaching of Gautama' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রিস্‌ ডেভিডস্‌ গ্রন্থটিকে 'Manual of Buddhism'—নামেই বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ

করেছেন। ১৮৮১ খ্রী. রিস্ ডেভিড্স্ নিমন্ত্রিত হয়ে হিবার্ট লেকচারে—বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনা করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে হিবার্ট লেকচারের অনুসরণে ধর্মবিষয়ে ঐতিহাসিক আলোচনার জন্য আমেরিকান কমিটি গঠিত হয়। এঁদের আহ্বানে রিস্ ডেভিড্স্ বৌদ্ধধর্মের 'ইতিহাস ও সাহিত্যের' আলোচনা করেন। ১৮৯৬ খ্রী. এটিও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[১১] সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে এই দুইটি গ্রন্থের প্রচুর প্রভাব রয়েছে যথাস্থানে তা আলোচিত হবে। এছাড়াও রিস্ ডেভিড্স্ এর 'Dialogues of the Buddha' ও 'Question of King Milinda' থেকে সত্যেন্দ্রনাথ প্রভূত সহায়তা পেয়েছেন।

প্রসংগত রিস্ ডেভিড্স্ সিংহলে ব্যারিস্টার থাকার সময়েই বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে জানতে আগ্রহী হন।[১২] পরবর্তী কালে লণ্ডন য়ুনিভারসিটিতে পালি ও বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। লণ্ডনের পালি টেক্স্ট সোসাইটির সভাপতিরূপে বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনায় জীবনের শেষকাল পর্যন্ত মগ্ন থেকেছেন। তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী কারোলিন এ. এফ. রিস্ ডেভিড্স্ বহু বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদে ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গ্রন্থরচনায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। Sacred Books of the East সিরিজএ ম্যাক্সমুলার বিবিধ বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত করে বৌদ্ধচর্চার ক্ষেত্র পরিপুষ্ট করেছেন। ১৮৭৯ খ্রী. এডুইন আরণল্ডের বিশ্ববিখ্যাত 'Light of Asia' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[১৩] এডুইন আরণল্ডের সংগে সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনীর যে পরিচয় ছিল, তা জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা থেকে জানা যায়। প্রাচ্য ভাষা ও কৃষ্টিপ্রেমী আর একজন বিদেশী মনীষী মনিয়ার উইলিয়ামস্। তাঁর রচিত 'Buddhism'—(১৮৮৯ খ্রী.) গ্রন্থ যে সত্যেন্দ্রনাথ গভীর মনোযোগে পাঠ করেছেন, তার ছাপ সত্যেন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থের স্থানে স্থানে চোখে পড়ে [যথাস্থানে উল্লিখিত হবে।]

স্যার উইলিয়াম জোন্সের নেতৃত্বে (১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানু.) কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা—প্রাচ্য জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে একটি মহৎ সূচনা নিয়ে আসে। ১৭৮৮ খ্রী. থেকেই সোসাইটির মুখপত্র 'Asiatic Researches'[১৪] তথ্যপূর্ণ নানা আবিষ্কারের কাহিনী নিয়ে প্রকাশিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রসংগে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিদেশী মনীষী বি. এইচ.

হজ্‌সনের কথা বিশেষ রূপে উল্লেখ্য। নেপাল থেকে হজ্‌সনের বৌদ্ধ গ্রন্থের আবিষ্কার বৌদ্ধচিন্তার জগতে এক বিশেষ অবদান। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐ গ্রন্থগুলি সম্পাদনায় এগিয়ে আসেন। এছাড়াও হজ্‌সন, মনীষী বার্নুফের কাছে ও রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে কিছু কিছু সম্পাদনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' গ্রন্থের ভূমিকায় হজ্‌সনএর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ও অন্যেরা হজ্‌সন সাহেবকে কি চোখে দেখাতেন তার আভাস দিয়েছেন।[১৫] প্রসংগত ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হজ্‌সন বেংগল সিবিল সার্ভিসে এসেছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কাঠমণ্ডুর রেসিডেন্ট থাকার সময়ে কাঠমণ্ডুর বিভিন্ন ধরণের পাল পার্বণ ও পূজাপদ্ধতির সংগে পরিচিত হন ও ১৮৪৩ খ্রী. অবসর নিয়ে দীর্ঘদিন নেপালে অন্বেষণে রত ছিলেন, পরে দার্জিলিঙে ফিরে এসে আরও ন'বছর জ্ঞানের সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন।

যে উদার লোকাশ্রয়ী ধর্ম ভারতবর্ষ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল, প্রতীচির মনীষীরাই সেদিকে আবার আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনেন।

প্রমথ চৌধুরী এর সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন—"অর্ধ শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধ কে, তাঁর ধর্ম কি, বৌদ্ধ সংঘই বা কি, এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের মধ্যে কোটিতে একজনও দিতে পারতেন না…। বৌদ্ধ, শব্দটি অবশ্য আমাদের ভাষায় ছিল, এবং বৌদ্ধ অর্থে আমরা বুঝতুম—একটি পাষণ্ড ধর্ম্মমত।…বাঙালী সভ্যতার বুনিয়াদ যে বৌদ্ধ, হিন্দু স্তরের দুহাত নীচেই যে বাঙলার বৌদ্ধ স্তর পাওয়া যায় আজকের দিনে তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।"[১৬]

এসব আবিষ্কারের প্রেরণাদাতা হিসাবে প্রাপ্য গৌরবের ভাগও প্রমথ চৌধুরী নির্দ্বিধায় বিদেশী পণ্ডিতদেরই অর্পণ করেছেন। তাঁর কথা—"যে বৌদ্ধধর্ম্মের নাম পর্যন্ত এ দেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেই ধর্মই যে আজকাল আমাদের সকল গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে…এই কারণে যে ভারতবর্ষের এই প্রাচীন ধর্মের সংগে বর্তমান ইউরোপ ভারতবাসীর নূতন করে আবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।"[১৭] অনুরূপ মন্তব্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থ করেছেন—'বৌদ্ধদের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হিন্দুতে করে নাই, মুসলমানেরাও করে নাই, বৌদ্ধেরাও বড় করে নাই, করিয়াছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, আর সেই ইউরোপীয়দিগের শিষ্য শিক্ষিত ভারত-সন্তান।"[১৮]

এতক্ষণ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থ আলোচনার প্রাক্‌-কথন হিসাবে বৌদ্ধ অন্বেষণে বিদেশী পণ্ডিতদের নিরলস প্রয়াস ও ভারতের শিক্ষিত জনমনে তার প্রভাব সামান্য আলোচিত হলো। বিষয়টি আমাদের এ আলোচনার সংগে সংযোগরহিত নয়, কারণ প্রথম যৌবনে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জানার যে অদম্য কৌতূহল[১৯] সত্যেন্দ্রনাথের মনে জেগেছিল, কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হওয়ার পরও তা থেমে যায় নি। এ সব আবিষ্কার ও নূতন নূতন গ্রন্থপ্রকাশে এবিষয়ে তাঁর মন আরও আকৃষ্ট হয়েছে। আমেদাবাদে জৈনদের 'বর্ষাযাপন' উৎসবে তিনি যোগ দিয়েছেন ও জৈনধর্মের সংগে বৌদ্ধধর্মের অপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত, সত্যেন্দ্রনাথের সংকলিত যে চারখণ্ড বাঁধানো বৃহৎ খাতা আছে। সেখানে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে রিস্‌ ডেভিড্‌স, মনিয়ার উইলিয়ামস্‌ ও অন্যান্যদের চরণাংশ কত সযত্নে তিনি নিজ হাতে টাইপ করে রেখে গেছেন—তার নিদর্শন আছে। কর্মজীবন থেকে মুক্ত হয়ে অবসরকালে পুংখানুপুংখ অধ্যয়নই ছিল তাঁর মনের মতো কাজ। এই সময়েই বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চায় তিনি পূর্ণ মনোনিবেশ করেন ও বৌদ্ধধর্ম রচনায় অনুপ্রাণিত হন। বংগীয় সাহিত্য পরিষদে বিদ্বজ্জনের সান্নিধ্যে তাঁর জ্ঞানৈষণা আরও পুষ্ট হয়েছে।

গ্রন্থ রচনার প্রস্তুতিপর্ব

'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থরচনার পূর্বে বংগীয় সাহিত্যপরিষদে বৌদ্ধধর্মবিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রথমটি পড়েন ১৩০৭এর ২৮শে শ্রাবণ (ইং ১২ই আগস্ট ১৯০০) পরিষদের ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে। বিষয়টি ছিল তেবিজ্জ-সুত্ত।[২০] এটিকে 'ত্রয়ীবিদ্যাসূত্র' নামেও সত্যেন্দ্রনাথ গ্রন্থের পরিশিষ্টে উল্লেখ করেছেন। তেবিজ্জসুত্ত বুদ্ধদেবের উপদেশমালার একটি বিশিষ্ট সুত্ত। 'মনসাকৃত' গ্রামে 'অচিরাবতী' নদী তীরে 'ভরদ্বাজ' ও 'বশিষ্ঠ' নামে দুই যুবকের প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ 'তেবিজ্জ সুত্তে' বর্ণিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের উপদেশমালার অন্যান্য সুক্তের চেয়ে এই সুক্তটি যে একটু পৃথক্‌ তা রিস্‌ ডেভিড্‌এর কণ্ঠেও শোনা গেছে।[২১]

সত্যেন্দ্রনাথের আলোচনাটি পরিষদে অনেকের কাছে নতুন মনে

হয়েছিল।[২২] অবশ্য এর আগে ১৮০৫ শকে সাধু অঘোরনাথের 'শাক্যমুনিচরিত ও পরিশিষ্ট' গ্রন্থে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা থেকে 'সগুণবাদ—তেবিজ্জ সুত্রের সার' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পাঠ করেন—১৩০৭এর ১০ই ভাদ্র। (ইং ২৬শে আগস্ট ১৯০০) পরিষদে তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনে। সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পরিষদ গৃহে স্থান সংকুলান হবে না বলে য়ুনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। সভায় সুরেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন, এ ছাড়াও ঠাকুর বাড়ি থেকে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রমুখেরা সভায় যোগদান করেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিষয় ছিল—বৌদ্ধধর্ম—দর্শন, নীতি, পরকাল ও মুক্তি'। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ থেকে এটি পৃথক পুস্তিকা রূপেও প্রকাশিত হয়।[২৩] প্রবন্ধটি শেষ হলে যেসব বক্তা তাঁর প্রবন্ধের উপর কিছু বলেছেন, তা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তিনি কিছু কিছু তথ্য গ্রহণও করেছেন। আবার অনেক সময় নিজ সিদ্ধান্তেই অবিচল রয়েছেন। পরিনির্বাণ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণিত—চুণ্ডের গৃহে বুদ্ধদেবের শূকর মাংস গ্রহণ ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে ঐ বস্তুটি শূকর মাংস নয়—বিষাক্ত শিলীন্ধ্র। প্রসঙ্গত মিসেস্ ডেভিড্স এর গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়।[২৫] তাছাড়া মনিয়ার-উইলিয়মস্ও পরিনির্বাণের এই কাহিনীটিকে সমর্থন করতে পারেন নি।[২৬] সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু গ্রন্থপ্রকাশের সময় 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র' অনুসরণে 'বরাহ মাংস' কথাটাই রেখেছেন।

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের তৃতীয় প্রবন্ধটি ছিল দীর্ঘ। ১৩০৮এর ২৫শে শ্রাবণ (ইং ১০ই আগস্ট ১৯০১) য়ুনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে, সাহিত্য পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে এটি পরিবেশিত হয়। প্রবন্ধটি দীর্ঘ থাকায় সবটা পড়া সম্ভব হয় নি, স্থানে স্থানে পড়েছেন ও শীঘ্রই এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে একথাও ঐ সভায় বলেন। ঐ সভায় ধর্মপাল ভিক্ষু[২৭] উপস্থিত ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের মতো 'গণ্যমান্য লোক' বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় আগ্রহী হয়েছেন—এজন্য তিনি তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ দেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও সত্যেন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইংরেজি গ্রন্থরাশি থেকে সঙ্কলন করে ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন

আর এর দ্বারা জনসাধারণের প্রভূত উপকার হবে বলেই শাস্ত্রী মহাশয় আশা পোষণ করেছেন। ঐ সভায় ধর্মপাল ভিক্ষুকে সত্যেন্দ্রনাথ 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ' শব্দের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন এই মন্ত্র উত্তরভারতে প্রচলিত, সিংহলে নেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'কারণ্ড ব্যূহে'র কথা উল্লেখ করেন ও ঐ গ্রন্থে প্রাপ্ত এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।[২৮] পরবর্তী কালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় সময় সত্যেন্দ্রনাথ এই মন্ত্রের বিশ্লেষণে নিজের মতটির সংগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রদত্ত ব্যাখ্যাটিও দিয়েছেন। হীনযান মহাযান প্রসংগেও 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ ধর্মপালভিক্ষুই যে এ বিষয়ে সব চেয়ে অভিজ্ঞ একথার উল্লেখ করেছেন। সুতরাং পরিষদের মণ্ডলীর সাহচর্যে বৌদ্ধ অন্বেষণে তিনি যে উপকৃত হয়েছেন, এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না।

গ্রন্থপ্রকাশ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩০৮ সালে বৌদ্ধধর্ম 'প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে কোন ভূমিকা ছিল না। প্রথম সংস্করণের সংগে দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যবধান প্রায় বাইশ বছর। ১৩৩০ সালে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের প্রথমে বুদ্ধদেবের যে চিত্রটি দেওয়া ছিল তা 'যবদ্বীপস্থ কোন প্রস্তর মূর্তি' থেকে গৃহীত ও যামিনীপ্রকাশ গংগোপাধ্যায় কর্তৃক চিত্রিত'। দ্বিতীয় সংস্করণে এর বদলে ধ্যানী বুদ্ধের আলোক চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ আকারে কিছু বড় হয়েছে। প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠা ছিল ২৪০। দ্বিতীয় সংস্করণে ৩২৭। বর্তমান দুটি গ্রন্থই দুষ্প্রাপ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে। প্রথম সংস্করণে মোট পরিচ্ছেদ ছিল আটটি। দ্বিতীয় সংস্করণে অন্টম পরিচ্ছেদ—'বৌদ্ধধর্মের উন্নতি, অবনতি ও পতন' নব সংযোজিত হয় ও মোট নয়টি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি ঢেলে সাজানো হয়।

মৃত্যুর বছর খানেক আগে গ্রন্থটি পরিবর্ধন ও পরিশোধনের কাজে ইনি ২০নং মে ফেয়ার রোডে কন্যাকে নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর জীবিত কালেই দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপার কাজ শুরু হয়। ১৯২২এর ১৫ই জুলাই তিনি ভূমিকাও লিখেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর দেখে যেতে পারেন নি। গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব ভার প্রমথ চৌধুরী গ্রহণ করেন ও গ্রন্থটির প্রথমে একটি

সংক্ষিপ্ত 'মুখপত্রও লিখে দেন.। মুখপত্রের তারিখ পাওয়া যাচ্ছে ১১৬।২৩ অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েকমাস পরে, তাঁর জন্মদিনের তারিখ। সত্যেন্দ্রনাথের জীবিতকালে পরিবারের মধ্যে তাঁর জন্মদিন বিশেষ উৎসাহের সংগে প্রতিপালিত হতো। ধারণা করা যায় জ্ঞানদানন্দিনী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর একান্ত ইচ্ছায় এই বিশেষ দিনটিতেই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন প্রমথ চৌধুরীর লিখিত মুখপত্রে তার সাক্ষ্য রয়েছে—"দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করতে তিনি ৮০ বৎসর বয়সে এক বৎসর কাল যে রূপ অগাধ পরিশ্রম করেছেন, তা যথার্থই অপূর্ব। দিনের পর দিন সকাল আটটা থেকে রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত তাঁকে আমি এবিষয়ে একাগ্র চিত্তে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে দেখেছি। শেষটা যখন তাঁর শরীর নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়ে তখনও তিনি হয় আরাম চৌকীতে নয় বিছানাতে শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিন এই বইয়ের প্রুফ সংশোধন করতেন।" সত্যেন্দ্রনাথ প্রুফ দেখার সময়ও নতুন নতুন তথ্য সংযোজন করতেন। এবিষয়েও প্রমথ চৌধুরী মুখপত্রে স্পষ্ট করেই বলেছেন—"এ সংশোধন শুধু ছাপার ভুলের সংশোধন নয়। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নতুন নতুন বই পড়ে, তাঁর লেখার যেখানে সংশোধন বা পরিবর্তন করা আবশ্যক মনে করতেন তা করতে তিনি একদিনও বিরত হন নি। তাঁর মৃত্যুর চারদিন আগেও তাঁকে আমি বৌদ্ধধর্মের প্রুফ সংশোধন করতে দেখছি।"

বিদেশী পণ্ডিতদের রচিত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পুস্তক, হিউয়েন সাং ফাহিয়ান ও কানিংহামের বিবরণ তিনি কতো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁটিয়ে দেখেছেন তার ছাপ বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে সুস্পষ্ট। প্রমথ চৌধুরীর মতে—"এই একাগ্র এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থখানি যতদূর সম্ভব নির্ভুল হয়েছে।" এ বিষয়ে কারো মতই যে চূড়ান্ত হতে পারে না, কারণ অনেক বিষয়ে এখনও অনেক সংশয়ের নিরসন হয় নি, একথাও তিনি ঐ সংগে বলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ আলোচনার প্রবাহ অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। লণ্ডনের পালিটেক্সট সোসাইটির বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশনায়, রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুরের উদ্যোগে কলকাতা 'বুদ্ধিস্ট টেক্সট সোসাইটি'-র প্রতিষ্ঠায় ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের পালি অভিধান প্রণয়নে বাঙালীর বৌদ্ধ-অন্বেষণ নব পথ

রূপে পরিগ্রহ করেছে। তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের কাছে দ্বিতীয় সংস্করণটি পেঁৗছে দেবার সময় সত্যেন্দ্রনাথ একে অগ্নিপরীক্ষার সমতুল্য মনে করেছেন।[২৯]

তুলনামূলক বিচারে সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রকেই বাঙালীর বৌদ্ধচর্চায় দ্বার উদ্ঘাটকের সম্মান দিয়েছেন।

বাংলাভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থরচনায় সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বসূরীদের মধ্যে সাধু অঘোরনাথ[৩০] গুপ্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র[৩১] ও ডা: রামদাস সেন[৩২] এর নাম বিশেষ রূপে উল্লেখ্য। এঁদের গ্রন্থ প্রচলিত সাধুগদ্যে রচিত, মাঝে মাঝে 'ললিত বিস্তর' থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে এডুইন আরণলডের 'লাইট অব এশিয়া' গ্রন্থের ভাবছায়ায় বুদ্ধদেবকে নিয়ে নিয়ে বাংলাভাষায় কাব্য[৩৩] ও নাটক[৩৪] রচিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের একই বছরে বালায় বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুবাদেরও[৩৫] নিদর্শন রয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম'-১ম সংস্করণ প্রকাশের পর বাংলাভাষায় বৌদ্ধবিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এখানে শুধু বৌদ্ধধর্ম ১ম সংস্করণ প্রকাশের প্রায় সমকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের উল্লেখ করা চলে।[৩৬]

সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের প্রধান গুণ সরলতা ও স্পষ্টতা। সাধারণ পাঠকের মনে বৌদ্ধধর্মের সম্যক্ জ্ঞান পরিস্ফুটনের দিকেই তিনি চেষ্টিত হয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী বলেছের—"আমি শুধু পণ্ডিত সমাজের নয়, দেশশুদ্ধ লোকের পক্ষে বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করি, আর আমার বিশ্বাস সাধারণ পাঠক সমাজ এই গ্রন্থ থেকে অনায়াসে বিনা ক্লেশে সে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।"[৩৭]

আলোচ্য গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বুদ্ধের জীবন, তাঁর ধর্মমত ও সংঘ সম্পর্কে মোটামুটি সব রকম জ্ঞাতব্য তথ্যই পরিবেশিত হয়েছে। একটি গ্রন্থে সব রকম বিষয়ের সমাবেশ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্যেও একথা স্পষ্ট শোনা গেছে। সেজন্যই প্রমথ চৌধুরী বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন—"পূজ্যপাদ ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'বৌদ্ধ-ধর্ম' ব্যতীত বাঙলা ভাষায় আর

একখানিও এমন বই নেই, যার থেকে বুদ্ধের জীবন বুদ্ধের জীবনচরিত তাঁর প্রবর্তিত ধর্মচক্র এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।"[৩৮]

শ্রীমতী আশা দাস তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি'—গবেষণা গ্রন্থেও বলেছেন—"একটি গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের সম্যক্ পরিচয়প্রদানের প্রচেষ্টা বাংলা ভাষায় এই প্রথম।" (পৃ. ২৭৯)

উপর্যুক্ত মন্তব্যের আলোকে বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধচিন্তায় সত্যেন্দ্রনাথের দান সহজেই নিরূপণ করা যায়।

অঘোরনাথ গুপ্তের 'শাক্য মুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' গ্রন্থটির প্রথম ভাগে সম্পাদকের লিখিত[৩৯]—পাঠকগণের প্রতি নিবেদন' থেকেই বোঝা যায়, তৎকালীন, পাঠকগণ বাংলাভাষায় বুদ্ধের একখানি জীবন কথা পড়তে কতটা আগ্রহী ছিলেন।

'শাক্যমুনিচরিত ও পরিশিষ্ট' গ্রন্থের অবতরণিকায় সম্পাদক গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় লিখেছেন—'মহাত্মা শাক্যের জীবন ও নির্বাণতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি (সাধু অঘোরনাথ) ললিতবিস্তরকেই প্রধান অবলম্বন করিয়াছেন, এ অংশ আমরা সাধ্যমত মূল গ্রন্থের সংগে মিলাইয়া প্রকাশ করিলাম। প্রচারাংশ এবং প্রবচনগুলি আমরা তেমন যত্ন করিয়া অবলম্ব্য গ্রন্থসমূহের সহিত মিলাইয়া দিতে পারিলাম না। উহা তিনি লিখিয়া যদবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রায় তদবস্থাতেই প্রকাশিত হইল।...ললিতবিস্তরে অষ্টোত্তর শত 'ধর্মালোকমুখ' লিখিত হইয়াছে, আমরা ইহার অনুবাদ 'বুদ্ধবচনসার' সংগ্রহে সংযুক্ত করিয়া দিলাম।' এর ফলে গ্রন্থটির ওজস্বিতা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পাদকের লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবতরণিকা ছাড়াও তাঁর রচিত 'বুদ্ধ যথার্থই কি নিরীশ্বরবাদী' এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটি পরিশিষ্টে সংযুক্ত হয়ে গ্রন্থের গৌরব বাড়িয়েছে। তবে গ্রন্থের জীবনী অংশ সর্বশ্রেণীর পাঠককে যেমন আকৃষ্ট করে, ললিতবিস্তরের অনুবাদ তেমনি পণ্ডিতদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। এ সব কথা ভেবেই শেষ পর্যন্ত সম্পাদক অনুবাদ থেকে নিজেই বিরত হয়েছেন।[৪০]

আলোচ্য গ্রন্থটিতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার অংশ মোটামুটি আলোচিত হয়েছে, কিন্তু অবনতি সম্পর্কে কিছুই আলোচিত হয় নি। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর গ্রন্থে 'উন্নতি' ও 'অবনতি' দু'বিষয়েই উপযুক্ত তথ্যপ্রদানে যত্নশীল হয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বসূরী কৃষ্ণকুমার মিত্রও বৌদ্ধধর্মের অবনতির কারণ অন্বেষণে উদাসীন ছিলেন না। তবে তাঁর গ্রন্থেও জীবনী অংশ যতটা বিস্তৃত আকারে পরিবেশিত হয়েছে—ধর্মতত্ত্ব ও সংঘ সম্পর্কে ততটা বিস্তৃত আলোচনা নেই। সুতরাং তিনটি বিষয়ের সমান আলোচনা তাঁর গ্রন্থেও নেই।

সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম পূর্বসূরী ডাঃ রামদাস সেন—তাঁর 'বুদ্ধদেব-তাঁহার জীবনী—ও ধর্মনীতি' গ্রন্থে মুখ্যত বুদ্ধ জীবনীই পরিবেশন করেছেন, সেই সংগে বুদ্ধের উপদেশগুলি বর্ণিত হয়েছে। ডাঃ রামদাস সেন তাঁর গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম প্রসংগে পাশ্চাত্য মনীষীদের প্রসংগ একদম এড়িয়ে চলেছেন। তাঁর ধারণা ছিল, ঐ ধরনে লিখলে পাঠকগণ তাঁর গ্রন্থের প্রতি আস্থাশীল হবেন না। ডাঃ রামদাস সেন-এর অধ্যাপক কালীবর বেদান্তবাগীশের লিখিত গ্রন্থের 'উপোদ্ঘাত বা মুখবন্ধ' থেকে তা স্পষ্ট ভাবে জানা যায়।[৪১]

কালীবর বেদান্তবাগীশের নির্দেশেই গ্রন্থ ট সম্পাদিত হয়েছে, সেজন্য গ্রন্থটিতে ললিতবিস্তর থেকে যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো দেবনাগরীতেই ছাপা হয়েছে। ৪র্থ পরিচ্ছেদে 'সঞ্চোদনা', ৫ম পরিচ্ছেদে—'দুর্নিমিত্ত দর্শন' ইত্যাদি 'ললিত বিস্তর'-এর সংগে সম্পূর্ণ মিল রেখে রচিত হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে পাশ্চাত্য মনীষীদের অবদান আছে। তবে তা সম্পূর্ণ অনুভাবিতা বলা চলে না। পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে বিদেশীদের মতামত যাচাই করেই তিনি তা গ্রহণ করেছেন।

প্রকাশের বাহন—পদ্যানুবাদ

পদ্যানুবাদের দিকে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল ঝোঁক। যেখানে অন্যেরা বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি তুলে গদ্যে ব্যাখ্যা করেছেন—সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ সহজ ও সুললিত পদ্যে এর অনুবাদ করেছেন।

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে'

শ্লোকটি সত্যেন্দ্রনাথের হাতে অনূদিত হয়েছে—

এ আসনে দেহ মম যাক শুকাইয়া
চর্ম অস্থি মাংস যাক প্রলয়ে ডুবিয়া
না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্লভ জগতে
টলিবে না দেহ মোর এ আসন হতে।

—পৃ. ২৩ বৌদ্ধধর্ম ২য় সং

দেবিন্দ নাগিন্দ নারিন্দ পুজিতো
মনুস্সিন্দ—সেট্ঠে হি তথৈব পুজিতো
তংবন্দথ পঞ্জলিকা ভবিত্বা
বুদ্ধো হবে কপ্পসতে হি দুল্লভোতি

পালি থেকে সত্যেন্দ্রনাথ এটির বাংলা বাক্যরূপ দিয়েছেন—

দেবেন্দ্র নাগেন্দ্র নরেন্দ্র পূজিত
মনুজেন্দ্র শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদেরও সেবিত
কৃতাঞ্জলি পুটে সবে করহ বন্দন
শতকল্পে সুদুর্লভ বুদ্ধের জনম।

ব্রজগোপাল নিয়োগী এর অনুবাদ করেছেন—

দেবেন্দ্র নাগেন্দ্র আর নরেন্দ্র পূজিত
অন্য সব শ্রেষ্ঠ জন দ্বারা সম্মানিত।
হয়ে কৃতাঞ্জলি তাঁরে কর প্রণিপাত
বহু কল্পে এক বুদ্ধ দুর্লভ দর্শন।[৪২]

এখানে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ ব্রজগোপাল নিয়োগীর অনুবাদ থেকে ছন্দ-গ্রন্থনে অধিক বিশুদ্ধি রক্ষা করেছে।

অনেক জাতি সংসার সন্ধাবিস্-সং অনিবিবসং
গহকারকং গবেসন্তো দুখাজাতি পুনপপুনং
গহকারক! দিট্ঠোহসি, পুন গেহং ন কাহসি
সববাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসংখিতং
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা।'

—বুদ্ধত্বলাভের পর বুদ্ধদেবের উক্তির এই

শ্লোকটি সত্যেন্দ্রনাথ যেরূপে অনুবাদ করেছেন তাতে মূল্যের মাহাত্ম্য ও

'সৌন্দর্য' পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। এটি সত্যেন্দ্রনাথের সার্থক অনুবাদের একটি নিদর্শন।

'জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর।
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ-ভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।'

এই শ্লোকটি তাঁর এত প্রিয় ছিল যে 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের আখ্যাপত্রেও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর বুদ্ধদেব গ্রন্থের ১০৯ পৃষ্ঠায় এই শ্লোকটির অনুবাদ গদ্যেই করেছেন। তাঁর আর একটি বিশিষ্ট অনুবাদও এখানে উল্লেখ করা যায়। এটি ধনিয়াসুত্ত। মহীতীরবাসী গোপাল ধনিয়া ও বুদ্ধদেবের কথোপকথন। বৌদ্ধধর্ম প্রথম সংস্করণে অনুবাদটি ছিল না। ভারতী থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে এটি স্থান পেয়েছে। Rhys Davids এর Buddhism—Its history and Literature (p. 167) গ্রন্থেও এই অনুবাদটি আছে

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ যে বিশ্লিষ্টধর্মী নয়—তা দুটো অনুবাদ পাশাপাশি রাখলেই চোখে পড়ে। তবে অনুবাদের সৌন্দর্য ততটা পরিস্ফুট নয়।

'পক্কোদনোদুদ্ধখীরোহহমস্মি
অনুতীরে মহিয়া সমান বাসো
ছন্নাকুটী আহিতো গিনি
অথচ পত্থয়সি পবস্স দেব'

ধনিয়া সুত্তের এই শ্লোকের অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ করেছেন—

পক্ক অন্ন গাভী দুগ্ধ আছি খেয়ে পিয়ে
মহীতীরে ভাই বন্ধু মিলি করি বাস
কুটীর ছায়িত, অগিনি আহিত
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন

রিস্ ডেভিড্স্ এর গ্রন্থ আছে—

Hot steams my food. My cows are milked.

So said the herdsman Dhaniya—
Along the banks of the Mahi
With equals and with friends I dwell.
Right well is my trim cottage thatched,
And on my hearth the fire burns bright.
So let the rain pour down now—
—if it likes, to-night :

বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে আর একটি আকর্ষণীয় কাব্যরূপ চোখে পড়ে। এটি বুদ্ধদেবের কাছে ব্রহ্মা সহাম্পতির প্রার্থনা—

দেখ গো মগধ রাজ্য হল ছারখার,
দুরাচার অনাচার অধর্মের জয়,
প্রভু হে তার হে ভবে, খোল স্বর্গদ্বার,
শুনাও তোমার ধর্ম, বিনাশি সংশয়।
দেখাও হে পুণ্য পথ, পবিত্র, সরল
অভ্রভেদী গিরিশিখে দাঁড়ায় যে জন
শৈল শৃঙ্গে দৃষ্টি তার স্থির, অচপল।
সত্যের শিখরে তুমি উঠেছ যখন
কৃপাদৃষ্টি কর, প্রভু মানবের পরে,
রোগ শোক জরা মৃত্যু গ্রাসে চরাচর
জয়হস্ত তুলি, বীর, চল পথ ধরে
জাগাও ভারতে, মর্ত্যে গৌরবে বিচর
প্রচারো সত্যের যশ দুন্দুভি নিঃস্বনে,
পরিত্রাণ কর সবে সুরনরগণে। (পৃ. ২১১, ২য় সং)

কবিতাটি চতুর্দশপদী ঢঙে লেখা। এই সময় তিনি ২০নং মে ফেয়ার রোডে 'কমলালয়'এ ইন্দিরা-প্রমথ চৌধুরীর কাছে ছিলেন, সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, প্রমথ চৌধুরী বাংলা সনেটের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাই সত্যেন্দ্রনাথের সনেট রচনার বাসনা সেই যোগাযোগের ফলে হওয়া অসম্ভব নয়।

এই গ্রন্থে ধম্মপদের অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ গদ্যেই করেছেন। চারুচন্দ্র বসু তাঁর ধম্মপদের অনুবাদ যেমন বিশ্লেষাত্মক ভাবে করেছেন, সত্যেন্দ্রনাথ যে

সে পথ দিয়ে যান নি তা দুজনের অনুবাদ তুলনা করলেই চোখে পড়ে।[৪৩] তাছাড়া এই গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'গদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' থেকে শ্লোক তুলে তিনি ধম্মপদের সংগে ব্রাহ্মধর্মের মূল নীতির সাধর্ম্য বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসংগে নবরত্নমালার মতো ধম্মপদের কিছুটা গ্রন্থনার কাজও তিনি করেছেন। একই ভাবের বিভিন্ন শ্লোক ধম্মপদের বিভিন্ন বর্গে স্থান পেয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ সেগুলি ভাবানুযায়ী—পাপপুণ্য অহিংসা, রিপুদমন, আত্মসংযম, সংসার, মৃত্যু, জরা ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ শিরোনামভুক্ত করে একত্রে সাজিয়েছেন ও সেই সংগে 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' থেকে এক একটি শ্লোক পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন—'পূজ্যপাদ বড়দাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। 'বৈদান্তিক চৌতালা মন্দিরের তুরীয় অবস্থা এবং বৌদ্ধ চৌতালা মন্দিরের নির্বাণমুক্তি এ পিঠ ও পিঠ[৪৪] দ্বিজেন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতি নিয়েই বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা শেষ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের কয়েকটি স্থানে রিস্ ডেভিড্স্-এর 'Buddhism—Thc Life and teaching' গ্রন্থের প্রত্যক্ষ প্রভাব[৪৬] চোখে পরে। রিস্ ডেভিডস্-এর 'Buddhism—Its History and Literature, গ্রন্থ থেকেও ইনি কিছু কিছু সাহায্য পেয়েছেন [৪৭] ধনিয়াসুত্তের অনুবাদটি এই বইয়েই আছে, সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

মনিয়ার-উইলিয়াম্স্-এর Buddhism গ্রন্থের প্রত্যক্ষ প্রভাবও সত্যেন্দ্র-নাথের গ্রন্থের স্থানে স্থানে দেখা যায়।[৪৮]

তিব্বতে লামাধর্ম প্রসংগে, দালাই লামার প্রাসাদকক্ষ পোতালায় লামার সংগে শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুরের সাক্ষাৎকারের চিত্র মনিয়ার-উইলিয়ম্স্-এর Buddhism গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে. সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে একথার উল্লেখ করেছেন।[৪৯] তিনিও ঐ সাক্ষাৎকারের একটি অনুরূপ চিত্র পরিবেশন করেছেন। গয়ার কাছে গয়াশীর্ষ পর্বতে বুদ্ধ দেবের উপদেশকে রিস্ ডেভিড্স্[৫০] ও মনিয়ার উলিয়াম্স্[৫১] দুজনেই Fire Sermon বলেছেন। এঁদের অনুসরণেই সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ এখানে 'আগ্নের উপদেশ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে এ ধারণা আরও স্পষ্ট হয়।—"...বুদ্ধ একদিন গয়ার নিকট 'গয়াশীর্ষ' পর্বতে উপবিষ্ট আছেন, রাজগৃহের অধিত্যকা তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত—এমন সময় সমানের এক পাহাড়ে ঘোর দাবানল তাঁহার

দৃষ্টিগোচর হইল। এই অনলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব এইরূপে উপদেশ দিলেন—তাহা 'আগ্নের উপদেশ' বলিয়া নির্দেশ করিতে চাই।"[৫২]

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে এখানে 'আদিত্য পর্যায় সূত্র' কথাটি রেখেছেন। "তদনন্তর তথাগত গয়ার সন্নিকটস্থ গয়াশীর্ষ পর্বতে গমন করিয়া এক হাজার শিষ্যের সমক্ষে 'আদিত্যপর্য্যায় সূত্র' ব্যাখ্যা করেন। (পৃ. ১৪৯)। সূত্রটিতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের লেলিহান শিখা ও দীপ্ত আদিত্যের বর্ণনা রয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের এই অনুবাদটির[৫৩] সংগে মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌-এর অনুবাদের[৫৪] প্রচুর মিল আছে। তবে 'দুষ্পর্দস্য' শব্দের প্রয়োগ বাংলায় অপ্রচলিত।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'Antiquites of Orissa', অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থ থেকে তিনি যে সহায়তা পেয়েছেন তা পাদটীকায় নিজেই উল্লেখ করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে কোন একটি অধ্যায়কে বিস্তৃত করে অন্য অধ্যায়গুলিকে নিষ্প্রভ করা হয় নি। লেখকের পরিমিতিবোধের ছাপ গ্রন্থে সুস্পষ্ট। পাণ্ডিত্য প্রকাশের সংযমে আলোচনাগুলি যেমন পরিচ্ছন্ন তেমনি প্রকাশের সাবলীলতায় রচনা হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত। বৌদ্ধ ইতিহাসের কালনির্ণয়ে তথ্যবহুল প্রামাণ্য বিবরণগুলিও রচনার গুণে নীরস হয় নি।

বৌদ্ধদর্শনের আলোচনায়—কর্মই একমাত্র যোগসূত্র, আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার, পঞ্চ স্কন্ধের সংযোগে জীবের জীবন ও বিয়োগে মৃত্যু ইত্যাদি কঠিন তত্ত্ব পরিবেশনের সময় বাগ্মিতা ঢঙে পাঠকের সংগে নৈকট্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। "মনে করুন তাড়িত শক্তির ন্যায় কর্মবল বলিয়া একটি শক্তি আছে, তাহার গতিবিধিতেই জীবন গঠিত হইতেছে" ইত্যাদি।

বৌদ্ধ সংঘের বর্ণনায়, বৌদ্ধভিক্ষুকদের রুচিসম্পন্ন জীবনযাত্রার প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরের প্রশস্তি আছে কিন্তু তা উচ্ছ্বাস প্রণোদিত নয়।—"স্বহস্তে সূত চীরপুঞ্জ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র···ত্রিবসনমণ্ডিত সুরুচিসংগত ভদ্র সাজে সজ্জিত হইয়া সর্বত্র বিচরণ করিতেন।"[৫৫]

এখানে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগেও রচনা আড়ষ্ট হয় নি। একটি স্বচ্ছন্দ গতিশীলতার ছাপ রচনায় অনুস্যূত।

বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ও বিকৃতি প্রসংগে অনেক মনীষীদের লেখা থেকে

যুক্তিবহ প্রামাণ্য তথ্য প্রদান করেছেন, কিন্তু রচনা বিবৃতিধর্মী হয় নি; পরিবেশনের গুণে তা উপভোগ্যই হয়েছে। লেখকের যুগোপযোগী, সংস্কার-মুক্ত মনের পরিচয় আলোচনার মধ্যে স্পষ্ট প্রতিভাত। বক্তব্যকে প্রামাণিক করতে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নেই। আবেগধর্মী বিশ্লেষণ তিনি পরিহার করেছেন। ঐতিহাসিকের মতো তথ্যের বিশ্লেষণেই তিনি আনন্দ পেয়েছেন। তথ্যগুলি সামনে তুলে ধরে পাঠককে যেন বিচারে আহ্বান করেছেন।—"ত্রিপিটকের ভিতরে রাজগৃহ ও বৈশালী সভার উল্লেখ আছে, অতএব তাহার উত্তরকালে ত্রিপিটক রচনা হওয়াই যুক্তিসংগত। আর এক কথা এই যে ত্রিপিটকের মধ্যে পাটলিপুত্র সভার কোন উল্লেখ নাই, অতএব তৎপূর্বে ইহার রচনাকাল নির্দ্ধারিত হইতে পারে।···আবার ঐ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহার কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন,···এই সমস্ত কারণে ত্রিপিটকের কিয়দংশ খৃ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে, কতক বা তাহারও পূর্বে বিরচিত।"[৫৬]

মাঝে মাঝে বক্তব্যে পরিহাস এনে রচনাকে আকর্ষণীয় করেছেন—"ভোটের—ধর্মরাজ—যাঁহার উপাধিচ্ছটা আবৃত্তি করিতেও কণ্ঠরোধ হয়,···নামাবলীর গৌরবে ইনি গৌতম বুদ্ধকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন।"[৫৭]

'রুষ সম্রাটের' নিকট দালাইলামার দৌত্য প্রসংগে বলেছেন - মেষ-ভল্লুকে মিত্রতা বন্ধনের চেষ্টা দেখিলে লোকের মনে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক।"[৫৮]

শিল্প সৌকর্যে মাঝে মাঝে এক একটি পদ অতুলনীয় হয়েছে। যেমন—"বৌদ্ধ আপনি আপনার প্রদীপ, আপনি আপন নির্ভর যষ্টি।"[৫৯]

আলোচ্য গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ বাগাড়ম্বর পরিহার করেছেন। বিষয়ানুসারী পরিবেশন—এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেখানে যে কথাটি বসালে ঠিক হয়, সেভাবেই তা সাজিয়েছেন ; ফলে সাধারণ পাঠকের মনে বুদ্ধের জীবন, ধর্ম ও সংঘের একটি স্পষ্ট ধারণা জাগ্রত হয়। বিদেশী পণ্ডিতদের গ্রন্থ থেকে তিনি সাহায্য নিলেও আরও নূতন তথ্য আহরণে তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না। মার্কিন দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার সম্পর্কে তাঁর সমকালীন সদ্য প্রকাশিত পত্র পত্রিকা থেকে তিনি সাহায্য নিয়েছেন তার নিদর্শনও আলোচ্য গ্রন্থে রয়েছে।[৬০] তাঁর নিরলস প্রয়াসে গ্রন্থটিতে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বিবিধ তথ্যের একত্র সমাবেশ হয়েছে, অথচ তা গুরুভার হয় নি।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে কাহিনী পরেবেশনে তাঁর রচনাংশ কিছ্ কিছ্ নাট্যগ্ণও এসেছে। তৎসম, তদ্ভব সব রকম শব্দকেই তিনি বিষয়ান্যায়ী বেছে নিয়েছেন। ফলে তাঁর রচনা জড়তামুক্ত, প্রসাদগ্ণ -সমন্বিত হয়েছে।

গ্রন্থটি সাধ্ গদ্যে লেখা। সাধ্ হলেও এ গদ্য যে বৈশিষ্ট্যপ্র্ণ তা প্রমথ চৌধ্রীর বক্তব্যে পরিস্ফ্ট। তিনি এই ভাষাকেই প্রকৃত সাধ্গদ্য বলেছেন। তাঁর কথায়—"এ ভাষা যেমন সরল তেমনি প্রাঞ্জল, যেমন শ্দ্ধ তেমনি ভদ্র। এতে সমাস নেই, সন্ধি, নেই, সংস্কৃত শব্দের অতি প্রযোগ নেই. অপ-প্রয়োগ নেই,...বাগাড়ম্বর নেই, বৃথা অলংকার নেই। এ ভাষা যেমন স্খপাঠ্য, তেমনি সহজবোধ্য।[৬১]

১. 'ডাগোবা' স্থলে 'দাগোব' শব্দ থেকে 'ডাগোবা' শব্দের প্রয়োগ এখানে য্ক্তিয্ক্ত। ম্দ্রণপ্রমাদে 'ডাগোবা' হওয়া বিচিত্র নয়। গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত 'আচার্য কেশবচন্দ্র (আদি বিবরণ) গ্রন্থে ঐ ভ্রমণ যাত্রায় সত্যেন্দ্রনাথের একই সংগে লিখিত কেশবচন্দ্র সেন-এর ইংরেজি দিন-লিপির বংগান্বাদ পরিবেশিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে প্. ৯০এ শব্দটি 'ডাগোবা' বলে উল্লিখিত। 'পাহাড়ের উপর একটি বৌদ্ধ মন্দির দেখিলাম।...প্রাংগণের মধ্যস্থলে পিরামিডের আকার একটি ডাগোবা আছে, শ্নিতে পাওয়া যায় উহার মধ্যে ব্দ্ধের দন্ত আছে।' নগেন্দ্রনাথ বস্ সংকলিত বিশ্বকোষ ৮ম ভাগ প্. ৪৬৪ অন্সরণ করলে দেখা যায়—দাগোব—'বৌদ্ধদিগের একপ্রকার স্মরণার্থ স্তম্ভ। ইহা সংস্কৃত 'ধাতুগর্ভ' শব্দের অপভ্রংশ। পালি ভাষায় 'ধাতুগব্ভ তাকিল 'দাগোব' Dagob...প্রায় প্রত্যেক দাগোবে এক একটি স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত বাক্স থাকে,...ঐ সকল বাক্সে দন্ত, অস্থি ও ভ্র্জপত্রে লিখিত অনেক প্র্থি দৃষ্ট হয়'।

২. ইনি বৌদ্ধদের সায়নাচার্য। ব্দ্ধগয়ায় ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম। রেবত নামক এক মহাস্থবিরের উপদেশ ইনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ইহাঁর ঘনঘোর কণ্ঠস্বর ব্দ্ধের অন্র্প কল্পনায় ব্দ্ধঘোষ ইঁহার নামকরণ

হয়। এই বৌদ্ধাচার্য্য চূড়ামণি পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে সিংহলে গমন করতে রাজা মহানামের রাজত্বকালে অনুরাধাপুরে বাস করেন, (খ্রী. ৪১০-৪৩২) ও তথায় ত্রিপিটকের মহাভাষ্য অত্থকথা রচনা করেন।"

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম : পৃ. ১৯৮, ২য় সং

৩. সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম" গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরীর লিখিত মুখপত্র।

৪. *The Mahawanso* : by George Turnour. In two Vols. Ceylon. 1837 (In Roman characters with the translation subjoined, and an introductory essay). বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্ত।

৫. দ্রষ্টব্য—ধম্মপদ অনুবাদকের তালিকা : সতীশচন্দ্র মিত্রের ধম্মপদ পদ্যানুবাদের ভূমিকা।

৬. Vol. I, 1870, Vol. II, 1873.

৭. 'We all owe much to Childers.' 'Monier Williams : Buddhism : Preface.

৮. Robert Caesar Childers of the Ceylon Civil Service, soon after his retirement in 1866, he set to work to arrange alphabetically all the words found in the *Abhidhana padipika*···T. W. Rhys Davids : Buddhism—Its History and Literature p. 49

৯. পূর্বোক্ত মুখপত্র : প্রমথ চৌধুরী

১০. 'বৌদ্ধধর্মের জানিবার বিষয় এমন কিছুই নাই যাহা ডেভিড্‌স্‌ সাহেবের গ্রন্থে সংক্ষেপরূপে বিবৃত না হইয়াছে। ঐ ধর্মের মত বিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় সচরাচর ঐ ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থ সকলে দেখা যায় তাহা হইতে ডেভিড্‌স্‌ সাহেব কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল স্থলে তিনি ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে নির্বাণ একটি। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের এই মূল মতে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।···'

—নির্বাণ প্রবন্ধ : লেখকের নাম অমুদ্রিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০০ শক জ্যৈষ্ঠ নবম কল্প, ৪র্থ ভাগ

১১. (American Lectures) T. N. Rhys Davids : Buddhism—Its History and Literature : Isted. 1896.

১২. 'ডেভিডস্ সাহেব অনেক দিন অবধি সিংহল দ্বীপে ব্যারিস্টারি কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া বৌদ্ধধর্মের বিষয় তথাকার যাত্রামুল্লে উন্নানসে নামক সুপণ্ডিত ও মহানুভব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট শিক্ষা করেন।'—পূর্বোক্ত 'নির্বাণ' প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০০ শক জ্যৈষ্ঠ।

১৩. In 1856 he came out to Poona as Principal of the Deccan College. Later he was made a fellow of Bombay University···It was however after his return to England··· he wrote the poem The *Light of Asia.*'—preface Sir Edwin Arnold : Light of Asia. (1st Published—1879)

১৪. Raja Rajendralal Mitra : History of Society (Appendix-C-তে উল্লিখিত Asiatic Researches, Vol. I-XX (1788-1839). —printed in thc Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal (from 1784-1883)

অপিচ—

'মূল্যবান ঐতিহাসিক আবিষ্কারের উপর প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করে··· তাঁরা সোসাইটির মুখপত্র Asiatic Researches-কে সমৃদ্ধ করে তুলতে লাগলেন ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে'।—ডঃ শিশিরকুমার মিত্র : রাজেন্দ্রলাল মিত্র (ইংরেজি থেকে অনূদিত)

১৫. Prof Owen, in his report to the British Association May 1863, bore the following testimony of the Subject, Mr. Hodgson···has contributed and important element to the Ancient History of India, by his Buddhist researches,···'

—Rajendralal Mitra ed. Sanskrit Buddhist Literature of Nepal : Introduction ; Alok Roy. 1971 ed.

১৬. প্রমথ চৌধুরী : মুখপত্র : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম : পৃ. ১৫।

১৭. প্রমথ চৌধুরী : মুখপত্র : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম : পৃ. ১৪।

১৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ—পৃ. ২

১৯. 'বৌদ্ধধর্ম জানিবার আমার বড়ই কৌতূহল। বৌদ্ধধর্ম বড় সহজ ধর্ম নহে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই এ ধর্মের অবলম্বী।'—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : সিংহলে ভ্রমণ বৃত্তান্ত : (২৬শে আশ্বিন মঙ্গলবার) বোম্বাই চিত্রে মুদ্রিত। পৃ. ৫০৬।

২০. 'It is called *Tevigga Sutta* merely because 'Gotama' is there described by the complimentery title of *Tevigga* —'wise in the Vedas' and its full name is thc '*Tevigga —Vakkhagotta—Sutta.*'

Sacred Books of the East—XI, p. 159

২১. 'This is the only Suttanta, among the thirteen translated in this volume in which the discourse does not lead up to Arahatship. It leads up only to the so called Brahma Viharas—the supreme conditions—four states of mind held to result, after death, in a rebirth in the hevenly words of Brahma,—Rhysa Davids : Dialogues of the Buddha. p. 298

২২. 'এরূপ প্রবন্ধ পরিষদে নূতন…'নগেন্দ্রনাথ বসুর উক্তি : সাহিত্য পরিষদের ১৩০৭এর কার্য বিবরণীতে প্রাপ্ত।

২৩. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধধর্ম : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০৭ সালের বিশেষ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা।

২৪. সন্ন্যাসী বুদ্ধ অশীতিবর্ষ বয়ক্রম কালে চণ্ডাল-গৃহে শূকর-মাংস ভক্ষণ ফলে রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন, এই একটা কথা প্রচলিত আছে, আজ প্রবন্ধেও তাহার উল্লেখ দেখিলাম। কথাটা কেমন শুনায়।…যাঁহারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে বৌদ্ধ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন চণ্ড ভ্রমক্রমে বিষাক্ত শিলীন্ধ্র দিয়াছিল।' ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরীর ভাষণ ১৩০৭এর কার্যবিবরণীতে প্রাপ্ত—সাহিত্য পরিষদ

পত্রিকা ১৩০৮ (চলন্তিকা অভিধানমতে 'শিলীন্ধ্র'—ব্যাঙের ছাতা' কদলী বা তজ্জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ বা তাহার পুষ্প)

২৫. 'I did not wish to hurt him (Chunda) by refusing to take of his chief dish, but it was not wholesome food…it was not pork, but made with the Pig worthed plant.' Rhys Davids : Gotam the man : My Passing from Earth : Ch XVI—p. 274.

২৬. The story is that Gautama died from eating too much pork (or dried boar's flesh). As this is some what derogatory to his dignity it is not likely to have been fabricated, A fabrication, too, would scarcely make him guilty of the inconsistency of saying—Kill no Living thing, and yet setting an example of eating fleshmeat." Monier Williams : Buddhism. p. 49

২৭. মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।

২৮. 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ মন্ত্রের মণি রত্ন নয়, আর পদ্ম পদ্মফুল নয়; মণিভদ্রের নাম থেকে মণি ও পদ্মপাণির নাম থেকে পদ্ম শব্দ নিয়ে মন্ত্রটি গঠিত।'—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৩৩৮এ সাহিত্য পরিষদের ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের আলোচনা।

২৯. বৌদ্ধধর্ম-২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন:—

এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্তিত আকারে পাঠকদের হস্তে সমর্পিত হইল। ইহার গুণদোষ পরীক্ষা তাঁহাদের উপরেই ন্যস্ত। এই অগ্নিপরীক্ষায় আমি যদি উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

কমলালয় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালিগঞ্জ, কলিকাতা

১৫।৭।১৯২২

৩০. সাধু অঘোরনাথ : শাক্যমুনি-চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব।

সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের মৃত্যুর পরে গ্রন্থটি উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৮০৪ শকে প্রকাশিত হয় ১ম ভাগ—বৈরাগ্য ও নিষ্ক্রমণ

১৮০৪ " " ২য় ভাগ—অধ্যয়ন ও তপশ্চরণ, সিদ্ধিলাভ নির্বাণতত্ত্ব ও প্রচার।

১৮০৫ " " ৩য় ভাগ—শাক্যমুনি চরিত ও পরিশিষ্ট

গ্রন্থের আখ্যাপত্রে সম্পাদক নিজের নাম দেন নি, শুধু 'তদনুগ বন্ধু' কর্তৃক সম্পাদিত এই লিখেছিলেন। নববিধান পাবলিকেশন কমিটীর সম্পাদক শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায় সংকলিত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ প্রণীত 'বৌদ্ধধর্ম'-প্রসঙ্গ' পুস্তিকার ভূমিকা থেকে সম্পাদকের নাম স্পষ্টভাবে জানা যায়—"সাধু অঘোরনাথের তিরোধানে উপাধ্যায় মহাশয়কে 'শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনা করিতে হইয়াছিল। বইটীর অবতরণিকায় ও পরিশিষ্টে তাঁহার লিখিত দুইটী বিশদ আলোচনা নিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল আলোচনা একত্রিত করিয়া 'বৌদ্ধধর্ম'-প্রসঙ্গ' নামে প্রকাশ করা হইল।' (কলিকাতা, ১৯শে নবেম্বর ১৯৫৮) সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত : গৌর গোবিন্দ রায় প্রণীত 'বৌদ্ধধর্ম' প্রসঙ্গ' পুস্তিকা)।

৩১. কৃষ্ণকুমার মিত্র : বুদ্ধদেব চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষেপ বিবরণ ২য় সং ১২৯৪ সাল

ঐ বুদ্ধদেব চরিত বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩য় সং ১৩০৬ "

গ্রন্থটি উৎসর্গও করেছেন—'পরম স্নেহশীল ৺গঙ্গাদাস গুহের পবিত্র নামে'।

৩২. ডাঃ রামদাস সেন : 'বুদ্ধদেব—তাঁহার জীবনী ও ধর্মনীতি'।

গ্রন্থকারের মৃত্যুর পরে অধ্যাপক কালীবর বেদান্তবাগীশের সহায়তায় পুত্র মণিময় সেন কর্তৃক ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে গ্রন্থকারের মৃত্যুর সময়ে মাত্র চার ফর্মা ছাপা হয় ও দীর্ঘদিন কাজ

বদ্ধ থাকে। মণিময় সেন পিতৃবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন।

৩৩. নবীনচন্দ্র সেন রচিত 'অমিতাভ' কাব্য ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। এর পূর্বেই এটি আংশিক প্রকাশিত হয়। দ্র. সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড : পৃ. ৩৭০।' 'নবীনচন্দ্র যে কাব্যগুলি রচনা করিলেন···অমিতাভ (১৩০২) বুদ্ধের জীবনী। ঐ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় উল্লিখিত—"প্রথম প্রকাশ (অংশত) 'বুদ্ধদেব' নামে জন্মভূমিতে।

৩৪. গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব রচিত' নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। নাটকটি অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে ১৯শে সেপ্টেম্বর—১৮৮৫ খ্রী.। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রই বুদ্ধচরিত নাটক লেখায় গিরিশচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি তাঁকে এডুইন আরণল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' বইখানি পড়তে দিয়ে এই অনুরোধ রাখেন। আরণল্ড এই নাটকের অভিনয় স্বচক্ষে দেখেছিলেন। গ্রন্থখানি উৎসর্গও করেছেন এডুইন আরণল্ডকে।

দ্র. ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য : গিরিশচন্দ্র ঘোষ—সাহিত্য সাধনা : গিরিশ-রচনাবলী ২য় খণ্ডে মুদ্রিত।

৩৫. মহাপরিনির্বাণসূত্র : অনুবাদ : ব্রজগোপাল নিয়োগী : (নববিধান-প্রচারক) প্রকাশ-১৯০১ খৃ.

৩৬. চারুচন্দ্র বসু : অনুবাদ : ধম্মপদ—১৯০৪ খ্রী.

সতীশচন্দ্র মিত্র : পদ্যানুবাদ ধম্মপদ ১৯০৫ খ্রী.

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : বুদ্ধদেব গ্রন্থ ১৯০৪ খ্রী. (ছাপাখানার বিপর্যয়ে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের বিলম্ব হয়েছিল। মূলত লেখার কাজ অনেক আগেই শেষ করেছেন। পূর্বোক্ত ধম্মপদের দুজন অনুবাদকের ভূমিকা লিখেছেন সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় : কাব্যানুবাদ বুদ্ধবাণী : লাইট অব এশিয়ার অষ্টম অধ্যায় অবলম্বনে ১৯০৯ (১৩১৬ সাল।)

রায় শরৎচন্দ্র দাশ বাহাদুর : অনুবাদ : বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা-১৯১২ খ্রী. (১৩১৯ সাল)

৩৭. সত্যেন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরীর লিখিত মুখপত্র—পৃ. ১৯-২০

৩৮. ঐ ঐ ঐ পৃ. ১৮

৩৯. 'অনেক গ্রন্থখানি দেখিতে ব্যাকুল হউয়াছেন,…সুতরাং শাক্যর 'বৈরাগ্য ও নিষ্ক্রমণ' পর্যন্ত প্রথম খণ্ড বাহির হইল'।
পাঠকগণের প্রতি নিবেদন : সম্পাদক [উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায়]

৪০. আমরা অনেকদূর অনুবাদ করিয়াও পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে সমুদায়াংশ প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। কেননা অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা এ দুই একত্র সংযোগ না করিলে—সকলের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন হইবে।'
সম্পাদক (গৌর গৌবিন্দ রায়) : শাক্যমুনি চরিত ও পরিশিষ্ট : ধর্মচক্র ও তৎপ্রবর্তক অধ্যায় : পাদটীকা : পৃ. ১২২, ২য় ভাগ তৃতীয় সং ১৮২৬ শক। (১৮২৬ শকে কে. পি. নাথ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে পূর্বের ২য় ভাগ ও ৩য় ভাগ একই সংগে যুক্ত হয়ে একত্রে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়)।

৪১. 'এ গ্রন্থ কোন ইংরেজি পুস্তকের অনুবাদ নহে।…ইংরেজি ভাষায় লিখিত বুদ্ধচরিতের অনুভাষা প্রচারিত হওয়ায় তৎপাঠে অনেক লোক বুদ্ধজীবনের প্রকৃত আদর্শ সন্দিহান হইতেছিলেন। বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধধর্ম ঠিক অনুভাষিতানুরূপ কিনা তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতে-ছিলেন।'—কালীবর বেদান্তবাগীশ : উপোদ্ঘাত বা মুখবন্ধ : ডাঃ রামদাস সেন লিখিত 'বুদ্ধদেব - তাঁহার জীবনী ও ধর্মনীতি'।

৪২. ব্রজগোপাল নিয়োগী : (নববিধানের প্রচারক) মহাপরিনির্বাণ সূত্রের অনুবাদ।

৪৩. মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং ব বহতো পদং ॥ ১ ধম্মপদ
চারুচন্দ্র বসুর অনুবাদ :—
'মনই ধর্ম সমূহের পূর্বগামী, মনই ধর্ম সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ধর্ম মন হইতেই উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ মনুষ্যের স্বভাব বা চিন্তা মনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়। জীবের চৈতসিক ভাব সমূহ

মন হইতেই উৎপন্ন হয় ও মনের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। যদি কেহ দূষিতান্তঃ-করণে কথা কহে, বা কার্য্য করে, তবে চক্র যেমন ভারবাহী বলীবর্দ্দের পদচিহ্ন অনুসরণ করে—দুঃখও তাহাকে সেইরূপ অনুসরণ করে।'
সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ :—
'মনেতেই ধর্ম, ধর্ম মনোগামী, যে ব্যক্তি মন্দভাবে আলাপ ও কার্য্য করে টানা গাড়ী যেমন বলদের পিছনে পিছনে যায়—দুঃখ সেইরূপ তার অনুগামী হয়।"

৪৪. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আর্য্যধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত প্রবন্ধ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

৪৬. সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম'	:	Rhys Davids : Buddhism—The Life and teaching.
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :—	:	Ch IV
বৌদ্ধধর্মের মত ও বিশ্বাস	:	The Essential Doctrines of
	:	Buddhism.
৪র্থ পরিচ্ছেদ :—	:	Ch VI
সংঘের নিয়মাবলী	:	The Order of Mendicants.
৬ষ্ঠ পরি: বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র	:	Ch I Appendix
(বিনয়পিটক, সুত্তপিটক, অভিধর্মপিটকের তালিকা)	:	List of the Pitakas
৭ম পরি : বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ও বিকৃতি	:	Ch VIII—Theory of he Buddhas, Manjasri, Avolokitesvara, Vajrapani, Dhyani—Buddhas, The Tantra System, Praying wheels and flags. (Ch IX) Lamaism of Tibet.
৮ম পরি : বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও পতন	:	Ch IX ...Asoka's Missionaries, Kanish-

	৯ম পরি : বিস্তার… উপসংহার	ka's Council,…Buddhism expelled from India…
৪৭.	Karma (p. 124) Daily life (p. 108) Ten Fetters (p. 141) Nirvana (p. 151, 162) T. W. Rhys davids : Buddhism——Its History and Literature.	
৪৮.	সত্যেন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম :	Monier Williams-এর Buddhism গ্রন্থের প্রভাব
	৪র্থ পরিচ্ছেদ : বৌদ্ধ :	Lec IV The Sangha or Buddhist order of Monks
	৭ম পরিচ্ছেদ — : বুদ্ধ ৩ত্ত্ব: মহাযান হীনযান 'বৌদ্ধধর্ম্মের নিরীশ্বর কঠোর ধর্মনীতি বৌদ্ধসমাজে অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই… পৃ. ২১২ ৭ম পরি:	Lec VIII Rise of Theistic and Poly Thesstic Buddhism.
	৭ম পরি : একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় এই তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবেরই নামান্তর।' পৃ. ২২১ ঐ	Lee IX Theistic and Polytheistic Buddhism…Manjusri, Avalokitesvara or Padmapani and Vajrapani…
	৭ম পরি: ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম :	Hindu Gods and demons adopted by Budhism…
	৭ম পরি : লামাধর্ম্ম :	Lamaism and the Lamaistic Hierarchy.
	৫ম পরিচ্ছেদ বর্ণিত : বৌদ্ধতীর্থ— কপিলবস্তু, বুদ্ধগয়া,	Lee XIV Sacred Places

বৌদ্ধমন্দির (রাজা অশোকের স্থাপিত) বোধিবৃক্ষ, সারনাথ সপ্তপর্ণীগুহা শ্রাবস্তী, জেতবন, চন্দনকাষ্ঠের বৃহৎ প্রতিমূর্তি পৃ. ১৩৮-১৪৫	Kapilvastu, Buddhagaya, Ancient Temple, Sacred tree, Restoration of Temple, Sarnath, Sattapanni Cave, Sravasti, Jetavana monastery, Sandal Wood image.

৪৯. 'আমাদের খ্যাতনামা পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস এই লামার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ শরৎবাবুর ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণিত আছে। মোনিয়ার উইলিয়মসের 'বৌদ্ধধর্ম" গ্রন্থে ৩৩১ পৃষ্ঠায় তাহার সারভাগ সন্নিবেশিত হইয়াছে।' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বৌদ্ধধর্ম -২য় সং পৃ. ২২৯।

৫০. T. W. Rhys Davids : Buddhism—Life and Teaching. Ch III Sermon on Fire

৫১. To them on a hill Gayasisa (Brahma-Yoni) near Gaya, he preached his burning fire Sermon (*Moha-Vagga* 1.21) Monier Williams : Buddhism. p. 46

৫২. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ—২৪০।

৫৩. 'হে ভিক্ষুগণ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কি হুতাশন জ্বলিতেছে, সমুদায় দৃশ্যমান জগতে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সকল ইন্ধন পাইয়া পঞ্চেন্দ্রিয় জ্বলিয়া উঠিতেছে। বাসনাগ্নি রাগাগ্নি, লোভাগ্নি, মোহাগ্নি জ্বলিতেছে—জন্ম মৃত্যু রোগ শোক নৈরাশ্য দুর্মনস্য সেই অনলে প্রসূত'...

—সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ : বৌদ্ধধর্ম পৃ. ঐ

৫৪. Everything, O monks is burning (adittam adiptam). The eye is burning ; visible things are burning. The sensation produced by contact with visible things is burning—burning with the fire of lust (desire) enmity and delusion (*ragaggina*, *dosaggina*, *mohaggina*) with birth, decay

(*jaraya*) death, grief, lamentation, pain, dejection (*domanassehi*) and despair (*upayasehi*),. Monier Williams : Buddhism, p. 46.

৫৫. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম্ম'—পৃ. ১০২—২য় সং।

৫৬. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : " —পৃ. ১৮২— " ।

" " —পৃ. ২৩১— " ।

৫৮. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ২য় বৌদ্ধধর্ম্ম' : ২য় সং —পৃ. ২৩১ ।

৫৯. ঐ ঐ ঐ —পৃ. ১১৪ ।

৬০. The Buddhist Discovery of America : Harper's Magazine July 1901.

বৌদ্ধধর্ম্ম' গ্রন্থে ২৯৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লিখিত।

৬১. প্রমথ চৌধুরীর মুখপত্র : সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' গ্রন্থে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ভাষা এবং সাংগঠনিক সত্যেন্দ্রনাথ   বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদে অবদান

পারিবারিক খাতা   গদ্যরীতি

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে অবদান

কার্যকাল

১৩০১ সালের মাঘ মাসে সদস্যভুক্তি থেকে ১৩১২ সালের চৈত্র পর্যন্ত প্রায় এগারো বছরেরও বেশী সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে যখন থেকে সত্যেন্দ্রনাথ পরিষদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন, সে সময় তাঁর চিন্তাশীলতা, সুপরিচালনা, ধৈর্য ও উৎসাহ-বাক্যে পরিষদ্-সদস্যগণ নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন। এই পর্বে বাংলাভাষার গঠনে তাঁর মননশীল বিশ্লেষণ ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর একান্ত অনুরাগ পৃথক্-ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

১৩০১-এর মাঘ থেকে ১৩০৩ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতার বাইরের সদস্য ছিলেন। ১৩০৪ থেকে কলকাতার সদস্যরূপে তাঁর নাম ঠিকানার নিদর্শন পরিষদে রয়েছে।[১] ১৩০৫-এর বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত সদস্য তালিকায় সত্যেন্দ্রনাথের নাম পাওয়া যায়। ঐ সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি। ১৩০৫-এর ৪ঠা বৈশাখ বার্ষিক অধিবেশন, তৎকালীন পরিষদ্-কার্যালয়ে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ১০৬১ গ্রে স্ট্রীটের ভবনে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠায় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ঐকান্তিক সহযোগিতার কথা পরিষদ্ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে সগৌরবে ব্যক্ত হয়েছে। পরিষদ্ প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই Bengal Academy of Literature-এর বিভিন্ন অধিবেশন তাঁরই আলয়ে অনুষ্ঠিত হতো।[২]

১৩০৬-এর ৩রা ফাল্গুন এক বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ এগারো জন সদস্য সাধারণ স্থানে পরিষদ্-কার্যালয় স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব করেন। ঐ এগারো জনের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথও ছিলেন। ঐ সভায় মতভেদ থাকলেও কার্যালয় পরিবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয় ও ১৩৭।১নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িতে পরিষদ্ স্থানান্তরিত হয়। ১৩০৬-এর বার্ষিক অধিবেশন এখানেই যথাসম্ভব পূর্বের ঐতিহ্য রক্ষা করে মণ্ডপ বেঁধে সমারোহের সঙ্গেই পালিত হয়। সংস্কৃত উত্তর-রামচরিতের দৃশ্যবিশেষ ও বাংলায় কুরুক্ষেত্র কাব্যের

আংশিক অভিনয় হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন উপস্থিত ছিলেন ও ১৩০৭ সালের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধক চরিতমালায় (৬৭নং) সত্যেন্দ্রনাথের বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে সভাপতির পদে নিযুক্ত থাকার কাল ১৩০৭ ও ১৩০৮ বলে উল্লিখিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ ১৩১০ ও ১৩১১ সালে আরও দু বছর বেশি সভাপতিত্ব করেছেন—তা পরিষদের কার্য বিবরণী থেকে জানা যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'পরিষৎ-পরিচয়' (১৩০০-১৩৫৬) গ্রন্থে সংশোধিত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে ; সেখানে ৮ পৃষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বের কাল ১৩০৭-১৩০৮ ও ১৩১০-১৩১১ স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে।

১৩০৯ সালেও কার্যনির্বাহক সমিতিতে সত্যেন্দ্রনাথ মনোনীত সদস্য ছিলেন। ঐ বছরেই ৩১শে ভাদ্র পরিষদ্ গৃহে বান্ধব সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৺রাজনারায়ণ বসুর উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভায় সত্যেন্দ্রনাথকে সভাপতিত্ব করতে দেখা যায়। ১৩১২ সালেও সত্যেন্দ্রনাথ মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৩০৬এর (৩রা ফাল্গুন) থেকে ১৩১২ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিষদের সংযোগের নিদর্শন রয়েছে। এর মধ্যে ১৩১১ সালে পাঁচ মাস (জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন) সভাপতি থাকাকালীন অনুপস্থিত ছিলেন। ১৩১৩ সাল থেকে পরিষদের কোন গুরুতর কার্যভার নিতে তাঁকে দেখা যায় নি। সম্ভবত ঐ সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের গৃহসংস্কারাদি ও অন্যান্য কাজে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। এরপর ১৯০৮ (১৩১৫) থেকেই রাঁচি বসবাসের উদ্যোগ আয়োজন চলে।

সাহিত্য পরিষদের কর্মধারা উন্নয়নে সত্যেন্দ্রনাথের ভূমিকা
গৃহনির্মাণ প্রকল্প ও বিবিধ শাখা সমিতির পুনর্গঠন

১৩০৭-এ সভাপতির কার্যভার হাতে নিয়েই পরিষদের কর্মোন্নয়নে সত্যেন্দ্রনাথ আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সময়েই পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ-প্রকল্প গৃহীত হয়। চারুচন্দ্র ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সদস্যের বিশেষ চেষ্টায় পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ভূমিদানে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন (১৩০৭, ২৮শে

পৌষ, ৮ম মাসিক অধিবেশন)। ভূমি সংক্রান্ত আইনগত সুব্যবস্থা ও গৃহনির্মাণ কার্য সুপরিচালনার জন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সদস্যদের নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে গৃহনির্মাণ-সমিতি গঠিত হয়। সাধারণ সভ্যদের অবগতির জন্য গৃহনির্মাণ সমিতি তাঁদের কাজের অগ্রগতি পরিষদের অধিবেশনে ব্যক্ত করেন। গৃহনির্মাণের ব্যয় আনুমানিক ত্রিশ হাজার টাকা স্থিরীকৃত হয়। এছাড়াও পূর্বের শাখা সমিতিগুলিকে পুনর্গঠিত করে—গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি; পরিভাষা সমিতি; ভাষা-বিজ্ঞান সমিতি; শব্দসমিতি ও গ্রন্থরচনা সমিতি নামে পাঁচটি শাখাসমিতি গঠিত হয়।

১৩০৭-এর বার্ষিক বিবরণে সত্যেন্দ্রনাথ পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে অনেক আশার কথা ব্যক্ত করেছেন। যে সমস্ত নির্বাচিত সদস্য তখনও চাঁদা দিয়ে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন নি, তাঁরা এলে পরিষদের কলেবর বৃদ্ধি হবে সংগে সংগে কার্যক্ষেত্রও আরও প্রসারিত হবে এই আশা তাঁর ছিল। 'ফ্রেঞ্চ-একাডেমী' দু চারজন সভ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করেই কত অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং পরিষদও একদিন সারস্বত সাধনার কীর্তিস্তম্ভ রূপে বিরাজ করবে সত্যেন্দ্রনাথের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ঐ বর্ষে গ্রন্থরচনা-সমিতির ও পুঁথি সংগ্রহের কাজে সত্যেন্দ্রনাথ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ১৩০৮-এ এই সমিতির কাজ সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণায় আরও অগ্রসর হয়। ১৩০৮-এ গ্রন্থরচনা সমিতির অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ভালো বই অনুবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে গ্রন্থরচনা সমিতির অনুবাদ শাখা গঠিত হয়। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' ও যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাজ-তরঙ্গিণী' বা 'সৈরউল মতাক্ষরীণ' অনুবাদ করবেন স্বীকার করেন। হাইকোর্টের অনুবাদক পূর্ণচন্দ্র দত্তকে 'সূর্যসিদ্ধান্ত' ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে কোন বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ করতে অনুরোধ করা হয়।

সরকারের সমালোচনায় পরিষদের নির্ভীক ভূমিকা

সরকারী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার জন্য চতুর্বিধ আঞ্চলিক বাংলায় (উত্তর, পূর্ব, মধ্য, পশ্চিম) পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করতে সরকারী কমিটির সুপারিশের উত্তরে পরিষদের পক্ষ থেকে অভিমত প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি শাখা কমিটি গঠিত হয়। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যো-

পাধ্যায় প্রমুখদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথও ঐ কমিটিতে ছিলেন। ইতোপূর্বে বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ করেও পরিষদ থেকে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত, হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্যের খসড়া প্রণয়নের ভার দেওয়া হয় ও জনসাধারণকে উদ্বোধিত করার জন্য জেনারেল অ্যাসেমব্লি হলে রবীন্দ্রনাথ 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। (১৩১১, ২৭শে ফাল্গুন)। ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন—"বোঝা যাইতেছে, কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে আমাদের দেশটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াটা একটা matter of great importance হইয়া উঠিয়াছে।...তথাপি ইংলণ্ডের সর্বত্র ইংরেজি ভাষার ঐক্য রক্ষা করা matter of greater importancc". 'ভারত সরকারের এই অকারণ চাষীপ্রীতি' দেখে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত না হয়ে পারেন নি।[৩] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারী কমিটির ঘোর সমালোচনা করে যে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল তাতে কৃষিজীবী অ অ-কৃষিজীবী উভয়েরই মংগল একসূত্রে গ্রথিত ছিল।[৪]

জনপ্রিয়তা ও আবৃত্তির প্রচলন

সত্যেন্দ্রনাথ সভাপতি থাকাকালীন ক্লাসিক থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট, জেনারেল অ্যাসেমব্লি ও আলবার্ট হলের কর্তৃপক্ষের সংগে পরিষদের সংযোগ নিবিড়তর হয়। ভারত-সংগীত সমাজের সংগে সাহিত্য পরিষদের হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপনের যোগসূত্র তিনিই রচনা করেন। ১৩০৭-এ পরিষদের বার্ষিক উৎসবে ভারত-সংগীত সমাজের সদস্যদের সংগীত নাট্যাভিনয় ও মধুর আপ্যায়নের কথা তৎকালীন পরিষদ সম্পাদক কৃতজ্ঞতার সংগে ব্যক্ত করেছেন। ধারণা করা যায় ভারত-সংগীত সমাজের প্রাণকেন্দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মাধ্যমে এই যোগাযোগ আরও গভীরতর হয়েছিল। ১৩০৭-এর বার্ষিক উৎসবকে সর্বাংগসুন্দর করতে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর সাহায্যে জামাতা প্রমথ চৌধুরী ও অনুজেরা এগিয়ে এসেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কর্মদক্ষতার যথার্থ চিত্র তৎকালীন সম্পাদকের বক্তব্যে প্রতিভাত।—"সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই পরিণত বয়সে পরিষদের সকল অনুষ্ঠানে যে উৎসাহ দেখাইয়াছেন তাহা একান্তই দুর্লভ।"[৫]

পরিভাষা সমিতির প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে—"বাংলা ভাষা এখনও গতিশীল, ইহার গতিরোধ করা কর্তব্য নহে। কিন্তু পরিভাষা একান্ত আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক প্রভৃতি বিষয়ের পরিভাষা নির্দ্ধারিত হইলে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইবে"। ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"ভাষায় হস্তক্ষেপ করা এখন অকর্তব্য, কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহা হইতে শ্রী ও লালিত্যরক্ষার নিয়ম আবিষ্কার করা আবশ্যক।"[৬] পরিষদের অধিবেশনে আবৃত্তি করার নূতন প্রথা সত্যেন্দ্রনাথের একটি বিশেষ অবদান। 'সত্যেন্দ্রনাথের শিল্পী-সত্তা' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। শুধুমাত্র পরিষদ-কর্মীদের মধ্যেই আবৃত্তিচর্চাকে সীমাবদ্ধ রেখে তাঁর তৃপ্তি ছিলনা। আবৃত্তিতে অর্থ পরিস্ফুট হয় সেজন্য তিনি বলেন—"বিদ্যালয়ে ভাল রূপ পড়া ও আবৃত্তি শেখানো ভাল। এ বিষয়ে যদি কাহারও উৎসাহ থাকে, তবে একটা পারিতোষিক দিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে ভাল হয়।"[৭]

গুণী-জন সম্বর্ধনা

বহিরাগত সুধীবৃন্দের সম্বর্ধনার দিকেও সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ নজর ছিল। ১৩০৭-এ বড়দিনের অবকাশে কংগ্রেস, কায়স্থ সভা ও থিইস্টিক কনফারেন্স উপলক্ষে কলকাতায় বহু সুধীজনের সমাগম হয়েছিল। পরিষদের পক্ষ থেকে আলবার্ট হলে এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানে এঁদের অপ্যায়িত করা হয়।

ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে ১৩০৮-এর ২৩শে ভাদ্র গোদাবরী জেলার ইল্লোড় নিবাসী শতাবধানী পণ্ডিত ব্রহ্মশ্রী বেসুরী শ্রীরামশাস্ত্রীকেও পরিষদ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

শতাবধানী পণ্ডিতের যুগপৎ বহু বিষয়ে অবধান কৌশল দর্শনের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ পরিষদ সদস্যদের প্রশ্ন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। একই সঙ্গে সদস্যদের প্রশ্ন শুনে নিয়ে পণ্ডিত শ্রীরামশাস্ত্রী স্রগ্ধরা ছন্দে কলকাতা নগরীর বর্ণনা, মালিনী ছন্দে পার্বতী বর্ণনা, পঞ্চচামর ছন্দে শৈশব বর্ণনা, তোটক ছন্দে সাগর-সঙ্গম বর্ণনা, ইংরেজি বিপর্যস্ত শব্দের বাক্য গঠন, সমস্যাপূরণ ইত্যাদির নির্ভুল উত্তর দিয়ে ও পেটা ঘড়িতে কতবার ঘণ্টা বাজানো হয়েছে তারও উল্লেখ করে সকলকে বিমোহিত করেছিলেন। তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রতিভার

সকলে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে পুনরায় আর একদিন পরিষদের সাধারণ সভায় তাঁকে আহ্বান জানানো হয়। শ্রীরামশাস্ত্রীর বিশুদ্ধ উচ্চারণে সত্যেন্দ্রনাথ এতই মোহিত হয়েছিলেন যে, সম্ভব হলে কিছুদিনের জন্যও তাঁকে সংস্কৃত কলেজ সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষা ও স্বরভেদ শিক্ষার কয়েকটি ক্লাস নিতে তিনি একান্ত মিনতি করেছিলেন। এর জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে সবরকম সাহায্য করতে সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তুত ছিলেন। তৎকালীন পণ্ডিতেরা যে ভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ করতেন তা সত্যেন্দ্রনাথের কানে ঠেকতো বলেই তিনি বলেছেন—"আমরা সংস্কৃত ভাষার হন্তারক হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের সংস্কৃতকে 'বাবু স্যাংস্কৃট' বলিলে চলে। প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ যখন স্বতন্ত্র, তখন সেই স্বতন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"[৮]

শোকসভা

পরিষদেয শোকসভাগুলি নিছক একদিনের শোকজ্ঞাপক অনুষ্ঠানেই পর্যবসিত না হয়ে প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতি সমন্বিত পদক, পারিতোষিক, গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ, ছাত্রদের উপযোগী বিশেষ বৃত্তিপ্রদান ইত্যাদি কার্যের মধ্যে যেন স্থায়ী রূপ পায় সেদিকে সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল। রজনীকান্ত গুপ্তর শোকসভায় (১৭ই আষাঢ়, ১৩০৭) সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণ থেকে তা স্পষ্ট ভাবে জানা যায়। রজনীকান্ত গুপ্তের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে সত্যেন্দ্রনাথকে কুড়ি টাকা চাঁদাও দিতে দেখা যায়।

মনীষী ম্যাক্সমুলারের শোকসভায় সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত না থাকলেও বঙ্গীয় পরিষদের প্রতি ম্যাক্সমুলারের প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ পরিষদ থেকে ম্যাক্সমুলার-রচনাবলী সংগ্রহ, ম্যাক্সমুলারের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি তাঁর যে ফোটোগ্রাফ (এক বছর বয়স থেকে ষোলো বছরের) পরিষদকে উপহার দিয়েছিলেন তার অন্বেষণ ও পুনঃস্থাপন ও তাঁর একটি বিশেষ তৈলচিত্র স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শোকসভায় সত্যেন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানেও ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের উৎকর্ষলাভ ও তার তরঙ্গাঘাতে ভারতবাসীর জাগরণ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। পরিষদ থেকে মহারাণীর শোকপ্রস্তাবের প্রতিলিপি পাওয়ার পর ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত সচিব

সত্যেন্দ্রনাথকে যে পত্র দিয়েছেন তা থেকে সত্যেন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু পরিচালনার আভাস পাওয়া যায়।[৯]

বিবিধ প্রবন্ধের আলোচনায় সত্যেন্দ্রনাথের মননশীলতা

সত্যেন্দ্রনাথ সভাপতি থাকার সময়ে পরিষদে যে সকল প্রবন্ধ[১০] আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক নিবন্ধ, বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও ঐতিহাসিক রচনাবলী উল্লেখ্য। এর মধ্যে বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধেই তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অসীম ধৈর্যে সত্যেন্দ্রনাথ সভার কাজ পরিচালনা করে বাগবিতণ্ডার ঊর্ধ্বে সদস্যদের চিন্তাধারাকে আকৃষ্ট করেছেন। মূলত ভাষার গতিশীলতার পক্ষে চলিত ও তৎসম উভয়বিধ শব্দেরই যে প্রয়োগ অনিবার্য আর এ বিষয়ে কোন বাঁধা নিয়মের বশবর্তী হতে গেলে বাংলা ভাষায় আড়ষ্টতা আসবে সেদিকেই তিনি সদস্যদের অবহিত করেছেন।

ব্যাকরণ ঘটিত আলোচনা

বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় যে সকল প্রবন্ধ পরিষদে পঠিত ও আলোচিত হয়েছে সে সম্পর্কে পরিষদের তৎকালীন সদস্যদের মধ্যে স্পষ্ট দুইটি ধারার আভাস পাওয়া যায়। একদল সংস্কৃত নিয়মের ঘোর পক্ষপাতী ছিলেন—অন্যদল বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য সংস্কৃতের নিগড়ে বাংলা ভাষাকে আবদ্ধ করার বিরোধী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আলোচনা উত্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ শোনার পর উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের পর সভায় দ্বিমত দেখা দেয়। উভয় পক্ষেই যে বলার অনেক কিছুই আছে সেকথা বলে সভাপতি হিসাবে সমন্বয় সাধন করলেও সত্যেন্দ্রনাথের মনের ঝোঁক যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পক্ষেই—তা জানাতে তিনি দ্বিধা করেন নি।—"শাস্ত্রী মহাশয় এ সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্যের আদর্শ।...আজকার প্রবন্ধের আলোচনায় দেখা গেল মত দ্বিবিধ হইয়াছে। সংস্কৃতানুসারে ব্যাকরণ আর বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতিগত ব্যাকরণ উভয়ের সামঞ্জস্য আবশ্যক। যে কোন ভাষার গতি পর্যালোচনা করিলেই দেখা যায়, ভাষা ব্যাকরণের অনুসারে গঠিত হয়না, গঠিত ভাষার নিয়মাদি নির্ধারণ ব্যাকরণের কার্য্য। বলিবার

কথা উভয় পক্ষেই বিস্তর আছে। মীমাংসাও অল্পে হইবে না।···আমার নিজের মনের ঝোঁক শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের সঙ্গেই মিলে। লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার প্রভেদ যত কম থাকে ততই ভাল। যা বলি তা বেশ বুঝি, কিন্তু তাহা লিখিয়া বুঝাইতে গেলে অভিধান ব্যাকরণের সাহায্য ভিন্ন হইবে না, ইহা একটু বিসদৃশ বোধ হয়। তবে ভাষার সৌন্দর্য সাধনের জন্য কিছু পার্থক্য কথিত ভাষার সঙ্গে থাকাও আবশ্যক। সে কতটা প্রয়োজন তাহা সুলেখক ও সুকবি সহজেই বুঝেন।·· যাঁহারা বাংলা ব্যাকরণ আলোচনা করিতে চাহেন, তাহাদের বাঙ্গালা ভাষার প্রধান উপাদান সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাল করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভাষার গতিও লক্ষ্য করা উচিত। বাঙ্গলা ভাষা এখন কোথায় গিয়া দাঁড়াইযাছে তাহা যিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তিনিই বাঙ্গালা ব্যাকরণের ঠিক পথ প্রদর্শক হইবেন। (সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৯ ; কা বি. ১৩০৮)

১৩০৮-এ ১২ই আশ্বিন রবীন্দ্রনাথের 'কৃৎ ও তদ্ধিত' বিষয়ক প্রবন্ধের শেষেও সত্যেন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে বলেছেন—"বাঙ্গালা ভাষার আর একরকম ব্যাকরণ যে হইতে পারে আজকের আলোচনায় তা বেশ বুঝা গিয়াছে। শাস্ত্রী-মহাশয়ই এই ভিন্ন পথটি দেখাইয়াছেন। অভিধান হওয়া অতীব আবশ্যক, নতুবা এ কার্য্য অগ্রসর হইবে না। অভিধান হলে বুঝা যাইবে, ব্যাকরণ কি ভাবের হইবে ; সংস্কৃত শব্দের অনুপাত অধিক হইলে ব্যাকরণে—সংস্কৃত সূত্রাধিক্য হইবে আর অনুপাতের এদিক ওদিক হইলে ব্যাকরণ অন্যরূপ হইবে।" কিছুদিন পরেই পরিষদে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ' প্রবন্ধ পাঠের পর (১৩০৮, ২৪শে অগ্রহায়ণ) পরিষদে ঘোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলেন—"রবীন্দ্রবাবু ভারতীতে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করতে গিয়া প্রতিবাদ করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য তিরস্কার বিদ্রূপ করা···ইহার উত্তর যে হয় না তাহা নহে, তবে আমি এখন কিছু বলিব না আমি আমার বক্তব্য লিখিয়াই বলিব"···[১১]

সভাদের মধ্যে বলাইচাঁদ গোস্বামী প্রমুখেরা সংস্কৃতের বন্ধন মোচন করলে বাংলা ভাষার কুফলই হবে এই মত পোষণ করতেন। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখেরা শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর মতানুসারী ছিলেন। অন্যদলের পক্ষে প্রমথনাথ চৌধুরী বলেন—"আমার মত

বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকৃতি তাহাতে সংস্কৃত শব্দ যত বেশী প্রবেশ করিবে ততই দোষের হইবে···শাস্ত্রীমহাশয় যে দুই প্রকার patent বাঙ্গলা ব্যাকরণের কথা বলিয়া গিয়াছেন সে সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছে ইহা বড় দুঃখের বিষয়, ভাষার আকার বা form কি ব্যাকরণ তাহা দেখাইয়া দেয়, ব্যাকরণ form গড়িয়া দিতে পারে না" । (কার্যবিবরণী ১৩০৮) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের মতের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। বাংলা ব্যাকরণ প্রকৃতপক্ষে যে বাংলা নিয়মেই চলবে—সংস্কৃত নিয়মে চলতে পারে না একথাটা পণ্ডিত মহাশয়েরা মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে স্বীকার করবেন বলেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন। রবীন্দ্রনাথ কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত যে খাঁটি বাংলা শব্দের তালিকা ইতিপূর্বে পরিষদে প্রদান করেছেন, তার দ্বারা ভবিষ্যতে বৈয়াকরণের কাজের উপকরণ সংগ্রহ করে রেখেছেন। যাঁরা 'ঐ সকল শব্দকে slang বলে ঘৃণা করেন', আর ভাষার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঐ সকল শব্দের আমদানী করছেন বলে তাঁর উপর 'খড়্গহস্ত' হয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বলেন প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল শব্দ 'পিতৃ-পিতামহের কাছ থেকেই পাওয়া', রবীন্দ্রনাথ কুড়িয়ে এনেছেন মাত্র। সবশেষে রবীন্দ্রনাথ এও বলেন—যে সংগ্রহের দোষে দু একটা বিজাতীয় শব্দ যদি আসেও ব্যবহারের সময় তা বিচার' করার ভার লেখকদের হাতেই রয়েছে।

পরিষদের এই বাগবিতণ্ডার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ যে শান্ত ভাষায় সভার কাজ পরিচালনা করেছেন তা থেকে তাঁর ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন—"রোগনির্ণয়ে যদি ডাক্তারে ডাক্তারে বিবাদ হয় তবে আর কি করিতে পারি ? এ সকল বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক—এরূপ স্থলে শ্লেষ বিদ্রূপ করা বা অপমান বোধ করা উচিত নহে। এ সকল বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ হইলে ঝাল মিটাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত।"[১২]

সত্যেন্দ্রনাথের মতে ভাষার প্রাণ কি তা বুঝে ব্যাকরণ গড়তে নিয়ম আবশ্যক হয় না। ভাষা আপনা থেকেই গড়ে ওঠে। পরিষদ্ থেকে যদি কোন নিয়ম প্রচারিত হয়ও তবু কেউ তা গ্রহণ করবে না। কারণ বাংলা ভাষার একটা রীতি তখন দাঁড়িয়ে গেছে। সে রীতি কেউ বদল করতে পারেন না। ব্যাকরণের উদ্দেশ্যও তা নয়। এটি ভাষার রীতি-নীতি দেখিয়ে দেবার ও বোঝাবার জন্য 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকা' মাত্র। সুতরাং ভাষায় যা আছে ব্যাকরণে তা রাখতেই হবে। বাংলা ভাষা যখন কেবল সংস্কৃত কথা নিয়েই রচিত নয়

তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করলেই চলবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন—"শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ যে শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের ব্যবহার ও গঠন সম্পর্কে নিয়মাদি বাংলা ব্যাকরণে থাকা আবশ্যক। যাঁহারা এগুলি slang বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার একাংশ বাদ দিতে চাহেন।"[১৩]

লিখিত ও কথিত ভাষায় চিরকালই কিছুটা পার্থক্য থাকবে—বিশেষত 'Dialectial গোলমাল' মেটাবার জন্য সাহিত্য সাহিত্যের ভাষা স্বতন্ত্র থাকার পক্ষেই সত্যেন্দ্রনাথ অভিমত দিয়েছেন। তবে সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য কি চলিত শব্দের বাহুল্য হলে ভাল হয় তা তখন পর্যন্ত ঠিক হয় নি; সুতরাং বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম প্রদর্শনের জন্য যদি কেউ কোন নূতন পথ দেখান তবে সে পথে কতটুকু অগ্রসর হওয়া যায় তা ধীরভাবে বিচার করে দেখা আবশ্যক, অযথা উত্তেজনা সৃষ্টি না করে এই মহৎ কার্যটির সুশৃংখল পরিচালনার জন্য তিনি সদস্যদের কাছে আবেদন রেখেছেন।

পরবর্তী মাসিক অধিবেশনেও (১৩০৮, ২৮শে পৌষ) পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর 'ব্যাকরণ ও বাংলা ভাষা' নামক প্রবন্ধের উত্তরে পরিষদে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সেদিন রবীন্দ্রনাথ সভায় উপস্থিত না থাকায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—আজ রবীন্দ্রবাবু উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত। কোন একটা বিষয়ে প্রথমে বাদীর বক্তব্য, পরে প্রতিবাদীর বক্তব্য, পরে বাদীর উত্তর, আলোচনা এইরূপে হইলেই ভাল হয়।" যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী বিতর্কের অবসানের জন্য বলেন—"তর্কটা ক্রমশই বিতণ্ডার দিকে যাইতেছে। আমার মনে হয় হীরেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রবাবু বিতণ্ডার একদলে এবং আমরা বাহিরে, এ বিতণ্ডার মীমাংসা হইলেই ভাল।"

সভাপতির ব্যক্তিত্বপূর্ণ দৃঢ় কণ্ঠে সত্যেন্দ্রনাথ একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত পথের গৌরবোজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা প্রচার করেছেন তেমনি শান্ত মধুর কণ্ঠে তুচ্ছ মনোমালিন্যের ঊর্ধ্বে বিরোধীদের চিন্তাধারাকে চালিত করেছেন। তাঁর উক্তিতে—"অতি অল্প কারণে কত বৃহৎ ব্যাপার কত বাগবিতণ্ডা হইয়া থাকে। পরিষদের ব্যাকরণ প্রবন্ধ তাহাই হইতেছে। শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বাংলা প্রত্যয়ের উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ভুল নাই এ কথা তিনিও বলেন না...সংস্কৃত অভিধান ও ব্যাকরণের

অন্তর্গত শব্দসমষ্টি ছাড়া ভাষার আর একটি দিক যে আছে তাহা দেখাইয়া দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য।...ভাষা এখন যে স্রোতে চলিয়াছে তাহা বদলাইতে পারা যাইবে না। বাংলা প্রত্যযান্ত শব্দ আজকাল লেখায় বেশী ব্যবহার হইতেছে।"[১৪]

সহজ কথায় ভাষা যাতে সাধারণের বোধগম্য হয়, মনের ভাব যথার্থ প্রকাশিত হয় অথচ অঙ্গসৌষ্ঠবের দ্বারা ভাষা প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে সেদিকেই সত্যেন্দ্রনাথের মনের ঝোঁক ছিল। সংস্কৃত ছাঁচে যদি ব্যাকরণ হয়ও সেখানে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার শব্দের প্রয়োগ ও ধাতু প্রত্যয় সম্বন্ধে কিছুটা ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক বলেই তিনি মনে করেছেন। মতবিরোধ থাকলেও পরিষদের আলোচনা ব্যক্তিগত না হয়ে যাতে সুপথে চালিত হয় সেদিকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বাংলা ভাষা বিষয়ক আরও তিনটি প্রবন্ধের পর সত্যেন্দ্রনাথের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার নিদর্শন রয়েছে। কালিদাস নাথ রচিত 'বাঙ্গালার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য' প্রবন্ধ পাঠের পর সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয় ভাষাবর্গের তিনটি ধারা, শকুন্তলার সহিত মৃচ্ছকটিক নাটকের প্রাকৃত ভাষার পার্থক্য, হিন্দুস্থানীর সঙ্গে পারসীকের মিশ্রণে উর্দু ভাষার সৃষ্টি, মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা অসমীয়া ইত্যাদি ভাষার সৃষ্টি সম্পর্কে তথ্যবহুল, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। এ ধরণের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য প্রবন্ধলেখককে তিনি ধন্যবাদ দেন। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে অভিধান ও ব্যাকরণের কাজও অগ্রসর হবে বলে তিনি মনে করেছেন। সেজন্য, ঐ প্রবন্ধ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

যদুনাথ মজুমদারের লেখা 'বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ' প্রবন্ধটি[১৫] পরিষদে ব্যোমকেশ মুস্তফী পাঠ করলে পর সত্যেন্দ্রনাথ প্রবন্ধকারের সব কথা মেনে না নিলেও সংস্কৃত দেবনাগর অক্ষরে লিখে বিশুদ্ধভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ করার পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন 'বাবু স্যাংস্কৃট' সংশোধিত হবার এটি একটি উপায়। এছাড়াও কতকগুলি শব্দের উচ্চারণগত নিয়ম নির্ধারণে তিনি সদস্যদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। 'ছেলে, খেলা, যেমন কেন, ইত্যাদি শব্দে এ'কারের বিভিন্ন উচ্চারণ কেন হয় সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে বলেছেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের 'বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি' প্রবন্ধ পাঠের পর সত্যেন্দ্রনাথ প্রবন্ধকারের সুললিত সাধুভাষার প্রশস্তি করেন। মাতৃভাষার সেবায় যে সকলের প্রাণপণ করা উচিত সেজন্য প্রবন্ধকারের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথও একমত পোষণ করেছেন। অনেক বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও বাংলা ভাষার উন্নতি বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ আশা পোষণ করেই বলেছেন—"আমাদের লেখকদের পক্ষে বিস্তর বাধা বিঘ্ন। দেশের লোকের সহানুভূতির অভাবে তাঁহাদের সে উদ্যমের স্ফূর্ত্তি নাই। তথাপি আশা আছে। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এই উন্নতির প্রধান কারণ সহবাস। পাশ্চাত্য সম্মিলনে বঙ্গভাষা বাল্যের পর যৌবনে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।"

ঐতিহাসিক জ্ঞানৈষণা

বিবিধ প্রবন্ধ পাঠের পর আলোচনা থেকে বাংলাভাষার গঠনচিন্তায় যেমন সত্যেন্দ্রনাথের যুক্তিনিষ্ঠ মন্তব্যের প্রভূত নিদর্শন পাওয়া গেল তেমনি ইতিহাসচিন্তার বিশ্লেষণেও তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ১৩১০-এর ২৬শে অগ্রহায়ণ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'প্রাচীন মিশরে আর্য্য সভ্যতার প্রভাব' প্রবন্ধ পাঠের পর আলোচনায় শুধুমাত্র সামাজিক ধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখেই আর্য-সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতাকে প্রভাবান্বিত করেছে একথা সত্যেন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করে, মিশরীয় সভ্যতার যে সময়ের কথা ঐ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে, সে সময়ে আর্য সভ্যতার অস্তিত্বের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ও উভয়ের যোগাযোগের সূত্র প্রমাণ-সাপেক্ষ বলে সত্যেন্দ্রনাথ অভিমত দিয়েছেন। তা না হলে কে কার কাছ থেকে নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা কঠিন। এই বিশেষণে সত্যেন্দ্রনাথের সুগভীর ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় সুস্পষ্ট।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবাবী আমলের বিধিব্যবস্থা' প্রবন্ধের[১৬] শেষে সত্যেন্দ্রনাথ—মুসলমান রাজত্ব যে কেবল বিলাসিতা ও অত্যাচারের ছিল না, রাজ্যে সুব্যবস্থাও ছিল—এই চিত্র পরিবেশনের জন্য প্রবন্ধকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন করেন। তবে ইওরোপীয় প্রথা যতটা মার্জিত নিয়মে গঠিত মুসলমান রাজত্বে তার যে অভাব ছিল এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন। মুসলমান শাসনকর্তারা বলপ্রয়োগে কোরাণের ধর্ম প্রচার

করতেন। পর্তুগীজারাও খ্রীস্টান ধর্ম-প্রচারে এই পথই অবলম্বন করেছিল। কিন্তু ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার ফলেই ইংরাজ রাজত্ব যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন।

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দাক্ষিণাত্যের পূজা ও ব্রত' প্রবন্ধটি[১৭] দেখে সত্যেন্দ্রনাথ এতই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে নিজেই তা পরিষদে পাঠ করেন ও এ প্রসঙ্গে তাঁর বোম্বাইজীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও কিছু ব্যক্ত করেন।

যোগেশচন্দ্র রায়ের 'খনা' প্রবন্ধ[১৮] শেষ হবার পর সত্যেন্দ্রনাথ বলেন—'ছেলেবেলা হইতে খনার কথা শুনিতেছি। কেরল দেশের রাক্ষসীপালিতা খনা কেরলী ভাষায় রচনা করেন নাই ইহাও আশ্চর্য।।' এ বিষয়ে গবেষণার সাহায্যে যদি কেউ আলোকপাত করেন তিনি পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র হবেন বলেই সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ভারতে নাট্যের উৎপত্তি'[১৯] প্রবন্ধ পঠিত হলে পর সত্যেন্দ্রনাথ সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন—"শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বেশ মৌলিক ও গবেষণাপূর্ণ হইয়াছে।" নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'গোবিন্দদাস'[২০] প্রবন্ধপাঠের শেষে সত্যেন্দ্রনাথের আলোচনায় ঐতিহাসিকসুলভ সন্ধানী দৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। তাঁর মতে—কোন পদটি কোন গোবিন্দদাসের তা এখনও নিঃসন্দেহে বলার সময় হয় নি। এ বিষয়ে আরও সংগ্রহ প্রয়োজন। ভাষাগত প্রমাণ ছাড়াও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেলে সিদ্ধান্তের পক্ষে আরও সুবিধা হবে একথার উপচ তিনি বিশেষ জোর দেন।

সদস্যদের প্রবন্ধ বিশ্লেষণে যেমন তাঁর উপযুক্ত সমালোচনার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি নিজের সৃষ্টির দ্বারাও পরিষদের আলোচনা সভায় নব সংযোজন করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক রচনাবলী, প্রসঙ্গত কালীবর বেদান্তবাগীশের 'শঙ্কর ও শাক্যমুনি' প্রবন্ধ ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ' প্রবন্ধের কথা বিস্তৃত ভাবে সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধ-ধর্ম' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক চিন্তা কুমারসম্ভবের অনুবাদ

পরিষদের বিদ্বজ্জন-সান্নিধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক চিন্তা, সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ ও গীতার বিশ্লেষণের আগ্রহ জেগেছে। কাজেই পরিষদ্

যেমন সত্যেন্দ্রনাথের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি পরিষদের সুধীমণ্ডলীর উপযুক্ত পরিবেশও সত্যেন্দ্রনাথের বহু রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে। ১৩১২ সালে সভাপতির গুরু দায়িত্ব গ্রহণ না করলেও সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক ও কুমারসম্ভবের তিনি যে অনুবাদ করেছিলেন সেগুলি পরিষদের অধিবেশনে (১৩১২, ৩রা অগ্রহায়ণ) যথারীতি পাঠ করেছেন। তাঁর অনুবাদ শুনে রসিকমোহন চক্রবর্তী উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেন—"আমরা কুমারসম্ভবের কয়েকটি উৎকৃষ্ট স্থানের উৎকৃষ্ট অনুবাদ[২১] শুনিলাম। আশা করি সমগ্র কুমারসম্ভব তিনি অনুবাদ করিয়া আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন'[২২] সত্যেন্দ্রনাথের অবসর জীবনের তিনটি গ্রন্থই (বৌদ্ধধর্ম, নবরত্নমালা, গীতার পদ্যানুবাদ) প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে কিছু কিছু অংশ পরিষদে আলোচিত হয়েছে।

সবশেষে বাহিরাগত ছাত্রদের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ যে উৎসাহোদ্দীপক ভাষণ দিয়েছেন তার উল্লেখ না করলে সত্যেন্দ্রনাথের অবদানের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। মফস্বল থেকে যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী হয়ে কলকাতায় এসেছিল তাদের ও কলকাতার কলেজের ছাত্রদের সংবর্ধনার জন্য ও তাদের সংগে সাহিত্য পরিষদের সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্য ক্লাসিক থিয়েটারে (১৭ই চৈত্র, ১৩১১) সাহিত্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঐ সভায় 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'এ বংগদেশের ও বাংগালী জাতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অনুসন্ধান কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ছাত্রবর্গকে আহ্বান করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৩১২ সালেও অনুরূপ সম্বর্ধনার আয়োজন মিনার্ভা থিয়েটারে হয়েছিল (২০শে চৈত্র)। সেদিনের সভায় অনিবার্য কারণে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতে পারেন নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঐ বছর পরিষদের মনোনীত সদস্য হলেও ছাত্রদের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে তাঁদের প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলেন। ঐ বছরের পর থেকে পরিষদে সক্রিয় অংশ নিতে সত্যেন্দ্রনাথকে বড় একটা দেখা যায় না। পরিষদের সভাপতি রূপে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ক্লাসিক থিয়েটারে তাঁর ভাষণ দিয়েই এ আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। বক্তব্যটি যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি আশাপ্রদ। টেনিসনের 'Old order changeth yielding place to new' কথাটির প্রতিধ্বনি সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্যে পরিস্ফুট—"আমাদের জীবনে এখন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, তোমাদের জীবনের এখন প্রভাত, সন্ধ্যার সহিত প্রভাতের

এক স্থানে সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছে। আমরা যে কার্যের সূত্রপাত করিয়া যাইতেছি, তোমরা নূতন বলে সেই সূত্র ধরিয়া জীবনের কার্যে প্রবৃত্ত হও।"

১. ১৩০১-এর ৮ম অধিবেশনে (৭ই মাঘ) সত্যেন্দ্রনাথ—সি, এস সেতারা, সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন। (১৩০১, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রাপ্ত) সত্যেন্দ্রনাথের ঠিকানা : ১৩০১-১৩০৩ এ সি, এস, সেতারা ; ১৩০৪-এ ৬২নং বালিগঞ্জ সারকুলার রোড়, ১৩০৬এ ৯নং স্টোর রোড, ১৩০৭-১৯নং স্টোর রোড। শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত—১৩০৭ সালের ৯ই শ্রাবণ পরিষদ্ সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথকে পরিষদ্-সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রেরিত ছাপানো আমন্ত্রণ লিপিতে-৯ নং স্টোর রোড ঠিকানা লিখিত। খুব সম্ভবত ১৩০৭ সালের শেষের দিকে ঠিকানা পরিবর্তিত হয়।

২. '১৮৯৩ অব্দের জুলাই মাসের ২৩শে তারিখে কলিকাতা শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের ২।২ নম্বর ভবনে বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। মিঃ এল. লিওটার্ড, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী প্রমুখের উদ্যোগে) সেই সভার•• কার্যকলাপে•• ইংরাজি বহুলতা দেখিয়া কতিপয় সভ্য আপত্তি করেন।•••শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পূর্বোক্ত সভাগণ পূর্বোক্ত স্থানে ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ•••একাডেমি অব লিটারেচার•••পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নামে অভিহিত করেন'। পরিষৎ-পরিচয় (১৩০০-১৩৫৬)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পরিষৎ-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। '২য় বর্ষের ২য় অধিবেশনে সাহিত্য পরিষদ্ এই হুসস্ত নাম গৃহীত হয়' ১৩০৩ ; কার্যবিবরণী।

'প্রথম দুই বৎসর ২।২ রাজা নবকৃষ্ণের স্ট্রীটে, রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাসভবনে পরিষদের অধিবেশনাদি হইত তৎপর ১০।১।১ গ্রে স্ট্রীট রাজা

বাহাদুরের নূতন বাড়ীতেই স্থানান্তরিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : মন্দির প্রতিষ্ঠা : ১৩১৬, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা থেকে শ্রীমদনমোহন কুমার রচিত—'বংগীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস—১ম পর্ব' (১৩০০-১৩০১) গ্রন্থের মুখবন্ধে উদ্ধৃত।

4th Meeting of the Academy—Sept. 1, 1893—President Maharaj Kumar Binoy Krishna Bahadur (found in the printed report of The Bengal Academy of Literature')

৩. রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১২৯

৪. From Satyendranath Tagore, President Bangiya Sahitya Parishad. To the Hon'ble Mr. H. W. C. Carnduff. C. I. E. Offg. Secretary to the Govt. of Bengal (14th April. 1905).

…As the government committee insist on a uniform scheme of schools…what provision the government proposes to make for the primary education of non-agriculturists…pupils brought up in the proposed new system of text-books…will be unable to accomodate themselves to the upper primary of Middle English school …primary education need not and should not be different in the case of agriculturists form that in the case of non-agriculturists…the proposed scheme while effecting only a slight saving of time and labour to agriculturist boys…is likely to retard the future progress of the agriculturists as a class by making the little education that they will receive unduly narrow and restricted… the raising of the different provincial dialects of Bengal to the dignity of written languagaes…divorced from the great stream of literary Bengal, can not fail to produce

sterility and retard the healthy growth of Bengali language. [Appx. A. ১১ দশ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী] সা. প.]

৫. ১৩০৭-এর কার্যবিবরণী।

৬. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৯

৭. ঐ।

৮. ১৩০৭-এর বার্ষিক অধিবেশনের ভাষণ।

৯. (To Babu Satyendranath Tagore. 30th January 1991)
Private Secretary's Office.
Government House, Calcutta
Sir,

I have to acknowledge the receipt of your letter of the 28th instant and its enclosure, and am directed and am desired by His Excellency the Viceroy to thank you sincerely for the expressions of sympathy and condolence which you have been good en ough to send him on behalf of the Bangiya Sahitya Parishad upon the occasion of the lamented death of Her late Majesty the Queen Empress and to assure you that it will be transmitted to the proper quarter.

Yours faithfully
(Sd) W. Lawrence
Private Secretary to the Viceroy.

১০. বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক :—

১৩০৭, ১০ই শ্রাবণ (ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে) শংকর ও শাক্যমুনিকালীবর বেদান্তবাগীশ

১৩০৭, ৪ঠা চৈত্র —বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ : সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

১৩০৭, ২৮ শ্রাবণ —তৈর্থিক সূত্র—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩০৭, ১০ই ভাদ্র —বৌদ্ধধর্ম-দর্শন-নীতি-পরকাল ও মুক্তি—সত্যেন্দ্রনাথ—(ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে বিশেষ অধিঃ)

১৩০৮, ২৫শে শ্রাবণ —বৌদ্ধধর্ম—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ইউনিভার সিটি, ইনস্টিটিউট হলে বিশেষ অধিবেশন)

বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক :

১৩০৮, ১১ই শ্রাবণ —ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৩০৮, ১২ই আশ্বিণ —বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত বিষয়ক প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ

১৩০৮, ১৫ই অগ্রহায়ণ—বাংগালার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য—কালিদাস নাথ

১৩০৮, ২৪শে অগ্রহায়ণ—বাংগালা ভাষা ও ব্যাকরণ—রবীন্দ্রনাথ

১৩০৮, ২৮শে পৌষ —ব্যাকরণ ও বাংগালা ভাষা নামক প্রবন্ধ—শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

১৩০৯, ১৪ই বৈশাখ —বাংলা ভাষার উচ্চারণ—যদুনাথ মজুমদার লিখিত ও ব্যোমকেশ মস্তফী পঠিত।

১৩১০, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ্য —বংগভাষার ক্রমোন্নতি—শ্রীযুক্ত রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর—

ইতিহাস বিষয়ক :

১৩০৮, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ —নবাবী আমলের বিধিব্যবস্থা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩১০, ৩১শে শ্রাবণ —খনা—যোগেশচন্দ্র রায়

১৩১০, ২৬শে অগ্র —প্রাচীন মিশরে আর্য্য সভ্যতার দান—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবিধ :

১৩০৭, ৪ঠা চৈত্র —দাক্ষিণাত্যের পূজা ও ব্রত—দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩১০, ১০ই জ্যৈষ্ঠ —ভারতে নাট্যের উৎপত্তি—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩১০, ২৫শে অগ্র. —বেদান্ত দর্শন—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

১৩১১, ২৪শে পৌষ —গোবিন্দদাস—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১১. সপ্তম মাসিক অধিবেশন, ১৩০৮, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯এর সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত কার্যবিবরণী।

১২. সপ্তম মাসিক অধিবেশন। ১৩০৮, ২৪শে অগ্রহায়ণ। প্রাগুক্ত।

১৩. সপ্তম মাসিক অধিবেশন, ১৩০৮, ২৪ অগ্রহায়ণ। প্রাগুক্ত

১৪. অষ্টম মাসিক অধিবেশন। ১৩০৮ ২৮শে পৌষ (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৯)

১৫. বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ : যদুনাথ মজুমদার লিখিত। ১৪ই বৈশাখ ১৩০৯। অষ্টমবর্ষের একাদশ অধিবেশন। ১৩০৯ এর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত।

১৬. ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮ (নবাবী আমলের বিধিব্যবস্থা)

১৭. ৪ঠা চৈত্র, ১৩০৭ (দাক্ষিণাত্যের পূজা ও ব্রত)

১৮. ১৩১০, ৩১শে শ্রাবণ খনা—যোগেশচন্দ্র রায় (চতুর্থ মাসিক অধিবেশন)।

১৯. ১৩১০, ১০ই জ্যৈষ্ঠ—ভারতে নাট্যের উৎপত্তি—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রথম মাসিক অধিবেশন)

২০. ১৩১১, ২৪শে পৌষ—গোবিন্দদাস—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (অষ্টম মাসিক অধিবেশনে কার্যবিবরণীতে প্রাপ্ত)

২১. দ্রষ্টব্য : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবরত্নমালা (কুমারসম্ভবের আংশিক অনুবাদ)

২২. ১৩১২ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী।

পারিবারিক খাতা

সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে বন্ধু ও পরিজন সকলের রচনাসৃষ্টির নিদর্শনস্বরূপ 'পারিবারিক খাতা'র পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব আজও রয়েছে।[১] 'পারিবারিক খাতা' মূলত খেয়ালখুশীতে লেখার খাতা হলেও স্থানে স্থানে রচয়িতাদের সিসৃক্ষু মানের ছাপ সুস্পষ্ট। সৃষ্টিশীল রচনার প্রেরণা ও পদ্ধতি হিসাবে 'পারিবারিক খাতা'র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এই সৃজনশীল পদ্ধতির উদ্ভাবক সত্যেন্দ্রনাথ, আর রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের সাহচর্যে এর পরিপুষ্টি। এই খাতায় লেখা বন্ধু ও পরিজনদের মন্তব্যসহ সত্যেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনাবলীর পরিচয় প্রদান করা বক্ষ্যমান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

এর চলতি নাম 'পারিবারিক খাতা' হলেও এর প্রকৃত নাম যে 'পারিবারিক স্মৃতি লিপি পুস্তক'[২] তা পাণ্ডুলিপি থেকেই জানা যায়। আত্মীয়বন্ধুদের অনেক মজার কথা, জ্ঞানগর্ভ উক্তি, ও স্মৃতিচারণা 'পারিবারিক খাতা'য় ছড়িয়ে আছে। '১২৯৫ থেকে ১৩০২ সন পর্যন্ত নানারকম রচনা' যে এই খাতায় পাওয়া যায় তা 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-শতবার্ষিক সংকলনে'ও (পৃ. ৪৭) উল্লিখিত। ফুলস্ক্যাপ সাইজের সমান লম্বা খাতাটি খুললেই প্রথমে কতগুলো 'নিষেধ' চোখে পড়ে।[৩] নিষেধগুলো যে রবীন্দ্রনাথই লিখেছিলেন তা ইন্দিরা দেবীর বক্তব্যে জানা যায়। পরবর্তীকালে ছাপার নিষেধটি না মেনে যে ভালই হয়েছে সে সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেছেন।[৪] পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করলে দেখা যায়, ছাপা বিষয়ে পুরোপুরি নিষেধ ছিল না—খাতায় লেখা চলাকালীন নিষেধ ছিল। 'পারিবারিক খাতা' ভবানীপুর বাড়িতে যে কত সযত্নে রক্ষিত হতো ইন্দিরা দেবীর কথায় তার আভাস পাওয়া যায়। এই খাতায় যার যা মনে হতো ইচ্ছেমতো লিখতে পারতেন। সকলের নজরে পড়বে বলেই সম্ভবত সিঁড়ির উপরে উঁচু ডেস্কে খাতাটি রাখা হতো।[৫]

রথীন্দ্রনাথ এই খাতাটি বালিগঞ্জের বাড়িতেও দেখেছেন। সেখানে যে ঘরে আড্ডা জমতো সেখানেই খাতাটি রাখা হতো।[৬] এত যত্নে ও সাবধানে 'পারিবারিক খাতা' রক্ষিত হলেও দুটি খাতার মধ্যে মাত্র একটি পাওয়া। গেছে। আর একটির কোন সন্ধান এখনো মেলে নি। পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন

ও চিঠিপত্র সঞ্চয়ে ইন্দিরা দেবীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও পারিপাট্যের ফলেই এই খাতাটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। ইন্দিরা দেবী এই খাতাটি রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।[৭]

রথীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীর বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিভিন্ন স্থানে বাড়িবদল হলেও এই উপভোগ্য সৃষ্টিশীল ব্যবস্থাটি পরিবারে যথাযথ রক্ষিত হয়ে এসেছে। সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে এই খাতাটি ছিল বলেই পরিবারের অনেকের রচনা এক জায়গায় জমেছে ; কারণ এমন দিন বাদ যায় নি যেদিন তাঁর গৃহে আত্মীয়বন্ধুদের কেউ না এসেছেন। সুতরাং প্রায়ই এ খাতার মধ্যে কারো না কারো লেখার আঁচড় পড়েছে। এই লেখাগুলি থেকে পরবর্তীকালে আত্মীয়বন্ধুরা প্রচুর আনন্দের খোরাক পেয়েছেন। এই খাতায় রথীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই তাঁর সম্পর্কে হিতেন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী (১লা নভেম্বর ১৮৮৮) ও জন্মের পর শিশু রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে বলেন্দ্রনাথের মন্তব্য (মার্চ, ১৮৯০) পাঠ করে দীর্ঘদিন পরেও পরিণত বয়সে রথীন্দ্রনাথ প্রচুর আমোদ পেয়েছেন।[৮] ইন্দিরা দেবীর কথায় জানা যাচ্ছে এই খাতায় তাঁদের 'আত্মীয়-বন্ধু অনেক অনেক ছেলেমানুষি লেখা' যেমন লিখে গেছেন তেমনি অনেকগুলি লেখার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্যও আছে (রবীন্দ্রস্মৃতি)। এই খাতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' রচনার প্রেরণা জেগেছিল বলে, শ্রীমতী চিত্রশ্রী বিশীও তাঁর গবেষণা-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৯]

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৭. ৮, ১৫ ও ১৬ই অক্টোবর এই চারদিনে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা 'পারিবারিক খাতা' থেকে আহরণ করা যায়। লেখাগুলো যে বিরজিতলাও-এর বাড়িতে থেকেই লিখেছিলেন তা সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই লেখার শেষে উল্লেখ করেছেন। সুদূর কর্মস্থলে থাকার ফলে কলকাতার বাড়ির 'পারিবারিক খাতা'য় সবসময় লেখার সুযোগ তাঁর হয় নি। শুধুমাত্র উপরিউক্ত লেখাগুলির সন্ধান পাওয়া।

'পারিবারিক খাতায়' লেখা সত্যেন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলার কথা' তিন ধাপে রচিত হয়েছে। প্রথম অংশটি ১৮৮৯-এর ৭ই অক্টোবরে লেখা, ৮ই অক্টোবরে ছেলেবেলার কথা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ রচিত হয়েছে। ঐ দিনেই বিবাহ ও একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা সম্পর্কে তাঁর মননশীল রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। এরপর ১৫ই অক্টোবরে 'নৃত্যপ্রিয়তা' ও ১৬ই অক্টোবরে 'চুম্বনরহস্য' সম্পর্কে

লেখেন। সত্যেন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তামূলক দৃষ্টিভংগীর পরিচয় বিবাহ ও একান্নবর্তী পরিবার প্রথা, নৃত্যপ্রিয়তা ইত্যাদি রচনায় যে পরিস্ফুট তা সমাজ-চিন্তা অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 'চুম্বনরহস্য' রচনাটিতে স্নেহের অভিব্যক্তিতে জাপান ও এদেশের স্বভাবগত পার্থক্য বিশ্লেষিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য রচনা হেতু পরিশিষ্টে যথাযথভাবে এগুলি দেওয়া গেল। ঐ সংগে সত্যেন্দ্রনাথের লেখার উত্তরে তাঁর বন্ধু তারক পালিত, রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপভোগ্য মন্তব্যগুলিও লক্ষণীয়।

'ছেলেবেলার কথা' রচনাটির সবচেয়ে বড় গুণ সরসতা। সহজ কথায় গল্পের ঢঙে নিজের শৈশব ও প্রথম তারুণ্যের দিনগুলির কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। ছেলেবেলার কথা রচনার সময় সত্যেন্দ্রনাথের বয়স সাতচল্লিশ পেরিয়ে গেছে। নিবিষ্ট হয়ে স্মৃতির পটে সন্ধানী দৃষ্টি রেখে অতীতের ছবি আহরণ করেছেন। 'ছেলেবেলার কথা'কে আমার বাল্যকথা' গ্রন্থের উৎস বলা চলে ; কারণ 'আমার বাল্যকথা' রচনার অনেক উপকরণই 'ছেলেবেলার কথা' থেকে সংগৃহীত। বাড়ির দালানে বেত্রহস্তে গুরুমশায়, ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর প্রেরণা, পলতার বাগানে বনভোজন, বোটানিক্যাল গার্ডেনে নৌকো উল্টানো, সপত্নীক বোম্বাই যাত্রার পূর্বে নানা বাধাবিপত্তি প্রভৃতি 'আমার বাল্যকথা'র বর্ণিত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির কথা 'ছেলেবেলার কথা'রও পাওয়া যাচ্ছে। মনে করা যেতে পারে—'পারিবারিক খাতা'টি খুলে 'ছেলেবেলার কথা' সামনে রেখে অতীত দিনের ছবিগুলি নিজের মনে আর একবার ঝালিয়ে নিয়ে অবসর-জীবনের পূর্ণ অবকাশের মুহূর্তে 'আমার বাল্যকথা' রচনা করেছেন। 'আমার বাল্যকথায়'—চিঠিপত্র, সতীর্থদের জীবনকথা, পিতা পিতামহ ও অন্যান্য পরিজনদের জীবনকথা ইত্যাদি নতুন কথা থাকলেও, গ্রন্থটির মূল কাঠামো 'ছেলেবেলার কথা'কে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর অনুরোধে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় 'আমার বাল্যকথা' ও 'আমার বোম্বাইপ্রবাস' (বোম্বাইচিত্রের সংক্ষিপ্ত ও সামান্য পরিবর্ত্তিত রূপ) প্রথমে প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তা একসংগে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে 'টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট' থেকে শুধু 'আমার বাল্যকথা'র নব সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

'আমার বাল্যকথা' থেকেও 'ছেলেবেলার কথা'য় অনেক নামধাম আরও স্পষ্ট করে জানা যায়। 'আমার বাল্যকথা'র (পৃ. ৩) চাটুয্যেমশায় 'ছেলেবেলার কথা'য় স্পষ্ট করে হরদেব চট্টোপাধ্যায় নামে উল্লিখিত। পলতার বাগানে যাওয়ার পথে বোটে যে 'কফ্‌প্রধান' লোককে নিয়ে নবনবাবুর পরিহাস চলছিল তাঁকে 'আমার বাল্যকথা' গ্রন্থে (পৃ. ৩) 'বে-বাবু' নামান্তরে 'হাবুবাবু' বলেছেন। 'ছেলেবেলার কথা'য় তাঁর সম্পূর্ণ নামটি বেণীবাবু রূপে পাওয়া যাচ্ছে। উপরন্তু তাঁর জীবিকার সন্ধানও এই রচনায় রয়েছে। মহর্ষি'র পরম স্নেহভাজন এই ব্যক্তিটি ছিলেন কোষাধ্যক্ষ।

ছেলেবেলার কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু 'আমার বাল্যকথা'য় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উল্লেখ নেই। প্রথম রচনাটিতে কেশবচন্দ্র সেনদের সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বোধন ও প্রথম লাইনটি[১০] কিছুটা সকৌতুকে ব্যক্ত হলেও সমকালীন সমাজপতিদের বিরোধিতা ও জনসাধারণের অজ্ঞতায় বিদ্যাসাগরের মতো ইস্পাত-দৃঢ় ব্যক্তির চোখেও যে মাঝে মাঝে আশার আলো নিভে যেতো তার আভাস পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথের সতীর্থ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থ বিপিনবিহারী গুপ্ত—অনুলিখিত) থেকে জানা যায় বিদ্যাসাগরের সময়ে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় সুস্থ সবল মানসিকতার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। এই পুস্তকে উপরোক্ত সভা সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখেছেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক ক্লাস চলতো ৺রামকমল সেনের[১১] বাড়ির একাংশে। সেখানেই কেশব সেন প্রমুখদের ডিবেটিং ক্লাব ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর Heroism of Ancient India[১২] প্রবন্ধটি সেখানেই পড়েছিলেন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তারও উল্লেখ করেছেন (পৃ. ৯১)। সত্যেন্দ্রনাথ 'কেশববাবুদের সভা' বলতে এই সভাকেই সম্ভবত বোঝাতে চাইছেন।

শৈশবের গুরুমশায় ও বাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার-এর মাঝে আর একজন শিক্ষক ভবানীবাবুর নাম 'ছেলেবেলার কথা'য় আছে। তাছাড়া, ছোটকর্তার বাড়ির দুই 'যমক ভাই' 'নিতাই' 'গৌর' আর 'ক্ষমাদিদির' কথাও রচনাটিতে পাওয়া যায়। 'আমার বাল্যকথা'য় এঁদের কারোরই উল্লেখ নেই।

মহর্ষি'কে নিয়ে রচিত দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতাটিতে 'আমার বাল্যকথা'র সঙ্গে 'ছেলেবেলার কথা'য় উদ্ধৃত দুলাইনে কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। আমার

বাল্যকথার—'বসিয়া ব্রহ্মর্ষি' তপোধন', ও অগ্নির আশ্রিত গাছপালা অতিশয়'; 'ছেলেবেলার কথা'য়—'বসিলেন ব্রহ্মর্ষি' তখন', ও 'অগ্নির আশ্রিত গাছাপালা সমুদয়' রূপে পাওয়া যাচ্ছে।

বিবাহপ্রসঙ্গ রচনাটিতে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্স-এর বিবাহপ্রথার আলোচনায় বিদেশের রীতিনীতি সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, ভারতবর্ষীয় বিবাহের দোষ গুণ দু দিকের প্রতিই তিনি আলোকপাত করেছেন। ঠিক তেমনি একান্নবর্তী পরিবারেরও ভালমন্দ দুদিকের কথাই উল্লেখ করে, স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে ও পারিবারিক শান্তি রক্ষার্থে এ প্রথার যে তিনি অবসান কামনা করেছেন তা সমাজচিন্তা প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। 'নৃত্যপ্রিয়তা' রচনাটিতেও ইউরোপীয় অন্যান্য নৃত্যপ্রিয় জাতির সঙ্গে ভারতীয়দের তুলনামূলক আলোচনার শেষে তাঁর বন্ধু তারক পালিত-এর বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য রচনাকারের পরিশীলিত মনের পরিচয় বহন করে।

'চুম্বনরহস্য' রচনাটিও জাপানীদের সঙ্গে এদেশের তুলনামূলক আলোচনা। সংক্ষিপ্ত বিষয়ালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পারিবারিক খাতায় সত্যেন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলার কথা' ছাড়া আর যতগুলি রচনা লিখেছেন (বিবাহ ও একান্নবর্তী পরিবার, 'নৃত্যপ্রিয়তা' 'চুম্বনরহস্য') সবগুলিতেই বিদেশের সঙ্গে এদেশের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। 'চুম্বনরহস্য' রচনাটিতে এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সুর সত্যেন্দ্র-নাথের লেখায় ধ্বনিত হয়েছে যা পাঠকের মনকে অভিভূত না করে পারে না। "যখন আমরা শিশুর মৃদু দেহখানি বক্ষে ধারণ করি—তার ছোট ছোট হাত দুটি আমাদের গলদেশে—তার তুল তুলে গাল আমাদের গালে অনুভব করি—যখন তার হাসি হাসি মুখ, জ্বল জ্বল আঁখি দুটি সমুখে দেখি তখন তায় চুমো না খাইয়া থাকিতে পারি না। চুমায় চুমায় তাকে ডুবিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। এ আমার স্বাভাবিক হৃদয়োচ্ছ্বাস।" এখানে ব্যক্তি সত্যেন্দ্র-নাথের স্নেহার্দ্র হৃদয়ের কোমল প্রকাশ পূর্ণ পরিস্ফুট।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনার শেষে রবীন্দ্রনাথের মননশীল আলোচনায় বিভিন্ন জাতির স্নেহপ্রকাশে চুম্বন যে অনেকটা স্বভাবগত না হয়ে প্রথাগত হয়েছে তার বিশ্লেষণ রয়েছে। সবশেষে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের কৌতুকপূর্ণ উক্তি পাঠকের হাস্যোদ্রেক না করে পারে না। (দ্রষ্টব্য—পরিশিষ্ট : পারিবারিক খাতা : চুম্বনরহস্য)

কাজে কাজেই রচনাকারদের ব্যক্তিত্বের ছাপ কোন কোন রচনায় পাঠকমনে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এখানেই 'পারিবারিক খাতা'র যথার্থ মূল্য নিহিত।

সবশেষে 'পারিবারিক খাতা'য় সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যরচনারীতির বিষয়ে সামান্য উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করা যেতে পারে।

কথ্যভাষাকে প্রকাশের বাহন করার দিকে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল আগ্রহ 'পারিবারিক খাতা'য় দেখা যায়। ঘরোয়া খাতা বলেই সম্ভবত কথার ভাষাকে লেখার ভাষায় স্থান দেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে ; যদিও তাঁর রচনারীতি এই পর্বে পূর্ণ ত্রুটিযুক্ত নয়। 'তিনি গোলার উপর লিখিত অক্ষরে ক খ শিখাইতেন, তেতালা বাড়ীতে তিনি পড়াতে আসতেন', 'বোটে করে আমরা একদল যাত্রী পলতার বাগানে গিয়া আহারাদি করিলাম' 'Sir সব মিটমাট করিয়া পক্ষপাতশূন্য হয়ে…'(ছেলেবেলার কথা') ইত্যাদি সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ তাঁর রচনায় দেখা যায়।

কথ্যরীতির মধ্যেও এই খাতায়—'চিরন্তন', 'বিবাহার্থী',' 'বেত্রহস্ত', 'স্বৈরগতি', 'পিঞ্জরাবদ্ধ', 'পদব্রজে' ইত্যাদি তৎসম শব্দ সুন্দরভাবে মিশে গেছে। এছাড়াও 'উদ্বাহ-শৃংখল ধারণ করা', দম্পতীর বিবাদ ভঞ্জন', শান্তি-শীল শীলতা', ইত্যাদি গুরুগম্ভীর আভিধানিক তৎসম শব্দের দীর্ঘ প্রয়োগ তাঁর রচনাকে ভারাক্রান্ত করে নি।

কতগুলি বিশিষ্ট বাক্যবিন্যাস রচনার সরসতাকে বর্ধিত করেছে। যেমন—'হা বিধাতঃ দেশের কি দশা করিলে—নাচেও সুখ নেই।' ('নৃত্যপ্রিয়তা')।

'তুল তুলে গাল' 'ঢল ঢল আঁখি' ইত্যাদি সাদৃশ্যবাচক দ্বিত্ব প্রয়োগে তাঁর রচনা ভাবপ্রকাশের অধিকতর উপযোগী হয়েছে। 'কণ্টে সুণ্টে'র মতো অপ্রচলিত ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈতের প্রয়োগও তাঁর রচনায় চোখে পড়ে। আলংকারিক শব্দ ব্যবহারের বিশেষ প্রবণতা 'নিঃশব্দ শব্দ-উচ্চারণ' ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। ইংরেজী শব্দের সার্থক প্রয়োগ 'অলস drone কুল', 'রিয়াল' প্রভৃতিতে চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে সংস্কৃত বাক্যের উদ্ধৃতিদানে তাঁর প্রবল আকর্ষণ লক্ষিত হয়।

রচনার পারিপাট্য সম্পাদনে এই পর্বে সত্যেন্দ্রনাথ কতটা মনোযোগী

হয়েছিলেন তার পূর্ণ পরিচয় পারিবারিক খাতায় পাওয়া যায়। এই রচনায় অনুসৃত কথ্যরীতি সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও, পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথের লেখায় সরস চলিত গদ্যের এটি পূর্বাভাস প্রদান করে।

১. শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

২. পারিবারিক স্মৃতি-লিপি পুস্তক

ইহাতে পরিবারের

অন্তর্ভুক্ত

সকলেই

(আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্বস্বজন)

আপন আপন মনের ভাব-চিন্তা-মন্তব্য বিষয় ঘটনা প্রভৃতি

লিপিবদ্ধ করিতে পারেন।

পারিবারিক-স্মৃতি-লিপি পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা)

৩. **নিষেধ**

১। পেন্সিলে লেখা

২। আমাদের পরিবারের বাহিরে এই খাতা লইয়া যাওয়া

৩। যতদিন এই খাতা লেখা চলিবে ততদিন এই খাতার প্রবন্ধ কাগজে অথবা পুস্তকে ছাপান।

(পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত)

৪. 'তার মধ্যে রবিকাকার নিজের হাতে কতকগুলি নিয়ম লেখা ছিল,··· ছাপার নিষেধটি পরে অবশ্য রক্ষিত হয়নি। আর প্রকাশ করে ভালোই হয়েছে কারণ হাতের অক্ষরের চেয়ে ছাপার অক্ষর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী।'

(ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : রবীন্দ্রস্মৃতি সাহিত্যস্মৃতি অধ্যায়)

৫. 'আমাদের একটি পারিবারিক খাতা ছিল যেটি পূর্বোক্ত ভবানীপুরের বাড়িতে সিঁড়ির উপরে একটি উঁচু ডেস্কের উপর শেকল দিয়ে বাঁধা থাকতো। যার যখন ইচ্ছে তাতে নিজের বক্তব্য লিখে রাখত।'

(ঐ পৃ. ৪৩)

৬. 'আমার মেজ জ্যাঠামহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত থেকে আই. সি. এস. হয়ে ফেরবার পর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে না থেকে থাকতেন বালিগঞ্জে। সেখানে তাঁর বাড়িতে আমাদের পরিবারের অনেকেই প্রত্যহ একত্র হতেন বিকালবেলায়।...যে ঘরে আড্ডা বসত—সেখানে রাখা থাকত একটা মোটা গোছের বাঁধানো খাতা। যখন যার খেয়াল যেত, যেমন খুশি তাতে লিখে। এরই নাম ছিল 'পারিবারিক খাতা'।' (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পিতৃস্মৃতি পৃ. ১)

৭. এরকম দুখানি খাতা পরপর ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয়টির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। প্রথমটি রথীর পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে তাকে উপহার দিই।'

(ইন্দিরা দেবী : রবীন্দ্রস্মৃতি। সাহিত্যস্মৃতি অধ্যায়)

৮. রবিকার সন্তান

'রবিকাকার একটী মান্যবান ও সৌভাগ্যবান পুত্র হইবে, কন্যা হইবে না, সে রবিকাকার মত তেমন রহস্যপ্রিয় হইবে না রবিকাকার অপেক্ষা গম্ভীর হইবে। সে সমাজের কার্য্যে ঘুরিবার অপেক্ষা দূরে দূরে একাকী অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবে।'—শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তার উত্তরে বলেন্দ্রনাথের উত্তর :

'হিন্দা' তোমার ভবিষ্যদ্বাণী এখন চাক্ষুষ—প্রকৃতিটা গম্ভীর যা'... তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে কিনা সমাজিক জীব না হয়ে খোকা যে আরণ্যক ঋষি হবে তাও...মনে হয় না।' (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি'তে (পৃ. ২) উল্লিখিত ও পারিবারিক খাতার পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত)

৯. 'পঞ্চভূতের চরিত্র পাঁচটি—ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এবং লেখক স্বয়ং এই ছয়জনের আলাপ আলোচনাকে অবলম্বন করিয়া লঘু গুরু বিষয়গুলি স্বাদু ও রমণীয় ভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। এই রচনার প্রেরণা সম্ভবতঃ সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্য চক্রের পারিবারিক খাতায় প্রকাশিত বিভিন্ন জনের মনোভাব বা রচনা'। চিরশ্রী বিশী : রবীন্দ্রগদ্যভাষার বিবর্তন (১৮৮৭ খ্রী. হইতে ১৯০০ খ্রী.)

১০. 'কেশববাবুদের একটা সভা ছিল···সেই সভায় বিদ্যাসাগর একটা বক্তৃতা দেন। এই বলে আরম্ভ করেন—"বৎস, আমি দাঁড়ালেই সব অন্ধকার দেখি।" (ছেলেবেলার কথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১১. কেশবচন্দ্র সেন-এর পিতামহ।

১২. দ্রষ্টব্য—এই গবেষণার ইতিহাসচেতনা অধ্যায়।

সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যরীতি

বাংলা গদ্যের বিবর্তনধারায় উদ্ভাবক কেরী-মৃত্যুঞ্জয়, 'গ্রানিটস্তরে' স্থাপয়িতা রামমোহন, শিল্পী বিদ্যাসাগর, বিজ্ঞানসাধক অক্ষয়কুমার দত্ত, মন্ময় অনুভূতির সার্থক স্রষ্টা দেবেন্দ্রনাথ ও বিচিত্র রসস্রষ্টার বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানের সঙ্গে সহজ সাবলীলতায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

ওজোগুণ সম্পন্ন বিবেকানন্দের গদ্য ও বিশিষ্ট উচ্চারণ ঢঙে দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য যেমন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তেমনি সহজ সরলতায় ও স্পষ্টতায় সতেন্দ্রনাথের গদ্যও একটি বিশিষ্ট গুণের অধিকারী।

যথোপযুক্ত গদ্যভাষাসৃজনে নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় তিনি নিষ্ঠার ছাপ রেখে গেছেন। বিশেষত চলিত বাংলার প্রতিষ্ঠালগ্নে তাঁর অবদানকে বিস্মৃত হলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে।

চলিত গদ্যের অফুরন্ত শস্য সম্ভারের উপযোগী কর্ষিত মৃত্তিকায় তিনি বীজ বপন করে গেছেন। এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর একটি বিশিষ্ট আসন প্রাপ্য।

সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থটির গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যের আসরে একটি যুগান্তকারী অবদান। অসিত হালদার তাঁর 'রবিতীর্থে'' গ্রন্থে (পৃ. ১৫) বলেছেন—"তাতেই বাঙলা ভাষার সংস্কৃতবহুল পোষাকী ভাব কেটে গিয়ে চলিত ভাষার দিকে মোড় ফিরলো।" অবশ্য মুখের কথাকে সাহিত্যের ভাষায় স্থান দিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ থেকে ঠাকুরবাড়ির অনেকেই চেষ্টা নিয়েছেন, তবে তৎকালীন প্রবীণদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের রচনারীতি নিয়েই বিরুদ্ধ সমালোচনা ও প্রত্যুত্তরের ঝড় উঠেছিল।[১] অসিত হালদারের পিতা সুকুমার হালদার এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে চলিত বাংলার সপক্ষে ও সাধুভাষা বা তথাকথিত 'বাবুবাংলা'র বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ শাণিত ভাষায় প্রমথ চৌধুরী ভারতীতে নিজ অভিমত প্রচার করেন।[২] প্রমথ চৌধুরীর বাচনিক ঢঙে সত্যেন্দ্রনাথও কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'অনর্থক বিশেষণ', 'অদ্ভুত সমাস' 'ভুল অর্থে'

বিশেষ্যের প্রয়োগ' ইত্যাদিতে তৎকালীন দিনের সাধুভাষাকে প্রমথ চৌধুরী যেমন 'বাবু-বাংলা'[৩] বলেছেন তেমনি বিকৃত উচ্চারণে তৎকালীন দিনে প্রচলিত সংস্কৃতকে সত্যেন্দ্রনাথও 'বাবু-সংস্কৃত' বলেছেন—(আমার বাল্যকথা —পৃ. ১৯)। 'বাবু-বাংলা'র চেয়ে বরং পণ্ডিতী বাংলা প্রমথ চৌধুরীর কাছে পরিশুদ্ধ বলে মনে হয়েছে, কারণ সেখানে 'মিষ্ট প্রয়োগ' না থাকলেও 'দুষ্ট প্রয়োগ' নেই।[৪] 'পণ্ডিতি বাংলার বিকার' থেকে যে বাবু-বাংলার সৃষ্টি হয়েছে সেই 'কৃত্রিম ভাষার হাত এড়াতে হলে মৌখিক ভাষার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই' বলেই তিনি দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন।[৫]

সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে কোন ওকালতি করার প্রয়োজনীয়তা প্রমথ চৌধুরী মনে করেন নি—তাঁর কথায় 'আমি এবং ঢাকা রিভিউ-এর সম্পাদক যেকালে পূর্ববঙ্গের নয় কিন্তু পূর্বজন্মের ভাষায় বাক্যালাপ করতুম, সেই দূর অতীত কালেই ঠাকুর মহাশয় সুযোগ্য লেখক বলে বাংলাদেশে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।' আর 'আত্মজীবনী লেখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঘরের কথা পরকে বলা'। 'ঘরাও ভাষাই ঘরাও কথার উপযোগী'।[৬] সামাজিক জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন সংস্কারমুখী ছিলেন, তেমনি রচনারীতিতেও প্রকাশের পক্ষে যেটি সহজ হবে বলে মনে করেছেন, তাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি ; তবে প্রমথ চৌধুরীর মতো অতটা জোরের সংগে শুধুমাত্র মৌখিক ভাষার প্রচার করতেও তিনি পারেন নি। তাঁর মতে—'বিষয়ের তারতম্য অনুসারে ভাষারও তারতম্য হয়'। সেজন্যই উভয় দলের মনরক্ষা করার প্রবণতা তাঁর নিজের কথাতেই স্পষ্ট।[৭] তবু জীবনের শেষ অধ্যায়ে তাঁর 'আমার বাল্যকথা'য় সাধুরীতির ঠাট অল্প কয়েকটি স্থানে মাত্র আছে—আগাগোড়া প্রায় চলিত রীতিতেই লেখা। 'আমার বোম্বাইপ্রবাস'-এ স্থানে স্থানে সাধু চলিতের মিশ্রণ থাকলেও একটি স্বচ্ছন্দ ঘরোয়া সুর সমগ্র রচনাটিতেই অনুস্যূত। সুতরাং নবীনদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি শুধু নবীনদের প্রেরণা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, তাঁদের রীতি অনুসরণও করেছেন। প্রবীণ সত্যেন্দ্রনাথকে পুরোভাগে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর চলিত রীতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ-উদ্দীপনা দ্বিগুণতর হয়েছে।

অবশ্য মুখের ভাষাই যে ভাবপ্রকাশের যথার্থ বাহন হতে পারে তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্যের আসরে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ

(১৮৪০-১৮৭০) সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বেই রেখে গেছেন। 'সর্বজনমধ্যে কথিত ও প্রচলিত' বাংলাভাষায়' 'আলালের ঘরে দুলাল' রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) তাঁর পূর্বসূরী প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রতি উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও[৮] 'আলালী ভাষায়' তিনি কিছুটা গাম্ভীর্য ও বিশুদ্ধির অভাবও লক্ষ্য করেছেন। ঐ ভাষা সবরকম ভাবপ্রকাশের উপযোগী বলে তাঁর মনে হয় নি।[৯] তাঁর মতে তারাশংকরের কাদম্বরী অনুবাদের অলংকারবহুল ভাষা ও প্যারীচাঁদের হালকা সাজের ঘরোয়া ভাষার সমন্বয়ে যথার্থ শিল্পগুণসম্পন্ন সাহিত্যিক গদ্যের সৃষ্টি হতে পারে। তবে বিষয়ভেদে 'এই উভয় জাতীয় ভাষার মধ্যে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতার' কথাও বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন।[১০] ইতিপূর্বে সাধু ও চলিত ভাষা সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের অভিমতেও আমরা বিষয়ের তারতম্যে রচনার পার্থক্যের কথা জানতে পেরেছি। সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের মতের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। (দ্র. ভূমিকা : আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস)

মুখের কথা—মায় কলকাতা অঞ্চলের প্রচলিত কক্‌নি বুলি cockney ব্যবহার করে রচনাকে জীবনধর্মী করার প্রয়াসে প্যারীচাঁদ মিত্রের থেকেও কালীপ্রসন্ন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩)-এ যে বিদ্রূপাত্মক নকশা রচনার প্রয়াস দেখা গিয়েছিল তা সার্থক রূপে বিকশিত হয়েছে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় (১৮৬২)। চলিত রীতির দিক থেকে হুতোমের নক্‌শা যে আলালী ভাষা থেকে বিশুদ্ধতর, সেটিও দুটি গ্রন্থ পাশাপাশি রাখলেই চোখে পড়ে।[১১] সত্যেন্দ্রনাথ এ ধরণের নকশা রচনার প্রয়াস নেন নি। বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ও মহান ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে যে আনন্দ লাভ করেছেন তা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। নিজের অভিজ্ঞতার ডালি মেলে দিয়ে কখনো কখনো পাঠকের সংগে অন্তরংগতা স্থাপনেও সক্ষম হয়েছেন। এই সহজবোধ্যতাই সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির মূলধন।

কিছু কিছু হাল্কা চালের প্রয়োগ তাঁর গদ্যে চোখে পড়ে, তবে তা পুরোপুরি আসর মাত করা মজলিসী ঢঙের নয়। তাঁর ঢঙ্ বিবৃতিমূলক হলেও যেমন সজীব তেমনি প্রাণবন্ত। মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ পরিহাসে পাঠককে আনন্দদানের উপায়ও তাঁর রচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[১২]

এতক্ষণ পর্যন্ত চলিত রীতির প্রতিষ্ঠার লগ্নে সত্যেন্দ্রনাথের অবদান আলোচিত হলো। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রধানত এজন্যই তিনি স্মরণীয়। প্রমথ চৌধুরীর পূর্বোক্ত বক্তব্যের সংগে সুর রেখে আমরাও এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বাংলা গদ্যের চলিত রীতির আবাহক রূপেই ভূমিকা স্বীকৃত।

সত্যেন্দ্রনাথের হাতে সাধুরীতিও সরল প্রকাশভংগীতে জনপ্রিয় হয়েছিলো। বিভিন্ন সময়ে সাধু রীতিতে লেখা তাঁর রচনাগুলির ধারাবাহিক আলোচনা করলেই তার অগ্রগতির স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ধারাবাহিক সূত্র ধরে সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে—তার মধ্যে 'কৃষ্ণ-কুমারীর ইতিহাস' প্রবন্ধটি উল্লেখ্য। ১৭৭৯ শকের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র পৌষ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। সে সময়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' পত্রিকা অনেকেরই লেখার প্রেরণা যুগিয়েছে। কিশোর সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে (প্রায় ১৫ বছর) এই প্রবন্ধ রচনায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া বিচিত্র নয়। প্রসংগত তত্ত্ববোধিনীর পেপার কমিটিতেও রাজেন্দ্রলাল কিছুদিন ছিলেন। পরবর্তীকালেও রাজেন্দ্রলালের নির্দেশেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখেরা 'পরিভাষাচর্চা' এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে কিছুদিন নিয়োজিত ছিলেন। 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস'-এ তৎসম শব্দের প্রচুর প্রয়োগে তৎকালীন সাধু গদ্যরীতির ধারা অনুসৃত হয়েছে। মনে হয় কিশোর সত্যেন্দ্রনাথ ঐ পর্বে তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতির ধারা খুঁজে পান নি। ঐ সময়ে তাঁর সাহিত্যগুরু অক্ষয়কুমার দত্তের প্রভাব অতিক্রমের চেষ্টা তাঁর রচনায় লক্ষিত হলেও তখনও পুরাতন সাধুরীতির ঠাট একদম বর্জন করতে পারেননি তা একটু অংশ তুলে ধরলেই বোঝা যাবে—"শাহপুরের অধিপতির প্রতাপ অসীম মহাসিন্ধুর প্রতাপাপেক্ষাও প্রচণ্ড—তাঁহার রাজ্য প্রায় পঞ্চাশৎ বিস্তীর্ণ গ্রামের আধার, তাঁহার শংখধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র দুই সহস্র অস্ত্রধারী যোদ্ধা একত্র হইত।"

প্রথম যৌবনে সত্যেন্দ্রনাথ পিতার সংগে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারের কাজে বিভিন্ন স্থানে গেছেন—কখনো বা সংগীতে অংশ নিয়েছেন, কখনো ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণ দেবার পূর্বে পিতাকে দেখিয়ে নেওয়া এঁদের রীতি ছিল। বিভিন্ন স্থানে পিতার ভাষণের অনুলিপি রাখতে গিয়ে ও পারিবারিক

উপাসনায় পিতার প্রার্থনা ও উপদেশ আকুল আগ্রহ নিয়ে শুনে শুনে ঐ রীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক।

উপনিষদের রসধারাকে সর্বজনবোধ্য করে তোলার প্রচেষ্টা করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি যেমন সহজ কথা খুঁজেছেন, তেমনি সাত্ত্বিক ভাবগুলিকে শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করতেও উদাসীন ছিলেন না। প্রধান আচার্যরূপে তাঁর উপদেশ শুধু উপদেশই নয়, শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায়—"সে বাণী যেন হৃদয় হইতে হৃদয়ে উচ্চারিত পরমাত্মীয় পরমসুহৃদের বাণী"।[১৩] পিতার রচনাশৈলী ও বাক্‌নির্মিতির অপূর্ব কৌশল সত্যেন্দ্রনাথ সেসময়ে অনুসরণ করেছেন। ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে সত্যেন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছেন তা যেমনি আবেগদীপ্ত তেমনি ব্যঞ্জনাময়।

তৎসম শব্দচয়নের প্রবণতা ও অলংকার পারিপাট্যের ছাপ তাঁর বক্তৃতায় সুস্পষ্ট :

"—অদ্য কি শুভদিন! অদ্য আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল। এই সমাজের প্রথমাবস্থায় কে মনে করিয়াছিল যে ইহা কুসংস্কার লতার পরশুরূপে উত্থিত হইয়া এতকাল পর্যন্ত যথার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিবে এবং ধর্মপথের দুস্তীর্ণ কণ্টক সমুদায় ছেদন করিতে থাকিবে।"

১৭৮১ শকের পৌষ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে সত্যেন্দ্রনাথের 'সিংহল উপদ্বীপে ভ্রমণ বৃত্তান্ত'[১৪] প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের বয়স তখন সতেরো পূর্ণ হয়ে কয়েক মাস চলছে। এটি সাধুরীতিতে লেখা হলেও স্বচ্ছ সরল ও সংক্ষিপ্ত। তৎসম শব্দের প্রয়োগ কমে এসেছে। আলাপচারী অন্তরঙ্গ ঢঙে পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। এই ভ্রমণকাহিনী রচনাতেও মহর্ষির প্রেরণা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের রচনাটি মহর্ষির ভাল লেগেছিল। কারণ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সত্যেন্দ্রনাথ পাঠকদের মনে 'সিংহল' সম্পর্কে যথার্থ ধারণা জাগাতে সক্ষম হয়েছেন।[১৫]

বস্তুতই ছোট ছোট সহজ কথায় তিনি ভ্রমণস্মৃতির যে মালা গেঁথেছেন, তার স্বচ্ছন্দগতি পাঠককে মুগ্ধ করে। সিংহল যাত্রায় কেশবচন্দ্র সেনও একই সঙ্গে ইংরেজিতে দিনলিপি রেখেছিলেন। কৃষ্ণবিহারী সেন প্রমুখেরা ধারণা করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের ইংরেজি দিনলিপি আশ্রয় করেই সত্যেন্দ্রনাথ ঐ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন। দুজনের নিবিড় বন্ধুত্বের সূত্রে একে অন্যে দুজনের দিনলিপি দেখেছেন—এ ধারণা স্বাভাবিক, তবে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়

'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থ রচনার সময়ে কেশবচন্দ্রের ইংরেজি দিনলিপির বঙ্গানুবাদ করতে গিয়েই ঐ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করেছেন ও সত্যেন্দ্রনাথের স্বকীয়তা স্বীকার করেছেন।[১৬] সকৌতুক বাগভঙ্গীতে উল্টাডিঙ্গি থেকে পালিয়ে আসা কেশবচন্দ্রের ভয়ে জড়সড় মূর্তি এবং সিংহলে নেমেই অতি উৎসাহে তাঁর স্বহস্তে 'বিস্বাদ' রন্ধন ও অবসন্ন দেহে শয্যাগ্রহণের ছবি সত্যেন্দ্রনাথ যেমন সরস করে এঁকেছেন, তা পাঠকের মনোদর্পণে জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়।

সমগ্র রচনাটিতে ভাবচিত্রের অভাব নেই। প্রত্যেক ভ্রমণপিপাসু তাঁর নিজের বিচিত্র আনন্দ-অভিজ্ঞতার কথা অপরের কাছে যথাযথ ভাবে নিবেদন করতে চান। এক্ষেত্রে রচনাশক্তিই ভ্রমণবিলাসীর হাতিয়ার। রচনায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক গুণ না থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রমণবিবরণ শুধু দিনলিপিতেই পর্যবসিত হয়, আবার রচনার গুণে দিনলিপিরও কোন কোন অংশ সজীব ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এ ধরণের উন্নত রচনাশক্তির পরিচয় আলোচ্য দিনলিপির স্থানে স্থানে আছে। সমুদ্রের নীলাম্বুরাশিতে গঙ্গার ধারা মিলনের ছবি পাঠকের মানসপটে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তাঁর রচনায়—

'ক্রমে জলের বর্ণ পরিবর্ত্ত হইতেছে। ঘোলা বর্ণ, সবুজ বর্ণ, গাঢ় সবুজ এই তিন প্রকার বর্ণ একে একে দেখা যাইতেছে। কতক দূরে নীলরেখা, আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!'

এখানে 'পরিবর্ত্ত' 'কতকদূরে' ইত্যাদি পুরানো সাধু ঠাটের শব্দ যেমন আছে তেমনি বর্ণনায় জোর আনতে, শব্দের দ্বিরুক্তিরও আশ্রয় নিয়েছেন। তাছাড়া আবেগাত্মক 'আহা' শব্দের প্রয়োগও সেই রচনায় চোখে পড়ে। "সিংহল দ্বীপের গালপুরী সম্মুখে! আহা! কি শোভা!"

'আহা' শব্দের প্রয়োগ দেবেন্দ্রনাথেরও একটি প্রিয় রীতি। তবে আবেগ থাকলেও রচনাটিতে পরিমিতিবোধের ছাপ সুস্পষ্ট। বর্ণনাসংযমের মাঝে বক্রোক্তির ছটায় রচনাটি চিত্তাকর্ষক হয়েছে :

"আমরা শীঘ্র শীঘ্র এক উত্তরণশালাতে চলিলাম। একি! গিয়া দেখি সকলই আশার বিপরীত। কলার গাছ, ভাঙ্গা প্রাচীর, খোলার ঘর, সকলই নয়নতৃপ্তিকর। আবার কলিকাতার বদ্ধভাব।...কোথায় বা সোনার লঙ্কা, কোথায় বা অশোকবন..."

একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে সত্যেন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে

অলংকার প্রয়োগের প্রবণতা অনেক কমে এসেছে। সাধু ঠাটে লিখলেও সহজ সাদামাটা কথায় বক্তব্যকে স্পষ্ট ও জোরদার করতেই তিনি সচেতন হয়েছেন—"সত্য আপনার বলেই এ প্রকার বলীয়ান যে তাহা অন্যের সাহায্য অতি অল্পই আবশ্যক করে। দেখ ব্রাহ্মধর্মের জন্য এখনো পর্যান্ত কাহারও রক্তপাত হয় নাই।"[১৭] অবশ্য এখানেও বক্তব্যে আবেগ সম্পূর্ণ দমিত হয়নি—"হা! তখন পৃথিবী কি সুখের দিন দেখিবে, যখন এইরূপ হইবে, সমুদায় ব্রাহ্মই এক শরীর, ব্রাহ্মধর্মই তাহার প্রাণ।"[১৮]

১৭৮৩ শকের ৭ই চৈত্র মহর্ষির দশ উপদেশ—'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' গ্রন্থের সংকলনের সময়ে উপক্রমণিকায় সত্যেন্দ্রনাথ যে গদ্যরীতির আশ্রয় নিয়েছেন তা ভাবাতিশয্য বর্জিত, স্বচ্ছন্দ ও যুক্তিবহ। চিন্তার স্বচ্ছতা ঐ সময়ে তাঁর রচনাকেও যে স্বচ্ছ করেছে তা উদ্ধৃত অংশ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাবে।—"যদি যুক্তি ও তর্ক এবং বুদ্ধি ও শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে জানা না যাইত—যদি সমুদায় দর্শনশাস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া না দেখিলে আমাদের ধর্মজ্ঞান না জন্মিত; তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত থাকিত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে রূপ সহজে হয়, সেই প্রকার সহজ জ্ঞান অন্যান্য বিষয়েরও হইয়া থাকে।"[১৯]

কৈশোর থেকে বিলাত গমনের পূর্ব পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির যে সকল নিদর্শন পাওয়া গেল তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁর হাতে সাধু ঠাটের গদ্য আড়ষ্টতামুক্ত হয়ে ক্রমশঃ সুষম ও সাবলীল হতে চলেছে।

পত্রাবলীর ভাষা

বিলাত থেকে গণেন্দ্রনাথকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্রের ভাষায় মাঝে মাঝে চলিত রীতির অনুসরণ দেখা যায়। সম্ভবত ঐ সময়ে অন্তরংগজনের কাছে ঘরোয়া কথাগুলি লেখার সময়ে কথ্য ঢঙই তার বেশি মনঃপূত হয়েছে; যেমন—"আমি তোমাকে অনেকদিন পত্র লিখি নাই বলে আমার ভাবের ত্রুটি মনে করো না"...

আবার পত্রে যেখানে সাধু ঠাট রেখেছেন সে ভাষাও প্রায় চলিতধর্মী। ক্রিয়াপদ সর্বনাম বদলে দিলে প্রায় মুখের কথাই হয়ে দাঁড়ায়। গণেন্দ্রনাথের ফটো পেয়ে লিখছেন—"মুখের ভাব স্বাভাবিক অপেক্ষা কিছু গম্ভীর

হইয়াছে, যেন কোন (বিশাল) রাজ্য কেমন করিয়া চালান যায় সেই ভাবনায় মগ্ন হইয়াছে"।

বিলেত থেকে জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা পত্রগুলির মধ্যেও বানানবৈশিষ্ট্য সহ মুখের কথার প্রয়োগ আছে : "কবে আবার চখে চখে দেখা হবে" ইত্যাদি (১৭ই মার্চ, ১৮৬৩)

'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটকের গদ্যসংলাপ : "কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হবার বছর দুয়েক পরেই (১৮৬৭) সত্যেন্দ্রনাথ যে সুশীলা-বীরসিংহ নাট্যানুবাদ হাতে নিয়েছিলেন এর গদ্যসংলাপে কথ্যরীতির পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই অভিমত দিয়েছেন। (দ্র. নাট্যানুবাদ : সুশীলা-বীরসিংহ অধ্যায়) সভাসদদের মুখে চলিত ভাষায় ব্যঙ্গোক্তি-পরিহাসে নাটকটিতে হাস্যরসের পরিবেশন সার্থক হয়েছে।

১৭৯৩ শকের ১১ই মাঘ (১৮৭১ খ্রী.) দ্বাচত্বারিংশ ব্রাহ্মসমাজে সত্যেন্দ্র-নাথ যে ভাষণ দিয়েছেন তা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।[20] ঐ ভাষণে আবেগবর্জিত একটি যুক্তিনিষ্ঠ জোরালো ঢঙ অনুসৃত হয়েছে। শান্ত সংযত প্রকাশের মধ্যেও শ্রোতার হৃদয়ে উদ্দীপনার আলোড়ন আনতে তা সক্ষম—"ব্রাহ্মগণ বিবেচনা করিয়া দেখ, ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি আমরা হৃদয়ের ধর্ম্ম করিতে পারিয়াছি? যদি করিয়া থাকি, তবে কেন আমরা দীনহীন ভাবে রহিয়াছি? কেন আমাদের জীবনে সে ধর্ম্ম প্রতিভাত হয় না? ...কেন আমরা ধর্ম্মযুদ্ধে বিমুখ? কেন সত্য প্রচারে অক্ষম? তাহার কারণ এই, আমাদের যত্ন নাই, উৎসাহ নাই।...আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেবল মুখের ধর্ম্ম করিয়া রাখিয়াছি। অন্য কথা দূরে থাকুক, আমরা সেই পবিত্র ধর্ম্ম আপনার পরিবারের মধ্যে আনিতেও বিমুখ। স্ত্রী যে সুখদুঃখভাগিনী, চিরসঙ্গিনী, তাহাকেও কি প্রতি ব্রাহ্ম এই উচ্চধর্ম্মের সহধর্ম্মিনী করিতে যত্নবান?"[21]

১৭৯৩ শকের ফাল্গুনে আদি ব্রাহ্মসমাজে সত্যেন্দ্রনাথের আর একটি বক্তৃতাও প্রকাশিত হয়েছে।[22] এই ভাষণে ত্রিশ বছরের পরিণত যুবক সত্যেন্দ্রনাথ যে রীতিকে প্রকাশের বাহন করেছেন তা মাঝে মাঝে আলাপচারী হলেও, যেমন বলিষ্ঠ তেমনি ঋজু। সহজ কথায় তাঁর ভাষণে ব্রাহ্মধর্মে গুরুর ভূমিকা যেমনি স্পষ্ট তেমনি আত্মোন্নতির চেষ্টার প্রতিও তা পূর্ণ সোচ্চার—"যদি কোন গুরুকে আশ্রয় করি, সে কেবল ইহারি জন্য যে উপদেশ ও

দৃষ্টান্তে তিনি আমারদিগকে সেই পরম গুরুর নিকটে লইয়া যাইবেন। তা না করিয়া যিনি ঈশ্বর হইতে আপনার প্রতি আমারদের হৃদয় মন আকর্ষণ করেন—ঈশ্বরের নাম করিয়া যিনি আপনার গৌরব প্রকাশ করেন, তিনি গুরু নহেন।"[২৩]

১২৮৪ বঙ্গাব্দে (১৮৭৭ খ্রী.) 'ভারতী' পত্রিকার জন্য কিছু লেখা দেবার তাগিদেই সত্যেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম বোম্বাইপ্রসঙ্গ নিয়ে লিখতে শুরু করেন। কর্মজীবনে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন স্থানে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন তারই স্বচ্ছন্দ প্রকাশে 'বোম্বাইচিত্র' বাংলা গদ্যসাহিত্যের আসরে একটি উল্লেখ্য অবদান। একদিকে গুজরাটের কৃষকদের জীবনচিত্র, অন্যদিকে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের উন্নাসিকতা কিছুই তিনি লিখতে দ্বিধা করেন নি। বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়ে সাধুভাষায় লিখিত হলেও তাঁর রচনা সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে।

'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৪'র ভাদ্র সংখ্যা থেকে ১২৮৫'র আশ্বিন পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের লেখা 'কড়ুয়া কণবী', 'গুজরাটে নামকরণ', 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' ও 'বোম্বাই রায়ৎ' প্রকাশিত হয়েছে।

১২৯২ সালে 'বালক' পত্রিকার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ মুখ্যত 'বোম্বাই সহর'কে নিয়ে লিখেছেন। বিচিত্র বিষয় নিয়ে সহজ কথায় পরিবেশনের জন্য রচনাগুলি আকর্ষণীয় হয়েছে। 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত বোম্বাই কাহিনীতে পূর্ণ সত্যেন্দ্রনাথের সুললিত সাধু গদ্য রচনাগুলি প্রকাশিত হয়।[২৪] বোম্বাই প্রসঙ্গের লেখাগুলিকে একদিকে তথ্যবহুল অন্যদিকে চিত্তাকর্ষক করার দিকে লেখক যত্নশীল হয়েছেন। (দ্র. ইতিহাসচেতনা অধ্যায়)। কোনো কোনো অংশ যে সাবলীল ও চিত্রধর্মী হয়েছে, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তার উল্লেখ করেছেন।[২৫]

ঐ সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের লেখা সাধু গদ্যের মধ্যেও যে গদ্যের কাঠিন্য ছিল না, বরং পরিহাস বক্রোক্তিতে রচনা প্রাণবন্ত হয়েছে, কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্যে তার প্রমাণ আহরণ করা যায়।

'গণ্ডের উপর বিস্ফোটক, একে পররাজ্য, তাহাতে আবার ইংরাজদের উদ্ধত স্বভাব' (ভারতবর্ষীয় ইংরাজ : বোম্বাইচিত্র, পরিঃ পৃ. ১২)।

'শীতকালে অর্দ্ধক্রোশ পদচালনা—বাবুদের ব্যায়ামের এক শেষ। বাবু

নামের সঙ্গে সঙ্গে গদিতে হেলান দিয়া পান তামাক, গল্পসল্প, আমোদ করা —এই ভাবই মনে উদয় হয়।' (ভারতবর্ষীয় ইংরাজ, বোম্বাইচিত্র, পৃ. ২১)।

তৎসম শব্দের সুষম প্রয়োগে রচনা মাঝে মাঝে মনোহারী হয়েছে—যেমন "সাগরগর্ভ হইতে এই চিরবসন্ত সুন্দর পুরী সমুত্থিত হইল ···এই বোম্বাই পুরী সমুদ্রের উপরে রত্নদ্বীপতুল্য শোভা পাইতেছে।" (বোম্বাইচিত্র, পৃ. ৩৩৩)।

কয়েকটি অপ্রচলিত সমাসবদ্ধ পদও চোখে পড়ে—উদ্বাহুবামন (পৃ. ২৪২), বিবৃদ্ধ আকার (পৃ. ২৭৯) অপমান-পুঙ্খ লিপিবাণ (পৃ. ৩৫১), নিপুত্রিক মরণান্তর (পৃ. ৩২৭) ইত্যাদি।

অনেক সময়ে তৎসম শব্দের সঙ্গে কথ্য শব্দের সহাবস্থানে লেখার অন্তরঙ্গ ভাব বেশি পরিস্ফুট হয়েছে—"এই সব উড় উড় কথার পর এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করা যাক" ইত্যাদি। লোকপ্রচলিত প্রবচন ও বিশিষ্ট বাক্‌ধারা সাধু কাঠামোর মধ্যেও তিনি অবলীলায় স্থান দিয়েছেন, যেমন—পেজমি, ছয়লাপ, ছুঁচ হইয়া প্রবেশ সংগীন হইয়া বাহির, ইত্যাদি।

বোম্বাইচিত্রে চার পরিচ্ছেদব্যাপী দীর্ঘ প্রবন্ধ 'বোম্বাইরায়ত'এ 'সকৃতাহৃত' 'বার্তাশাস্ত্র', 'শিরস্ক' (শিরোনাম অর্থে) 'বরিষ্ঠ (সিনিয়র অর্থে) ইত্যাদি অপ্রচলিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ যেমন আছে, তেমনি কতগুলি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগও এই রচনাটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। ইংরেজি 'subsistence level', 'boom', 'effective' ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে যথাক্রমে 'সর্বনিম্ন গ্রাসাচ্ছাদন', উত্তেজনা', 'ফলোপধায়ী' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ 'বোম্বাই-রায়ত'এ আছে। কিন্তু এতে রচনাটি আড়ষ্ট হয় নি। চলিত শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দগুলির অবস্থানও শ্রুতিকটু হয় নি।

বোম্বাই ভ্রমণের পরে আরও কেউ কেউ ভ্রমণবিবরণ লিখেছেন।[২৬] তবে সত্যেন্দ্রনাথের মতো এত দীর্ঘ পরিসরে তথ্যাশ্রয়ী অথচ প্রাঞ্জল করে অনেকেই বলেন নি। এটি সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ কৃতিত্ব। তৎকালীন দিনে 'বোম্বাই চিত্রে'র জনপ্রিয়তার মানদণ্ডেই গ্রন্থটির সার্থকতা নিরূপণ করা চলে। রায় জলধর সেন নিজেই বলেছেন, হিমালয়ভ্রমণ শেষ করে তিনি 'বোম্বাই চিত্র'-কেই আদর্শ করে প্রথমে লিখতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত স্বর্ণকুমারী দেবীর কথায় তিনি অন্যভাবে লিখেছেন।[২৭]

বোম্বাই চিত্র ও আমার বোম্বাইপ্রবাস

'বোম্বাইচিত্র' গ্রন্থে অজন্তা, কারওয়ার, নাসিক, উত্তরভারত ভ্রমণ, সিমলা-বাস ইত্যাদি প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত ছিল, সেগুলি 'আমার বোম্বাইপ্রবাস' গ্রন্থে লেখা হয়েছে।[২৮] অনেক দর্শনীয় স্থান ও ব্যক্তির প্রসঙ্গ, ধর্মসম্প্রদায়ের কথা 'আমার বোম্বাইপ্রবাস' গ্রন্থে নতুন করে বিবৃত হয়েছে।

তিনি নিজেই বলে গেছেন—'আমার বোম্বাইপ্রবাস' গ্রন্থের অনেক উপকরণই 'বোম্বাইচিত্র' গ্রন্থ থেকে আহৃত। কিন্তু বোম্বাইপ্রবাস গ্রন্থ লেখার সময়ে রচনায় কাটছাঁট বিষয়ে তিনি যে বিশেষ মনোযোগী হয়েছিলেন তা উপকরণগুলির নবভাবে সন্নিবেশ থেকেই বেশ বোঝা যায়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে 'আমার বোম্বাইপ্রবাসে'র রচনারীতি অনেক সংহত। 'বোম্বাইচিত্রে' প্রাসঙ্গিক ভাবে তুকারাম, বোম্বাইরায়ত, ভারতবর্ষীয় ইংরেজ এমন কি বাল্যকালের 'সিংহলে ভ্রমণবৃত্তান্ত'ও স্থান পেয়েছে। সেগুলি 'বোম্বাইপ্রবাস' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। এদের মধ্যে তুকারাম 'নবরত্ন-মালা'য় ও 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিতও হয়েছে। সেই কারণেই 'আমার বোম্বাইপ্রবাসের' সঙ্গে বাল্যস্মৃতি সংযোজনের পরেও আকারে অতটা সুবৃহৎ হয় নি, অথচ কথ্য শব্দের অধিক প্রয়োগে ও বিষয় সন্নিবেশের পারিপাট্যে গ্রন্থটি যথার্থই পরিশোধনের দাবি রাখে। বিশেষত 'আমার বাল্যকথা' লেখার সময়ে নিজের জীবনস্মৃতির পটে যাঁদের সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের কথাই মুখ্য করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন এবং আশ্চর্য সাবলীল ঢঙে এমন মুখোমুখি নিবেদন করেছেন, যা পাঠককে পরিতৃপ্ত না করে পারে না।

১৮৮৯ সালে পারিবারিক খাতায় সত্যেন্দ্রনাথের রচনাগুলি চলিত গদ্যের প্রস্তুতিপর্বের সার্থক নিদর্শন বহন করে। ঐ পর্বে অধিকাংশ সময়ে চলিত গদ্যের হালকা সাজে হৃদয়ের ভাবগুলিকে রূপ দিতে পেরেছেন। যদিও সাধু ক্রিয়াপদ ইত্যাদিতে তাঁর চলিত গদ্য এখানে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়, তথাপি রচনার মধ্যে একটি ঘরোয়া প্রসাদগুণ আছে যা পাঠককে মোহিত করে। পরিজন ও বন্ধুদের আনন্দদান করাই পারিবারিক খাতার রচনা-গুলির প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর মনোমত বিষয় ও পরিবেশ পেয়েছেন, সুতরাং তাঁর প্রকাশও সরস হয়েছে। এই সময় থেকেই আলাপী ঢঙে সহজ করে

বক্তব্য প্রকাশের যে রীতি আয়ত্ত করেছিলেন তা বিষয়ান্তরে প্রয়োগ করতেও তাঁকে দেখা যাচ্ছে।

অষ্টষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের ভাষণ[২৯] দেবার সময় গভীর তত্ত্বমূলক নিবেদনেও ক্রিয়াপদে চলিত রূপ রক্ষা করেছেন—

"তাঁর সিংহাসন সমক্ষে আমাদের হিসাব দেখাবার দিন এই। কিরূপ হিসাব?

আত্মার উন্নতি কতদূর সাধন করেছি॥"

বঙ্গভাষার গঠনে সত্যেন্দ্রনাথের দান বিস্তৃতভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন অধিবেশনে তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা গেছে—ঐ সময় তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মুখের ভাষাকে অপাংক্তেয় করে রাখার অধিকার কারো হাতে নেই। কারণ প্রবহমানতাই ভাষার প্রাণ, তবে মুখের ভাষার সঙ্গে শিল্পসুষমার চর্চাও যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্যই সংস্কৃতানুগ ব্যাকরণ ও বাংলাভাষার প্রকৃতিগত ব্যাকরণ, দুই ধারার সামঞ্জস্যই তাঁর কাম্য ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য বিবরণীতে তাঁর অভিমত স্পষ্ট করেই লিখিত রয়েছে—"অক্ষয় দত্তাদি এবং এখনকার ভাষার সমতা রাখিয়া ভাষার গতিকে স্থির করাতেই পারিলে ভাল হয়।"

এই আদর্শ রীতি মনে মনে ভেবে নিয়েই তিনি ঐ সময় বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থরচনায় হাত দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে চলতি ভাষার মিশ্রণ একটিও নেই। সমাস আড়ম্বরমুক্ত, পরিশুদ্ধ ঝরঝরে ঐ সাধুভাষাকে প্রমথ চৌধুরী যথার্থই প্রসাদগুণসম্পন্ন আদর্শ সাধুগদ্য বলেছেন। (দ্র. বৌদ্ধধর্ম অধ্যায়)। গীতার ভূমিকা লেখার সময়ও এই সাধুভাষাই তাঁর প্রকাশের বাহন হয়েছে। আবার ঘরোয়া সুরে বক্তব্য প্রকাশের সময়—চলিত ঢঙকেই আশ্রয় করে তিনি বেশি তৃপ্তি পেয়েছেন। ন্যাওটো, মুড়িসুড়ি, ব্যাড়াতে, ঝিমচ্ছেন, দেঁড়ো, ঘেঁসতাম না, চুপ্‌টি করে, ইত্যাদি শব্দ আশ্চর্য সুন্দর ভাবে আমার বাল্যকথায় মিশে গেছে যদিও রীতির বিচারে মাঝে মাঝে সাধু ক্রিয়াপদ সর্বনাম ইত্যাদি থাকায় কিছুটা ত্রুটি থেকে গেছে।

আচার্যের ভাষণ

১৯০৬-৭ সালে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে[৩০] তাঁর ধর্মীয় ভাষণে বৈজ্ঞানিক[৩১] ভিত্তিতে বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা যায়। এদিক থেকে তাঁর পদ্ধতি যেমনই আধুনিক, তেমনি আধুনিক যুগের ধনসর্বস্বতার বিরুদ্ধে তাঁর সহজ ঢঙ্ও মর্মস্পর্শী হয়েছে। পরিমিত ভাবাবেগ রচনার ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে—"বন্ধুগণ! ধনেতেই আমরা বড় হই না—মহত্ত্বের মনুষ্যত্বের লক্ষণ অন্য।...মনে রেখো এই সংসারে তোমার আমার দুদিনের তরে মিলন বৈ নয়।...আমরা একই তীর্থের যাত্রী, পথে কিছু দিনের জন্য দেখা সাক্ষাৎ।"[৩২]

আদি ব্রাহ্মসমাজে বুধবারের উপদেশ ছাড়াও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দিনে সত্যেন্দ্রনাথের বক্তৃতা যে জনগণের হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠাতেই তা লিখিত রয়েছে।[৩৩]

সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের শেষবেলাকার আর একটি ভাষণের উল্লেখ করেই এ আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। নববর্ষের মহিমাজ্ঞাপক একটি আদর্শ রচনা হিসেবে ভাষণটি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে ক্ষিতীন্দ্রনাথের সম্পাদিত ১৮৪৬ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।[৩৪]

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি ক্ষিতীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ মনোভাব থেকেই ধারণা করা যায় যে ভাষণটি কোনরূপ সম্পাদনার স্পর্শ ছাড়াই যথাযথ রূপে মুদ্রিত হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে গভীর ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রেও এই ভাষণটি সত্যেন্দ্রনাথের চলিত রীতির সার্থক নিদর্শন। ভাষার অসাধারণ লালিত্য গুণে এটি পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে অথচ এতে একটিও সাধু চলিতের মিশ্রণ চোখে পড়ে না।

সত্যেন্দ্রনাথ মূলত মননশীল লেখক, তিনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক নন। কিন্তু গদ্য রচনায় আধুনিকীকরণ ও শিল্পসৌন্দর্য সাধনের প্রচেষ্টা—তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও থেমে থাকে নি। ১৯১৫ সালে 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাইপ্রবাস' নামক গ্রন্থপ্রকাশের পরবর্তী পাঁচ ছ' বছরে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ও পরিবর্ধনের কাজেই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর শারীরিক অপটুতাও হয়তো বা ঐ সময় কোন নূতন গ্রন্থ হাতে নেওয়ার অন্তরায় হয়ে থাকতে পারে। তবে ইতোমধ্যে কোন নূতন লেখা না লিখলেও রবীন্দ্র-প্রমথের সান্নিধ্যে তাঁর গদ্য লেখার ঢঙ যে ক্রমেই সব রকম বিষয়ের ক্ষেত্রে

চলিত রীতির দিকেই ঝুকেছিল তার প্রমাণ পূর্বোক্ত ভাষণটিতে সুস্পষ্ট। তার উদ্ধৃতি দিয়েই আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

"হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও, প্রবৃত্তির বেগে সমস্তকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করো না, সকলের চেয়ে বড় হব, সকলের চেয়ে কৃতকার্য্য হয়ে উঠব, এইটেকেই তোমার জীবনের মূলতত্ত্ব বলে জেনো না।...প্রেমে নত হয়ে একেবারে সেইখানে গিয়ে তোমার মাথা ঠেকুক, যেখানে জগতের ছোট-বড় সকলেই এসে মিলেছে।"

১. "তাঁর বম্বে প্রবাস ভারতীতে আমার মতই চলিত বাংলায় লিখেছিলেন। ...'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় মেজদাদার উক্ত লেখার বিরুদ্ধে সমালোচনা বেরিয়েছিল। সম্পাদক মহাশয় এই মর্মে লিখেছিলেন : 'শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মত প্রবীন সাহিত্যিক প্রাদেশিকতা রক্ষা করিয়া 'বম্বেপ্রবাস' বিষয় 'ভারতী'তে লেখায় বঙ্গ সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হইল।'" রবিতীর্থে অসিত হালদার। পৃ. ১৫।

২. "আমার পিতা সেই 'ঢাকা রিভিউয়ের' সমালোচনা রাঁচিতে মেজদাদা মহাশয় এবং তাঁর জামাতা প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে একযোগে দেখান, ফলে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'সাধুভাষা-বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধ চলিত বাঙলায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন 'ভারতী'তে এবং অব্যবহিত পরে তাঁর 'সবুজপত্র' পত্রিকায় সেই ধারা বজায় রাখেন।'" রবিতীর্থে অসিত হালদার। পৃ. ১৬।

৩. বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা : প্রমথ চৌধুরী। (ভারতী ১৩১৯ পৌষ)—প্রবন্ধ সংগ্রহ ১ম খণ্ড (মে ১৮৬১ মুদ্রণ পৃ. ২২১)

৪. প্রমথ চৌধুরী : সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা : (ভারতী ১৩১৯ চৈত্র) প্রবন্ধ সংগ্রহ—ঐ—পৃ. ২৩২

৫. ঐ পৃ. ২৩৩।

৬. ঐ : বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা— পৃ. ২১৯

৭. "এই গ্রন্থে সাধুভাষা ও চলিত ভাষা এ উভয়েরই সম্মিশ্রণ দৃষ্ট হইবে। ...কোন কোন পণ্ডিত সাহিত্য-ক্ষেত্রে কথিত ভাষার ব্যবহার নানা কারণে দূষ্য বিবেচনা করেন, আবার 'বীরবল' প্রমুখ অপর একদল সাহিত্যক আছেন যাঁহারা ঐ ভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। আমি প্রয়োজন মত এই দুই প্রকার ভাষার উপযোগ করিয়া উভয় পক্ষেরই মনোরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছি"। —আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস ; ভূমিকা।

৮. তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তার জন্য ইংরেজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না...।—প্যারীচাঁদ মিত্র : বঙ্কিমচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সমালোচনা সংগ্রহ—৬ষ্ঠ সং পৃ. ২৪০।

৯. আমি এমন বলিতেছি না যে, আলালের ঘরে দুলালের আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। ঐ পৃ. ২৪০।

১০. পৃ. ২৪০—ঐ

১১. বাবুরাম বাবু চৌগোঁপ্পা—নাকে তিলক—ওগ্রাপেড়ে ধুতি পরা—ফুলপুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মতো...ইতস্তত: বেড়াইয়া চাকরকে বলেছেন, ওরে হরে। শীঘ্র বালি যাইতে হইবে...। (আলাল)

হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দেখাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা...। হুতোম প্যাঁচার নকশা।

১২. 'ন্যাড়া মাথায় বাড়ীময় ঘুরে বেড়ানো আর সকলের কাছ থেকে ব্রহ্মচারী বলে অভিনন্দন পাওয়া—মনে মনে কত গর্ব হচ্ছে—যেন আমি কি একটা ধনুর্ধর হয়েছি, অথচ ব্রহ্মচর্য কাকে বলে মানবক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ'—আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৫৮—বৈতানিক প্রকাশনী।

১৩. বাংলা সাহিত্যের একদিক : শশিভূষণ দাশগুপ্ত। পৃ. ১০২।

১৪. সিংহল উপদ্বীপে ভ্রমণবৃত্তান্ত—সিংহল ভ্রমণের দিনলিপি। ১৭৮১ শক পৌষ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। পরবর্তী-কালে বোম্বাই চিত্র গ্রন্থের সংগে 'সিংহলে ভ্রমণবৃত্তান্ত' নাম পুনর-মুদ্রিত হয়েছে। (দ্র. এই গবেষণার বৌদ্ধধর্ম অধ্যায়)।

১৫. মহর্ষির পত্রাবলী—৫৪নং পত্র পৃ. ৭৬। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত। (৮ই পৌষ ১৭৮১ শক)—'আমি সিংহল উপদ্বীপে সত্যেন্দ্রনাথকে সংগে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তাহার পথে যাইতে আসিতে এবং সিংহলে যে কয়েক দিবস ছিলেন সেই কয়েক দিবসে তাঁহার যে সকল মনোভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এই পৌষ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইয়াছে। তাহা দেখিলে সিংহলের ভাব অনেক বুঝিতে পারিবে।'

১৬. 'ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সত্যেন্দ্রবাবুর লিখিত বৃত্তান্ত এই পরিভ্রমণ বৃত্তান্তের অনুবাদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, উহা যে অনুবাদ মাত্র নহে তাহা অনায়াসে বুঝা যায়।' উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় : আচার্য কেশবচন্দ্র (শতবার্ষিকী সং) পৃ. ১০২।

১৭. একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণ : তত্ত্ববোধিনী —১৭৮২ শকের ফাল্গুন-এ মুদ্রিত।

১৮. একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের ভাষণ—১৭৮২ শক ফাল্গুন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

১৯. ব্রাহ্ম ধর্মের মত ও বিশ্বাস (প্রধান আচার্য মহাশয় কর্তৃক ১৭৮১-৮২ শকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত দশ উপদেশ) উপক্রমণিকা : সত্যেন্দ্রনাথ।

২০. একমেবাদ্বিতীয়ম : দ্বাচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা। ১১ই মাঘ ১৭৯৩ শক।

২১. ঐ —উদ্ধৃত।

২২. আদি ব্রাহ্মসমাজে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৩৯৩ শকের ফাল্গুন মাসে বিবৃত হয়। (কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিংকর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত। ১৭৯৪)

২৩. ১৮৯৪ শকে প্রকাশিত, ১৮৯৩ শক ফাল্গুনে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণ।

২৪. ১২৯৫ সালে প্রকাশিত বোম্বাইচিত্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২৫. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণ কাহিনীগুলি নানা স্থানে সাহিত্যের মর্যাদা লাভের অধিকারী হইয়াছে। বর্ণনাগুলি স্থানে স্থানে ছবির মতন ফুটিয়াছে, রচনারীতিও সাবলীল।' শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বাংলা-সাহিত্যের একদিক—পৃ. ২১৫।

২৬. দ্র. বোম্বাইভ্রমণ : ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্ণিমা পত্রিকা (৩য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা) ১৩০২ শ্রাবণ-ভাদ্র।

২৭. সত্যেন্দ্রনাথের শোকসভায় সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন এর ভাষণ। ৩রা চৈত্র ১৩২৯ (১৭ই মার্চ, ১৯২৩)।

২৮. গ্রন্থের ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন—'আমার বাল্যকথা' ও বোম্বাই প্রবাস'। গ্রন্থের ভিতরের পৃষ্ঠায় 'আমার বাল্যকথা' ও আমার বোম্বাইপ্রবাস' স্বতন্ত্র ভাবে মুদ্রিত। সেজন্যই 'আমার বোম্বাই প্রবাস' পৃথক্ করে উল্লেখ করা গেল।

২৯. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ফাল্গুন ১৮১৯ শক।

৩০. শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে বৃত হইলেন ...তত্ত্ববোধিনী ১৮২৭ শক ফাল্গুন।

৩১. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আচার্যের ভাষণ—আত্মশক্তি—শ্রাবণ ১৮২৮ শক, তত্ত্ববোধিনী।

ঐ ঐ —জীবন-শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কার্তিক ১৮২৮ শক তত্ত্ববোধিনী।

৩২. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আচার্যের ভাষণ—ধনলালসা চৈত্র ১৮২৮ শক তত্ত্ববোধিনী।

৩৩. মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব—১৮২৮ শক আষাঢ়।

৩৪. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : নববর্ষ।

পঞ্চম অধ্যায়

শিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ   সত্যেন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা   গান   অভিনয়   আবৃত্তি

সত্যেন্দ্রনাথের শিল্পী সত্তা

জাতীয় জীবনের চিন্তাবিৎ সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিন্তার বিশ্লেষণের পর তাঁর শিল্পীসত্তার পরিচয় না দিলে অপূর্ণতা থাকে। বিভিন্ন আসরে সংগীত রচনায়, অভিনয়ে অংশগ্রহণে ও পরিচালনায়, আবৃত্তিচর্চায়, শখের ছদ্মবেশ-ধারণে ও যন্ত্রসংগীতের অভ্যাসে তাঁর শিল্পীমনের পরিচয় সুপরিস্ফুট। চিত্রাংকনে তাঁর নিজস্ব প্রতিভার নিদর্শন না পাওয়া গেলেও চিত্রশিল্পে তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। আমেদাবাদে অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রাংকন-শিক্ষার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ উপযুক্ত শিক্ষক রেখেছিলেন।[১]

ঠাকুরপরিবারের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অসিত হালদারের অজন্তা গুহার ছবির প্রতিলিপি সংরক্ষণে সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন। সগৌরবে একথা 'আমার বোম্বাই-প্রবাস' গ্রন্থেও (পৃ. ১১৪) উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'আমার বোম্বাইপ্রবাস' যখন 'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত হয় তখন শিবাজীর আফজল খাঁ হত্যাকে নিয়ে একটি ছবিও তিনি অসিত হালদারকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন। ছবিখানি তাঁর মনের মতো হয় নি। এ প্রসংগে রাঁচি থেকে তিনি অসিত হালদারকে যে পত্র লিখেছেন তাতে তাঁর প্রখর চিত্রসমালোচনা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।[২]

উপযুক্ত শিল্পীর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া ও সমাদর করা তিনি উচিত বলেই মনে করতেন। চিত্রকর শশী হেস-এর একজন গুণগ্রাহী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি যাতে ছবির অর্ডার পান সেদিকে রবীন্দ্রনাথের মতো সত্যেন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি ছিল। [দ্র. পিতৃস্মৃতি : রথীন্দ্রনাথ, পৃ. ৮৬] বিদেশিনী হয়েও আমাদের অজন্তা গুহার 'চিত্রোদ্ধার' কার্যে লেডি হ্যারিংহাম-এর উদ্যোগে সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ সাধুবাদ দিয়েছেন।[৩]

গান

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে উচ্চাংগ সংগীতের আসর থেকে ও বিষ্ণু চক্রবর্তীর[৪] সান্নিধ্যে শৈশব থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ সংগীতের পরিমণ্ডলে বড় হয়ে উঠেছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়—"মৌলাবক্স, যদুভট্ট প্রভৃতি বড় বড় সংগীতজ্ঞরা আসর জমিয়েছেন এ বাড়ির বৈঠকখানায়।"[৫] এছাড়াও

সংগীতজ্ঞ রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজচন্দ্র রায় প্রমুখেরা এ বাড়িতে আসর জমাতেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী'র কাছে সংগীত শিক্ষায় যে আনন্দ লাভ করেছিলেন তা পরবর্তী কালে নিত্য নূতন ব্রহ্মসংগীত রচনায় ও পরিবেশনে আরও বিকশিত হয়েছে। তরুণ বয়সেই দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা লিখে রাখবার ভার সত্যেন্দ্রনাথের উপর থাকায় ব্রাহ্মধর্মের মূল ভাবগুলি সত্যেন্দ্রনাথের মনে অবিরত অনুরণিত হতো। সেজন্যই অতি সহজে ঐ ভাবগুলি তিনি তাঁর সংগীতে পরিবেশন করতে পেরেছেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী ধ্রুপদ খেয়ালই বেশী গাইতেন। সত্যেন্দ্রনাথের শৈশবে ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপূজার সময় বিষ্ণু চক্রবর্তী যে আগমনী বিজয়া সংগীত গাইতেন তার রসও ছিল উচ্চাঙ্গের। যাত্রার আসরের গানের চেয়ে তার সুর ছিল সম্পূর্ণ পৃথক্। সত্যেন্দ্রনাথের নিজের কথায়—"যাত্রার গান যেমন প্রাকৃত বিষ্ণুর তেমনি classical—সে কি চমৎকার ঠেকত, শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী মোহিত হয়ে যেত।"[৬] জীবনের প্রান্তসীমায় এসেও বিষ্ণুর গাওয়া আগমনী গান সত্যেন্দ্রনাথ ভুলে যান নি।[৭] উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে চলে গেলেও বিষ্ণুর সংগীতশিক্ষার আসরের অভাব তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছেন। ১৮৬২-র ১০ই জুন লণ্ডন থেকে গণেন্দ্রনাথকে লেখা পত্রে স্পষ্টভাবেই বিষ্ণুর স্মৃতি জাজ্বল্যমান রয়েছে।[৮]

শৈশবের এই সংগীত শিক্ষাগুরুর প্রভাবে 'কালোয়াতি' গানের একটা ঠাট[৯] যে শুধু রবীন্দ্রনাথের মনে 'জমে উঠেছিল' তা নয়, অল্পবিস্তার তা তাঁর অগ্রজদের ক্ষেত্রেও সক্রিয় হয়েছিল। কালোয়াতি গানের প্রভাব অন্যান্য ভ্রাতাদের মধ্যেও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিষ্ণুর হিন্দী গান ভেঙেই সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথমে ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন একথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি প্রবন্ধে উল্লিখিত। (প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৮)। পরবর্তী কালে সত্যেন্দ্রনাথ দূরে চলে যাওয়ার পরেও নানা ওস্তাদের সুর ভেঙে ব্রহ্মসংগীত রচনার উৎসাহ দ্বিজেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে জেগে ওঠে।[১০]

বিষ্ণুর হিন্দী গান ভেঙে সত্যেন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম ব্রহ্মসংগীত রচনার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত সে যুগে যে সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল একথাও ঐ গ্রন্থ থেকে জানা যায়।[১১]

রামমোহনের যুগে ব্রহ্মসংগীত ছিল তত্ত্বমূলক। পিতার ধর্মচেতনায়

উদ্বোধিত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তত্ত্বের সংগে হৃদয়ের সংযোগে ব্রহ্মসংগীতে নূতন ভাবের সঞ্চার করলেন। তখন তাতে উপাসকগণ আপন হৃদয়ের সুর খুঁজে পেলেন।

বিদেশে গিয়েও সত্যেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে ব্রাহ্মধর্মের সংস্কৃত শ্লোকআবৃত্তি ও গীতি-উপাসনা শত কাজের মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখে-ছিলেন।

কর্মস্থলে রাজকাজের গুরুভার নিয়েও সত্যেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত রচনায় আকুলতা নিঃশেষ হয়ে যায় নি। যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই পিতার নিকট ব্রহ্মসংগীত লিখে পাঠিয়েছেন।[১২] গানগুলি কেমন হলো তা জানতে তিনি উদ্‌গ্রীব থাকতেন। গান লিখেই শুধু তাঁর পত্রাবলী থেকে জানা যায়।[১৩] গানগুলির মধ্যে দু একটি গান যদি ১১ই মাঘের উৎসবে গীত হতো তাহলেই তিনি সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি পেতেন। সুদূর কর্মস্থলে থেকেও ১১ই মাঘের উৎসবের যোগ দেবার আনন্দ তিনি এর দ্বারাই লাভ করতেন।[১৪] নানা ছন্দে পরীক্ষানিরীক্ষার পর নূতন ব্রহ্মসংগীত লিখেই তিনি গণেন্দ্রনাথের অভিমত জানতে আগ্রহী হতেন। ওদিকে জোড়াসাঁকো থেকে ওঁদের লেখা গানগুলিও গণেন্দ্রনাথ তাঁকে পাঠাতেন। জোড়াসাঁকোয় পাঠানো সত্যেন্দ্রনাথের সংগীতগুলিতে সুর বসিয়ে পরখ না করা পর্যন্ত রচনা সম্পর্কে তাঁর সংশয় দূর হতো না নিজের লেখা গানের সুর সম্পর্কেও যেমন তাঁর আগ্রহ ছিল তেমনি অন্য ভাইদের লেখা নতুন গানের সুর শুনতেও তিনি উৎসুক থাকতেন।[১৫] মেঘদূতের ছন্দে তিনি যে গান লিখে গণেন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মন্দাক্রান্তার সাতাশ মাত্রার পর্ব বজায় রাখতে তিনি বিশেষ চেষ্টা নিয়েছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা উচ্চারণপদ্ধতি দিয়ে ছন্দটির বিচার করা যায় না। গানের জন্য রচিত বলেই দীর্ঘ স্বরগুলিকে দুমাত্রা ধরা চলে। যেমন :

২ ২২ ২ ১১১১১২ ২১২১১২ ২
পাপে তাপে | বিকলিত মনঃ | শীঘ্র সন্তাপ নাশো |

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত' একাদশ সংস্করণে এই গানটি সত্যেন্দ্রনাথের নামে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে (পৃ. ৫১৯)।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত'-এর ত্রয়োদশ সংস্করণে সত্যেন্দ্র-

নাথের সাঁইত্রিশটি ব্রহ্মসংগীত লিপিবদ্ধ হয়েছে। একাদশ সংস্করণেও আরও ষোলোটি সংগীত মুদ্রিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের রচিত সংগীতগুলির একটি তালিকা এ অধ্যায়ের শেষে সন্নিবেশিত হলো।

বিভিন্ন পত্রাবলী থেকে সত্যেন্দ্রনাথের রচিত কয়েকটি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারীকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথের একটি গানের উল্লেখ আছে। গানটি জীবনের শেষবেলায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কত প্রিয় ছিল তা তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়। গানটির প্রথম লাইন—'কেহ নাহি আর আমার সব তুমি'।[১৫]

গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত ১৮৬৯ খ্রী: ২৪শে জানুয়ারীর পত্রে পাদটীকা ১২) যে পাঁচটি গান তিনি লিখে পাঠিয়েছেন তার মধ্যে 'ইচ্ছা হয় সব' ভুলে' সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত' একাদশ সংস্করণে ও 'হে করুণাকর, দীনসখা তুমি', 'মংগলনিদান বিঘ্নের কৃপাণ' ত্রয়োদশ সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছে। 'দীন দয়াময় ভুল না অনাথ' ও 'কৃপাসাগর হে অখিল জগৎপাতা' এ দুটি গান উক্ত দুই সংস্করণে সত্যেন্দ্র-নাথের রচিত বলে কোন নির্দেশ নেই।

দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাংগালীর গান' গ্রন্থে

১. জয় জয় পরব্রহ্ম অপার তুমি অগম্য (পৃ. ৬০৯),

২. অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুল না রে তাঁয় (পৃ. ৬১০),

৩. অচল ঘন গহন গুণ, গাও তাঁহারি…(পৃ. ৬১০) এবং

৪. দরশন দাও হে হৃদয়সখা…(পৃ. ৬১০) প্রভৃতি সংগীত সত্যেন্দ্রনাথের গান বলে উল্লিখিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলির কোনটিই যে সত্যেন্দ্র-নাথের রচিত নয় তা ব্রহ্মসংগীত দ্বাদশ সংস্করণ থেকে জানা যায়। ঐ গ্রন্থে সংগীতগুলির রচয়িতা যথাক্রমে ১—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃ. ১০৪) ২—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃ. ১৪) ৩—বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় (পৃ. ১১৯) ৪—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃ. ১৮৬) বলে মুদ্রিত।

''ব্রহ্মসংগীত' ত্রয়োদশ সংস্করণে (পৃ. ১৫) ও একাদশ সংস্করণে (পৃ. ২৮) 'কেন ভোলো ভোলো চিরসুহৃদে', (কুকব, আড়াঠেকা) দেবেন্দ্রনাথের রচনা বলে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। কলকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগে সংগীত বিশেষজ্ঞদের সংগে আলোচনায় জানতে পারা যায় ইন্দিরা দেবী এই

গানটিকে—'বাবার লেখা' বলে মন্তব্য করেছেন। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি ২য় খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠার পাদটীকায়ও এই গানটি যে সত্যেন্দ্রনাথের বলে ইন্দিরা দেবী বলেছেন তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সমাজে প্রচলিত সুরের সংগে গানটির সুরের পার্থক্যের কথাও সেখান থেকে জানা যায়।[১৬] বিশ্বভারতী থেকে 'সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনী'কে নিয়ে সুপ্রিয় ঠাকুর প্রমুখ গুণি-জনের দ্বারা ১৯৭৫-এর ২৮শে এপ্রিল যে বেতার অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছিল তাতে স্পষ্ট করেই এই গানটি সত্যেন্দ্রনাথের রচনা বলে বিঘোষিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র[১৭] সূত্রে 'তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে' এই সংগীতটি বহুল প্রচারিত হলেও এর মূল রচয়িতার সন্ধান অনেকদিন পর্যন্তই অজ্ঞাত ছিল। বিভিন্ন স্থানে গানটির রচয়িতারূপে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের নাম থাকায় আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীকিরণশশী দে এই গানটির প্রকৃত রচয়িতা কে এ প্রশ্ন তুলেছিলেন, তারা উত্তরে শ্রীপুলিনবিহারী সেন সংশয় নিরসনের জন্য যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেছিলেন।[১৮]

প্রকৃতপক্ষে এই সংগীতটির রচয়িতা কে এই সংশয় নিরসনের সবচেয়ে বড় সহায়ক শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, যার উল্লেখ আমরা কিছু আগেই করেছি। সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি থেকে এ গানটি যে তাঁরই রচনা তাঁরই রচনা তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (দ্র. মেজপ্র কপি) দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা ব্রহ্মসংগীত সম্পর্কে এ ধরণের সংশয় জাগা যে অমূলক নয় এ প্রসংগে পূর্বোক্ত পত্রিকায় শ্রীপুলিনবিহারী সেন-এর বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে—"রচয়িতাদের নামোল্লেখ ব্যতীত সমসাময়িক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" এগুলি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রচয়িতাদের 'গৃহিণীপনার অভাবে' তাঁদের স্বকীয় নামে সমসাময়িক কোনো গ্রন্থে বা তাঁদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে সংকলিত হতে বড় দেখা যায় না। ...যে আদি ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে এগুলি গীত হয়েছে তাঁদের প্রকাশিত ব্রহ্মসংগীত গ্রন্থ যতদূর দেখেছি তাতে কোনো গানের রচয়িতার উল্লেখ নেই। ফলে পরবর্তী কালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক ভ্রাতার রচিত গান অন্যের নামে দীর্ঘকাল ধরে প্রচারিত হয়েছে...।"

১৭৯১ শকের আষাঢ় সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রচয়িতার নাম ছাড়াই এই সংগীতটি প্রকাশিত হয়েছিল। গানটির স্বরলিপিকার যে দ্বিজেন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে শ্রীপুলিনবিহারী সেন উপযুক্ত তথ্য প্রদান করেছেন।[২০] দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' (১৩১২) গ্রন্থে এই গানটি সত্যেন্দ্রনাথের রচনা বলেই উল্লিখিত হয়েছে। তবে 'এই গ্রন্থে তথ্যের মুদ্রণে প্রমাদ অত্যন্ত বেশি' বলেই বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন।[২১] 'হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংগীত-সার-সংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩০৬) সত্যেন্দ্রনাথের নামে এই সংগীতটি মুদ্রিত হয়েছে' বলে শ্রীপুলিনবিহারী সেন উল্লেখ করেছেন। যদিও ঐ গ্রন্থে 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনাও সত্যেন্দ্রনাথের নামে উল্লিখিত হয়েছে' বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এছাড়াও কাঙ্গালীচরণের ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন' একথার উল্লেখ থাকলেও আলোচ্য গানটি সেখানে দ্বিজেন্দ্রনাথের নামেই মুদ্রিত। কিন্তু সকল সংশয়ের নিরসন হয় সত্যেন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত পত্রের দ্বারা :

ক) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র। ডেলিভারী পোস্টমার্ক ৩০শে জানুয়ারী ১৮৬৯। দ্র. এই অধ্যায়ের শেষে পরিবেশিত যেরক্স কপি।

খ) গণেন্দ্রনাথকে লিখিত ইংরেজি পত্র। সাতারা, ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ দ্র. ঐ।

সত্যেন্দ্রনাথের জাতীয়সংগীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' জনগণের মনে তৎকালে কি বিপুল উদ্দীপনা এনেছিল তা স্বদেশচেতনা অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সাহিত্যসাধক চরিতমালায় (৬৭ নং) সংগীতটির রাগিণী খাম্বাজ, তাল আড়াঠেকা পাওয়া আছে। সরলা দেবীর 'শতগান'-এ (তৃতীয় সং, পৃ. ১৩৯) গানটির রাগিনী খাম্বাজই আছে, তাল একতালা (এই গানটি ষষ্ঠ পংক্তি 'শতগান' (৩য় সং), আছে—'শতখনি রত্নের নিদান', সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৬৭-এ 'শতখনি রত্নের নিধান' রূপে মুদ্রিত। গানটির ত্রয়োদশ পংক্তি 'শতগান'-এ আছে—'দময়ন্তী পতিব্রতা', সাহিত্যসাধক চরিতমালায় 'পতিরতা' রূপে মুদ্রিত। হিন্দুমেলার সময়ে যে সুরে এ গানটি গীত হতো তা পরিবর্তিত করে জোরালো সুর দেওয়ার কথাও স্বদেশচেতনা অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সংগীতভারতী শ্রীবাণী দেবী D. Mus. 'জয় ভারতের

জয়' স্বরসংবাদের প্রারম্ভেই লিখেছেন—'পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জয় ভারতের জয়' গানটির Chorus অবলম্বন এই স্বরসম্বাদটি রচিত হইয়াছে। ...এই গৎটি বাজাইতে হইলে নিম্নমত বাদ্যযন্ত্রগুলি আবশ্যক...।' সেখানে রাগিণী মিশ্র খাম্বাজ, তাল পটতাল পাওয়া যাচ্ছে।

ব্রহ্মসংগীত ত্রয়োদশ সংস্করণের ৫৪ পৃষ্ঠার মুদ্রিত সত্যেন্দ্রনাথের 'প্রথম কারণ আদি কবি' গানটির সংগে সরলা দেবীর—'শতগান' ৩য় সংস্করণের ১৯৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রূপের কয়েকটি স্থানে পার্থক্য চোখে পড়ে।

ব্রহ্মসংগীত ত্রয়োদশ সংস্ককরণে ৫৪ পৃষ্ঠায় গানটির ৪র্থ পংক্তি আছে —'আহা কেমন মনোহারী', সরলা দেবীর শতগান-এ আছে—'আহা কি বা মনোহারী'। ব্রহ্মসংগীত ত্রযোদশ সংস্করণে ৫ম পংক্তি—'দিশি নিশি সৌন্দর্য-ভাতি', সরলা দেবীর শতগানে আছে—'দিকে দিকে সৌন্দর্যভাতি'। ত্রয়োদশ সংস্করণে এই গানের সুর শুক্ল বেলাওল, শতগানে সুর হিন্দুস্থানী।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও শিল্পীরা বিশেষ আগ্রহে তাঁর সংগীতের চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেম। এখনও তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় নি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগীত প্রকাশ কমিটির সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী 'ব্রহ্মসংগীত' একাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তৎকালীন দিনের ব্রহ্মসংগীত রচনা সম্পর্কে বলেছেন "বিষয়সূচীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক নিশ্চয়ই ইহা অনুভব করিয়া সুখী হইবেন যে ব্রহ্মসংগীতের গানের মধ্যে সংসারের সম্বন্ধে অভিযোগের ও বিরাগের ভাব ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে। .. ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর, প্রফুল্ল চিত্তে দুঃখ ও সংগ্রামবরণ, প্রভৃতি ভাবের গানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ...এখনও সংকল্প-দ্যোতক গানের সংখ্যা বড়ই কম...।"

সত্যেন্দ্রনাথের কোনো ব্রহ্মসংগীতে সংকল্পের পূর্ণ দ্যোতনা রয়েছে।

প্রেমমুখ দেখো রে তাঁহার
শুভ্র, সত্যস্বরূপ, সুন্দর, নাহি উপমা তাঁর...

এই বিখ্যাত সংগীতটিতে প্রথমদিকে ঈশ্বরের স্বরূপ ও করুণার মহিমা ব্যক্ত হলেও শেষ দুই ছত্রে এক সর্বত্যাগী মহান সংকল্প গীতরচয়িতা সত্যেন্দ্রনাথের সমস্ত সত্তায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে।—

'যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ,
ছাড়ি যাব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান।'

'অপার করুণা তোমার' এই সংগীতটিতেও ঈশ্বরে করুণার মাহাত্ম্য দিয়া শুরু হলে শেষ হয়েছে এক মহান সংকল্প দিয়ে…

'তোমা বিনা চাহি না, চাহি না কিছু আর
সম্পদ বিষসম তোমায় ছাড়িয়ে…'

সত্যেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত শুধু অনুতাপ ও বিলাপের নয়—শান্তি ও আশার বাণী নিয়ে এসেছে—

'শোকে মগন কেন জর্জর বিষাদে,
ভ্রমিছ অরণ্য মাঝে হয়ে শান্তিহারা ॥
যাঁর প্রীতি-সুধার্ণবে আনন্দে রয়েছে সবে,
তাঁর প্রেম নিরখিয়ে মুছ অশ্রুধারা ॥'

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তির অধ্যায়ে তাঁর রচনাশক্তির পরিচয় প্রদানে আমরা চেষ্টিত হয়েছি। রচনার পরিপাট্য-বিধানে যে তিনি কিছুমাত্র উদাসীন ছিলেন না বরং বিশেষ যত্নশীল ছিলেন তার আলোচনা আমরা সেখানেই করেছি। তথাপি কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে মূলের প্রতি আনুগত্য রক্ষার যে সজাগ দৃষ্টি তাঁকে রাখতে হয়েছে, গানের ক্ষেত্রে সে প্রয়োজন নেই বলে সত্যেন্দ্রনাথের রচনা এখানে আরও সাবলীল ও ভাব আরও স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের সংগীত তাঁর মৌলিক রচনাশক্তির পরিচয় বহন করে বলেই এখানে তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার যথার্থ রূপ ধরা পড়ে।

সত্যেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ব্যাপক প্রচারিত হয়েছিল। নিজের ও অন্যান্যদের রচিত অনেকগুলি ব্রহ্মসংগীতের মারাঠী অনুবাদে তিনি রা-জহুরেকে সাহায্য করেছিলেন। যেমন :

দয়াঘন তুজবিন কো হিতকারী (দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী)
—সত্যেন্দ্রনাথ।

সোডী মহিবরী শান্তিচে বারি (বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি)
—রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথের সংগীত বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে এক নিবিড় সংযোগ সেতু

রচনা করেছে। একথা সগৌরবে দ্বারকানাথ গোবিন্দ বৈদ্য[21] স্মরণ করেছেন,—'বাংগলা ও মহারাষ্ট্র এই দুই প্রদেশে যতদিন ভক্তিমার্গের লোক আছে ততদিন তাঁহার স্মৃতি স্থায়ী না হইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার রচিত স্বয়ংস্ফূর্ত পদাবলীর দ্বারা এই মহৎ কার্য সাধিত হইবে, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। ...আমাদের পুরাতন সংগীতের মধ্যে তাঁহার কতকগুলি পদাবলী গৃহীত হইয়াছে।'[22]

কলকাতা থেকে দূরে থাকার ফলে অনেকেরই জানা ছিল না যে সত্যেন্দ্রনাথ গান গাইতে জানেন। এ প্রসংগে ইন্দিরা দেবী বলেন—'ব্রাহ্মসমাজের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সে বিষয়ে তাঁর আন্তরিক উৎসাহের কথাও অনেকে জানেন, তবে তিনি যে নিজে গাইতে পারতেন এবং ব্রহ্মসংগীত তৃতীয় ভাগের প্রায় সমস্ত গানই যে তাঁর রচনা তা হয়তো জানেন না।'[23]

সোলাপুর ছাড়বার আগে 'মতিবাগে' স্থানীয় উকিলদের আয়োজিত বনভোজনের মাধ্যমে সত্যেন্দ্রনাথের বিদায় সম্বর্ধনা; উদ্যোক্তাদের বিশেষ ইচ্ছায় খাওয়ার শেষে অনুষ্ঠিত সভায় মারাঠী যুবকের 'জয় ভারতের জয়' গীত পরিবেশন ও সংগীতটির শিক্ষাদানে ইন্দিরা দেবীর নিরলস প্রয়াস, তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায়।[24] প্রসংগত সংগীতটির সুর ও ভাব সম্পর্কে নানা তথ্যও তাঁর কথায় পরিস্ফুট। "—'ভারতের জয়'টা মতিবাগে গাওয়া হয়। তাই যে টুকু সময় ছিল ওটা শেখাতে গেল। ছেলেটা এদিকে যদিও গায় মন্দ না...কিন্তু...খালি কানে শুনে শিখত, তাই তার নিজের ঝোঁকের মাথায় খাম্বাজের তান দিতে আরম্ভ করত, আর ঠিক প্রত্যেক সুরটা আলাদা ধরতে পারত না।"[25]

দু রকম সুরেই যে সংগীতটি গীত হতো সে কথাও ইন্দিরা দেবীর বক্তব্য থেকে জানা যায়—"আমাদের ফেসানের ইংরিজিয়ানা সুরটা ওকে শেখালুম না, মনে হল ওর গলায় সেটা নিতান্ত বেমানান হবে, টানা সুরেই সবটা গাইতে বল্লুম। তবু 'ভারতের জয়'-এর ওখানটা যথেষ্ট নাচুনে আছে, সে কিছুতেই ঠিক ঝোঁক রেখে রেখে ওটা গাইতে পারত না।' শেষপর্যন্ত গানটি যখন পরিবেশিত হলো তখন ইন্দিরা দেবীর মনে হলো শুধু মিষ্টি গলা হলেই জাতীয়সংগীত পাওয়া যায় না। এর জন্য বেশ জাঁকালো কণ্ঠ চাই। বিশেষ করে এ গানটি একক পরিবেশনের জন্য নয়—'পিয়ানোর সংগে অনেকে মিলে

গাবার জন্য হয়েছে।" কলকাতায় সমবেত কণ্ঠে পিয়ানোর সংগে গাইলে গানটি এমন জমজমাট হতো যে 'শুনলে খুব মুমূর্ষু ভারতবাসীরও প্রাণে একটু উৎসাহের সঞ্চার হয়'—ইন্দিরাদেবী মন্তব্য করেছেন। মূল গানটির সুর যথাযথ রেখে মারাঠী শব্দ বসানোর ফলে ভাবের বিশেষ কোন পার্থক্য ঘটে নি। তবে বাংলা ভাষায় 'কি ভয় কি ভয়' শব্দের মধ্যে যে আশার উদ্দীপনা রয়েছে মারাঠী 'কা ভয়, কা ভয়' এর মধ্যে তা ফুটে উঠতো না। মারাঠীতে যথাযথ ভাব প্রকাশিত না হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ মনে কখনো বা পদটি বদলে দেবার কথাও ভেবেছেন। কিন্তু এই পদটির সংগে সমগ্র গানের যে অংগাংগী সম্পর্ক আছে তা ইন্দিরাদেবী সুন্দর করে বলেছেন —" 'ভারতের জয়' বলবার জন্যে আমাদের একটু উৎসাহের দরকার নাহলে এ অধীন মুখে সহজে বেরবে কেন।"[২৭]

নিজে যেমন গানের চর্চা করতেন তেমনি যাঁরা ভাল গান গাইতে পারতেন তাঁদের নিয়ে গানের আসরও বসতো তাঁর কর্মস্থলের আবাসে। সরলা দেবী সোহনি বলে একজন সাব জজের উল্লেখ করেছেন।[২৮] পুণার গায়ন সমাজের আদর্শে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ভারত সংগীতসমাজ' প্রতিষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার সক্রিয় ছিল, এটি মনে করতে কোন বাধা নেই। সংগীতের পরিমণ্ডল তাঁর কর্মস্থলের আবাসকেও আনন্দমুখর করে রাখতো। পার্টি হলে পিয়ানোর সংগে মায়ার খেলার গানের ধুয়াতে ইন্দিরা দেবীদের সংগে সাহেবেরাও এসে যোগ দিতেন।[২৯] ইংরাজি গানেও সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগ কম ছিল না। 'কারোয়ারে' প্রতিভা দেবীর পিয়ানো বাজনার সংগে সত্যেন্দ্রনাথ যে ইংরেজি গান গাইতেন একথা ইন্দিরা দেবীর কথায় জানা যায়।[৩০]

নিজে সংগীতের যতটুকু চর্চাই করেছেন সুযোগ মতো অন্যকে শিখিয়ে আনন্দ পেয়েছেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করে ফিরে আসার সময় ইটালীর ফ্লোরেন্স-এ হাংগেরিয়ান বন্ধু পুলজকী গ্যাব্রিয়েল-এর গৃহে একটি বালিকাকে অতি যত্নের সংগে দু একটি বাংলা গান শিখিয়ে এসেছিলেন।[৩১]

এতক্ষণ আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ওস্তাদ গায়ক হওয়ার সময় ও সুযোগ তাঁর ছিল না। প্রধানত স্বদেশ চেতনা ও অধ্যাত্মচেতনাকে আশ্রয় করেই তাঁর সংগীতপ্রতিভার বিকাশ ঘটে। কঠোর

রাজকাজে ব্যস্ত থাকিলেও কন্যা ও পরিজনদের নিয়ে গান ও যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা তিনি অবসর যাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের গানের তালিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত' ত্রয়োদশ সংস্করণে মুদ্রিত

১	অতুল জ্যোতির জ্যোতি।	: পরজ, চৌতাল (পৃ. ৫৮)
২	অপার করুণা তোমার।	: টোড়ি, কাওয়ালি (পৃ. ৮০)
৩	অমৃতধনে কে জানে রে, কে জানে রে।	: বেহাগ, ধামার (পৃ. ২৭)
৪	আজ সবে গাও আনন্দে।	: হাম্বীর ধামার (পৃ. ২১)
৫	আজি আমাদের মহোৎসব।	: শংকরা, আড়াঠেকা (পৃ. ৪২৪)
৬	আনন্দমনে, বিমল হৃদয়ে, ভজ রে ভবতারণে।	: টোড়ি, আড়াঠেকা (পৃ. ১)
৭	আমি হে তব কৃপার ভিখারী	: কাফি, যৎ (পৃ. ৭৯)
৮	আর কারে ডাকি, তোমায়। ছাড়ি যাব কার দ্বার।	: বাহার, আড়াঠেকা (পৃ. ৩৩৩)
৯	কত যে তোমার করুণা ভুলিব না জীবনে।	: জয়জয়ন্তী, কাওয়ালি (পৃ. ৭৮)
১০	কে জানে মহিমা, বিভু তোমার।	: গৌড়মল্লার, চৌতাল (পৃ. ৬৮)
১১	কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি।	: পরজ, ঝাঁপতাল (পৃ. ১২৩)
১২	গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু।	: গৌড়মল্লার, চৌতাল (পৃ. ১২০)
১৩	গাও রে জগপতি জগবন্দন, ব্রহ্ম সনাতন পাতকনাশন।	: ঝিঁঝিট, ঠুংরি (পৃ. ২১)
১৪	জননী সমান করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।	: জয়জয়ন্তী, চৌতাল (পৃ. ২৮)
১৫	জয় দেব, জয় দেব জয় মংগল-দাতা।	: মিশ্র, একতাল (পৃ. ১০২)

১৬ জান না রে কত তাঁর করুণা। : ছায়ানট, আড়াঠেকা (পৃ. ২৭)

১৭ তৎসৎ ব্রহ্মপদ প্রণমি হে দণ্ডবৎ। : ভৈরবী, ঝাঁপতাল (পৃ. ১০৪)

১৮ তারো হে তারো হে ভয়হর ভবতারণ। : কেদারা, ত্রিতাল (পৃ. ৩৩৬)

১৯ তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর। : কল্যাণ, চৌতাল (পৃ. ৫০)

২০ তোমারি এ রাজ্য ধনধান্যপূর্ণ শোভাময়। : ভৈরব, চৌতাল (পৃ. ১২৩)

২১ ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম। : মিশ্রকেদারা, ঝাঁপতাল (পৃ. ৫৭৩)

২২ থেকো না থেকো না দূরে, নাথ। : দেশ তেওট। (পৃ. ১৮৯)

২৩ দয়াঘন, তোমা হেন কে হিতকারী ? : আশা, ঠুংরি (পৃ. ৮১)

২৪ দরশন দাও হে কাতরে। : মিশ্র বেলাওল. আড়াঠেকা (পৃ. ১৮৬)

২৫. দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও। : পূরবী, একতাল (পৃ. ৬)

২৬ প্রথম কারণ, আদি কবি, শোভন তব বিশ্বছবি। শুক্ল বেলাওল, চৌতাল (পৃ. ৫৪)

২৭ প্রেমমুখ দেখো রে তাঁহার। : বেহাগ, রূপক (পৃ. ২৯)

২৮ বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর। : আশা, ঠুংরি (পৃ. ৫৫)

২৯ বিপদরাশি, দুঃখদারিদ্র্য কী করে ? : মেঘমল্লার, ঝাঁপতাল (পৃ. ৩৩)

৩০ মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম। : খট্, সুরফাঁক্তা (পৃ. ৩১৪)

৩১ মঙ্গল নিদান, বিঘ্নের কৃপাণ। : বেহাগ, ঝাঁপতাল (পৃ. ৩১৩)

৭২ শোকে মগন কেন জর্জ'র বিষাদে। : জয়জয়ন্তী, আড়া ঝাঁপতাল (পৃ. ৩৩৭)
৭৩ সবে কর আজি তাঁর গুণগান। : খট্, সুরফাঁকা (পৃ. ৪১৭)
৭৪ সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা। : ভৈরব চৌতাল (পৃ. ৪)
৭৫ হয়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমার। : সিন্ধুড়া, ধামার (পৃ. ৩২১)
৭৬ হে করুণাকর, দীনসখা তুমি। : রামকেলি, কাওয়ালি (পৃ. ৯৬)
৭৭ হে প্রভু পরমেশ্বর তব করুণা। : টোড়ি, কাওয়ালি (পৃ. ১৮৮)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মসঙ্গীত' একাদশ সংস্করণে প্রাপ্ত, অতিরিক্ত সঙ্গীত

৭৮ অতুল করুণা তোমার অনুপম দয়া। : কানাড়া, তেতালা, (পৃ. ১৩৮)
৭৯ আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁকে। : কাফি, আড়াঠেকা (পৃ. ৫০৪)
৮০ ইচ্ছা হয় সর্ব ভুলে ছাড়ি মোহ কোলাহলে। : জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল, (পৃ. ৩৫৯)
৮১ এমন দিন না রবে তা জান। : ভৈরবী, ঢিমে তেতালা (পৃ. ৭৯১)
৮২ এমনি কি হে দিন যাবে চিরকাল। : সরফরদা, আড়ঠেকা. (পৃ. ৪৮৩)
৮৩ কতই করুণা হতেছে বরষণ তোমার। : মুলতান, তেওট (পৃ. ১৩৩)
৮৪ কি আমি বলিব তোমারে। : বাহার, কাওয়ালি (পৃ. ১২৩)
৮৫ কে বা ভুলিবে তোমারে, পেয়ে তোমার প্রীতিসুধা। : মালকোষ, আড়াঠেকা (পৃ. ১৪২)
৮৬ গেল বিভাবরী আইল শুভ্র-বসনা উষা। : টোড়ি, আড়াঠেকা (পৃ. ৪)
৮৭ চাহি সদা তোমার সঙ্গে থাকি। : মুলতান, একতালা (পৃ. ২৭২)
৮৮ তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও। : কুকভ, তেওট (পৃ. ৩)
৮৯ নব বরষের আজি প্রথম প্রভাত। : আলাইয়া, একতালা (পৃ. ৭০২)

৫০ নাথ, কি দিব তোমারে। : জয়জয়ন্তী, রূপক (পৃ. ৩৫৪)

৫১ পাপে তাপে বিকলিত মন, : ভৈরবী, ঠুংরী (পৃ. ৫১৯)

৫২ প্রেমসিন্ধু উথলে দেখে তোমায়। : বেহাগ, কাওয়ালি (পৃ. ২৮৬)

৫৩ বিষয়-সুখে মন তৃপ্তি কি মানে। : আশা, ঠুংরি (পৃ. ৩৫৬)

জাতীয় সঙ্গীত

৫৪ মিলে সবে ভারত সন্তান। : খাম্বাজ, আড়াঠেকা

পত্রাবলী থেকে প্রাপ্ত

৫৫ দীন দয়াময় ভুল না অনাথে। : গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রে উল্লিখিত

৫৬ কৃপাসাগর হে অখিল জগৎপাতা। : (২৪ জানুয়ারী, ১৮৬৯, আহমদনগর।)

৫৭ কেহ নাহি আর আমার—সব তুমি। : স্বর্ণকুমারীকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্রে উল্লিখিত (২৬শে কার্তিক, ১৩৩১ শান্তিনিকেতন।)

৫৮ তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে। : মহর্ষিকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রে উল্লিখিত (চিঠিবিলির পোস্টমার্ক ৩০শে জানুয়ারী, ১৮৬৯)।

ও

সাতারা থেকে গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রেও উল্লিখিত (৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯)।

৫৯ কেন ভোলো ভোলো চিরসুহৃদে : ইন্দিরা দেবীর বক্তব্য অনুসরণে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা স্বীকৃত ও ১৯৭৫ সালের ২৮শে এপ্রিল বিশ্বভারতী বেতার অনুষ্ঠানে প্রচারিত।

১. "Joti appears to be content···I have also got a drawing-master for him." Ahmedabad, 11th May, 1867, Satyendranath's letter to Ganendrath.

২. "অসিত, attitude আর expression ঠিক না হলে ভাল ছবি কি করে হয় আমার তো বোধগম্য নয়। যদি দর্শকের কল্পনার উপরই সমস্ত রাখা যায় তাহলে হিজিবিজি যা তা' করলেই চলতে পারে—ভাল আঁকার দরকার কি? তোমাদের ও স্কুলের গরিমা আমি বুঝতে পারি না। "ভারতী" তে আফজল খাঁ বধের যা ছবি বেরিয়েছে, সেটা ঠিক হয় নি। আর একবার চেষ্টা করে দেখ। আক্রমণ সামনে থেকে হবে অথচ কোলাকুলি করতে যাচ্ছে এমন ভাব থাকবে, আর শিবাজীর মুখের ভাব একটু fierce হবে। যখন মারতে উদ্যত, তখন আর কোমল ভাব রাখা যায় না।" (পত্রটি অসিত হালদার তাঁর 'রবিতীর্থ'' গ্রন্থে (পৃ. ২৩) উদ্ধৃত করেছেন। তারিখ অনুল্লিখিত)

৩. আমার বাল্যকথা ও বোম্বাইপ্রবাস—পৃ. ১১৪।

৪. আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক 'বিষ্ণু চক্রবর্তী' আমাদের বাড়ীর বেতনভুক গায়ক ছিলেন।' পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮।

৫. রবীন্দ্রনাথের গান : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৪।

৬. আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৬০।

৭. 'আজু পরমানন্দ। মম গৃহে আলো।
যাও যাও সহচরী
আন ডেকে পুরনারী
বরদারে বরণ করি বিলম্বের কি ফল।' (ঐ. পৃ. ৬৩)

৮. My dear Mejdada,
What a long distance separates us now !···While I write the sun has passed its meridian, but you are all wrapped up in darkness. I can guess···you are probably taking

lessons from *Bishnoo*, whom I figure very well, sitting beside his *Tambura*, with its everlasting twang ringing in all your ears—a sound which never resounds in these shores.…'—London 10th June 1962.

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমাদের সংগীত, সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩২৮ (সংগীত সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবের ভাষণ)

১০. '…সর্বপ্রথম মেঝদাদা বড়দাদা বিষ্ণুর গান ভাঙিয়া ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। কিছুকাল পরে বড়দাদা ও সেজদাদা ও আমি—আমরা নানা ওস্তাদের হিন্দী গান ভাঙিয়া ব্রহ্মসংগীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই।' (পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

১১. 'বিষ্ণুর এই হিন্দী গান ভাঙিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন।…সত্যেন্দ্রনাথের গান লোকে খুব ভালবাসিত। তাঁহার রচনায় এমন একটা সহজ কবিত্ব ছিল এবং সুরের সংগে ভাবের এমনি একটা মাখামাখি ছিল যে, তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত।'—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২৫, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ৬৭নং-এ উদ্ধৃত।

১২. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র।

পোস্ট মার্ক
30 January 1869
Delivery

শ্রীচরণেষু,

মহাশয়ের নিকট আর দুইটি সংগীত প্রেরণ করিতেছি—অনুগ্রহ করিয়া দৃষ্টিপাত করিবেন।

সেবক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দীন দয়াময় ভুল না অনাথে…
তুমি বিনা কে কভু 'শংকট' নিবারে…

(দ্র. মেজক্ষু কপি বানান 'শংকট' দেখা যাচ্ছে)

১৩. গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র

আহম্মদনগর

"মেজদাদা, ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৬৯

বাবামহাশয়কে কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত লিখিয়া পাঠাইয়াছি দেখিয়া থাকিবে। তোমাকে তাহা দিতেছি ও বিষ্ণুকে দিয়া তাহার কোন ভাল সুর করাইতে পার তাহা কি দেখিবে ?...ইচ্ছা হয় সর্ব ভুলে..., মংগল নিদান বিশ্বের কৃপাণ...হে করুণাকর দীনসখা তুমি..., দীন দয়াময় ভুল না অনাথে...। কৃপাসাগর হে অখিল জগৎপাতা...কোন সুরে কিরূপ হইল লিখিয়া বাধিত করিবে।"

১৪. "My dear Mejdada, I am very glad to learn that the Maghotsava went off so well and that you took so active part...There appears to have been a flood of hymns for the occasion—I am only sorry that mine reached you too late... I give you the 6th hymn below... তুমি বিনা কে প্রভু শংকট নিবারে..."
Satara, 7th February, 1869

১৫. গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র

"ভাই মেজদাদা,

...এবার নানা রকম ছন্দ করিতেছি, যথা ললিতলবংগের ছন্দ, মেঘদূতের ছন্দ ইত্যাদি। তাহা কিরূপে শুনিতে হয় তোমারা পরখ করিয়া না বলিলে বুঝিতে পারিতেছিনা। আমার তো মন্দ লাগে না। আচ্ছা একটা লিখেছি দেখ দেখি। তুমি যদি বিষ্ণুকে দিয়া সুরে বসাইবার কোন পন্থা দেখ, তবে আমাকে লিখিলে আমি সবগুলির গান তোমার কাছে পাঠাই, তোমাদের গানগুলি বেশ হইয়াছে —আমার ভারি ইচ্ছা হয় যে কলিকাতায় গিয়া সেই সকল শুনিয়া আসি।

মেঘদূতের ছন্দ

পাপে তাপে বিকলিত মনঃ শীঘ্র সন্তাপ নাশো
মোহাচ্ছন্নে হৃদয়গগনে প্রেমসূর্য্য প্রকাশো

দ্রষ্টব্য : এই গবেষণার মেঘদূত কাব্যানুবাদ অধ্যায়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দ।

১৬. স্বর্ণকুমারীকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্র। দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে স্বর্ণকুমারীর লেখা 'শোকাশ্রু'তে পরিবেশিত। (স্বর্ণকুমারী সংকলিত 'সাহিত্যস্রোত' প্রথম ভাগে মুদ্রিত)

শান্তিনিকেতন

২৬শে কার্তিক, ১৩৩১।

স্নেহের বোনটি আমার

…দিব্যধামস্থিত আমার প্রাণের ভাই সতুর বিরচিত একটি ব্রহ্মসংগীত এক্ষণে আমার জপমালা হইয়াছে। সে গীতটি এই :

কেহ নাহি আর আমার সব তুমি!

লয়েছি শরণ তব দীননাথ

যদি পাই তোমার চরণ ছায়া নাহি ডরি করাল কালে।

হায়! বিষ্ণু নাই—কে এ গানটি গাইয়া আমাকে শুনাইবে।

তোমার নিয়ত শুভাকাংক্ষী বড়দাদা

১৭. কেন ভোল, ভোল চিরসুহৃদে…(ককুভা—আড়াঠেকা)

'ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি (নবপর্যায়) প্রথম খণ্ডে এই গানটির সমাজে প্রচলিত সুরের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল। গানটি মহর্ষির রচনা বলে উল্লেখ ছিল। কিন্তু শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর নিকট পরে জানা গেল যে ইহা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। এই গানের সুর তিনি যাহা জানেন তাহাও শ্রুতিমধুর। সেইজন্য এ গানটি তাঁর কৃত স্বরলিপিসহ এই খণ্ডে পুনঃ প্রকাশিত হল।'—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি : ২য় খণ্ড, পৃ. ২০ পাদটীকা।

১৮. '…পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন,…আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে

কে সহায় ভব-অন্ধকারে।

—দ্র. জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ

১৯. ১৯৬৭ সালের ১৩ই জানুয়ারীর আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীকিরণশশী

দে-র প্রশ্ন ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন-এর উত্তর একই সাথে মুদ্রিত হয়েছে।

২০. (১৭৯১ শক, কার্তিক সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত পাঁচটি ব্রহ্ম-সংগীতের স্বরলিপি প্রসঙ্গে)—'স্বরলিপিকার যে দ্বিজেন্দ্রনাথ এই কথাই স্বীকৃত, (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সা. সা. চরিতমালা। বাংলা স্বরলিপি ইতিহাস শ্রীশান্তিদেব ঘোষ : দেশ—সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৩)।' ১৯৬৭-র ১৩ জানুয়ারীর আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীপুলিনবিহারী সেনের বক্তব্যে প্রাপ্ত।

২১. দ্র: গীতবিতান জ্ঞাতব্যপঞ্জী : বিশিষ্ট আকরগ্রন্থ : পৃ. ৯৫৯ [অখণ্ড গীতবিতান (১৩৭১)]

২২. দ্বারকানাথ গোবিন্দ বৈদ্য—'সুবোধ' পত্রিকার সম্পাদক।

২৩. পরলোকবাসী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : দ্বারকানাথ গোবিন্দ বৈদ্য। 'সুবোধ' পত্রিকা থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বাংলায় অনূদিত। (১৮৪৪ শক, ফাল্গুন তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত) দ্র. পরিশিষ্ট, ৩। শ্রুতি ও স্মৃতি পাণ্ডুলিপি পৃ. ৪৯।

২৪. সত্যেন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরা দেবী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫২।

২৫. দ্র. মারহাট্টী পানসুপারি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, ভারতী, বৈশাখ ১৩০৬।

২৬. ঐ।

২৭. মারহাট্টী পানসুপারি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : ১৩০৬ বৈশাখ ভারতী, পৃ. ৩৯।

২৮. বম্বে অঞ্চলে মেজমামার কাছে যতবার গিয়ে থেকেছি…মারাঠীদের সংগীত-কুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি। সেতারায় সোহনি বলে একজন সাবজজ ছিলেন সুগায়ক। তাঁর কাছে থেকে সংগৃহীত একটি হোলির গান চমৎকার—"পাঁব লগে কর যোড়ি শ্যাম মুঝে খেলনা হোরি।"—জীবনের ঝরাপাতা : সরলা দেবী, পৃ. ৭৬।

২৯. 'বাবার কাছে বোম্বাই থাকাকালীন সাহেবদের মহলে এক সময় মায়ার খেলার গানের খুব আদর হয়েছিল এবং উচ্চারণ করতে না পারলেও

তারা 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি' গানে 'টোবে কেন, টোবে কেন' বলে ধুয়োর অংশ যোগ দিত।'—রবীন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, পৃ. ২০।

৩০. 'একটা বড় পিয়ানো ছিল। প্রতিভাদিদি বাজাতেন ও বাবা ইংরেজী গান গাইতেন। প্রতিভা দিদি বাবাকে খুব ভালবাসতেন।…মা এক একবার মজা দেখবার জন্য সন্ধ্যাবেলা হয়ত ঠাট্টা করে বলতেন—'আজ কিন্তু ওঁর গানটা তেমন ভাল হয় নি' আর অমনি প্রতিভাদিদির চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়ত।'—ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী : শ্রুতি ও স্মৃতি পাণ্ডুলিপি পৃ. ৪৯।

৩১. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস : পৃ. ৬৯।

অভিনয়

সত্যেন্দ্রনাথের অভিনয়ে অংশগ্রহণ ও সুষ্ঠুরূপে অভিনয় পরিচালনার কথা ঠাকুরবাড়ির অনেকেই তাঁদের স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন। সেগুলি একত্র করলে নাট্যানুরাগী সত্যেন্দ্রনাথের শিল্পী-সত্তার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কলকাতার বাড়িতে এলেই বিভিন্ন নাটকের মহড়া চলতো। তখন মহা উৎসাহে জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছেলেমেয়েরা সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে সমবেত হতেন। অভিনয় পরিচালনার ভার সত্যেন্দ্র-নাথের উপর থাকলে সকলে খুব খুশি হতেন। তার কারণ সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, যা মধুর অথচ কর্মে শিথিল নয়।

মহড়া উপলক্ষে তাঁর গৃহে যে খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা হতো তার আকর্ষণও ছেলেদের কাছে কম ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে সেই—মধুর দিনগুলির কথা ফুটিয়ে তুলেছেন।[১]

'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ের পরিচালক রূপে সত্যেন্দ্রনাথের সুন্দর চিত্র অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' গ্রন্থে পরিস্ফুট। বাল্মীকিপ্রতিভা বেশ কয়েকবারই ঠাকুরবাড়ির পরিজনদের দ্বারা অভিনীত হয়েছে। তবে সত্যেন্দ্রনাথ যেবার পরিচালনা করেছিলেন সেটিকে অবনীন্দ্রনাথ 'বড়ো বাল্মীকিপ্রতিভা' আখ্যা দিয়েছেন, কারণ তাঁর মতে, "ওরকম মহা ধুমধামে বাল্মীকিপ্রতিভা হয় নি আর।"

এই অভিনয়টি কেন হয়েছিল এ প্রসঙ্গে কিছু বিবরণ অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' গ্রন্থে ও ইন্দিরা দেবীর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থে বাল্মীকিপ্রতিভার এই বিশেষ অভিনয়টি দেবেন্দ্র-নাথের ইচ্ছায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে লেডী ল্যান্সডাউনের পার্টি উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল বলে উল্লিখিত।[২] আবার ইন্দিরা দেবীর বক্তব্য থেকে জানা যায় একবার বিলেত থেকে ফিরে আসার সময় লেডী ল্যান্সডাউনকে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন।[৩] দুজনের বক্তব্যের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও এই সিদ্ধান্তে আসা কষ্টসাধ্য নয়, যে সত্যেন্দ্রনাথ পথে প্রথম আমন্ত্রণ জানালেও তা বাস্তবায়িত হয়েছে দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ও আনুকূল্যে।

জোড়াসাঁকো বাড়ির কর্ণধার তখন দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর অনুমতিতেই সমস্ত কাজ পরিচালিত হতো। সুতরাং পিতা পুত্রের যৌথ উদ্যোগেই এর পেছনে ছিল। উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার যে দেবেন্দ্রনাথই বহন করেছিলেন, তা দুজনের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট জানা যাচ্ছে।[৪]

'বাল্মীকিপ্রতিভা'র এই বিশেষ অভিনয়ে সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশনায় কতগুলি নূতনত্ব লক্ষিত হয়। দস্যুদলের নাচে কাবুলী নৃত্য পরিবেশিত হয়। এটি সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ দান। ঐ নাচ যে শেষ পর্যন্ত কত কষ্ট করে সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথেরা আয়ত্ত করেছিলেন সে কথাও 'ঘরোয়া' থেকে জানা যায়। নাচটির মহড়ায় সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশ একটুও ভুল হওয়ার উপায় ছিল না। অভিনয় পরিচালক সত্যেন্দ্রনাথ ছড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়ালেও তাঁর মধ্যে কোন কঠোরতা ছিল না, বরং এক কর্তব্যনিষ্ঠ স্নেহার্দ্র পরিচালকের উৎসাহের ছবিতে অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনাটি উপভোগ্য হয়েছে।[৫]

ঐ অভিনয়ে ডাকাতদের রূপসজ্জায় সত্যেন্দ্রনাথের যে প্রভূত দান রয়েছে,—অবনীন্দ্রনাথ তা বলে গেছেন। ডাকাতদের খালি গায়ে স্টেজে আসা সত্যেন্দ্রনাথ কিছুতেই মানেন নি। কাবুলী নৃত্যের অনুসরণে যেমন দস্যুদলের নাচ তৈরি হয়েছে, তেমনি তাদের পোষাকও কাবুলীদের মতোই করিয়েছিলেন। সম্মানিতা ইংরেজ-মহিলা এবং উচ্চপদস্থ সাহেবদের সামনে খালি গায়ে নৃত্য পরিবেশনে তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল।[৬]

'রাজা ও রাণী'র অভিনয় প্রসঙ্গে পরিচালক সত্যেন্দ্রনাথের আরেকটি বিশেষ দিকের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। অভিনেতারা চরিত্রগুলির মূল ভাব যথাযথ ফুটিয়ে তুলবেন, সেদিকেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসবশত সংলাপে অভিনেতাদের যদৃচ্ছা শব্দপ্রয়োগ তিনি কিছুতেই অনুমোদন করতেন না। 'রাজা ও রাণী' নাটকে ত্রিবেদীর ভূমিকায় অক্ষয় মজুমদারের অতিরিক্ত সংলাপ জুড়ে দেওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কারণ কমিক চরিত্রের দিকেই অক্ষয়বাবুর প্রবল ঝোঁক ছিল। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রটি পুরোপুরি কমিক নয়। ত্রিবেদীর বাইরের সরলতা-ভানমাত্র। এদিকে সত্যেন্দ্রনাথ অক্ষয়বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দ্বিধা করেন নি। অবশেষে শিল্পীর মানভঞ্জনের জন্য অক্ষয়বাবুকে চাদর ও অর্ঘ্য-দানের কথাও ইন্দিরা দেবী ও অবনীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়।

বিরজিতলায় 'রাজা ও রাণী' অভিনয়ের জন্য চওড়া বারান্দায় স্টেজ বাঁধা হয়েছিল। অভিনয়ে দেবদত্ত—সত্যেন্দ্রনাথ, নারায়ণী—মৃণালিনী দেবী, বিক্রম রবীন্দ্রনাথ, সুমিত্রা— জ্ঞানদানন্দিনী, ত্রিবেদী—অক্ষয় মজুমদার, কুমার—প্রমথ চৌধুরী ও ইলার ভূমিকায় প্রিয়ম্বদা দেবী অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

পরদিন 'বঙ্গবাসী' কাগজে 'ঠাকুরবাড়ির নূতন ঠাট' বলে একটি শ্লেষাত্মক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। ইন্দিরা দেবীর কথায়—'তাতে উক্ত পাত্রপাত্রীর তালিকা এবং পরস্পরের সম্পর্ক পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া ছিল। বলা বাহুল্য বাবা এসব সমালোচনায় ভ্রূক্ষেপও করলেন না।'[৭] প্রগতিশীল সত্যেন্দ্রনাথের উন্নত রুচিবোধের যথার্থ মূল্যায়ন করতে দেশের কিছু সংখ্যক লোকের মানসিকতা তখনও গড়ে ওঠে নি। বঙ্গবাসী কাগজের কটু সমালোচনায় তা সুস্পষ্ট।

অন্যদিকে পাবলিক থিয়েটারের অ্যাকট্রেসরা সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশিত 'রাজা ও রাণী'তে সুমিত্রার ভূমিকাকেই আদর্শ করেছিলেন। অভিনয়ে ও রূপসজ্জায় সেদিনের পাবলিক স্টেজের অভিনেত্রীদের সামনে কোন অনুকরণীয় উন্নত আদর্শ ছিল না বলেই তারা অনেক কষ্টে পুরুষের বেশে[৮] এসেও সেদিনকার অভিনয় দেখে যান। এঁদের এই অনুকরণের মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশিত অভিনয়ের উন্নত মান স্বীকৃত। স্ত্রী-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যেমন অটল ধৈর্যে আপন পরিবার থেকেই সংস্কারসাধন করতে চেয়েছেন তেমনি অভিনয়ের শিল্পবোধের কাছে, পারিবারিক সম্পর্কে পুরানো প্রথাগুলিকে পরিবর্তিত করে এক উদার স্নেহ মধুর পরিবেশে— পরিজনদের শিল্পচেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন।

অভিনয়ে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল অনুরাগের কথা স্বর্ণকুমারী দেবীর কথায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয়—'তিনি যখন কর্মস্থল হইতে কলিকাতায় আসিতেন তাঁহার গৃহ লোকসমাগমে আমোদপ্রমোদে ভরিয়া উঠিত। তিনি অভিনয় করিতেও বড় ভালবাসিতেন। অনেকবার তাঁহার নিজবাটীতেই নাট্যাভিনয় হইয়াছে। এই অভিনয়ে তিনি কোন না কোন পার্ট (Part) গ্রহণ করিতেন।'[৯]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'ভারত সংগীতসমাজ'-এর উৎসাহী সদস্য ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। প্রায় ষাট বছর বয়সে এই সমাজের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে সত্যেন্দ্রনাথের মার্ক এণ্টনির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[১০]

'জুলিয়াস সীজার' অভিনয়ের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল অনুরাগের

নিশ্বাস ইন্দিরা দেবীর বক্তব্য থেকেও আহরণ করা যায়। শুধু নিজে অভিনয় করেই তাঁর তৃপ্তি ছিল না অন্যদের দিয়ে করাতেও তিনি চেষ্টা করেছেন। 'ভরু শি বোনরজি'র পুত্রবধূ ও কেশবচন্দ্র সেনের পুত্রকে দিয়ে এই নাটকটির আংশিক অভিনয় করাতে তিনি বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।[১১] সম্ভবত ১নং রেনি পার্কে'র বাড়িতে থাকার সময় এটি করেছিলেন।

১৯০৮-এ জোড়াসাঁকোয় গগনেন্দ্রনাথের বাড়িতে (৫নং বাড়ি) যখন 'জুলিয়াস সীজার'-এর অভিনয় হয়েছে তখনও সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিয়ে সাগ্রহে সেই অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন।[১২] ঠাকুর পরিবারের ও পরিচিত পরিবারের যুবকেরা মিলে গগনেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় 'মিলনী' ক্লাবে 'জুলিয়াস সীজার' অভিনয়ের কথা দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়ও উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত ঐ ক্লাবে অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য 'হ্যারি নেভিল' নামে এক ইওরোপীয়ান অভিনেতাকে গগনেন্দ্রনাথ বেতন দিয়ে নিযুক্ত করেছিলেন।[১৩]

ইংরেজি নাটকের মতো সংস্কৃত নাটকের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগের কথা জনসাধারণের অবিদিত ছিল না। সোলাপুর থাকার সময় এক নাটকের ম্যানেজার সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে শকুন্তলা নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন। ঐ নাটকের অভিনয় দেখে সত্যেন্দ্রনাথ হতাশ হয়েছিলেন, তা নিজেই লিখে গেছেন।[১৪] রুচিশীল সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনায় ছিল তপোবনের স্নিগ্ধ ছায়া; পাত্র-পাত্রীদের বেশভূষায় ও সংযত অভিনয়ে সে যুগটিই ধরা দেবে—এই আশা নিয়েই তিনি নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কালিদাসের রচনার ঐরকম বিকৃত পরিবেশন দেখে তিনি ধিক্কার না দিয়ে পারেন নি। তৎকালীন পারসী নাট্যমণ্ডলীর নির্দেশনার দৈন্যও সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়েছে। পারসীরা জীবনযাত্রায় ইউরোপীয় আদর্শের একান্ত ভক্ত। তবে ঐ অনুকরণ যদি সৌন্দর্যসৃষ্টি ও রসের ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয় তবে তা কাব্যকে হত্যা করার সামিল হয় বলেই সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেছেন :

আবৃত্তি

বিভিন্ন ভাষায় যথাযথ স্বরভঙ্গী সহকারে কবিতা আবৃত্তি করার এক প্রবল অনুরাগ সত্যেন্দ্রনাথের ছিল। শৈশবেই শিক্ষাগুরু বাগেশ্বর বিদ্যালংকারের কাছে শুনেছিলেন—

'আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।'
শৈশব থেকেই পারিবারিক উপাসনায় স্তোত্রমালা[১৫] থেকে আবৃত্তি করাতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। অবসর জীবনের পূর্ণ অবকাশের সুযোগ এই শিল্পী-সত্তা তাঁর মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হয়। এ সম্পর্কে প্রামাণ্য বিবরণের অভাব নেই। ইন্দিরা দেবী বলেছেন—'বাবার শেষ জীবনে কবিতা আবৃত্তি করবার ঝোঁকের কথা হয়তো অনেকেই জানেন, যাঁদের বয়স এখন পঞ্চাশোর্ধ্বে।'[১৬] বিশেষ যত্নে অন্যকেও আবৃত্তি শিখিয়ে তিনি যথার্থ আনন্দ পেতেন। যাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে আবৃত্তি শিখিছেন তাঁরা সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁর এই বিশিষ্ট গুণের কথা যে মনে রেখেছিলেন ইন্দিরা দেবী সেকথারও উল্লেখ করেছেন।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ী' গ্রন্থে সত্যেন্দ্র-নাথের এই বিশিষ্ট শিল্পী-সত্তার পরিচয় উচ্ছ্বাসিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে উন্নতমানের আবৃত্তি করার পথ সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম দেখিয়েছেন বলে তিনি বলেছেন। তখনকার দিনে কবিতাপাঠের সংগে অনেক সময় আসরে অংগভংগীপূর্ণ উচ্ছ্বাস পরিবেশিত হতো। ঐ ধরণের কবিতাপাঠ ও যথার্থ আবৃত্তি যে সম্পূর্ণ পৃথক্, এই বোধটুকু সত্যেন্দ্রনাথ জনগণের মধ্যে জাগাতে চেয়েছেন। যেখানে কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য শ্রোতার মন অনুরণিত হয়, সেখানেই যে আবৃত্তি সার্থক হয়, বিভিন্ন আসরে আবৃত্তি করে সত্যেন্দ্রনাথ তা নিজেই দেখিয়ে গেছেন। সৌরীন্দ্রমোহনের কথায়—"ইংরেজী বাংলা কবিতার আবৃত্তি—সত্যেন্দ্রনাথই তার প্রবর্তন করেন বললে অত্যুক্তি হবে না।" আবৃত্তিতে 'সুরেলা একটানা ভংগী' সত্যেন্দ্রনাথের অপছন্দ ছিল, তেমনি আবৃত্তির নামে 'ভাঁড়ামো করার' তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশিত কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যে ভাব ফুটিয়ে তুলতে যে নিষ্ঠা ও অনুশীলনের প্রয়োজন সে পথে না গিয়ে কেউ কেউ চিরাচরিত সহজ পথ ভাঁড়ামির আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই দেখে ব্যথিত চিত্তে সৌরীন্দ্রমোহন সত্যেন্দ্রনাথকে স্মরণ না করে পারেন নি।[১৮]

ঠাকুরবাড়ির সংগে সৌরীন্দ্রমোহনের যোগাযোগের ফলে তাঁর বক্তব্যকে অপ্রমাণ্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, তাঁর নিজের কথা থেকেই জানা যায় তিনি 'কিশোর বয়স থেকে এ পরিবারের সংগে মিলিত হবার সুযোগ সৌভাগ্য লাভ' করেছেন।[১৯] 'ভারতী' সম্পাদনাকে কেন্দ্র করে এ

যোগাযোগ আরও নিবিড় হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়।[২০] সৌরীন্দ্রমোহনের কলেজ জীবনে সত্যেন্দ্রনাথের বালিগঞ্জের বাড়িতে তাঁর সংগে যোগাযোগের কথা সৌরীন্দ্রমোহন সশ্রদ্ধে ব্যক্ত করেছেন। প্রসংগত সৌরীন্দ্রমোহনদের 'ভবানীপুর সাহিত্যসমিতি'-তে সত্যেন্দ্রনাথকে সভাপতি করার আবেদন, এত সহজে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, যে সেজন্য তাঁদের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণ, আবৃত্তি ইত্যাদি শুধুমাত্র সিভিলিয়ান, ব্যারিস্টারদের আসরে পরিবেশিত হবে এ ধরণের সীমায়িত মনোভাব তাঁর ছিল না। সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ ছিল। এরকম আবেদন নিয়ে এলে সম্ভবত কেউ ফিরে যেতো না।[২১]

রায়বাহাদুর জলধর সেনও আবৃত্তিচর্চায় পথিকৃতের গৌরব সত্যেন্দ্রনাথকে অর্পণ করেছেন। তিনি বলেন—"তাঁহার আবৃত্তিশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল, যাঁহারা তাঁহার রবিবাবুর 'পুরাতন ভৃত্য' আবৃত্তি শুনিয়াছেন—তাঁহারা সকলেই জানেন। তিনি রচনার ভিতর হইতে pathos টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া 'সেই পুরাতন ভৃত্যের' কেষ্টা চাকরটাকে ঠিক চোখের সামনে প্রতিভাত করিয়া দিতেন। কবিতা নাটক—সর্ববিধ রচনাই যথোপযুক্ত ভাব স্বরভংগীর সহিত আবৃত্তি কিরূপ আনন্দজনক ও শিক্ষাপ্রদ হয়, তাহা তিনিই প্রথম বাঙালীকে শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন।"[২২]

সত্যেন্দ্রনাথের শোকপ্রশস্তিতে 'প্রবাসী' ও Modern Review পত্রিকাও সত্যেন্দ্রনাথের আবৃত্তি প্রসংগে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেছেন। প্রবাসী পত্রিকার অভিমত—"যথোপযুক্ত ভাব ও স্বরভংগীর সহিত আবৃত্তি যেমন আনন্দদায়ক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। আমাদের দেশে বেশী লোকে ইহা অভ্যাস করেন না। সত্যেন্দ্রনাথ ইহা সযত্নে শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন।' (মাঘ ১৩২৯) Modern Review—পত্রিকার মতে—"He was a master of elocution and could recite poems and dramatic passages very effectively." (Feb. 1923).

বৃদ্ধ বয়সেও সত্যেন্দ্রনাথের আবৃত্তি যে সকলকে মোহিত করতো এ সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী দেবীও বলেছেন—"শেষজীবনে কবিতা আবৃত্তি করিবার দিকে তাঁহার একটা ঝোঁক হইয়াছিল। কোন পার্টীতে নিমন্ত্রিত হইলে ইংরাজী ভাল ভাল কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথেরও কোন কোন কবিতা তিনি আবৃত্তি

করিতেন। এ বয়সেও যে বড় বড় কবিতা তিনি মনে রাখিতে পারিতেন ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।"[২৩]

স্বর্ণকুমারী দেবীর কথার অনুরূপ সুর রমেশচন্দ্র দত্তের দৌহিত্র মধু বসুর কণ্ঠেও শোনা যায়—"আমাদের ধর্মতলার বাড়ীটা ছিল এক কথায় সংস্কৃতির কেন্দ্র—গান বাজনার আসরে কোনদিন রবীন্দ্রনাথ, কোনদিন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অংশগ্রহণ করতেন। যখন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আসতেন তখন তিনি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন।"[২৪]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সভাপতির কার্যভার নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ কবিতা আবৃত্তির নূতন প্রথা চালু করেছিলেন। ১৩০৭-এর ৫ই ফাল্গুন সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' কবিতাটি আবৃত্তি করেন।[২৫] আবৃত্তির পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ পেশোয়া বংশের ইতিহাস থেকে সামান্য বিবরণ প্রদান করেন। রঘুনাথ রাও-এর অন্যায়ভাবে পেশোয়া নারায়ণ রাও-এর হত্যা ও সভাপণ্ডিত রামশাস্ত্রীর পদত্যাগের কাহিনী তিনি প্রাক্-কথন হিসাবে বর্ণনা করেন।[২৬]

পরিষদের সকলেই যে সত্যেন্দ্রনাথের আবৃত্তি শুনে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলেন পরিষদের কার্যবিবরণীতে তার সাক্ষ্য রয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অভিভূত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন—"এ বিষয়ে তিনিই উপযুক্ত লোক আর সেই জন্যই আমরা এত আনন্দিত হইলাম।"[২৭]

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী পরিষদে এই নব অবদানের জন্য সত্যেন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন—"সভাপতি মহাশয় আজ এই নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আবৃত্তিতে আমরা বাস্তবিকই আনন্দিত হইলাম। সভাপতি মহাশয়ের অনুসরণে আমাদের অন্যান্য সভ্য এ বিষয়ে চেষ্টা করিলে সুখী হইব।"[২৮]

ঐ বছরেই ২৮শে চৈত্র পরিষদে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের 'বিবাহ' কবিতা আবৃত্তি করেন। সত্যেন্দ্রনাথের আবৃত্তি শুনে চারুচন্দ্র মল্লিক অভিভূত হয়ে বলেছিলেন—"এমন সুন্দর আবৃত্তি আমরা কখন শুনি নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম না জানি কি হইবে কিন্তু শুনিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি।" বার্ধক্যেও সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রতিভা বিকাশের জন্য যে অধ্যবসায় ও উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন তা পরিষদের সভ্যগণের অনুকরণীয় বলেই তিনি মন্তব্য

করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে আরও অনেকে এগিয়ে আসবেন এই আশা নিয়েই মল্লিক মহাশয় সর্বশেষে বলেছেন—'আমরা এ সম্বন্ধে নূতন লোককে ব্রতী হইতে দেখিলে সুখী হইব।"[২৯]

সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণায় অনেকেই যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তারও কিছু নিদর্শন সাহিত্য পরিষদের কার্যবিবরণীতে আছে। ১৩০৭-এর ৪ঠা চৈত্র নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাহিত্য পরিষদে বিহারীলাল চক্রবর্তী রচিত 'মায়া দেবী' কবিত পাঠ করেছিলেন। ১৩০৮-এর ১২ই আশ্বিন পরিষদে মাখনলাল দীক্ষিত 'মদনভস্ম' ও ক্ষীরোদপ্রসাদ স্বরচিত 'খাঁজাহান' নাটকের অংশ আবৃত্তি করেন। ঐ সভায় গোদাবরী জেলার ইল্লোডনিবাসী শতাবধানী পণ্ডিত শ্রীরামশাস্ত্রীকে সত্যেন্দ্রনাথ 'মদনভস্ম' ও রতিবিলাপের'র কিছু অংশ আবৃত্তি করতে অনুরোধ করেন। বস্তুত এই অংশগুলি যে সত্যেন্দ্রনাথের কত প্রিয় ছিল নবরত্নমালার অনুবাদেই তা প্রমাণিত। বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে শ্রীরামশাস্ত্রীর আবৃত্তি শেষ হলে পর সত্যেন্দ্রনাথ মাখনলাল দীক্ষিতকে ঐ উচ্চারণ অনুসরণ করতে উপদেশ দেন কারণ দীক্ষিতের সংস্কৃত উচ্চারণ অন্যান্যদের চেয়ে অনেক শুদ্ধ হলেও পণ্ডিত শ্রীরামশাস্ত্রীর মত বিশুদ্ধ নয়।

জীবনের শেষে অধ্যায়ে রাঁচির মোরাবাদী পাহাড়ের 'শান্তিধামে' বছরের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হওয়ায় কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তথাপি বার্ধক্যেও তাঁর শিল্পীসত্তার বিলাপ ঘটে নি। মোরাবদী থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ রাঁচির ক্লাবের নিমন্ত্রণে প্রায়ই অংশগ্রহণ করতেন। সেখানে তাঁর আবৃত্তি হতো।[৩০]

এতক্ষণ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় পরিজন ও বাইরের বিভিন্ন সুধীজনের বক্তব্য থেকে আবৃত্তিকার সত্যেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট শিল্পবোধের পরিচয় উদ্ঘাটন করা গেল। সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা এই তিন ভাষায় আবৃত্তিতেই তাঁর সমান দখল ছিল। তরুণ বয়সেই শেক্সপীয়ারের কাব্যপাঠ শুনতে তিনি কত আগ্রহশীল ছিলেন তা সিংহলে ভ্রমণবৃত্তান্তের দিনলিপিতে নিজেই বলে গেছেন।[৩১] শেক্সপীয়ারের আবৃত্তি ইংরেজদের কণ্ঠে পরিবেশিত হলেই তাঁর আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পেতো। সম্ভবত ইংরেজদের উচ্চারণভঙ্গী ও পরিবেশনার ঢঙ তিনি আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হতেন। এছাড়া মারাঠী গুজরাটী ইত্যাদি

ভাষায় তাঁর সুন্দর ভাষণ থেকেও ধারণা করা যায়, এসকল ভাষার আবৃত্তিতেও তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

সংস্কৃতভাষার চর্চা রাজকাজের ফাঁকেও তিনি বজায় রেখেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনীকে কলকাতা থেকে তাঁর সংস্কৃত বই কর্মস্থলে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন।[৩২] টেনিসনের কাব্যসম্ভারের সাথে 'সংস্কৃত কাব্য সংগ্রহ' তাঁর লাইব্রেরিতে একই সংগে সাজানো থাকতো।[৩৩] দিনান্তে সকল কাজের শেষে কিছুক্ষণ সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা তাঁর একান্তই যে প্রিয় ছিল তা ইন্দিরা দেবীর কথায় প্রমাণিত হয়। "আমরা যখন ছুটিতে বম্বে যেতুম তখন রাত্রে খাবার পর আমাদের শকুন্তলা প্রভৃতি কত কাব্য পড়ে শোনাতেন।... ঢুলনি পেলেও টেবিলে খানিকক্ষণ না বসে কখনো শুতে যেতেন না"[৩৪]

ইংরেজি সাহিত্যও তাঁর কতো প্রিয় ছিল তার প্রমাণ—সত্যেন্দ্রনাথের সংগৃহীত চার খণ্ড বিবিধ সংকলনের মধ্যে শুধু মাত্র ইংরেজি সাহিত্যেরই সংকলন একটি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশে যে শোকার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে সেখানে সংস্কৃত আবৃত্তির সংগে তাঁর ইংরেজি আবৃত্তিরও বিশেষভাবে প্রশস্তি করা হয়েছে—'শেক্সপীয়ারের বহুল অংশও তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কোন কোন সভায় সুনিপুণভাবে উহার আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিতে অনেকেই তাঁহাকে দেখিয়া থাকিবেন।' (মাঘ, ১৮৪৪ শক) ইংরেজি আবৃত্তিচর্চায় প্রিয় সুহৃদ তারকনাথ পালিতের সান্নিধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে ধরে নেয়া যায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সুহৃদ তারক পালিতের ইংরেজি আবৃত্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তারক পালিতের আবৃত্তিরীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেন: 'ইংরাজী গদ্য পদ্যের আবৃত্তি মোটামুটি বলিতে গেলে দুই প্রকারের আছে বলা যায়। এই প্রকার আবৃত্তি খুব demonstrative : চীৎকার, হাত পা নাড়া ইত্যাদি। আরেক প্রকারের আবৃত্তি তরংগবিহীন, একঘেয়ে। তারকের রীতি এই দুইয়ের বহির্ভূত, ঠিক বুঝাইতে গেলে বোধহয় তাহাকে serene বলা যাইত পারে'।[৩৫]

তারক পালিতের আবৃত্তিরীতির আলোচনা এখানে নিতান্ত অপ্রাসংগিক নয়, কারণ তারক পালিত আবৃত্তিতে যে দুটি দিক বর্জন করেছেন সত্যেন্দ্রনাথও সেগুলি কোনদিন গ্রহণ করেন নি। সুতরাং দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধুর ইংরেজি আবৃত্তিরীতিতে সাধর্ম্য ছিল বলে মনে করা যায়।

১৯৭৭-এ শান্তিনিকেতনে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়[৩৬] এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—তিনি যখন যুবক (২৫।২৬ বছর) তখন শান্তিনিকেতনের পুরানো নাট্যঘরে সত্যেন্দ্রনাথের মুখে বাংলা ও ইংরেজি আবৃত্তি শুনেছেন। বাংলা কবিতাটির নাম ছিল 'বন্দীবীর' (রবীন্দ্রনাথ)। ইংরেজি কবিতাটির নাম তিনি তখন স্পষ্ট করে না বললেও কবিতাটিতে বারে বারে বারে আরও Din, Din, Din, শব্দটি তাঁর স্পষ্ট স্মরণে ছিল। রুডইয়ার্ড কিপ্‌লিঙ্‌ ; এর' 'Gunga Din' কবিতাটিতে বারে বারেই Din ! Din ! শব্দটি চোখে পড়ে ১৯৮১ সালে ৫ই জুলাই এই কবিতাটি তাঁকে দেখাতে নিয়ে গেলে তিনি স্পষ্ট করেই বলেন—এই কবিতাটিই তিনি সত্যেন্দ্রনাথের মুখে শুনেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ইংরেজি আবৃত্তির জন্য যে কবিতাগুলি নির্বাচন করতেন এর মধ্যে এই কবিতাটি তাঁর প্রিয় ছিল, এই ধারণা সম্পর্কে নিসংশয় হওয়া যায়। সেজন্য কবিতাটি পরিশিষ্টে দেওয়া গেল। প্রসংগত সত্যেন্দ্রনাথের চারখণ্ড সংকলনেও ইংরেজি কবিতাগুচ্ছে কবিতাটি স্থান পেয়েছে।

শান্তিনিকেতনে শ্রীমতী পূর্ণিমা ঠাকুরের সংগে এক সাক্ষাৎকারে জানা গেছে ছোটবেলায় পূর্ণিমা ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহলাভ করে ধন্য হয়েছেন। পূর্ণিমা ঠাকুর তাঁর 'নম্মা'[৩৭] ইন্দিরা দেবীর কাছে কিছুদিন থাকার ফলে সত্যেন্দ্রনাথকে আরও নিবিড় ভাবে জেনেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের অপূর্ব আবৃত্তি শোনার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের অপূর্ব আবৃত্তি শোনার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ যখন মাঝে মাঝে রাঁচি থেকে কলকাতায় আসতেন তখন যেখানেই থাকতেন, প্রত্যেক রবিবার সকলকে নিয়ে একটি পারিবারিক উপাসনার আয়োজন করতেন। রবিবার সকলেরই ছুটির দিন থাকায় এই দিনটিতেই উপাসনা হতো। সেখানেই তাঁর মুখে বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত মন্ত্রের আবৃত্তি শুনে পূর্ণিমা ঠাকুর মুগ্ধ হয়েছেন। এছাড়াও 'দুই বিঘা জমি' 'বন্দীবীর' ইত্যাদি কবিতার আবৃত্তি সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে বহুবার শুনেছেন।

এ সকল বক্তব্য থেকে সত্যেন্দ্রনাথের বাংলায় আবৃত্তি নির্বাচনেরও একটা দিক খুঁজে পাওয়া যায়। তত্ত্বমূলক কবিতার চেয়ে আখ্যানমূলক 'কথা ও কাহিনীর' কবিতাগুলিই অধিকাংশ সময় আবৃত্তির জন্য তিনি বেছে নিতেন তা অসিত হালদারের বক্তব্য থেকে জানা যায়। প্রসংগত সত্যেন্দ্রনাথের

আবৃত্তি-শিক্ষাপ্রণালীরও তিনি আভাস দিয়েছেন।[৩৮] রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি সত্যেন্দ্রনাথের ভাল লাগতো বলেই বিভিন্ন আসরে তিনি তা আবৃত্তি করতেন। এর পিছনে কোন প্রচারের উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। তথাপি সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে 'advertize' করেছেন এমন অভিযোগও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উত্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে যে যথোচিত উত্তর দিয়েছেন সেখানেই আবৃত্তিকার সত্যেন্দ্রনাথের আসল পরিচয় আরও স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রিয়বরেষু বোলপুর

'…মেজদাদা আমার রচিত কবিতা আবৃত্তি করে আমাকে advertize করে বেড়িয়েছেন একথা আপনারই মুখে শোনা গেল—তার কারণ আপনি অপ্রিয় কথা বলবার ভার নিয়েছেন…আপনি অতি সহজেই এমন কথা মনে করতে পারতেন যে আমার কবিতা তাঁর কাছে পরিচিত এবং প্রিয়, সেই জন্যেই তিনি একথা ভুলে যান যে আমার কবিতা আবৃত্তি করলে আর কারও মনে বেদনা লাগতে পারে। আমার কবিতা আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে অবিবেচনার কাজ হতে পারে, কিন্তু যিনি চিরজীবন নিজের মানমর্যাদা অতি সহজে সকলের কাছে নত করে রেখেছেন একদিনের জন্যও যাঁকে কেউ অহংকার অনুভব করতে দেখেনি তিনি আমার কবিতা advertize করবার ভার নেবেন একথা অশ্রদ্ধেয়।' ইতি ২৩শে বৈশাখ ১৩১৩

দ্র: রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড, পৃ, ৩০৭-৮ (৩য় সং)।

বাদ্যযন্ত্রচর্চা ও ফ্যান্সি ড্রেস

যন্ত্রসংগীতে সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা তাঁর পত্রাবলী থেকে জানা যায়। কর্মস্থল থেকে ১৮৬৮-র ৩রা আগস্টের পত্রে লিখেছেন —আমি গোঁসায়ের বই হইতে অনেকগুলি গৎ তুলিয়াছি ও বাজাইতে পারি।" (পুরাতনী)। সেতারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে শিক্ষিত করে তুলতে সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন।[৩৯] সত্যেন্দ্রনাথকে ছোট হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে সৌদামিনী দেবী নিজেই দেখেছেন।[৪০] এছাড়া তাঁর কর্মস্থলের আবাসে একটি বড় পিয়ানোও ছিল। কর্মস্থলে ও তাঁর কলকাতার বাড়িতে নানা বাদ্যযন্ত্রের চর্চা হতো; এতে তাঁর উৎসাহ ছিল প্রচুর।

আর একটি বিশেষ দিকে সত্যেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল। বিষয়টি নিছক আমোদের হলেও এর শিল্পমূল্যও অবহেলার নয়। কর্মস্থলে ইওরোপীয়ান ক্লাবে আয়োজিত ফ্যান্সি ড্রেসে সত্যেন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করতেন।[৪১] যে সমস্ত পরিজনরা তাঁর কাছে গিয়ে থেকেছেন এ ব্যাপারে তিনি তাঁদেরও উৎসাহিত করেছেন। অবসরজীবনে কলকাতায় আসার পরেও পরিজনদের মধ্যে ছদ্মবেশ-সাজ দেখলে তিনি প্রীত হতেন।[৪২] নিছক আমোদেই সত্যেন্দ্রনাথের তৃপ্তি ছিল না; এর মধ্যে দিয়ে শৈল্পিক বিকাশ ঘটলেই তিনি পরিপূর্ণ আনন্দ পেতেন।

পত্নীর জন্য নব নব পরিচ্ছদ পরিকল্পনায় তাঁর শিল্পবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট রূপে পাওয়া যায়। পারসী শাড়ি পরার ঢঙ জ্ঞানদানন্দিনী শিখে নেওয়ার পরেও মাথায় একটি আবরণ ছাড়া পরিচ্ছদ যে সম্পূর্ণাঙ্গ হয় না—এজন্য তিনি অনেক ভেবেছেন[৪৩] নিজের পোশাক নির্বাচনেও তাঁর সুরুচির ছাপ সুস্পষ্ট। টুপিতে হাল্কা জরির কাজ ও বেগুনী প্রভৃতি হাল্কা রঙের পাগড়ি তার পছন্দসই ছিল। জমকালো সাজ লাল রঙের প্রতি তাঁর যে ঘোর বিতৃষ্ণা ছিল তা জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত তাঁর পত্রে জানা যায়।[৪৪]

শিল্প ও সুরুচির চর্চায় জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার দিকে সত্যেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার বিরাম ছিল না। আকর্ষণীয় গৃহসজ্জা ও উদ্যান-রচনার ক্ষেত্রেও তা বিকশিত হয়েছে। এ কথায় সত্যেন্দ্রনাথের জীবন ছিল শ্রী-মণ্ডিত—যেখানে অর্থের প্রাচুর্যই বড় কথা নয়—শিল্পীসুলভ দৃষ্টি-ভঙ্গীই বড়।

---

১. মেজোজ্যোঠামশায় তখন থাকেন বিরজিতলার বাড়িতে। সেখানে আমাদের রিহার্সেল হবে। তিনি নিলেন রিহার্সেলের ভার। আমাদের মহা ফূর্তি। মেজোজ্যাঠামশায়ের বাড়িতে রিহার্সেল মানেই তো খাওয়ার ধুম।...বিকেল হতে না হতে সবাই ছুটতুম। (ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১০১।)

বিকেলের চা থেকে খাওয়া শুরু হত। রাত্রের ডিনার পর্যন্ত খাওয়া চলত আমাদের। আর সংগে সংগে রিহার্সেলও চলত। (ঐ, পৃ. ৯০)।

২. 'এবারে কর্তাদাদামশায়ের কী খেয়াল হল, লাটসাহেবের মেম লেডী ল্যান্সডাউনকে পার্টি দেবেন, হুকুম হল বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয় হবে।' (ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১০১)।

৩. 'বাবা একবার বিলেত থেকে আসবার সময়ে তাঁর সহযাত্রী তখনকার লাটপত্নী লেডী ল্যান্সডাউনকে জোড়াসাঁকোর বাড়ি আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।...কলকাতায় আসবার পর লাটপত্নী এই নিমন্ত্রণ রক্ষার অভিপ্রায় জানালে তার জন্য বাল্মীকিপ্রতিভার একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়।'—রবীন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী পৃ. ২৮ (১৯৬২)।

৪. 'তখন এরকম ইলেকট্রিক বাতি ছিল না, গ্যাস বাতি, কার্বন লাইটের ব্যবস্থা হল লাল সবুজ মখমলের পর্দা দিয়ে স্টেজ সাজানো হল। এটা সেটা কিছুই বাদ নেই। কর্তাদাদামশায়ের খরচ—মনের সুখে জিনিসপত্তর আনিয়ে সাজানো গোছানো গেছে। ওদিকে আবার বিরাট পার্টি''...ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-পৃ. ১০৩।

"তাঁদের যথাযোগ্য সমাদর দেখাবার জন্য কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিপুদাদা তাঁর স্বতঃসিদ্ধ রসিকতা করে বলেছিলেন, জোড়াসাঁকোর উঠানের সাজসজ্জা দেখে লাটপত্নী বাড়ি গিয়ে নিশ্চয়ই লাট-সাহেবকে বলবেন—Darling! All velvet and festoons!"
—রবীন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী—পৃ. ২৮ (১৯৬২)।

৫. সেখানে (বিরজিতলায়) একদিন একটা কাপ্তেন এসেছিল, কাবুলীদের নাচ দেখালে।...তারা নেচেছিল খোলা তলোয়ার ঘুরিয়ে কাবুল দেশের হাজারী নাচ। (পৃ. ১০২ ঘরোয়া) সেই খোলা তলোয়ার ছোরা ঘুরিয়ে কাবুলীদের নাচ নেচে দিলুম আমরা। এই নাচ আমরা রিহার্সেলে কম কষ্ট করে শিখেছিলুম? মেজোজ্যাঠামশায় ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। গান গেয়ে নাচতে নাচতে হয়রান হয়ে পরতুম তবুও থেমে যাবার জো নেই, থেমেছি কি মেজোজ্যাঠামশায় পিছন

থেকে ছুড়ি দিয়ে খোঁচা মারতেন। মহা মুশকিল, যে-জায়গায় খোঁচা মারতেন পিঠটা পাটা একটু বগড়ে নিয়ে আবার উদ্দাম নৃত্য জুড়ে দিতুম।'—ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃ. ১০৫।

৬. 'যত সব সাহেবসুবো, লাটসাহেবের মেম আসবে।...মেজোজ্যাঠামশায় বলেন, ও হবে না, খালি গায়ে ডাকাত সাজা হবে না।...আমি বললুম তা হলে ও হাজারীদের মতো সাজ করা যাক। সবাই খুশি, বললেন এ ঠিক হবে। ডাকো দরজী। আগে ছিল ডাকাতের খালি গা, বুকে সরু শালুর ফেটি। দরজী এসে আমাদের সাজ করতে লাগল, কাবুলীদের মতো গায়ে সেইরকম পাঞ্জাবি, পা অবধি কাবুলী পাজামা।'—ঐ, পৃ. ১০২।

৭. রবীন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—পৃ. ৩৩ (১৯৬২ পুনর্মুদ্রণ।

৮. 'এমারেল্ড থিয়েটার রাজা ও রাণী নিয়েছিল। পাবলিক অ্যাক্টর অ্যাকট্রেস অভিনয় করে।...আমাদের যখন রাজা ও রাণী অভিনয় হয় সে সময়ে একদিন কী করে পাবলিক অ্যাকট্রেসরা ভদ্রলোক সেজে অভিনয় দেখতে ঢুকে পড়ে। আমরা কেউ কিছু জানি নে।...পাবলিক স্টেজে রাজা ও রানী অভিনয় করবে, আমাদের নেমন্তন্ন করেছে।...রানী সুমিত্রা স্টেজে এল, একেবারে মেজোজ্যাঠাইমা। গলার সুর, অভিনয, সাজসজ্জা, ধরণ-ধারণ হুবহু মেজোজ্যাঠাইমাকে নকল করেছে।' (ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৯২ ৯৩)

৯. সাহিত্যস্রোত ১ম ভাগ। স্বর্ণকুমারী দেবী : —পৃ. ৩৯১।

১০. সমাজে ইংরেজী নাটকের অভিনয় হতো। একবার 'জুলিয়াস সীজার' অভিনীত হয়েছিল। এ অভিনয়ে সীজার সেজেছিলেন—স্যার বি. এল. মিন ; মার্ক এন্টনি—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; বুটাস—হেমচন্দ্র বসুমল্লিক ; কাসিয়াস—প্রকাশচন্দ্র দত্ত ; এবং ক্যাস্কা—অটলকুমার সেন।

সত্যেন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায় ষাট বৎসর। তিনিও 'সংগীত-সমাজের সদস্য ছিলেন।' (জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৯৯)।

১১. 'তিনি (বাবা) একবার ঐ মেম বউ (মিসেস শেলি বাঁড়ুয্যে) এবং নির্মল সেন (কেশববাবুর পুত্র) প্রভৃতিকে নিয়ে শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সীজারের আংশিক অভিনয় করবার সব তোড়যোড় করেছিলেন। সেটা বোধহয় ১নং রেনি পার্কে।' শ্রুতি ও স্মৃতি পাণ্ডুলিপি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী—পৃ. ৪৬।

১২. আজ গগনদের ওখানে মেঝদাদাতে আমাতে জুলিয়াস সীজারের ইংরেজী অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম—ছোট রাজা ছিলেন—চমৎকার হয়েছে।' (22nd February—Saturday)। ১৯০৮-এ লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরী : শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্রসদনে প্রাপ্ত।

১৩. ঘরের মানুষ গগনেন্দ্রনাথ : দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২৭।

১৪. সোলাপুরে থাকিতে বাহির হইতে গাইয়ে ওস্তাদ, নাট্যমণ্ডলীর লোকেরা মধ্যে মধ্যে আমার সংগে দেখা করিতে আসিত। একবার এক পারসী নাট্যশালার ম্যানেজার আসিয়া আমাকে মুরুব্বি ধরিয়াছিল,...তাঁহাদের অভ্যস্ত নাটকের তালিকা আমাদের নিকট পাঠানো হইল...দুর্ভাগ্যক্রমে অভিজ্ঞান 'শকুন্তলা' আমার মনোনীত হইল। সে অভিনয় দেখিয়া আমার আপাদমস্তক সর্বাংগ জ্বলিয়া গেল। তাপসকন্যা একেলে পারসী রমণীর বেশে রংগভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। দুষ্যন্ত একালের নবেল বর্ণিত প্রণয়ী। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ হিন্দুস্থানী ভাষায় গান করিতে লাগিল। দুষ্যন্তের পুত্র, সেও নব্য পারসী বালক, পিতাকে দেখিয়া তাহার উপর একটা বই ছুঁড়িয়া মারিল।...কালিদাস তাঁহার নাটকের এইরূপ অপব্যবহার দেখিলে কি মনে করিতেন বলিতে পারি না। আমার বোম্বাই প্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বৈতানিক প্রকাশনী—পৃ. ১৪৩-১৪৪।

১৫. স্তোত্রমালা—অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু প্রমুখদের বিরচিত। আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বৈতানিক প্রকাশনী—পৃ. ১।

১৬. সত্যেন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী—বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫২।

১৭. জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—পৃ. ৯৯।

১৮. ঐ —পৃ. ৯৯।

১৯. জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী : আমার কথা : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

২০. ভারতী সম্পাদনা ১৩২২-১৩৩০। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। দ্র. জীবনের ঝরাপাতা—পরিশিষ্ট।

২১. ফটকে পা দিতে গা কাঁপিয়া উঠিল। সিভিলিয়ান মানুষ—তাহার উপর ধনে মানে খ্যাতিতে কোথায় সত্যেন্দ্রনাথ, আর কোথায় আমরা কলেজের দুজন নগণ্য ছোকরা।···ভয়ে ভয়ে কথাটা তুলিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন—বেশ যাব একজন এসে নিয়ে যেয়ো। ···ভারতী, মাঘ, ১৩২৯। সত্যেন্দ্রনাথের শোকপ্রশস্তি, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

২২. বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে সত্যেন্দ্রনাথের শোকসভায় (৩রা চৈত্র, ১৩২৯) সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের ভাষণ।

২৩. স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিত 'শোক-নৈবেদ্য' থেকে প্রাপ্ত। লেখিকা সংকলিত 'সাহিত্যস্রোত' ১ম ভাগে মুদ্রিত।

২৪. আমার জীবন : মধু বসু পৃ. ৬। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু ও কমলা বসুর পুত্র, পরবর্তী কালে চিত্রজগতে সুপরিচিত)।

২৫. দ্র. রবীন্দ্র রচনাবলী—৭ম খণ্ড (বিশ্বভারতী) কথা : বিচারক—।

* * * * *

কহিলা শাস্ত্রী—রঘুনাথ রাও
যাও করো গিয়ে যুদ্ধ
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার······

২৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০৭-এর কার্যবিবরণী।

২৭. ঐ

২৮. ঐ

২৯. ঐ

৩০. 2nd May, 1908 Saturday : সন্ধ্যার সময় ক্লাবের নিমন্ত্রণে গেলুম···মেঝদাদার recitation হল।

2lst Novenber, 1908 Saturday : আজ সন্ধ্যার পর মহেন্দ্রবাবুর গাড়ীতে আমি মেঝদাদা ও মহেন্দ্রবাবু Club-

এর Literary Society-তে গেলুম—মেঝদাদা শানিবাবু ও জিতেন্দ্র-বাবুর recitation হল।

16th December, 1908 Wednesday : '...Club-এর Literary Society-তে...মেঝদাদার recitaion হল। সবশেষে আমি হিতে বিপরীত পড়লুম।'

[১৯০৮-এ লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরী থেকে প্রাপ্ত। শান্তিনিকেতনে-রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত]

৩১. পান্থশালার রক্ষক আমাদিগকে কোলমেন নামক এক সাহেবের নিকটে লইয়া গেলেন। সাহেব সর্বপ্রকারেই নিপুণ। সেক্সপিয়ার গ্রন্থ হইতে ভাল ভাল কবিতা পাঠ করিলেন। সকল কবিতাই ভাবে পরিপূর্ণ—পাঠকও সর্বপ্রকারে মনোরঞ্জক। সিংহলে ভ্রমণ বৃত্তান্ত : বোম্বাইচিত্র : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থে ৫১৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

৩২. আমার সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহের বইটাও যদি পার পাঠাইবে।

পুরাতনী—১১নং পত্র।

৩৩. দ্র. জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ। আমেদাবাদ।

৩৪. সত্যেন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী : বিশ্বভারতী পত্রিকা—তৃতীয় বর্ষ, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫২।

৩৫. পুরাতন প্রসঙ্গ : কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : বিপিনবিহারী গুপ্ত অনুলিখিত, পৃ. ১৯০।

৩৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের তারিখ—২রা আশ্বিন, ১৩৮৪ (১৯৭৭)। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার ৫ই জুলাই ১৯৮১।

৩৭. ১৯৭৭-এর ২রা আগস্ট শান্তিনিকেতনে এক সাক্ষাৎকারে পূর্ণিমা ঠাকুর বলেন—'ইন্দিরা দেবী ছিলেন আমার ন-জেঠাইমা'। ন-মা বলেই তাঁরা ডাকতেন। পাবনা হরিপুর গ্রামের নামকরা চৌধুরী বংশে দুর্গাদাস চৌধুরীর চতুর্থ পুত্র প্রমথ চৌধুরী ও বর্ষপুত্র ছিলেন

সুহৃদনাথ চৌধুরী। (ডাক্তার) পূর্ণিমা ঠাকুর সুহৃদনাথ চৌধুরীর (সুহৃৎ চৌধুরী) কন্যা। ইন্দিরা দেবীর পরিবারের সংগে এঁদের ঘনিষ্ঠতার কথা পূর্ণিমা ঠাকুর অন্যত্রও বলেছেন—'বাবা (সুহৃদনাথ চৌধুরী) যুদ্ধে গেলেন—মাকে ও আমাদের পাঁচ ভাইবোনকে রেখে কমলালয়ে, ইন্দিরা দেবীর তত্ত্বাবধানে।'—পূর্ণিমা ঠাকুর রচিত 'ইন্দিরাস্মৃতি' পাণ্ডুলিপি পৃ. ৩২।

৩৮. '...আমাদের (ছেলের দলকে) কথা ও কাহিনীর কবিতা (মেজদাদামশাই) আবৃত্তি করাতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কি ভাবে ভাল করে কবিতা পাঠ করতে হয় তার হদিস্ বাত্‌লে দেওয়া। যতদূর মনে আছে তিনি এই কথাই আমাদের বলেছিলেন—সাধারণ কথা বলার সময় আমরা যেমন বিশেষ বিশেষ শব্দের উপর ঝোঁক দিয়ে বলি, কবিতা পাঠের বেলায় ও পাঠকালে ভাবপ্রকাশক মূল কথাগুলিকে বুঝে জোর দিয়ে পড়লেই কবিতা সুন্দর ভাবে পড়া হয় এবং অপরের শুনে বোঝার পক্ষেও সুবিধা হয়। অনর্থক সুর করে টেনে টেনে কবিতা পাঠ একেবারেই তিনি পছন্দ করতেন না।' রবিতীর্থে : অসিত হালদার; পৃ. ২৩-২৪।

৩৯ Joti is learning Sitar—(Satyendranath's letter to Ganedranath,—Ahmedabad 2nd June, 1867.
Joti is learning 'Sitar'—this is the only amusement I can provide for him here.'—*Ibid*, Ahmedabad 4th Sept 1862.

৪০. বাহিরের দালানে যেদিন লোক সমাগম হইত,...মেজদাদা নিজে গান রচনা করিয়া একটি ছোট হার্মোনিয়ম লইয়া মনের সংগে যখন সেই গান গাহিতেন তখন সকলেই মুগ্ধ হইত...।'—পিতৃস্মৃতি : সৌদামিনী দেবী। (স্মৃতিকথা গ্রন্থে মুদ্রিত)

৪১. বাবা সোলাপুর ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। একবার মনে আছে তাঁর দৈন্যদশা জ্ঞাপন করবার জন্য ছদ্মবেশ উৎসবে ছেঁড়া খোঁড়া কাপড়ের উপর প্রেসিডেন্টের চাপরাশ লাগিয়ে সেজেছিলেন। আমাকে গ্রীসীয় পোষাক পরানো হয়েছিল, জ্যোতিকা মশায় Robin Hood সেজেছিলেন।'—স্মৃতি ও স্মৃতি : ইন্দিরা দেবী; পৃ. ৫৩।

৪২. দ্রষ্টব্য—ঘরের মানুষ গগনেন্দ্রনাথ : শ্রীদ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় পৃ—১৭-১৮ (গগনেন্দ্রনাথের কাবলীওয়ালার সাজ)।

৪৩. 'একটা Head-dress করিতে দিবে না।' শ্রীস,' ১১৪নং পত্র, পুরাতনী : ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী সংকলিত। '…মাথা'র জন্য কোন veil কি পাগড়ীর মত কোন কাপড় তৈয়ার করিতে দিবে না ?—১০৪নং পত্র, পুরাতনী।

৪৪. আমার জন্য যদি জরির টুপি করিতে দেও, তবে খুব যে জমকাল করিবে তা নয়। প্লেন কাজ যেমন হয়। (১১৫নং পত্র, পুরাতনী)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিজন পরিবেশে ও বান্ধবসমাজে সত্যেন্দ্রনাথ

পরিজনদের মাঝে   বান্ধবসান্নিধ্যে

পরিজনদের মাঝে

সত্যেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক আলোচনার পর অন্তরংগ ও ঘরের মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের সামান্য পরিচয় না দিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে।

জীবনকথা অধ্যায়ে তাঁর স্নেহসিক্ত ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু আভাস মাত্র দেওয়া গেছে। বর্তমান আলোচনায় পরিজন ও বান্ধবেরা তাঁকে যে ভাবে দেখেছেন—সেই আলোকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের অনুধাবন করা হবে।

ইন্দিরা দেবী 'সত্যেন্দ্রস্মৃতি'[১]তে লিখেছেন—"একজন নামী লেখক বলেছেন,—'আমরা যাকে Personality বলি, সেটি কতগুলি বড় এবং অনেক গুলি ছোটর সমষ্টি।' বড়গুলি বাইরের লোক জানতে পায় বা খোঁজ রাখে ছোটগুলি বেশির ভাগ ঘরের লোকেই জানতে ও দেখতে পায়।"

পিতামাতার দুই বিপরীত ব্যক্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে ইন্দিরা দেবী বলেছেন জ্ঞানদানন্দিনী 'অল্পে অধীর অল্পে কাতর ছিলেন', তাঁর তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথ অনেক 'ধীরশান্ত' ছিলেন। পরিবারের 'দু' চারজনের উপর তাঁর গভীর ভালোবাসা আবদ্ধ না থেকে দশজনের উপর স্নেহরূপে ছড়িয়ে পড়েছিল। একজনের অনুভূতিতে ছিল বেশি প্রগাঢ়তা, অপর জনের বেশি প্রসারতা।[২] কাজে কাজেই সত্যেন্দ্রনাথের এই ব্যাপক স্নেহপ্রবণতা পরিজনদের ক্ষেত্রে সমভাবেই বিস্তৃত ছিল।

উচ্চপদে থাকার জন্য অনেক সময় পরিজনদের জন্য সুপারিশও তাঁকে করতে হয়েছে। নিজের আত্মীয়ের জন্য অন্যকে অনুরোধ করা অনেক সময়েই তাঁর ভালো লাগেনি, যেজন্য কলকাতা থেকে দূরে বোম্বাই-এর কর্মস্থলই তাঁর পছন্দসই ছিল।[৩] কিন্তু কলকাতায় এলে মুখোমুখি কোন আত্মীয়কে বিমুখ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। অবসর জীবনেও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য তাঁর সুপারিশের নিদর্শন রয়েছে।[৪] কেবলমাত্র কর্মজীবনেই সত্যেন্দ্রনাথের বিচারকের ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল না। পরিজনদের মধ্যেও সুবিচারক রূপে তাঁর একটি শ্রদ্ধার আসন বিরাজিত ছিল। মহর্ষির উইল অনুসারে জোড়া-সাঁকো ঠাকুরবাড়ি ও জমিদারি ভাগ হয়ে যাওয়ার পর হেমেন্দ্রনাথের উত্তরা-ধিকারিগণের মধ্যে এ বিষয়ে কিছু ক্ষোভের সঞ্চার হয়। কারণ তাঁদের মতে

—প্রপিতামহদেবের উইল অনুসারে' তাঁরা অনেক কম পেয়েছেন। সেজন্য তাঁরা কিছু ক্ষতিপূরণও দাবি করেছেন। হিতেন্দ্রনাথের কথায়—ঐ ক্ষতি-পূরণ-"পূর্ববর্তী উইলের বলে প্রাপ্যাংশের-বিপদাপদে কষ্ট ভয় পরিহারার্থ কিঞ্চিৎ সাহায্যদানমাত্র"[৫] তাছাড়া এঁদের জন্য নির্ধারিত জমিদারির অংশ—'স্টেটে আয় কম, সদর খাজনা বেশি', ইত্যাদি কারণে—উড়িষ্যার জমিদারি সম্পর্কেও এঁদের মনে হতাশার ভাব ছিল। এ ব্যাপারে পিতৃহীন হিতেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যস্থতার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিচারক সত্যেন্দ্রনাথ মধ্যস্থ হয়ে যে কথা বলবেন—তার প্রতি হিতেন্দ্রনাথ ও তাঁর জননীর গভীর আস্থা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ যে কখনও একতরফা দেখবেন না—এ বিশ্বাস হিতেন্দ্রনাথের মনে সুদৃঢ় ছিল—তাঁর চিঠিতেই এর প্রমাণ রয়েছে।[৬] শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় হিতেন্দ্রনাথের মন আশ্বস্ত হয়েছিল ও তিনি সত্যেন্দ্রনাথের—'সত্যবাণী শিরোধার্য্য' করেছিলেন।[৭] সত্যেন্দ্রনাথের 'ত্যাগ স্বীকারের ভাব' ও উদারতা দেখে হিতেন্দ্রনাথ বরং লজ্জিতই হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে লেখা হিতেন্দ্রনাথের চিঠিতেও সত্যেন্দ্রনাথের এই উদারতার কথা আরও স্পষ্ট ভাবে লেখা রয়েছে।[৮] শেষটায় হিতেন্দ্রনাথের উড়িষ্যার জমিদারি সন্তুষ্ট চিত্তেই গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৮১ সাল থেকেই পুত্রকন্যার উপযুক্ত শিক্ষার নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আপন পরিবারকে নিয়ে এক সংগে বাস করা তাঁর জীবনে হয়ে ওঠে নি। শিশুকালে বিলাতের পরিবেশে প্রায় বছর দুয়েক কাটানোর যে সুফল ইন্দিরা দেবী ও ও সুরেন্দ্রনাথের জীবনে ফলেছে তা ইন্দিরা দেবী নিজেই বলেছে।[৯] অক্লেশেই তাঁরা ইংরেজি ভাষা অরস্ত করে বিদেশী সমাজে প্রাণখুলে মিশতে পেরেছেন। ইংরেজি ব্যাকরণ শেখার হাড়ভাংগা পরিশ্রমের হাত থেকে যেমন তিনি পুত্র-কন্যাকে রেহাই দিয়েছিলেন তেমনি এঁদের মানসিক খোরাকের জন্য শৈশবেই দিয়েছিলেন সুন্দর ছবি দেওয়া ইংরেজি বই। ইংরেজি শেখার রীতিতে, এই প্রাণবন্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলে শিশুদের জীবনে অপূর্ণতা থাকবে বলেই ইন্দিরা দেবী মনে করেছেন।[১০] শৈশবে Nice এর হোটেলে ফরাসী ভাষাও একই ভাবে এঁরা আয়ত্ত করেছিলেন।

পুত্রকন্যাকে বাইরে বোর্ডিংএ রেখে পড়ানো সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এতে তাঁর গৃহজীবনের সুখও অব্যাহত থাকতো। কিন্তু বোধ

সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত হিতেন্দ্রনাথের পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা

ওঁ

শ্রীচরণেষু

মেজজ্যেঠামহাশয়,

আপনার সস্নেহ লিপি শিরোধার্য্য করি-
লাম। আপনার আশীর্ব্বাদের ভার, উদারতা
স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইলাম এবং অতিশয় লজ্জিত
হইলাম। বিচারের সূক্ষ্মতার প্রতি — বিস্ময় [illegible]
প্রীতি পূর্ণ হইল। মন উদার ও মুক্ত হইয়া গেল।
আপনার শ্রীচরণে কালি প্রণাম করিতে যাইব।

৺পিতামহদেবের উইল উল্টাইবার কথা
আদৌ মনেই উদয় হয় নাই, কেবল একটু কম
পাইয়াছে, তবু একটু বেশী পাইয়াছে এরূপ প্রমাণে
আলোচনাই হয় নাই, শুধু কথা পাড়িয়াছিলাম
মাত্র। আর ইহা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ
আমাদের হাতে কখনো বিষয়ের ভারও পড়ে
নাই, আমরা কখনো বিষয়ও দেখি নাই, হঠাৎ
ঘাড়ে বিষয়ের ভার পড়াতে আমাদের একপ
হওয়াই স্বাভাবিক। পূর্ব্ব হইতে বিষয়কার্য্যের
ভিতর পড়িয়া ও শিক্ষিত [illegible] কাজের [illegible]
যে লাভ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। — যাই
হোক কেবল পড়িয়া কথা পাড়িয়াছিলাম
মাত্র। কিন্তু ছিদ্রান্বেষীরা আমাদের কথা-

করি তার দুটো অন্তরায় ছিল। এক জ্ঞানদানন্দিনীর অতিরিক্ত সন্তানবাৎসল্য, (যে জন্য সুরেন্দ্রনাথের পড়ার জন্য বিলেতে যাওয়া হলো না) অন্যটি উগ্র সাহেবিয়ানার প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের বিরূপ মনোভাব। গৃহজীবনে বর্ধিত হলে সন্তানেরা তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে চলবেন, এই ভরসা সত্যেন্দ্রনাথের ছিল। সেজন্য নিজেকে বঞ্চিত করেও ঐ ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছেন। ইংরেজ জাতির কর্মপ্রেরণা, নিয়মানুগত্য প্রভৃতি সদ্গুণ সত্যেন্দ্রনাথকে মোহিত করেছিল কিন্তু তিনি ভারতীয় আদর্শকে বর্জন করতে চান নি। তাঁর পথ ছিল সমন্বয়ের। ভারতীয় আদর্শের সংগে ইয়োরোপের কর্মচাঞ্চল্য ও যুক্তিবাদের মিলন সাধন করাই ছিল তাঁর আদর্শ সেজন্য ছেলেমেয়েদের সাহেবী স্কুলে পড়তে দিয়েছেন, কিন্তু সিমলায় কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে জ্ঞানদানন্দিনীর রক্ষণায় দেশীয় আবহাওয়াতেই এঁদের মানুষ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ যে ঠিক পথ বেছে নিয়েছিলেন তা তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু তারক পালিতও পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে। (দ্র. তারক পালিত—বান্ধব সমাজ)

এই ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের স্কুলের ছুটির জন্য দিনগোনা অথবা নিজের ছুটির জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের আর কোন উপায় ছিল না। সেসময় প্রবাসে পরিজনদের মধ্যে যাঁরা গিয়ে তাঁর নিঃসংগতা ঘুচিয়েছেন এঁদের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ছিল। তার নিদর্শন পাওয়া যায় স্বর্ণকুমারীকে লেখা আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাইপ্রবাস গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে।[১২]

স্নেহের ভগিনী স্বর্ণকুমারী

স্বর্ণকুমারী সাতারা, পুণা, কারোয়ার, সোলাপুর এ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে মাঝে মাঝে থেকেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে সরলা দেবীও বোম্বাই প্রদেশে মেজ মামার কর্মস্থল থেকে অনেক কিছু সংগ্রহ করেছেন।

পুণায় 'বম্বে প্রেসিডেন্সী'র সিভিলিয়ানদের একটা 'ফ্যান্সি ড্রেস বল'এ স্বর্ণকুমারী ও সরলাদেবী যোগদান করেছিলেন। সরলাদেবীর কথায়—"সমস্ত ঘর ভরা সাহেবমেমদের মধ্যে আমরা তিনজন মাত্র ইণ্ডিয়ান—মেজমামা—মা ও আমি।...মনে পড়ে মা সন্ন্যাসিনীর সাজে গিয়েছিলেন, আমি সরস্বতীর।"[১৩]

সোলাপুরে মারাঠী ক্লাবে দশেরা উৎসবে বরোদার গাইকোয়াড় এর সৌজন্যে সরলা দেবী ও স্বর্ণকুমারী মুগ্ধ হয়েছিলেন। ঐ উৎসবে লাঠি-তলোয়ার খেলা। ব্যায়ামের প্রদর্শনী ও বীরত্বমূলক বক্তৃতার ধারা দেখে সরলা দেবী মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই লিখেছেন—'বীরাষ্টমীর বীজ…মনে মনে উপ্ত হল সেই দশেরা দিনের খেলা দেখায়।'

শিক্ষার প্রতি স্বর্ণকুমারীর গভীর আগ্রহ থাকায় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর শিক্ষার অগ্রগতিতে সত্যেন্দ্রনাথের যথেষ্ট দান রয়েছে। ভগিনী-পতি জানকীনাথ ঘোষালও স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শকে পুরোপুরি অনুসরণ করতেন।

গ্রন্থকর্ত্রীর নাম ছাড়া স্বর্ণকুমারীর দীপ-নির্বাণ ১ম সংস্করণ হাতে পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তা স্বর্ণকুমারী রচনা বলে মনেই করতে পারেন নি। ভেবেছিলেন এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মনে করেছেন—মেজদাকে অবাক করে দেবার জন্যই ঐ ব্যবস্থা হয়েছিল—স্বর্ণকুমারী যে গ্রন্থ লিখছেন একথা স্বর্ণকুমারী বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেউ তাঁকে আগে জানাননি।[১৪]

সত্যেন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে স্বর্ণকুমারী দেবী কিছু না কিছু উপহার পাঠাতে ভোলেন নি। ১৯২১ সালে লিখিত তাঁর শুভকামনাজ্ঞাপক পত্রে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা উৎসারিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত 'শোক-নৈবেদ্য' কবিতাটি মেজদাদার প্রতি স্বর্ণকুমারী দেবীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার এক অপূর্ব নিদর্শন। (দ্র. ৪নং পরিশিষ্ট)। আর্থিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও পরিবারের অন্যান্যদের চেয়ে সত্যেন্দ্রনাথই যে স্বর্ণকুমারী দেবীর নিকটজন ছিলেন তা ঐ পত্র থেকে জানা যায়।[১৫] স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্রকন্যারাও সত্যেন্দ্রনাথের সংগে যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করেছিলেন তা সিবিলিয়ান হয়ে জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের সত্যেন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রতি বছর তাঁকে বোম্বাই থেকে এক বাক্স আলফাঁসো ('আফুস') আম পাঠানোতে এবং সরলাদেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে বিবিধ কাজে ও ঘটনায় মেজ মামার সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণে প্রমাণিত হয়। সপরিবারে সত্যেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে বৈদ্যনাথে সরলাদেবীর বিবাহ উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শরীর শোধরাবার জন্য স্বর্ণকুমারী সেসময় বৈদ্যনাথে গিয়েছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীই ছোট বোনের বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা

ছিলেন। সুতরাং রাঁচিতে সত্যেন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানোতে স্বর্ণকুমারী দেবীর সংগে হিরণ্ময়ী দেবীরও উৎসাহ কম ছিলনা, এটি সরলা দেবীর কথা থেকে আভাস পাওয়া যায়।[১৬]

গৃহপালিকা সৌদামিনী

স্বর্ণকুমারীর পর যে বোন তাঁর হৃদয়ের কাছে এসেছেন—তিনি সৌদামিনী। সৌদামিনী ছিলেন যথার্থই গৃহপালিকা। মায়ের মৃত্যুর পর জোড়াসাঁকো বাড়ির হাল ধরেছিলেন তিনি। সকলকে 'কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়েও' সুখী করাই ছিল তাঁর ব্রত। ভাইফোঁটার দিনে ভ্রাতাদের আমন্ত্রণ করা অথবা পত্রযোগে তাঁদের কল্যাণকামনা করা তাঁর অন্যতম কর্তব্য ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দূরে থাকায়, তাঁর কলকাতার সংসারে জ্ঞানদানন্দিনীর খোঁজখবরও তিনি নিয়মিত নিয়ে এসেছেন।

সৌদামিনী দেবীর অভাবে জোড়াসাঁকো বাড়ি যে ভ্রাতাদের কাছে শূন্য বলে মনে হয়েছে তা সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্র থেকে স্পষ্ট জানা যায়।[১৭] পত্রোত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে যে সমদুঃখকাতরতা প্রকাশ করেছিলেন তাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করে লিখেছিলেন—"সৌদামিনীর দিব্যধামে প্রয়াণের কথা তোমার সংগে বাঁটাবাঁটি করিয়া ক্ষণেকের জন্য অনেকটা শান্তি লাভ করিলাম।"[১৮]

সৌদামিনীর কারোয়ারে কিছুদিন থাকার কথা জীবনকথার কর্মজীবন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। জোড়াসাঁকো বাড়িতে প্রথম এসে সৌদামিনী দেবীর স্নেহ ও যত্নে জ্ঞানদানন্দিনী নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজীবন এই মধুর সম্পর্ক বজায় ছিল। 'রাঁচির গিরিগৃহে' মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসেও তাঁকে জ্ঞানদানন্দিনীর সংগে অতিথি আপ্যায়নে নিয়োজিত থাকতে দেখা গেছে।

সেজবোন শরৎকুমারী ও ছোটবোন বর্ণকুমারীর সংগেও তিনি আজীবন সংযোগ রক্ষা করেছেন। শরৎকুমারী ও যদুনাথ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথকে জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে লিখিত পত্রেও রহস্য করতে দেখা গেছে।[১৯]

বড়দার স্মৃতি

সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতিতে একটি প্রধান আসন জুড়ে আছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। তাঁর কিছু কিছু রচনার নিদর্শনও তিনি 'আমার বাল্যকথা' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।' গৃহিণীপনার অভাবে' দ্বিজেন্দ্রনাথের অনেক লেখা বিনষ্ট হলেও পুস্তিকা ও পত্র পত্রিকা থেকে তা সংগৃহীত করে গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রণের কাজে সুধীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথকেই সত্যেন্দ্রনাথ উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে করেছেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের মতের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের বিস্তর পার্থক্য থাকলেও, দুজনের মধ্যে ছিল গভীর সম্প্রীতি। দুজনের মতান্তর কোনদিনই মনান্তরে পরিণত হয় নি। সামাজিক অন্যান্য বিষয়েও দ্বিজেন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতার কথা ইন্দিরা দেবী ও স্বর্ণকুমারী দেবী দুজনেই বলেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন, এ বিষয়ে দুজনের প্রায়ই তর্ক হতো এবং তাঁরা তা সকৌতুকে শুনে নিজেদের মত গঠন করার সুযোগ পেতেন। শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারেন নি স্বর্ণকুমারী দেবী একথারও উল্লেখ করেছেন।[২০]

রাজনৈতিক বিষয়ে দুজনের চিন্তাধারার পার্থক্য 'সত্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা' অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। মতভেদ থাকলেও দ্বিজেন্দ্র নাথের চিঠির ভাষা বড় সরস, দুই ভাই একে অন্যকে দীর্ঘদিন না দেখে থাকতে পারতেন না। রাঁচিতে সত্য ও জ্যোতি দুই ভাইকে দেখার প্রবল আগ্রহে 'আসানসোল[২১]—আদ্রা' জংসনের মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের খেয়াল প্রসূত রাঁচি অভিযানের কাহিনী অ্যানড্রুজ 'বড়দাদা'র স্মৃতিচিত্রে তুলে ধরেছেন। ভাইদের পেয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের আর আনন্দের সীমা থাকে নি।

শান্তিনিকেতনে জয়শ্রী সেন এর সংগে সাক্ষাৎকারে জানা গেছে—খুব সম্ভবত ১৯২২ সালে বড়দাদাকে দেখতে সত্যেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এসে ছিলেন। উঠেছিলেনও 'নিচু-বাংলায়' দ্বিজেন্দ্রনাথের গৃহে। শান্তিনিকেতনে ঐ তাঁর শেষ আসা। এখানে অল্প ক'দিন ছিলেন, মন্দিরে একদিন উপাসনাও করেছেন। শরীর তাঁর খুব ভাল ছিল না, ঐ অবস্থায়ই কলকাতা ফিরে যান। জয়শ্রী ঠাকুর (সেন) ও তাঁর দিদি তখন শান্তিনিকেতনে মেয়ে বোর্ডিং এ ('দেহলি'র কাছে মাটির বাড়িতে) ছিলেন।

যেদিন সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ শান্তিনিকেতনে এলো. সেদিন এই খবরটা কি ভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেওয়া যায়, এই নিয়ে সকলে চিন্তিত হয়ে পড়েন। জয়শ্রী ঠাকুর ও তাঁর দিদি মঞ্জুশ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথের বাড়িতে আসেন। আচমকা শোকে হঠাৎ যাতে কোন অঘটন না হয়, সেজন্য ভয়ে ভয়ে দিনেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথকে বলেন—সত্যেন্দ্রনাথের অবস্থা খুবই আশংকাজনক। খবর শুনেই অস্থির হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রিয় অনুচর মুনীশ্বরকে ডেকে বললেন—'এক্ষুনি কলকাতায় চলে যাও, ওর খবর নিয়ে এসো।' ···মুনীশ্বর অবশ্য যায় নি।

১৯২২ সালটিকে সনাক্ত করার জন্য জয়শ্রী সেন তাঁর প্রায় চৌদ্দ বছর বয়সের সময় বিলাত থেকে ফিরে আসার পাসপোর্টের তারিখও দেখিয়েছেন। ১৯২০ সালে বিলাত গিয়েছিলেন, ফিরেছেন ১৯২২ সালে। ফেরার পথে কলম্বো থেকে খুব সম্ভবত ডিসেম্বরের প্রথমেই কলকাতা চলে আসেন ও কলকাতা পৌঁছানোর কিছুদিন পরেই তিনি শান্তিনিকেতন বোর্ডিং-এ যান।

সুতরাং ১৯২২ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে (২২।২৩ নাগাদ) শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন—এটি নিশ্চিত ভাবেই জানা যায়। ইন্দিরা দেবীর লেখায় ৭ই পৌষ সত্যেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে যাওয়ার উল্লেখ আছে। তবে তিনি সালটি সম্পর্কে অতটা নিশ্চিত করে না বলায় জয়শ্রী সেনের কাছে সন্ধান নিতে হলো। ইন্দিরা দেবীর কথায়—'মনে হয় ১৯২২ খ্রী. কোন সময় আমাদের কাছে থাকতে আসেন। গ্রীষ্মকালে সেবারে পুরী বেড়াতে গিয়ে বেশ ভাল ছিলেন। ···ভিতরে ভিতরে বাবার কিন্তু অর্শের ব্যামোটা বেড়ে গিয়েছিল। ···সেই অবস্থায় তিনি ৭ই পৌষে জোর করে বোলপুরে গেলেন ···এখন মনে হয় যেন তাঁর প্রিয় বড়দাদার সংগে শেষ দেখা করতে গিয়েছিলেন। (শ্রুতি ও স্মৃতি পৃ. ১৪৪)।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে প্রাণের ভাই সতু'র বিরচিত—'কেহ নাহি আর আমার—সব তুমি' ব্রহ্মসংগীতটি দ্বিজেন্দ্রনাথের অধ্যায়ে 'জপমালা হয়েছিল। (দ্র. গান)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথা

সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে আসার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে শুধু তাঁর মুখ থেকে বিলেতের গল্পই শুনেছেন তাই নয়—মেজদাদার যথাযথ উচ্চারণ

ভঙ্গীও অনুসরণ করেছেন। এর ফলে Mont Blanc এর উচ্চারণ মঁ ব্লাঁ বলে মাস্টারমশায়কে বিস্মিত করে দেন। সত্যেন্দ্রনাথ যখন পরিবারে পরিবর্তনের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন—সেই স্রোতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে মতামত কিছুটা পরিবর্তিত হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর কিছুটা কটাক্ষ করেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'[২২] লিখেছিলেন। শেষে লজ্জিত হয়ে এর দ্বিতীয় সংস্করণ আর প্রকাশ করেন নি। মেজদাদার প্রভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী-স্বাধীনতার এতদূর ভক্ত হয়ে পড়েন যে চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানে থাকার সময় স্ত্রীকে অশ্বচালনা শিক্ষা দিয়েছেন। পরে গড়ের মাঠে দুজনে আরবী ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া খেতে ও বেরিয়েছেন। বিবিধ ভাষায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দক্ষতা, গীতবাদ্য ও নাট্যরচনায় তাঁর অনুরাগের পিছনে সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগিতা কার্যকরী ছিল। যে ছবি আঁকা নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মশগুল হয়ে থাকতেন তার প্রথম প্রশংসা মেজদাদার সান্নিধ্যেই এসেছিল [২৩]

সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও সহায়তার ফলেই বৃদ্ধবয়সেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তিলকের গীতারহস্যের অনুবাদ হাতে নিতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থলে কিছুদিন থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মারাঠী ভাষা শিখেছিলেন। সেজন্য তিলকের গীতারহস্যের উপক্রমণিকার কিছু অংশ অনুবাদ করে একটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশও করেছিলেন। সমগ্র গীতারহস্যের অনুবাদ করার কথা তিনি তখনও ভাবেন নি। সত্যেন্দ্রনাথই তাঁকে এ বিষয়ে সাহস দেন ; তিলকের সঙ্গে পত্রযোগে গ্রন্থপ্রকাশের সর্ত ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজখবরও নেন তিনি। তিলকও সেসময় একজন বাংলা অনুবাদকের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়ে তিনি পত্রোত্তরে লিখেছিলেন—"আপনি এ বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন, তখন আমার আর কোন ভাবনা নাই এবং অনুবাদ যে ঠিক মূলানুযায়ী হইবে তৎসম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত।" (বোম্বাই ২০ শে অক্টোবর ১৯১৭)।[২৪]

এই গবেষণার 'জীবন-কথা' অধ্যায়ে রাঁচিপর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ ও দুই ভায়ের নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্যের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। মাঝে মাঝে কলকাতা বা অন্যত্র গেলেও সত্যেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ অধ্যায়ে প্রায় দশএগারো বছর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে 'শান্তি-

ধামে'ই কাটিয়েছেন। দুজনের একই সাথে কুসুমতলায় উপাসনা, তারপর প্রাংগণে প্রাতরাশ গ্রহণ. পালিত পশু-পক্ষীদের আহার্যবিতরণ, দর্শনেচ্ছু পথিকদের সংগে আলাপনে দুই ভাইয়ের মোরাবাদীর দিনগুলি নির্জনতার মধ্যেও নিঃসংগ ছিল না।[২৫]

রবীন্দ্রসান্নিধ্য

কিশোর রবীন্দ্রনাথের জীবনবিকাশে একটি বড় অংশ জুড়ে আছেন সত্যেন্দ্রনাথ। আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের বাংলো—'বাদশাহি[২৬] আমলের' বিশাল প্রাসাদের শূন্য ঘরে ঘরে নির্জন মধ্যাহ্নে অদম্য কৌতূহল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে গিয়েই মেজদাদার লাইব্রেরিতে সাজানো টেনিসনের কাব্যসম্ভার ও সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহের সংগে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁর মনের মধ্যে তখন রস আস্বাদনের যে তাগিদ ছিল, অভিধানের সাহায্যে তার কিছুটা পূরণ হয়। তাঁর রসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করতে সত্যেন্দ্রনাথ যে ত্রুটি রাখেন নি তা রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই জানা গেছে।[২৭] ঐ সময় ভারতীতে প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলির উপকরণ সত্যেন্দ্রনাথই তাঁর সামনে এনে ধরেছিলেন। তুকারামের অভংগের অনুবাদেও ঐ সময় তিনি মেজদাদাকে সাহায্য করেছেন।[২৮] ইংরেজিতে লেখাপড়ার চর্চা হলেও একা বাড়িতে ইংরেজি কথাবলায় রবীন্দ্রনাথ অভ্যস্ত হচ্ছেন না—এই ভেবে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে বোম্বাইতে আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্-এর গৃহে মাস দুয়েকের জন্য রাখেন। এখানে ইংরেজিতে কথা বলার জড়তা তাঁর আপনি কেটে যায় ও ইংরেজি কায়দাকানুন তিনি সহজেই শিখে নেন, কারণ এই গৃহে রবীন্দ্রনাথ পেলেন আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্-এর কন্যা আন্না তরখড়কে—'যিনি ঝকঝকে করে মেজে এনেছিলেন —তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে'—যিনি ছিলেন কবির 'আপন মানুষের দূতী'। যাঁর নাম দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—নলিনী।[২৯] মৃত্যু এসে নলিনীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেও এই বন্ধুত্বের দান রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হন নি। সুতরাং কিশোর কবির জীবন বিকাশের সহায়ক হবে মনে করে চিন্তাশীল সত্যেন্দ্রনাথ যে উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন তা যথার্থই তাঁর জীবনে ফলপ্রসূ হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থলের নানা স্থানে ও তাঁর কলকাতার ১০নং উড্ স্ট্রীটের ও সাউথ সার্কুলার রোডের বাসা বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ যে ছিলেন তা তাঁর চিঠি

থেকে জানা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের ৪৯নং পার্ক স্ট্রীটের তেতলা বাসা বাড়িতে তাঁর প্রথম মেয়ে বেলা ও মৃণালিনী দেবী সহ কয়েকদিন ছিলেন।[৩০] ঐ সময় রবীন্দ্রনাথকে মায়ার খেলা লিখতে ইন্দিরা দেবী দেখেছেন।[৩১] বির্জিতলায় রাজা ও রাণীর অভিনয়ে যে রবীন্দ্রনাথ অংশ নিয়েছিলেন তা 'সত্যেন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের ৫০নং পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতেও যে আনন্দের হিল্লোল বইতো, সেখানে জোড়াসাঁকো থেকে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে প্রায়ই যোগ দিতেন,। কারোয়ার ও সোলাপুরে রবীন্দ্রনাথের থাকার কথা জীবন কথা অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সোলাপুরে কিছুদিন মৃণালিনী দেবীকেও রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ির আবহাওয়ায় ছেলেরা অনেক কিছু শিখতে পারবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল।[৩২]

'নাসিক হইতে খুড়ার পত্রে' ইন্দিরা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথের সংগে রবীন্দ্রনাথের যে স্নেহমধুর সম্পর্ক ছিল, হাস্যপরিহাসের মাধ্যমে সেই চিত্রই ফুটে উঠেছে। এই মধুময় সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল বিদেশে, সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম ফার্লোতে। 'রবীন্দ্রস্মৃতি'তে ইন্দিরা দেবী যেমন বিদেশে রবিকাকার আনন্দময় সান্নিধ্যের কথা লিখেছেন তেমনি ঐ সময়ের কথা 'জীবনস্মৃতি'তেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার অবকাশ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল।' [পৃ. ৯৬]

বিশ্বভারতীর কর্মযজ্ঞে জড়িত হয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের সংগে পূর্বের মতো সংযোগ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি—রাঁচিতে তাঁর যাওয়াই হয় নি, তবে সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা পত্রে, সিলভ্যাঁ লেভিদের নিয়ে একবার রাঁচি যাওযার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।[৩৩] বিশ্বভারতীর constitution ও তাঁকে পাঠাবেন একথা ঐ পত্রে আছে।

বিভিন্ন সভাসমিতিতে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন এই অনুজের প্রতি জনসাধারণের মনোভাবকে মধুর করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তেমনি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েও সরল নিরহংকারী এই অগ্রজের প্রতি চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের মন প্রসন্ন ছিল। তাঁর লেখায় কোনো কোনো চরিত্রে মেজদাদার ছায়াও এসেছে।[৩৪] সুকুমার সেনের কথায়—"বড়দাদার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভক্তি প্রায় পিতৃবৎ ছিল। শেষকালেও তিনি বড়দাদাকে 'শ্রীচরণেষু' পাঠ দিয়ে চিঠি আরম্ভ করতেন·· মেজদাদাকে রবীন্দ্রনাথ খানিকটা সখার মত অন্তরংগভাবে

দেখতেন। তাই মাঝ বয়সের চিঠিতে তাঁকে সম্বোধন করতেন 'ভাই মেজদাদা'। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ছিল বিমিশ্র ভক্তিশ্রদ্ধার সঙ্গে সৌহার্দ্য।[৩৫] অনুজের ঋণ স্বীকার করতে উদার সত্যেন্দ্রনাথের মনে যে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না—বরং গৌরব ছিল তা বোম্বাইচিত্রের উৎসর্গপত্র থেকেই জানা যায়।[৩৬]

জীবন-পথের দিশারী দেবেন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ একটি পিতৃস্মৃতি লেখেন তা রবীন্দ্রনাথের খুবই ইচ্ছা ছিল। তিনি নিজে বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেটুকু লিখছেন, তা বিশদ হয় নি বলে তাঁর মনে হয়েছে। সৌদামিনী দেবীকেও এবিষয়ে প্রেরণা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথকে এবিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়ংবদা দেবীকেও লিখেছিলেন।[৩৭]

সত্যেন্দ্রনাথ পিতৃস্মৃতি না লিখলেও, তাঁর অনেক পত্রে ও পরিজনদের মুখে পিতার সঙ্গে তার মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। 'আমার বাল্যকথায়' দেবেন্দ্রনাথ অধ্যায়ে পিতার কথা বিশেষ কিছু না বললেও ঐ গ্রন্থের নানা স্থানে পিতার কথা ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। তা ছাড়া 'ছেলে-বেলার কথা'য় পিতার কথা কিছু কিছু লিখেছেন। মহর্ষির আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় ব্রাহ্মসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে পিতার ধর্মজীবনের চিত্র বিশেষভাবে এঁকেছেন।

খ্রীষ্টধর্মের প্রবল মোহ থেকে ভারতের সুপ্রাচীন ঔপনিষদ চিন্তার জগতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনকে ফিরিয়ে আনাই ছিল দেবেন্দ্রনাথের ব্রত। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে পিতার অনুবর্তী হয়ে সকল কাজ যে করতে পারেন নি, তা পারিবারিক খাতার 'ছেলেবেলার অধ্যায়ে' নিজেই বলেছেন। আমার বাল্যকথায়ও ঐ সময় নিজেকে তিনি ঘোর Radical বলেছেন। পিতার কোনো কোনো কাজ ঐ সময় সমর্থন না করলেও পরবর্তী কালে পিতার রক্ষণশীল পদক্ষেপকে সুবিবেচনাপ্রসূত বলেই মন্তব্য করেছেন।[৩৮]

ব্রাহ্মসমাজ থেকে কেশবচন্দ্রের বিদায়ে গণেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রে সত্যেন্দ্র-নাথ পিতার প্রতি অনুযোগই করেছেন।[৩৯] পরবর্তী কালে ধীরপথগামী পিতার পক্ষেই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।[৪০] শৈশবে পিতৃপ্রভাবে যে ধর্মাশ্রিত

জীবন গড়ে উঠেছিল—জীবনের শেষ অধ্যায়েও এর বিকাশের জন্য তাঁকে নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। পারিবারিক উপাসনায় মহর্ষি একদিন পুত্রদের জীবনে এই আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে নদীর বাঁধের সংগেই তুলনা করেছেন।[৪১] প্রথম যৌবনে পিতার সাবধান বাণী তাঁর জীবনে যে কতো কাজে লেগেছে তা তিনি বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। বিলেতে গিয়ে প্রথমে দেবেন্দ্রনাথকে ইংরেজ সমাজের প্রচলিত নাচ-মজলিস এর কথাও তিনি চিঠিতে লিখেছেন—প্রত্যুত্তরে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন—ঐ রাক্ষসী মায়ায় মত্ত হয়ে' সত্যেন্দ্রনাথ যেন তাঁর 'আসল কাজ' বিস্মৃত না হন। 'বিলেত থেকে ফিরে' আসার পরেও সত্যেন্দ্রনাথের 'ইংরেজি রকম চালচলনের বাড়াবাড়ি' দেখে একদিন তিনি পারিবারিক উপাসনায়, ইংরেজি রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণ থেকে তাঁকে দূরে থাকতে সাবধান করেছিলেন।[৪২]

প্রভাতে স্নান, উপাসনা, ঘড়ির কাঁটার তালে নির্দিষ্ট কাজ সমাপন, যুক্তাহারবিহার, মিতব্যয়িতা, বিষয় সম্পদে নির্লিপ্ততা ইত্যাদি সদ্‌গুণ পিতার জীবন থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ আহরণ করেছিলেন।

যুগের ভাবে ও কর্মস্থলের পরিবেশে সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে কিছুটা ইংরেজি ভাবের স্রোত এলেও তা যে ধ্বংসাত্মক হবে না, এ বিশ্বাস দেবেন্দ্রনাথের ছিল। কারণ পুত্রের চরিত্রের বনিয়াদটি যথার্থরূপে গঠন করতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। প্রয়োজনবোধে তিনি তাঁকে স্বাধীনতাও দিয়েছেন। পিতা যে সত্যেন্দ্রনাথের স্বাধীন ইচ্ছায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান নি, সেজন্য সত্যেন্দ্রনাথ আন্তরিক কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর মনটি যুগোপযোগী ছিল বলেই জোড়াসাঁকো বাড়িতে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে নানা পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল আর সত্যেন্দ্রনাথের হাতেই তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। তিনি বাধা হয়ে দাঁড়ালে অত সহজে পরিবর্তন আনা সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে সহজ হতো না সত্যেন্দ্রনাথ তা নিজের মুখেই বলেছেন। (দ্র. ছেলেবেলার কথা।)

অন্তঃপুরের চিরাচরিত প্রথার উপর হঠাৎ হস্তক্ষেপ করতে দেবেন্দ্রনাথ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হলেও, বাড়ির মেয়েরা যাতে অহমিকাশূন্য বিচারশীল মতবাদ গ্রহণ করতে পারেন—সেদিকে দেবেন্দ্রনাথের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

জ্ঞানদানন্দিনীর বিবাহের কিছু পরে কন্যাকে দেখবার প্রবল ইচ্ছায় অভয়াচরণ ও নিস্তারিণী দেবীর কলকাতার ভাড়াটে বাড়িতে আগমন ও ভাড়াবাড়ি

বলেই সেখানে সারদাদেবীর বধূকে যেতে না দেওয়ায়, সত্যেন্দ্রনাথ যেমন আহত হয়েছিলেন, তেমনি মহর্ষি'ও পত্নীর কাজ একটুও সমর্থন না করে বলেছিলেন—'মা গাছতলায় থাকলেও মেয়ে মায়ের কাছে যাবে।[৪৩] পিতার এই মানবিকতাপূর্ণ সত্যভাষণে সত্যেন্দ্রনাথের মন যে শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল, তা স্বভাবতই আঁচ করা যায়।

প্রথম জীবনে মহর্ষি'র অমতে অনেক কাজ করলেও জীবনের শেষদিকে সত্যেন্দ্রনাথ নিজের মতের সংগে সম্পূর্ণ মিল না হলেও—মহর্ষি আঘাত পাবেন—এই চিন্তা করে অনেক কাজ থেকে বিরত থেকেছেন। ইন্দিরা দেবীর কথায়—"বাপকে কি ভক্তিই করতেন। নিজের ইচ্ছে থাকলেও কখনো বাপের অমতে কাজ করতেন না।"[৪৪]

জোড়াসাঁকো বাড়ি থেকে স্বতন্ত্র থাকলেও—পিতৃভবনের সংগে তাঁর নিবিড় সংযোগ ছিল। পিতার শেষ যাত্রায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও তাঁর জন্মতিথি ও মৃত্যুতিথিতে জোড়াসাঁকোর উপাসনা মণ্ডপে তাঁকে স্মরণ করে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিয়েছেন। মহর্ষি'র আদর্শকে নিজেদের জীবনে বাঁচিয়ে রাখা ও তার প্রচার করাকেই তিনি তাঁর স্মৃতিপূজার শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করেছেন।

সুযোগ্যা সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী

অসীম ধৈর্যে ও পরম স্নেহে জ্ঞানদানন্দিনীকে সত্যেন্দ্রনাথ যথার্থই সহধর্মিণী করে তুলেছিলেন। যশোরের নরেন্দ্রপুর গ্রামের মেয়ে জ্ঞানদানন্দিনী সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণায় বাংলার স্ত্রীসমাজে অবরোধ প্রথা উন্মোচনে ও বঙ্গনারীর 'শালীন শোভন' পরিচ্ছদ রচনায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। মহর্ষি'র কাছ থেকে স্ত্রীকে বোম্বাই নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাওয়ার পরেই সত্যেন্দ্রনাথ এক ফরাসী মিলিনরের সাহায্যে তাঁর 'বহির্গমনের উপযোগী' পেশওয়াজ ওড়না ইত্যাদি সহ একটা ওরিয়েণ্টাল ধরণের পোষাক তৈরি করালেন। পোষাকটি বোম্বাইতে মেমসাহেবদের কাছে বাহাবা পেলেও, অনেকটা তুর্কী ঢঙের বলে সত্যেন্দ্রনাথের ঠিক মনঃপূত হয় নি। বোম্বাইতে মাণকজীর কন্যা সিরিণবাইরা রেশমী পারসী শাড়ি পরতেন। শাড়ির সংগে 'জ্যাকেট ও সদ্রা'[৪৫] পরিধান করতেন। ওঁদের ঢঙ একটু বদলে নিয়ে জ্ঞানদানন্দিনীর নিজের মতো করে

পরতে শুরু করলেন।[৪৬] তাতে পিছনে কুঁচি– সামনে আঁচল বা কাঁধে ব্রোচ দিয়ে আটকানো থাকতো। কেউ কেউ এই শাড়ি পরার ঢংকে বলতেন— বোম্বাই দস্তুর। এই ঢংএর শাড়িপরা যে সত্যেন্দ্রনাথের ভাল লেগেছে তা গগেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠি থেকেও জানা যায়।[৪৭]

কলকাতায় এসে এই নূতন ঢঙের শাড়িপরার পদ্ধতি শেখাবার জন্য জ্ঞানদানন্দিনী কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। অনেকেই শিখতে এসেছিলেন; বিহারীলাল গুপ্তের স্ত্রী সৌদামিনী গুপ্ত ও শিখে গিয়েছিলেন।[৪৮] ঠাকুরবাড়ি থেকে ক্রমশঃ ব্রাহ্ম মেয়েদের মধ্যে এই শাড়ি পরার পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তী কালে দিল্লী দরবারের সময় মহারাণী সুনীতি দেবী ও মহারাণী সুচারু দেবী—'অধুনাতন নবীনতম পন্থায়' ঐ ঢঙের পরিবর্তন আনেন বলে সরলা দেবী উল্লেখ করেছেন— যদিও পথপ্রদর্শিকার গৌরব তিনি জ্ঞানদানন্দিনীকেই অর্পণ করেছেন[৪৯] ঐ ফ্যাশন কে পালটালেন এ সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী কারো নামোল্লেখ করেননি, তবে কালের স্রোতে 'ঐ ঢঙে' যে অনেক হেরফের হয়েছে এ বিষয়ে তিনিও একমত।[৫০] শাড়ির সংগে Head dress হিসাবে 'ভেল' অথবা লেসের টুপি ইত্যাদি তৈরি করাতেও সত্যেন্দ্রনাথ পত্নীকে চিঠিতে লিখেছেন। গত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ত্রিকোণাকার লেসের টুপির চল ছিল।[৫১]

শুধুমাত্র পত্নীর পরিচ্ছদ সমস্যা দূর করেই স্বামী হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় নি। কথাবলা ও চালচলনের জড়তা কাটিয়ে পত্নীকে ইউরোপীয় সমাজে মেশবার উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। যশোর-নরেন্দ্রপুরে শৈশব কাটিয়ে ও জোড়াসাঁকো অন্তঃপুরে আবদ্ধ থেকে জ্ঞানদানন্দিনীর মধ্যে স্বভাবতই কিছুটা কুণ্ঠার ভাব প্রথমে ছিল। এজন্য সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথকে প্রথম দিকে কিছুটা অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। বোম্বের গবর্ণর স্যার বার্টল ফ্রেয়রের সংগে জ্ঞানদানন্দিনীর প্রথম সাক্ষাতের পর, গবর্ণরের অনেক কথার উত্তরেও লজ্জাশীলা জ্ঞানদানন্দিনী একটিও কথা না বলে সত্যেন্দ্রনাথকে হতভম্ব করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন তাঁর বিলাতবাসের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে হেমেন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনীকে ইংরেজি শিক্ষায় অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন; কিন্তু তা যে 'দু তিন অক্ষর বানান করে পড়া অবধি মাত্র' ছিল তা তিনি ভাবতেও পারেননি।[৫২] সেদিন থেকেই পত্নীর

ইংরেজি শিক্ষার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। জ্ঞানদানন্দিনীও সেদিন শুধু অশ্রুবর্ষণ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি; উপযুক্ত সহধর্মিণী হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। এই ঘটনার প্রায় তিন বছর পরেই (৮ই জুন, ১৮৬৮) জ্ঞানদানন্দিনী কলকাতা থাকার সময় সত্যেন্দ্রনাথ So far away কবিতাটি অনুবাদ করে পত্নীকে পাঠাতে লিখেছেন।[৫৩] যে সমস্ত রোমাঞ্চকর ইংরেজি উপন্যাস ঐ সময় সত্যেন্দ্রনাথ পড়েছেন তা জ্ঞানদানন্দিনীকেও আনিয়ে পড়তে লিখেছেন।[৫৪] পরবর্তী চিঠিতেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞানদানন্দিনী গ্রন্থগুলি এনে পড়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ চিঠিতে গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রগুলির যেভাবে সমালোচনা করেছেন তাতে ধারণা হয় যে ঐ সময় জ্ঞানদানন্দিনী সাহিত্য সমালোচনায় একজন রসজ্ঞা সঙ্গিন হয়ে উঠেছেন। এ ছাড়াও আরও ভাল ভাল বই পড়ার নির্দেশ তিনি পত্নীকে দিয়েছেন।[৫৫] ঐ সময় কলকাতায় জ্ঞানদানন্দিনীর শিক্ষার জন্য যে মেম নিযুক্ত করেছিলেন, তার কাছে নিয়মিত পড়াশুনা করছেন জেনে সত্যেন্দ্রনাথ প্রীত হয়েছেন। কলকাতা থেকে ফিরে আসার সময় জ্ঞানদানন্দিনীর যে সমস্ত পড়ার বই আনার নির্দেশ তিনি তাঁকে দিয়েছেন—তাতে ইতোমধ্যেই জ্ঞানদানন্দিনী বায়রণ, কোলরিজ ও টেনিসনের কবিতাবলীর সঙ্গে উত্তমরূপে পরিচিত হয়েছেন তা বেশ বোঝা যায়।[৫৬] জ্ঞানদানন্দিনীর ইচ্ছামতো ইংরাজি পত্রিকা রাখতে তিনি তাঁকে উৎসাহিত করেছেন। Illustrated London News কি অন্য কোনো ছবিযুক্ত পত্রিকা জ্ঞানদানন্দিনীর ভাললাগবে বলে চিঠিতে লিখেছেন।[৫৭] ঐসময় বাংলা পুরানো ও নতুন কবিদের রচনাগুলি নিয়ে একটি 'কাব্যসংকলন' গ্রন্থ অথবা 'সংগীতসংকলন' গ্রন্থ প্রস্তুত করতেও তিনি জ্ঞানদানন্দিনীকে অনুপ্রাণিত করেছেন।[৫৮]

পরবর্তী কালে Nice এ থাকার সময় কাজ চালানো মতো ফরাসী ভাষাও জ্ঞানদানন্দিনী শিখেছিলেন তা তিনি নিজেই বলেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ ও চর্চার ফলে এই ভাষার প্রতিও জ্ঞানদানন্দিনীর যথেষ্ট আকর্ষণ জন্মেছিল। তাছাড়া মারাঠী ভাষাও তাঁর আয়ত্তে ছিল। ১২৯০-৯১ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত জ্ঞানদানন্দিনীর লিখিত 'ভাউ সাহেবের বখর' এর সাক্ষ্য বহন করে।

পরিচ্ছদ ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সমাজের রাজনীতির সঙ্গেও

জ্ঞানদানন্দিনীকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হতে হয়েছে। বোম্বাইতে প্রথম যেদিন সত্যেন্দ্রনাথ ডিনার পার্টি দিলেন, সেদিন আমন্ত্রণকারিণীর উপযুক্ত সম্মান জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে কেমন অস্বস্তিকর লেগেছিল—যা থেকে পালিয়ে এসে সত্যেন্দ্রনাথকে হতভম্ব করেছিলেন তা তিনি নিজের মুখেই বলেছেন।[৫৯] এক্ষেত্রেও সত্যেন্দ্রনাথ ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভাষার দৈন্যে প্রথম দিকে জ্ঞানদানন্দিনী কারো সংগে মিশতে পারছেন না, এতে সত্যেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে চিঠিতে দুঃখ প্রকাশ করলেও ধীরে ধীরে তাঁর কাছে সব সহজ হয়ে আসবে এ বিশ্বাস তাঁর ঐ পত্রেই পরিস্ফুট।[৬০]

পরবর্তী কালে অতিথি আপ্যায়নে ও নানা সমাজিকতায় তিনি পারদর্শিনী হয়ে ওঠেন।

জ্ঞানদানন্দিনীর সম্পাদনায় 'বালক' (১২৯২) পত্রিকা প্রকাশে সত্যেন্দ্রনাথের যথেষ্ট অনুপ্রেরণা ছিল এটি ধারণা করা যায়। এই পত্রিকাকে উপলক্ষ করেই সত্যেন্দ্রনাথের বোম্বাইপ্রসংগের অনেক লেখা রচিত হয়েছে। পরবর্তী কালে সেগুলিই গ্রন্থাকারে বোম্বাই চিত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জ্ঞানদানন্দিনী নিজেও এই পত্রিকায় 'ব্যায়াম'[৬১] ও 'আশ্চর্য পলায়ন'[৬২] ইত্যাদি রচনা লিখেছেন। হিতেন্দ্রনাথ প্রমুখ ছোটদের লেখা নিয়েই পত্রিকাটি বের করার পরিকল্পনা প্রথমে জ্ঞানদানন্দিনীর মনে আসে, শেষে বড়দের লেখারও দরকার হয়ে পড়ে ও রবীন্দ্রনাথের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন ঘটে।

১৯১৮ সালে রাঁচিতে সত্যেন্দ্রনাথ 'জ্ঞানদাচরিত' লিখবার জন্য কন্যা ইন্দিরাকে নিজের হাতেই একটা ছক করে দিয়েছিলেন।[৬৩] তাতে দেখা যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জ্ঞানদানন্দিনী Home Rule-এর পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজদের নিন্দায় সময়ক্ষেপ না করে নিজেদের আত্মগঠনের উদ্যোগ যে শক্তহাতে নিজেদেরই নিতে হবে তা 'ইংরেজনিন্দা ও দেশানুরাগ' প্রবন্ধে জ্ঞানদানন্দিনী দৃঢ়তার সংগে ব্যক্ত করেছেন।[৬৪]

শিশুদের নিয়ে আনন্দময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনী দুজনেই থাকতে ভালবাসতেন। ছোটদের দিয়ে নাটক মূকাভিনয় করানো তাঁর অতি প্রিয় কাজ ছিল। আদরের বড় নাতি সুবীরেন্দ্রকে (সুবীর) খুশী করার জন্যই 'টাক্‌ডুমাডুম্‌' ও 'সাত ভাই চম্পা' নাট্যাকারে প্রকাশ করেন।

জোড়াসাঁকো বাড়ির অনেকের মুখ থেকেই জ্ঞানদানন্দিনীর সুখ্যাতি শোনা গেছে। প্রফুল্লময়ী দেবী তাঁর চরম দুঃখের দিনেও জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে যে সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন তা 'আমাদের-কথা'য় ব্যক্ত করেছেন।[৬৫] সরলাদেবীর কথায়—মেজমামী এ পরিবারের একটি বিশালহৃদয়া বধূ, যেমন বিশালহৃদয় ছিলেন তাঁর স্বামী আমাদের মেজমামা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।" (দ্র. জীবনের ঝরাপাতা ; পৃ. ৪৯।)

জন্মদিন পালন, শাশুড়ীহীন জামাইদের জামাইষষ্টীতে আপ্যায়ন ইত্যাদি কাজে জ্ঞানদানন্দিনী যে আনন্দ পেতেন তাতে সত্যেন্দ্রনাথেরও আকর্ষণ কম ছিল না। রাঁচিতে প্রমথনাথ বসুর স্ত্রী কমলা বসুর সংগে নারীসমিতির কাজে যেমন আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তেমনি কোলদের সংগে বসে ওদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতেও তাঁর আগ্রহ কম ছিল না। সর্বাবস্থায় সকলের সংগে মিলে চলাই ছিল তাঁর ধর্ম আর এই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন স্বামীর কাছে। বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে জ্ঞানদানন্দিনীরই রচিত অসমাপ্ত পদ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যে গানটি লিখেছিলেন—তার রেশ জ্ঞানদানন্দিনীর মন থেকে কোনদিন মিলিয়ে যায় নি। তাঁর বার্ধক্যে—যখন বাইরের অনেক স্মৃতিই বিলুপ্ত হয়েছে—তখনও স্মৃতির অতলে এটি স্থায়ী ছিল।[৬৬]

অপর ঘনিষ্ঠেরা

এতক্ষণ পর্যন্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যাঁদের কথা আলোচিত হলো—এঁদের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের সংযোগ নিবিড় ছিল, কিন্তু অন্যান্য পরিজনদের সম্পর্কেও তাঁর সংযোগের যে সকল প্রমাণ পাওয়া গেছে—তার সামান্য আভাস না দিলে অপূর্ণতা থাকবে বলেই এখানে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা গেল।

এই নিবন্ধের বিভিন্ন অধ্যায়ে গণেন্দ্রনাথকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চিঠির উল্লেখ আছে। গণেন্দ্রনাথ যে সত্যেন্দ্রনাথের কতো আপন ছিলেন এ থেকে তা প্রমাণিত হয়। একান্নবর্তী পরিবারের নিয়মে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পরেই গণেন্দ্রনাথকে সত্যেন্দ্রনাথ মেজদাদা ডাকতেন—সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সেজদা। পরবর্তী কালে যদিও সত্যেন্দ্রনাথকেই সকলে মেজদাদা ডাকতেন—সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সেজদা। পরবর্তীকালে যদিও সত্যেন্দ্রনাথকেই সকলে মেজদাদা ডেকেছেন—তথাপি সত্যেন্দ্রনাথের 'মেজদাদা' ছিলেন গণেন্দ্রনাথই। 'কুলোকের

কুমন্ত্রণায় এক বাসায় বিবাদ বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়' একথা চিঠিতে লিখে সত্যেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। চিরদিন নিবিড় ভালবাসার বন্ধনে দুজনে আবদ্ধ। এই মধুর সম্পর্কে যারা ফাটল ধরাতে এসেছে, তারা নিতান্তই হীন, সত্যেন্দ্রনাথের ঐ চিঠিতে সেটি আরও স্পষ্ট অভিব্যক্ত হয়েছে।[৬৭]

অবসরজীবনে সত্যেন্দ্রনাথকে পরিজনদের সুখদুঃখের সংগে বিশেষভাবে জড়িত থাকতে দেখা যায়। ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়নি এমন দু একটি পরিজন পরিবেশের চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো। সত্যপ্রসাদের ছেলে সুপ্রকাশের বিয়ের বৌভাতে (৩০শে জানুয়ারী ১৯০৮) ও ডাঃ দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহপ্রবেশের আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে (১৩ মার্চ, ১৯০৮) যেমন তাঁকে দেখা গেছে, তেমনি মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের শেষকৃত্য সমাপনে শ্মশানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন (১০ জানুয়ারী ১৯০৮)।

সত্যেন্দ্রনাথের গৃহের পরিবেশে এমনই একটা সহজ স্বচ্ছন্দ আতিথ্যের আবাহন ছিল যে পরিজনেরা বেড়াতে এলেও অনেক সময় রাতে থেকেই যেতেই।[৬৮] এমন কি দূরবর্তী কুটুম্বেরাও যোগাযোগ রাখতেন। শাশুড়ী সহ প্রজ্ঞাসুন্দরী[৬৯] দেবীর দেখা করতে আসায়—তা প্রমাণিত হয়।[৭০] তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও সহজভাবে আত্মীয়দের গৃহে গিয়ে প্রাণখোলা আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করতেন। ৪৪নং বেনেপুকুর রোডে, শরতকুমারী দেবীর গৃহে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ছোটদের নিয়ে যে আবৃত্তির আসর জমাতেন তা অসিত হালদার নিজেই বলেছেন—।[৭১] শ্রীসৌরকুমার চৌধুরী এক সাক্ষাতকারে বলেছেন—তাঁর বয়স যখন সাত বছর তখন তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে আবৃত্তি শুনিয়েছেন। সৌরকুমার চৌধুরীর শৈশবে সত্যেন্দ্রনাথের সংগে প্রায়ই তাঁর এই মজার খেলাটা হতো—'হাত মুঠো করে বলতেন—দ্যাখো তো কোন হাতে রয়েছে'। গান শেখা নিয়েও তিনি উৎসাহ দিয়ে বলতেন—"সরলার কাছে গিয়ে গান শোন না"।[৭২]

প্রমথ চৌধুরী-কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রে,[৭৩] বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় ৫০নং পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির অতিথিসমাগমের একটি দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথের কলকাতার বাড়িতে এদের সমাগমে 'প্রমারা' ও 'শারাড্' ইত্যাদিতে আসর যেমন জমজমাট হতো তেমনি তাঁর কর্মস্থলের বাংলোতে

আত্মীয়দের আনা গোনার বিরাম ছিল না। সৌদামিনী দেবীর ছোট মেয়ে ইন্দুমতীর স্বামী 'পল্টনের ডাক্তার' ছিলেন ও 'বিলেত ঘুরে এসেছিলেন'। মাদ্রাজ অঞ্চলে এঁর কর্মক্ষেত্রে থাকায় ইন্দুমতী সত্যেন্দ্রনাথের বাংলোতে প্রায়ই এসে থাকতেন হাসিখুশি চটপটে ইন্দুমতীকে সকলেরই খুব ভাল লাগত ও এই পরিবারে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন।[৭৪]

সৌদামিনী দেবীর পুত্র সত্যপ্রসাদের সপরিবারে সোলাপুরে কয়েকবার অবস্থানের কথাও জানা গেছে।[৭৫] সত্যেন্দ্রনাথের ইংরেজি গান গাওয়া প্রসংগে, প্রতিভাদেবীর সংগে সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহমধুর নৈকট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য সত্যেন্দ্রনাথের গান, শিল্পী-সত্তা-অধ্যায়) বিরজিতলাও এর বাড়িতে প্রতিভাদেবীরা কেমন আনন্দে সময় কাটাতেন, তা সত্যপ্রসাদ গংগোপাধ্যায়কে কাব্যাকারে লিখিত প্রতিভা দেবীর একটি চিঠি থেকে জানা যায়[৭৬] আশুতোষ চৌধুরীর সংগে এর বিবাহের ফলে ও অন্যান্য বৈবাহিক সূত্রে দুজনের পারিবারিক সংযোগ আরও নিবিড় হয়। বালিগঞ্জে কাছাকাছি অবস্থানে সম্পর্ক নিকটতর হবার সুযোগ ঘটে। হেমেন্দ্রনাথের আর একজন কন্যার সংগেও সত্যেন্দ্রনাথের গভীর স্নেহের কথা ইন্দিরা দেবী উল্লেখ করেছেন। ইনি শোভনা দেবী। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যমধুর চালচলন সত্যেন্দ্রনাথকে এতই প্রীত করতো যে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে 'দেখনহাসি' ডাকতেন।[৭৭] ১৯২২-এ অসুস্থ সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে ইন্দিরা দেবী যখন পুরী গিয়েছিলেন—তখন শোভনা দেবীও সংগে গিয়েছিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের খুব সেবাযত্ন করেছিলেন।

বর্ষীয়সী পরিজনদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ এক দিদিমার কাছে বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছেন। ইনি সারদা দেবীর কাকীমা—কাকার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বয়সে সারদা দেবীর প্রায় সমবয়সী ছিলেন। বিলাত যাবার সময় জ্ঞানদানন্দিনীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে সত্যেন্দ্রনাথ এঁকে অনুরোধ করে যান ও তিনি সেই দায়িত্ব যথার্থরূপেই প্রতিপালন করেছিলেন। দিদিমা ও নাতির মধ্যে যে রহস্য চলে সেদিক থেকেও ইনি সত্যেন্দ্রনাথকে বঞ্চিত করেন নি। বিলাত যাবার প্রাক্‌কালে জ্ঞানদানন্দিনীর রচিত অর্দ্ধ সমাপ্ত পদটি তিনিই সত্যেন্দ্রনাথের নজরে আনেন।[৭৮]

সুদূর কর্মস্থলে থাকলেও জোড়াসাঁকোর বাড়ির খবরাখবর তাঁকে চিঠিতে

না জানালে তিনি যে ক্ষুব্ধ হতেন তা ১৮৬৮-র ১৪ই এপ্রিলে গগেন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর পত্রে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিবাহের খবর পত্রিকা মারফৎ জানতে পেরে ইনি ব্যথিত হয়েছিলেন।

পরিজনদের মধ্যে যদি কেউ গ্রন্থ লিখে তাঁকে পাঠাতেন তবে তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁকে উৎসাহিত করতেন। শ্রীনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীর লিখিত 'আমার-খাতা'[৭৯] গ্রন্থের প্রারম্ভে মুদ্রিত সত্যেন্দ্রনাথের অভিমত থেকে ও হেমলতা ঠাকুরের 'দুনিয়ার দেনা'[৮০] গ্রন্থখানি পাওয়ার পর তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক পত্র থেকে তা প্রমাণিত হয়।

অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ও নিস্তারিণী দেবীর প্রতি তাঁর সম্পর্ক নিছক জামাতার সম্পর্ক ছিল না। পুত্রের মতোই তিনি তাঁদের লেখা দেখাশোনা করে এসেছেন ও নিয়মিত তাঁদের মাসোহারা দিতেন।[৮১] পিতামাতার সেবার জন্য জ্ঞানদানন্দিনী যে সকল উদ্‌যোগ নিয়েছেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাতে বাধা দেন নি। জ্ঞানদানন্দিনী এঁদের বড় মেয়ে হওয়ায় ও তাঁর প্রায় পনেরো বছরের ছোট ভাই শ্যামাচরণ[৮২] জীবনে উন্নতি করতে না পারয়ে—সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদা-নন্দিনীকেই এঁদের দেখা শোনার জন্য বিশেষ ভাবে ভাবতে হয়। প্রসংগত মহর্ষির দেওয়া হীরের কণ্ঠী বিক্রয় করে, সেই টাকায় জ্ঞানদানন্দিনীর 'ঘুসুড়ি'তে পিতামাতার জন্য বাড়ি কেনা ও পরে দূরবর্তী বলে ওটি বিক্রয় করে, ১৯নং স্টোর রোডেরই কম্পাউণ্ডের পিছনের গেট-এ কড়ায়া রোডে,[৮৩] জ্ঞানদানন্দিনীর পিতামাতার জন্য পৃথক্ বাড়ি নির্মাণে, সত্যেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন ছিল।

বয়সের ব্যবধান থাকায় শ্যামচরণ ও তাঁর পত্নী নিরোজিনী দেবী সত্যেন্দ্র-নাথ-জ্ঞানদানন্দিনীকে যেমন সমীহ করতেন, তেমনি কাছাকাছি থাকায় ১৯ নম্বর স্টোর রোডের বাড়ির বিভিন্ন উৎসবে ও প্রয়োজনের সময় সব সময়েই এঁরা সাহায্য করতেন।

শেষ বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জন্মদিনে ছোটদের হাতে খেলনা তুলে দিয়ে বিশেষ তৃপ্তি পেতেন। তাছাড়া ওদের জন্মদিনে তো উপহার দিতেনই, এমন কি কেউ দূরে থাকলেও এই বিশেষ দিনে আশীর্বাদ স্বরূপ কিছু পাঠাতে তাঁর ভুল হতো না। বিদেশে জয়শ্রী ঠাকুরকে (সেন) লেখা তাঁর পত্রে এর নিদর্শন রয়েছে।[৮৪] সত্যেন্দ্রনাথ-সুরেন্দ্রনাথের জমিদারী হিসেবের

খাতায়ও লৌকিকতা খাতে ব্যয়ের নানা নিদর্শন থেকে পরিজনদের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের পারিবারিক যোগসূত্রের পরিচয় সুস্পষ্ট রূপে জানা যায়। নবরত্নমালা সম্পাদনা কার্যে প্রিয়ম্বদা দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রিয়ম্বদা দেবী ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর ভগ্নী প্রসন্নময়ী দেবীর কন্যা। প্রিয়ম্বদা দেবীর শান্ত মধুর স্বভাব, বিদ্যাচর্চায় প্রবল আগ্রহ, সত্যেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করতো। বালিগঞ্জে কাছাকাছি থাকার ফলে দৌহিত্রী-সমা এই কন্যার সংগে সংগে সত্যেন্দ্রনাথের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শোকের আঘাত প্রিয়ম্বদা দেবীর জীবনে বারে বারে এসেছে। দুঃখের কথায় তাঁর ডায়েরির পাতা অশ্রুসজল।[৮৫] মেজদাদার সংগে পড়াশুনার কাজে ডুবে থেকে, প্রিয়ম্বদা দেবীও কিছুটা শান্তি আহরণ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশে প্রিয়ম্বদা দেবীর রচিত 'প্রয়াণ' কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি প্রিয়ম্বদা দেবীর অজস্র শ্রদ্ধার নিদর্শন বহন করে। (দ্র. পরিশিষ্ট-৫)।

পরিজনদের নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সারা জীবন যে আনন্দ কুড়িয়েছেন—অবসর জীবনে তা যে আরও প্রাণবন্ত হয়েছে তা সৌম্যেন্দ্রনাথের পরিবেশিত 'তিন পুরুষের হোলিখেলায়' পরিস্ফুট। ঐ প্রাণোচ্ছল বর্ণনা দিয়েই সত্যেন্দ্র-নাথের সপরিজন জীবনচিত্রের আলোচনা শেষ করা যেতে পারে—"সেবার তিন পুরুষের হোলিখেলা হয়েছিলো ১৯নং ষ্টোর রোডের বাড়ীর বিরাট বাগানে। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ, নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মেজদিদি জ্ঞানদানন্দিনী এঁদের দল, তারপরে বাবা, কাকা, মা কাকীদের দল আর আমাদের ভাই বোনদের দল।"[৮৬] পরিজনদের মাঝে আনন্দিত সত্যেন্দ্রনাথের রূপ এখানে স্পষ্ট প্রতিভাত।

এতক্ষণ পরিজনদের বক্তব্যে ঘরের মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের যতটুকু পরিচয় আহরণ করা গেল, তা থেকে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যে অবিচল, দরদী ও মধুর ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

১. বিশ্বভারতী পত্রিকা : তৃতীয় বর্ষ-শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫২।
২. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : শ্রুতি ও স্মৃতি পাণ্ডুলিপি—পৃ. ৭১ক।

৩. আমার বোম্বাইপ্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ২৬৩। (বোম্বাই ও বাংলা দেশ)।

৪. Berhampur

স্নেহাস্পদেষু August 12/97

ক্ষিতি. তুমি যে রকম সার্টিফিকেট চেয়েছ সে ধরণে একটা পাঠাচ্ছি —বোধ করি এই যথেষ্ট হবে।...

My nephew Kshitindranath Tagore has asked me for a certificate. I have much pleasure in stating that I have a high opinion of his business capacity and moral character and I feel confident that he will give satisfaction to his employers in any work requirinng honesty, industry and intelligence.

Satyendranath Tagore

I. C. S. (retired)

[রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালায় রক্ষিত]

৫. সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত হিতেন্দ্রনাথের পত্র : (শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-ভবনে হিতেন্দ্রনাথের চিঠির ফাইলে রক্ষিত)।

৬. 'শ্রীচরণেষু

মেজ জেঠামশায়...

বিচারকের কাছে যেমন সকল কথা খুলে বলে সেইরূপ আপনার কাছে সকলি খুলে বলবো এবং যা প্রশ্ন করবেন তার উত্তরও প্রাণখুলে দেবো। এতে আদৌ লজ্জা নাই কারণ এ ঘরের লোকেরা কাছে বলচি পরিবারস্থিত গুরুজনের কাছে বলচি। আপনি সব দিক দেখে শুনে ন্যায় ধর্ম্মতঃ যেটা বিচার করে দেবেন তাতেই আমাদের ক্ষোভ মিটে যাবে।'...

ইতি

আপনার

স্নেহাকাঙ্ক্ষী হিতু

৭. সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত হিতেন্দ্রনাথের পত্র ১৬.৭.১৪ ফটোকপি দ্রষ্টব্য।

৮. ভাই সুরেন,

মেজ জেঠা মহাশয়ের সত্যবাণী শিরোধার্য্য করিলাম। তাঁর ত্যাগ স্বীকারের ভাব উদারতা ও সরলভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম…বিশেষতঃ উনি যে চিঠিতে ঐ কথাগুলি বলিলেন— যাহা হউক তোমাদের এ ক্ষোভ যাহাতে দূর হয় তাহা সাধ্যমত করা আমার একান্ত ইচ্ছা,…এই প্রস্তাবিত বিনিময় সংক্রান্ত লেখাপড়া প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের তাহা করা যাইতে পারিবে' পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তাঁর কথাগুলিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ স্মরণ করিয়া বিষয়ের অনুদার ক্ষুদ্র ভাবের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইতেছে ও লজ্জিত হইতেছি। ইতি ইন্দা।

৯. 'অতটুকু বেলায় অতদিন বিলেতে থাকার দরুন আর কিছু না হোক আমাদের ইংরেজি ভাষার বনেদ পাকা হয়ে গিয়েছিল'। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। দ্র. সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন। পৃ. ৬।

১০. '…আর কী চমৎকার ছবি দেওয়া বড়ো বড়ো রাজসংস্করণ…কত আনন্দই না এসব বই থেকে পেয়েছি। তাই আজকাল ইংরেজি ভাষার প্রতি অবহেলা দেখে ভাবি যে, কেন আমাদের ছেলেরা সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে!…ইংরেজিভাষা জানার অনেক সুবিধে আছে, প্রায় সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গেই সখ্য স্থাপন করতে পারা যায়।'— পৃ. ৬—ঐ।

১১. 'Nice এ গিয়ে যখন দিনকতক হোটেলে ছিলুম, তখন ফরাসী বলা শেখাবার উদ্দেশ্যে মা আমাদের রান্নাঘরের দিকে পাঠিয়ে দিতে বলতেন —যাও ফরাসীতে দুধ চাও, গরম জল চাওগে ইত্যাদি।' পৃ. ৭—ঐ

১২. স্নেহের ভগিনী!

তোমাকে খুসী করবার জন্যে আমার এই বাল্যকথার স্মৃতির মায়াপুরী থেকে উদ্ধার করে তোমার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছি— তুমি নাছোড়বান্দা হয়ে না ধরলে এ কথাগুলি স্মৃতিতেই থেকে যেত। তা ছাড়া আমার বোম্বাই কাহিনীর সঙ্গে তুমি কত রকমে জড়িত, তার বর্ণিত অনেক ঘটনা তোমার চোখের সামনে ঘটেছে, তাতে যে সকল

লোকের কথা পাড়া হয়েছে তারা অনেকে তোমার সুপরিচিত কেননা কত সময় তুমি আমার বোম্বাই প্রবাস-সঙ্গিনী হয়ে কত আদর যত্নে প্রবাসযন্ত্রণা যে কি তা আমাকে জানতেই দাও নি ; এই সকল কারণে এই কথামালা যেমন তোমার কাছে আদরণীয় হবে এমন আর কোথায় ? তাই ভাই এই গ্রন্থখানি তোমার করকমলে অর্পণ করছি, তুমি আমার স্নেহের উপহার গ্রহণ কর।

রাঁচী   তোমার

৫ই আগস্ট ১৯১৫   মেজদাদা

১৩. জীবনের ঝরাপাতা : সরলা দেবী। পৃ. ১০২।

১৪ 'সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশে বইখানি (দীপনির্বাণ) হাতে পেয়ে ভেবেছিলেন এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা—'জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে ? এই বলে তিনি ভগ্নীর প্রাপ্য অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন ভাইকে। হিরণ্ময়ী দেবীর প্রদত্ত এই তথ্যটিও রহস্যজনক মনে হয়।…আমি বলি এটার মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সে যন্ত্রের একজন যন্ত্রী ছিলেন। উভয়ে মিলে মেজদাদাকে একটা Pleasant Surprise দিতে চেয়েছিলেন। এবং রহস্যাভিনয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম হয়েছিলেন।' [পশুপতি শাসমল মহাশয়ের 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য' গবেষণা গ্রন্থে বিজন বিহারী ভট্টাচার্য মহোদয়ের লিখিত ভূমিকায় প্রাপ্ত] (পৃ. ৯)

১৫. ভাই মেজদাদাটি

তুমি তাহলে এবার আশিতে পদার্পণ করলে ? মনেই হয় না, অথচ বছর গুলো কেটে যায়।…এখনো তোমার স্মৃতিশক্তিতে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়, কায়মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিই, আর প্রার্থনা করি—এই রকমেই যেন দিন যায়।…বাড়ীর চেয়েও প্রধান হেংগাম এই মকদ্দমা।…তোমার টাকাও সেজন্য শোধ করতে পারছি নে। আরো কিছুদিন ভাই অপেক্ষা করতে হবে। এই বিপদের সময় তোমার এ টাকাটা না পেলে বড়ই মুস্কিলে পড়তে হোত। কত যে মনে মনে কৃতজ্ঞতা অনুভব করি। আর কারো কাছে চাইতেও ত পারতুম না, তোমার জন্মদিনে এবার কি হোল লিখো মেজদা।…

সেন্ট দুটি পেয়েছ ত ভাই। মেখো ভাই। আর ত বেশী কিছু দেবার অবস্থা নেই, আর মিষ্টি পাঠালে খারাপ হয়ে যায়। শত শত প্রণাম জেনো।

তোমার স্নেহের বোনটি।

(সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত স্বর্ণকুমারী দেবীর পত্র—শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত)

১৬. জীবনের ঝরাপাতা : সরলা দেবী। পৃ. ১৭৬-১৮৭।

১৭. সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠি। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৯, বৈশাখ-আষাঢ়, দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা—৬নং পত্র।

ভাই সতু,

লিখছি মনের খেদে. সৌদামিনী একা ছিলেন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ী। জোড়াসাঁকো বাড়ী এখন আর নাই,…মহর্ষি পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত গার্হস্থ্যধর্ম নিয়মাদির প্রতি ভক্তি নিষ্ঠা এবং প্রাণের টান তেমন আর কাহার? আমাদের এ বাড়ী ও বাড়ী সে বাড়ীর পুরাতন বিবরণ বৃত্তান্তের repository তেমন আর কে? ভায়েদের সুখের দুঃখের অংশিনী তেমন আর পাওয়া যাইবে কোথায়? সৌদামিনী gone and all is darkness.'

তোমার সমদুঃখসুখ বড়দাদা

১৮. ঐ—৭নং পত্র (সৌদামিনী দেবীর মৃত্যু, ১৯২০)

১৯. 'Oswald Crey বোধ করি তোমার মনোনীত হইবে। তাহাতে Mrs. Mark Cray অনেকটা শরতের মত—বাহিরের বেশভূষা ও আড়ম্বর-প্রিয় ও তাহার স্বামী যাহা বলে তাহাই ভাল—স্বামী ঠিক যতদূর মত না হোক্ কিন্তু কতকটা।'—'পুরাতনী : ইন্দিরা দেবী সংকলিত —১৫ নং পত্র।

২০. 'অবশেষে সত্যের নিকট দ্বিজকে পরাস্ত মানিতে হইয়াছিল। কালচক্রের সহায়তায় ক্রমশঃ বড়দাদাকে মেজদাদা অনেকটাই আপনার দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন।'—স্বর্ণকুমারী দেবী : সাহিত্য স্রোত : শোকাশ্রু (দ্বিজেন্দ্রনাথের উদ্দেশে)

২১. বড়দাদা : চার্লস ক্রীয়ার এণ্ডরুজ : অনুবাদ— প্রণতি মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৯।

২২. প্রথমাংক প্রথম গর্ভাংক—বিধুমুখীর প্রতি—

পূর্ণ'…বললে, সাঁইজির গির্জেয় যাব, ভালো বললে, রবসেনের ওখানে চা খাব, ভালো তাই খাও। বললে মেয়েমানুষের স্বাধীনতা আছে, আমি যেখানে খুশি উড়ব—ভালো তাই ওড় গিয়ে! আমি কোন্ কথাটা শুনি নি বল দেখি ডিয়ার?

দ্র. কিঞ্চিৎ জলযোগ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ, (বিশ্বভারতী)। পৃ. ৬।

২৩. 'ব্যারিস্টার সত্যপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পিতৃব্য প্রতাপনারায়ণ সিংহ তখন মণিরামপুরে আছেন। মেজদাদার সংগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মণিরামপুরে যান। কেন যেন একদিন তাঁর প্রতাপনারায়ণের ছবি আঁকার ইচ্ছে হয় এবং ইচ্ছাপূরণও তিনি করেন।…তাঁর প্রথম আঁকা ছবির প্রশংসা শুনে তাঁর উৎসাহ হয়, তখন তিনি বাড়ির লোকদের ছবি এঁকে এঁকে হাত পাকাতে আরম্ভ করেন।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বংগবাণী ১৩৩২ আষাঢ় (সুশীল রায় প্রণীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থে পৃ. ১৮৬)

২৪. মন্মথনাথ ঘোষ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : (প্রথম প্রকাশ : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা; আষাঢ় ১৮৪৯ শক)

২৫. দ্র. সাহিত্য স্রোত : স্বর্ণকুমারী দেবী।

২৬. আমেদাবাদে একটা পুরোনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগল। জজের বাসা ছিল শাহিবাগে, বাদশাহি আমলের রাজবাড়িতে।… সামনে প্রকাণ্ড চাতাল; চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্চার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরি আনার।…আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণের গল্পের।

—ছেলেবেলা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৭৬-৭৭ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ সং)।

২৪. মেজদাদাকে বলিলাম আমি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায়

লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন। তিনি আমার সম্মুখে টেন (Taine) প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচার মাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম।... এমনকি অ্যাংলোস্যাক্সন ও অ্যাংলো নর্মান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলোও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। (দ্র. জীবনস্মৃতি খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ পৌষ, পৃ. ১২১।
স্যাকসন জাতি...ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ, ১২৮৫ ফাল্গুন ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ) —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী—পরিবর্ধিত সং ১ম খণ্ডে প্রাপ্ত, পৃ. ৭১।

২৮. দ্র. তুকারামের জীবনী ও অভঙ্গমালা অধ্যায়।

২৯. দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছেলেবেলা – ছেলেবেলা—পৃ. ৭৮-৮০।

৩০. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : শ্রুতি ও স্মৃতি পাণ্ডুলিপি—পৃ. ৪৪।

৩১. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : রবীন্দ্রস্মৃতি—পৃ. ৩৩।

৩২. ভাই ছুটি,

...আমি বেশ জানি যতদিন তোমরা সোলাপুরে থাকবে ততদিন তোমাদের পক্ষে ভাল হবে। ছেলেরা অনেকটা শুধরে এবং শিখে ভাল হয়ে আসবে এই রকম আমি খুব আশা করেছিলুম...রবি। (শিলাইদহ, নদীপথে ১৮৯২)—চিঠিপত্র-১ম খণ্ড, মৃণালিনী দেবীকে লিখিত।

৩৩. ভাই মেজদাদা,

...এখানে Prof. Sylvain Levy কাজ করতেন।...যদি সুবিধা হয় তাঁদের বরঞ্চ একসময়ে রাঁচিতে আপনাদের ওখানে নিয়ে যাব।... বিশ্বভারতীকে কতকটা খাড়া করে তোলা গেছে—এটাকে এবার সাধারণের হাতে সমর্পণ করা গেল—তারই একটা constitution গড়া গেছে। সেটা ছাপা হলে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

ইতি ২৬ পৌষ ১৩২৮ স্নেহের রবি।

মূল পত্র—শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

৩৪. প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত চিঠিপত্র অষ্টম খণ্ড।

ভাই

চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে মেজদাদার শিশুবৎ স্বাচ্ছন্দ্যারল্যের ছায়া আছে…।'

(শিলাইদহ ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯০০)

৩৫. শ্রীসুকুমার সেন রচিত : পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ (লীলাস্মৃতি বক্তৃতামালা) পৃ. ২১-২২।

৩৬. উৎসর্গপত্র

স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাই রবি,

তুমি এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিয়াছে—তোমার প্ররোচনায় ইহার জন্মলাভ, ইহার স্থানে স্থানে তোমার হস্তচিহ্ন বিদ্যমান। এই গ্রন্থখানি তোমার হস্তে সাদরে সমর্পণ করিতেছি, তুমি আমার এই স্নেহের উপহার গ্রহণ কর।

৩৭. শিলাইদা, নদিয়া, ২৫শে ফাল্গুন, ১৩১৮ (প্রিয়ংবদা দেবীকে লিখিত) কল্যাণীয়াসু

আমি বলে বলে বড়দিদিকে এই পিতৃস্মৃতি লিখিয়েছি। মেজদাদাকে বলেছিলুম যদি তিনি লেখেন ত ভাল হয়। যা কিছু মনে আছে তাই সরলভাবে বলে গেলেই বেশ হয়—তুমি মেজদাদাকে অনুরোধ কোরো ত? আমার যেটুকু বলবার আছে, জীবনস্মৃতিতে বলেছি।…জ্যোতিদাদা প্রবাসীতে একটুখানি লিখেছেন কিন্তু সে বেশ ভরারকম হয়নি…ইতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত)

৩৮. আমার বাল্যকথা—বৈতানিক প্রকাশনী ; পৃ. ৪।

৩৯. তুমিই বল দেখি ভাই যে কেশববাবু নিতান্ত অবমানিত হইয়া পদভ্রষ্ট হইয়াছেন কিনা। আমি যদি তাঁহার জায়গায় থাকিতাম তবে আমার প্রতি এরূপ আচরণ আচরিত হইলে আমি আপনাকে অপমানিত বোধ করিতাম'—১৮৬৭, ৩১শে মার্চ, গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের

৪০. My fathe's work has throughout been constructive and not destructive. He was builder-up, not a puller-down. He was···not in favour of any revolutionary measures of reform which might have the effect of permanently alienating the general body of his countrymen from the *Brahma Samaj*, and thus operate as a bar to the diffusion and acceptance of pure Monotheism in the country. —Introductoty Chapter : By the translator. (S. N. Tagore) *The Autobiography of Maharshi Devendranth Tagore*. (Eng. tr)

৪১. "ব্রাহ্মধর্মপুস্তক তোমাদিগকে আমি বাল্যকালাবধি অভ্যাস করাইতেছি, কেননা 'মণ্ডলঘাট' বলিয়া আমাদের যে একটা সামগ্রিকা ছিল, তথায় দেখিলাম যে, দামোদরের জল বৃদ্ধি হইবে বলিয়া প্রায় ছয় মাস পূর্ব হইতেই আমাদের প্রজারা সেতুবন্ধ করিল, যেহেতু দামোদরের জল স্ফীত হইবার সময় তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার উপায় ···এখন তোমাদিগের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইতেছে। এখন আমি দেখিতে পাইব যে, আমি যে সেতুবন্ধ করিয়াছি, তাহা উপযুক্ত হইয়াছে কি না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ : ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষী (২৭ জুন ১৯৩৩ সালে মুদ্রিত)

৪২. দ্র. আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈতানিক প্রকাশনী। পৃ. ৪।

৪৩. ইন্দিরা দেবী সংকলিত—'পুরাতনী : জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা। (বিবাহের কথা) পৃ. ২২।

৪৪. শ্রুতি ও স্মৃতি পাণ্ডুলিপি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী— পৃ. ২৭।

৪৫. সদরা—পারসীদের জাতীয় পরিচ্ছদ—শুভ্র মংগল বসন—পাতলা মলমলের বা নেটের পিরাণ।

৪৬. ওরা ডান কাঁধের উপর শাড়ি পরে···আমি সেটা বদলে আমাদের মত বাঁ কাঁধে পরতুম। জ্ঞানদাদেবীর আত্মকথা : পুরাতনী—পৃ. ৩০।

৪৭. VILLA BYCULLA

My dear Mejdada Bombay, 5th January, 1865

...My wife has adopted the Parsee Costume. It is our Saree, but I like their mode of putting it on. It looks decent and pretty....

৪৮. স্মৃতি ও স্মৃতি পাণ্ডুলিপি—পৃ. ৪৭

৪৯. বাঙালী মেয়েদের পরিচ্ছদে ভারতীয় ঐক্যসাধনে মেজমামী প্রথমে পথ-প্রদর্শিকা। এ দ্বিতীয় রকমটি সেই ঐক্যেরই আর এক পদক্ষেপ মাত্র।'—জীবনের ঝরাপাতা : সরলা দেবী। পৃ. ৫৪।

৫০. 'পার্শী' মেয়েদেরই শাড়ী পরবার ঢং একটু বদলে মা আমাদের একেলে মেয়েদের পরণের উপযোগী করে চালু করেছিলেন, তারপরে অবশ্য অনেক হেরফেরের পর এখন একরকম পহেরওয়া দাঁড়িয়ে গেছে।'—স্মৃতি ও স্মৃতি—ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী। পৃ. ৫১।

৫১. স্মৃতি ও স্মৃতি পাণ্ডুলিপি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।—পৃ. ৫৯ক।

৫২. জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : পুরাতনী—পৃ. ৩০।

৫৩. পুরাতনী—২০নং পত্র।

৫৪. তুমি Oswaldcray পড়িতে আরম্ভ করিয়াছ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। Dr. Davenal অনেকটা রাজাবাবুর মত বড় ঠিক বলিয়াছ। (পুরাতনী ৩ নং পত্র) 'তুমি কি Miss Braddon এর *Lady Audley's Secret* আনাইয়াছ। আমি সেই লেখকের *Aurora Floyd* পড়িতেছি—ইহাতেও খুন প্রভৃতি Sensational ব্যাপার বর্ণিত আছে। পড়িতে খুব মন লাগে (ঐ ৫৪নং পত্র) 'তুমি *Aurora Floyd* আনাইয়াছ...কেমন লাগিতেছে ; (৭৫নং পত্র, ঐ)।

৫৫. তোমাকে একটা ভাল বই বলিবার কথা আছে। আচ্ছা *Romola* by George Eliot আনাইয়া দেখ দেখি। (ঐ ৭৮নং পত্র)

৫৬. পুরাতনী ১১৫নং পত্র।

৫৭. ঐ ৮২নং পত্র।

৫৮. পুরাতনী : ইন্দিরা দেবী সংকলিত। ৩৬নং পত্র।

৫৯. 'উনি যেদিন বম্বেতে প্রথম ডিনার পার্টি' দিলেন, আমার মনে আছে

আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলুম যে খাবার টেবিলে কিছুতেই বসব না,...যেই একজন সাহেব আমার হাত তার হাতের ভিতর নিয়ে টেবিল পর্যন্ত নিয়ে, অমনি আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম।'—জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : পুরাতনী পৃ. ৩৪।
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : দ্র. ভারতবর্ষীয় ইংরাজ : বোম্বাই চিত্র মুদ্রিত পৃ. ১৮। 'বসিবার সময় কোন্ সাহেব কোন্ বিবিকে টেবিলে লইয়া যাইবেন তাহার নিয়ম আছে। অভ্যাগতদের মধ্যে যিনি সকল অপেক্ষা বড় বিবি, তাঁহাকে গৃহস্বামী লইয়া যান—আর যিনি সকল অপেক্ষা বড় সাহেব তিনি গৃহিণীকে লইয়া যান।'

৬০. 'My wife has got rid of a great deal of her shyness but you must know that 15 years' confinement and training in our Zenana is not an easy thing to get over...unfortunately she can't talk any of the languages of this place...Satyendranath's Letter to Ganendranath. Villa Byculla. Bombay 5th January, 1895.

৬১. ব্যায়াম, বৈশাখ সংখ্যা—বালক।

৬২. আশ্চর্য পলায়ন—বৈশাখ-আষাঢ় : বালক।

৬৩. ছকটি 'পুরাতনী' গ্রন্থের প্রথমে ইন্দিরা দেবী কর্তৃক পরিবেশিত।

৬৪. ইংরাজেরা আমাদের হইয়া যতগুলি কাজ করিয়াছেন আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার মূলে ততখানি কুঠারঘাত পড়ে।...জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : ইংরেজনিন্দা ও দেশানুরাগ (ভারতী ১২৮৮) (শান্তিনিকেতনে অনাথ দাসের সৌজন্যে বিশ্বভারতী বেতার অনুষ্ঠান—সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনী' পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত। ১৯৭৫-এর ২৮শে এপ্রিল ঘোষিত)

৬৫. আমাদের কথা : স্মৃতিকথা। প্রফুল্লময়ী দেবী।

৬৬. কেমন বিদায় লব থাকিতে জীবন (ললিত)
দ্র. সত্যেন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২।

৬৭. যাহারা চিরকাল একত্রে খাওয়া একত্রে শোওয়া...করিয়া আসিতেছে তাহাদের মধ্যে যাহারা শত্রুতার বীজ ছড়াইবার চেষ্টা করে তাহাদের

দুষ্ট মতি আর কে আছে।'—গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৬২। ৩৮ কেনসিংটন পার্ক গার্ডেনস, লণ্ডন।

৬৮. আজ বৈকালে সুপ্রকাশ ও তনুজা এসেছিল। সুপ্রকাশ তনু আজ এখানে থেকে গেল।—২৯ আগস্ট, ১৯০৮ [জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরিতে লিখিত।]

৬৯. আসামে লক্ষ্মীকান্ত বেজবড়ুয়ার সংগে হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর বিবাহ হয়।

৭০. 'বৈকালে প্রজ্ঞা তার শাশুড়ীকে নিয়ে উপস্থিত—তিনি অর্দ্ধোদয় যোগে গংগাস্নান করতে এসেছিলেন'—৬ই ফেব্রু. ১৯০৮—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরি।

৭১. অসিত হালদার : রবিতীর্থে : পৃ. ২৩ (দ্র. শিল্পী-সত্তা অধ্যায়ে—আবৃত্তি)।

৭২. ১৯৭৮এ-১৫, ক্যামাক স্ট্রীটে শ্রীসৌরকুমার চৌধুরীর সংগে এক সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত। আশুতোষ চৌধুরীর কন্যা অশোকা দেবীর পুত্র। প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, মধ্য এশিয়া কায়রো ; ঢাকায়ও ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন।

৭৩. 'গত সন্ধ্যাবেলার জনসংখ্যার একটা তালিকা দিলেই বুঝতে পারবে পঞ্চাশ নম্বরের সভাসংখ্যা বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় নি। কুমুদ, লোকেন, সতু, তারকবাবু, লিলু, সত্য, অরু, নরু আমি ছোট বউ, আমার সব কটি সন্তান (শেষটিকে তুমি দেখনি) বড়দিদি, বলু, সরলা এবং এ বাড়ির স্থায়ী অধিবাসীবর্গ। আজকাল দুই একটি করে ইংরাজেরও সমাগম হচ্চে। তন্মধ্যে বাড়ুয্যের পুত্রবধূ, Miss Valentine নাম্নী একটি কুমারী এবং Miss Forbes.'—[অরু = অরুণেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র। নরু = সত্যপ্রসাদের স্ত্রী—নরেন্দ্রবালা দেবী। লিলু = লিলিয়ান পালিত (বাসন্তীললনা) তারক পালিতের কন্যা। বাড়ুয্যের পুত্রবধূ = শেলী বোনার্জি'র পত্নী]। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড। (শনিবার ১৬ই জুন ১৮৯৪।)

৭৪. 'ইন্দুদিদি গাউন পরতেন ও সাহেবদের সংগে সমানে টেনিস খেলতেন।

তাঁকে সে বেশ মানাতও,...খুব ফরসা রং ছিল। খুব ভাল রাঁধতেও পারতেন, যদিও একটু মাদ্রাজী ফ্যাশনের, কারণ নিত্য বাবু (চাটুয্যে) আমাদের ভগ্নীপতির সে অঞ্চলেই কর্মক্ষেত্র ছিল।... বাবার ওখানে বম্বে অঞ্চলে ইন্দুদিদি অনেক সময় গিয়ে থাকতেন, তাই এঁর সঙ্গেও ছেলেবেলায় আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়।' শ্রুতি ও স্মৃতি পাণ্ডুলিপি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। পৃ. ১৫ক।

৭৫. 'ভিন্ন ভিন্ন সময় সত্যদাদা ও তাঁর স্ত্রী নরু বৌঠান এবং ছেলেমেয়ে সুপ্রকাশ শান্তাকে নিয়ে সপরিবারে দিনকতক সোলাপুরে ছিলেন।'— শ্রুতি ও স্মৃতি, পৃ. ৫২।

৭৬. সত্যদাদা, ১১শে কার্তিক। মঙ্গলবার

সন ১২৯৭ সাল

* * * * * * *

মোরা শুধু বির্জিতলা জোড়াসাঁকো করি
অতীত ভবিষ্যতের ফল রাশি স্মরি।
বিজ্জিতলায় টেনিস খেলি সবে মেতে
তার পরে সংগীতের জড় হয় দল
উপভোগ করি তাহা খুব আরামেতে

হস্তলিখিত এই চিঠিটি রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালায় রক্ষিত। 'প্রতিভার বাক্স' এই শিরোনামের অন্তর্গত। চিঠি শুরু হওয়ার আগেই লেখা আছে—"আমি এই চিঠিটা সত্যদাদাকে গাজিপুরে পাঠাইয়াছিলাম।"

৭৭. শ্রুতি ও স্মৃতি, পাণ্ডুলিপি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। পৃ. ১১৪।

৭৮. জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা : পুরাতনী : পৃ. ২৫। এই আলোচনার জ্ঞানদানন্দিনী প্রসঙ্গে ৬১নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৭৯. "তোমার বাল্যকাহিনীর খাতাখানি পেয়ে খুসি হয়েছি। সহজ কথা সহজ ভাষায় বেশ সুপাঠ্য হয়েছে। তোমার এ বইও পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হবে, সন্দেহ নাই।'—(শ্রীনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীর 'আমার খাতা' গ্রন্থের প্রারম্ভে মুদ্রিত সত্যেন্দ্রনাথের অভিমত)

৮০. স্নেহের হেমলতা, শান্তিধাম, রবিবার...

...গল্পগুলিতে একটু একটু ভাবের রেখা আছে—নিতান্ত

রূপকথা নয়। ভাষা প্রাঞ্জল ঝরঝরে— লেখা বেশ সুপাঠ্য হয়েছে।·· গদ্যে তোমার কবিতা ফুটে বেরিয়েছে। এবার যেন তোমার ঠিক রাস্তা পেয়েছে—আরো অনেকদূর এগিয়ে কি নূতন নূতন সৃষ্টি কর তার জন্য পাঠকরা প্রতীক্ষা করে থাকবে। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তাক্ষরে প্রাপ্ত) [হেমলতা দেবী : দুনিয়ার দেনা (১৩২৭)—সাতটি গল্পের সংকলন—দৈবের লীলা ও নীতিবোধে পরিপূর্ণ, সর্বশেষ কাজে গল্পের নামেই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে]

৮১. দ্র. ইন্দিরা দেবীর—শ্রুতি ও স্মৃতি। পৃ. ১১। রামচন্দ্রপুরে সংজ্ঞাদেবীর সঙ্গে এক সাক্ষাতকারেও একথা মৌখিক জানা গেছে।

৮২. ডাকনাম শ্যামাচরণ, ভালনাম, জ্ঞানদানন্দিনীর দেওয়া অনিলচন্দ্র। (অভয়াচরণ, শ্যামাচরণ ইত্যাদি নামকরণে শাক্তধর্মানুরক্তির ছায়া আছে।)

৮৩. শ্রুতি ও স্মৃতি : ইন্দিরা দেবী পৃ. ৯৪।

৮৪. শ্রীমতী জয়শ্রী সেন (ঠাকুরকে) লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র। দ্র: পরিশিষ্ট—১২।

৮৫. ৭ই জুলাই, ১৯০৬।

'আজ তারাকুমারকে লইয়া আমি ও দাদা কাশী যাত্রা করিলাম। তাহাকে স্কুলে রাখিয়া আসিব। ৮ই জুলাই কাশী পৌঁছিলাম। ৯ই তারাকুমার ভর্তি হইল।'**** 'কাশী কলেজে প্রাণাধিক তারাকুমার ৩০শে জুলাই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। আমি এখনও বাঁচিয়া আছি।' [২৭শে নভেম্বর, ১৯০৬।]

—প্রিয়ম্বদা দেবীর ডায়েরি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত।

৮৬. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : যাত্রী (প্রথম খণ্ড) : পৃ. ১৭।

বান্ধবসান্নিধ্যে

কলকাতা বোম্বাই ও রাঁচিতে সত্যেন্দ্রনাথের বান্ধবসমাজকে নিয়ে তিন ভাগে আলোচনা করা যায়।

বালিগঞ্জের যে পাড়ায় সত্যেন্দ্রনাথের অবসর জীবন কেটেছে—সরলা দেবী তাকে বলেছেন 'ইংগবংগ সমাজ'। কাছাকাছি আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে সেখানে একটি আনন্দময় পরিবেশ রচিত হয়েছিল।[১]

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃস্মৃতি গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে যে তাঁর মেজোজ্যাঠা মহাশয়ের কলকাতার বাড়িতে যাঁরা আসতেন তাঁরা সকলেই প্রায় বিলাত প্রত্যাগত। অধিকাংশই ছিলেন ব্যারিস্টার আবার এঁরা অবসরমতো দেশোদ্ধারের কাজেও খানিকটা মন দিতেন। নেতা হওয়ার সব রকম যোগ্যতাই ওঁদের ছিল।[২] বংগীয় সাহিত্যপরিষদে যোগাযোগের ফলে কলকাতায় সত্যেন্দ্রনাথ যে বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর সংগে পরিচিত হয়েছেন তা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। [দ্র. বংগীয় সাহিত্যপরিষদে অবদান অধ্যায়]

হিন্দুমেলা অধ্যায়েও নবগোপাল মিত্র প্রমুখের কথা উল্লিখিত। এছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের কলকাতার বন্ধুবর্গের মোটামুটি তালিকা পরিজনদের লেখা থেকেই আহরণ করা যায়। এখানে বিশেষ করে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেল।

ইন্দিরা দেবী বলেছেন—'বাবার প্রায় সমসাময়িক সিবিলিয়ান সকলেরই পরিবারের সংগে আমাদের অন্তরংগ বন্ধুতা ছিল। যথা—*সুরেন্দ্র বাড়ুয্যে *রমেশচন্দ্র দত্ত, *বিহারীলাল গুপ্ত, ব্যারিস্টারদের মধ্যে—তারক পালিত, মনোমোহন ঘোষ, ডব্লু. সি. বাড়ুয্যে, সত্যপ্রসন্ন সিংহ, অতুল মল্লিক'।[৩] ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সংগে যোগাযোগের কথা ইন্দিরা দেবী উল্লেখ করেছেন।[৪]

পরবর্তী কালে কংগ্রেসের নেতা হয়েও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে প্রায় আসতেন। এমন কি রাঁচি পর্বেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া বিশিষ্ট নেতা রাসবিহারী ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ ও আশুতোষ চৌধুরী—প্রমুখেরা প্রায় প্রত্যহই বিকেলবেলা সত্যেন্দ্রনাথের

বাড়িতে আসতেন, 'অনেক রাত পর্যন্ত তাঁদের আড্ডা জমত' একথা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (পৃ. ৯-১০)। তাছাড়া সমসাময়িক রাজ কর্মচারীদের মধ্যে কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের কথাও রথীন্দ্রনাথ ঐ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (পৃ. ৯) কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত যে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট প্রতিবেশী ছিলেন তা সরলা দেবীর বক্তব্য থেকেও জানা যায়। [দ্র. ১০নং পাদটীকা] বিহারীলাল গুপ্তের কন্যা স্নেহলতা (লটি) লরেটোতে ইন্দিরা দেবীর সহাধ্যায়িনী ছিলেন, সেজন্যই দুই পরিবারের মধ্যে প্রভূত যোগাযোগ ছিল।[৫] পরবর্তী কালেও স্নেহলতা সেন এই হৃদ্যতার সম্পর্ক রক্ষা করে এসেছেন, তা তাঁর পুত্র কুলপ্রসাদ সেন-এর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এক সাক্ষাৎকার-এ জানা যায়।[৬] ডব্লু সি বোনার্জি'র পরিবারের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ হৃদ্যতার কথা সত্যেন্দ্রনাথের অভিনয় পরিচালনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। (দ্র. শিল্পীসত্তা অধ্যায়—অভিনয়)। পার্ক স্ট্রীটে থাকার সময়েই ডব্লু সি বোনার্জি'র সঙ্গে সখ্য স্থাপিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের কলকাতার বাড়িতে যাঁরা সাহিত্যচক্রের আসর জমাতেন— এঁদের মধ্যে লোকেন পালিত, আদুলের অক্ষয় চৌধুরী ও তাঁর সুযোগ্য পত্নী শরৎকুমারী চৌধুরাণীর (লাহোরিণী) নামে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। লেডি অবলা বসু, মহারাণী সুনীতি দেবীর সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। পাথুরেঘাটার প্রদ্যোৎকুমার সত্যেন্দ্রনাথের কলকাতার বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। সংগীতের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য পাথুরে-ঘাটার ছোটরাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথা ইন্দিরা দেবী 'সংগীতস্মৃতি' প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন। (দ্র. রবীন্দ্র-স্মৃতি: পৃ. ১৩ (সং ১৯৬২) ৫০নং পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্র-নাথের আগমনের কথাও ইন্দিরা দেবীর বক্তব্যে পরিস্ফুট।[৭]

পাথুরেঘাটা ঠাকুর বংশের সম্পর্ক সূত্রে[৮] জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথাও এখানে একটু বিশদ করে বলা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের বিদেশের জীবনের সঙ্গে ইনি বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলমণিকে[৯] বিবাহ, পিতা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ত্যাজ্যপুত্র হওয়া, লণ্ডনে জীবনযাপন ইত্যাদি কারণে স্বদেশের সমাজ থেকে ইনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন। সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য পিতার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের

মামলা এদেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলো। এসব কারণে বাংগালীদের মধ্যে প্রথম ব্যারিস্টার হলেও দেশবাসীদের মধ্যে তা সগৌরবে প্রচারিত হয় নি। লণ্ডন য়ুনিভারসিটিতেও জ্ঞানেন্দ্রমোহন আইন পড়াতেন। বিলাতে সত্যেন্দ্র-নাথ তাঁর বাড়িতে মিশনারীদের বড় আড্ডা দেখেছেন। তাঁর স্ত্রী কমলার শান্ত-শ্রীমণ্ডিত ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণে সত্যেন্দ্রনাথ ও মনমোহন মুগ্ধ হয়েছেন। তুলনায় জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে মনোমোহনের দৃষ্টিতে বিপরীতই মনে হয়েছে।[১০] জ্ঞানেন্দ্রমোহনের আত্মম্ভরিতা[১১] ও অতিরিক্ত অর্থসচেতনতা[১২] বিদেশে মনোমোহন ঘোষের কাছে অসহ্য ঠেকলেও সত্যেন্দ্রনাথ আগাগোড়াই তাঁর সংগে সদ্ভাব রেখেই এসেছেন। কারণ বিদেশে তিনি ছিলেন বড় সহায়। পরবর্তী কালেও তাঁর ভরসা করেই সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনীকে একা বিদেশ পাঠাতে সাহসী হয়েছেন। জ্ঞানদানন্দিনীকে একা দেখে জ্ঞানেন্দ্রমোহনও অবাক হয়েছেন কিন্তু তিনি তাঁর যথাকর্তব্য সাধনে বিরত থাকেন নি।[১৩] অসচ্ছল প্রকৃত বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয়ের দরদ উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের চিঠি থেকে স্পষ্ট জানা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ যখন সবেমাত্র কর্মে যোগদান করেছেন—সেসময় একটি বই কেনার জন্য উমেশচন্দ্রকে চার টাকা দিয়েছিলেন। একথা সত্যেন্দ্রনাথ ভুলে গেলেও প্রয়োজনের সময় ঐ সাহায্যের কথা উমেশচন্দ্র চিরদিন মনে রেখেছেন। (দ্র: মধুস্মৃতি : নগেন্দ্রনাথ সোম। পরিশিষ্ট ; পৃ. ৪৪৭।)

মহর্ষির অন্তরংগ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি উচ্চধারণা পোষণ করতেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয়ের অগ্নিতে 'শীতপ্রধান দেশে শীতল হৃদয়সকলকে প্রজ্বলিত' করতে সমর্থ হবেন—এমন উৎসাহসূচক কথাও বিলাতে তাঁর ছাত্রাবস্থায় তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন। প্রত্যুত্তরে সবিনয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন—'এ শীতল দেশ বটে, কিন্তু লোকের হৃদয়ে অগ্নির অভাব নাই…।' (তত্ত্ববোধিনী, অগ্রহায়ণ, ১৮৪৯ শক)

বংগীয় সাহিত্যপরিষদে সত্যেন্দ্রনাথের শোকসভায় (৩রা চৈত্র, ১৩২৯, ১৭ই মার্চ ১৯২৩) যে সব সুধীবৃন্দ তাঁর কর্মবহুল জীবন, সাহিত্য সৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের প্রশস্তি করে—তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তাঁরাও সত্যেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ও যথার্থই অনুরাগী।

ঐ দিনের সভাপতি রায় জলধর সেন তাঁর ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথকে 'পিতৃ-স্থানীয়' বলেছেন। প্রায় ছাব্বিশ বছর পূর্বে নাটোর সম্মেলনে ভূমিকম্পে ত্রস্ত ভীত পরিবেশের মধ্যেও সত্যেন্দ্রনাথের ধৈর্যে অটল, ঈশ্বরে সমর্পিত চিত্ত, প্রশান্ত মূর্তি, জলধর সেন-এর স্মৃতিতে উজ্জ্বল ছিল। তাঁর কথায়—"সভামধ্যে সকলে উপবিষ্ট এমন সময় প্রবল ভূমিকম্প আরম্ভ হইল।...আমি শ্রীযুক্ত অক্ষয় মৈত্রের প্রভৃতি সকলেই অস্থির হইয়া চারদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। কিন্তু সত্যেন্দ্রবাবু—'যিনি কাঁপাচ্ছেন তিনি স্থির করিয়া দিবেন' এই বলিয়া স্থির হইয়া আসনে বসিয়া রহিলেন। তখনকার তাঁহার স্থির ধীর গম্ভীর মূর্তি—তাঁহার নির্ভরশীলতা—তাঁহার ভগবৎপ্রীতি সকলের হৃদয় বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল।" প্রসংগত নাটোরের ঐ সম্মেলনে ভূমিকম্প বিপর্যস্ত অবস্থায়ও সত্যেন্দ্রনাথের যে ছবি অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া' গ্রন্থে এঁকেছেন তা জলধর সেন-এর বক্তব্যেরই অনুরূপ। মৃত্যু জীবনের অবধারিত পরিণতি। সুতরাং একে শান্তভাবে গ্রহণ করতে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। সদস্যেরা খড়ের তৈরি কাছারি বাড়িতে ঘুমুতে গেলেও সত্যেন্দ্রনাথ পূর্বের পাকা বাড়িতেই নিশ্চিন্ত ঘুমিয়েছিলেন।[১৪]

সত্যেন্দ্রনাথের 'ইব্রাহিম ও অগ্নি উপাসক' কবিতাটি আবৃত্তি করেই নরেন্দ্রনাথ দেব ঐ শোকসভায় সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও নলিনীকান্ত সরকার—'ভারত সংগীত' পরিবেশন করেন। নির্মলচন্দ্র বড়ালও সত্যেন্দ্রনাথের রচিত আর একটি গান ঐ সভায় গেয়েছিলেন। কুমার নরেন্দ্র-নাথ লাহা সমবেদনাসূচক পত্র পরিষদে পাঠিয়েছিলেন ও নিজে ঐ শোকসভায় উপস্থিত হতে না পেরে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ চুনীলাল বসু, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায়, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী প্রমুখেরাও ঐ সভায় তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।[১৫]

সত্যেন্দ্রনাথের দুই বিশিষ্ট বন্ধু মনোমোহন ঘোষ ও তারক পালিতের কথা দিয়েই এ আলোচনা শেষ করা যায়। মনোমোহন ঘোষ তাঁর স্ত্রী স্বর্ণলতাকে লরেটো কনভেণ্টে রেখেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ অতটা করেন নি। কর্মী ও সংগঠক মনোমোহনের কথা সত্যেন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞচিত্তে বিভিন্ন সভায় বলেছেন। হিন্দু স্কুল থেকে তারক পালিতের সংগে যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল

তা বার্ধক্যেও অটুট ছিল। ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে যে ভারতীয় কৃষ্টির সংগে সংযোগ রাখা উচিত— সত্যেন্দ্রনাথের এই পথকে তারক পালিতও পরবর্তী কালে শ্রেষ্ঠ পথ বলে মেনেছেন।[১৬]

বোম্বাইপ্রবাসের বান্ধবসমাজ

সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠকাল বোম্বাই প্রদেশে অতিবাহিত হওয়ায় অনেকের কাছেই এই অনুযোগ শুনতে হয়েছে—'বিদেশে সমস্ত জীবন কাটানোর চেয়ে স্বদেশে কেরানীর কাজ করাও ভাল।'[১৭] সত্যেন্দ্রনাথ এই সংকীর্ণ মনোভাবকে কোনোদিনই সমর্থন করেন নি। তিনি বোম্বাইতে থাকার ফলে শুধু যে তিনিই উপকৃত হয়েছেন এমন নয়, তাঁর পরিজনদের দৃষ্টি-ভংগীর পরিবর্তনেও এটি সহায়ক হয়েছে। তাঁর নিজের কথায়—'যতদিন আমি ওদেশে ছিলাম, মনে হইত বোম্বাই বাংগলা যেন একটি যোগসূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। বাংগলা দেশ হইতে আমার পরিবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্য হইতে একটা লোকের স্রোত একটানা বহিতেছিল,⋯ইহাতে এই দুই দেশের লোকদের পরস্পর সখ্যবন্ধন হইবার দিব্য সুযোগ হইত।[১৮] বোম্বাই প্রদেশের জনগণের মধ্যে যে সকল সদ্গুণ আছে তা তিনি যেমন আহরণ করেছেন তেমনি তাঁর যতটুকু দেবার আছে তা দিতেও তিনি কার্পণ্য করেন নি। ধীরে ধীরে বোম্বাইপ্রবাসকে আর তাঁর প্রবাস বলেই মনে নি। যে দেশের জল হাওয়া 'হাড়ে-মাসে'[১৯] জড়িত সে দেশকেই আপন মনে করেছেন। ঐ অঞ্চলের বিবিধ ভাষায় সত্যেন্দ্রনাথের দক্ষতাও এই ভাববিকাশের বড় সহায়ক হয়েছিল। অনেক সময় এর দ্বারাই তিনি জনসাধারণকে কাছে টানতে পেরেছেন। শুধুমাত্র রাজকাজের প্রয়োজনে তিনি ঐ ভাষাকে সীমায়িত করে রাখেন নি; উপযুক্ত চর্চার দ্বারা বিভিন্ন সভাসমিতিতে তা প্রয়োগ করে জনগণের আস্থাভাজন হয়েছেন।

ভোলানাথ সারাভাই

আমেদাবাদ প্রার্থনাসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় সত্যেন্দ্রনাথ নিয়মিত যোগ দিতেন। সেখানে বাংলা সংগীত অনুবাদ করেও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে (যে ক'দিন ছিলেন) দুজনে একসাথে গেয়েছেন।[২০] প্রার্থনাসমাজের অধ্যক্ষ

ভোলানাথ সারাভাইয়ের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের এতই বন্ধুত্ব হয় যে তাঁকে একবার জোড়াসাঁকোয় আসতে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কন্যা জিতোবাকে নিয়ে জোড়াসাঁকোয় এসেছিলেন ও মহর্ষি তাঁর সংগে আলাপ করে প্রীত হয়েছিলেন। আমেদাবাদ প্রার্থনাসমাজে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষণগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ভার নিয়েছিলেন ভোলানাথ সারাভাই।

মহীপতরাম রূপরাম ও লালশঙ্কর উমিয়াশঙ্কর

আমেদাবাদ প্রার্থনা সমাজে ভোলানাথ সারাভাইয়ের সহযোগী ছিলেন মহীপতরাম রূপরাম। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমেদাবাদ প্রার্থনা সমাজের বিবরণ এঁকেই পাঠাতে দেখা যাচ্ছে। ইনি বিলাত থেকে আসার পর হিন্দু সমাজের কাছে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন।[২১] আমেদাবাদ প্রার্থনা-সমাজে লালশংকর উমিয়াশংকরের সংগেও সত্যেন্দ্রনাথ পরিচিত হন। ১৯০৭-এ সুরাটে থিইস্টিক কনফারেন্স সভাপতিরূপে সত্যেনাথের নাম প্রস্তাব করতে এঁকেই দেখা যাচ্ছে। আমেদাবাদে রণছোড়লাল ছোটালাল ও সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। শহরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে এঁর কর্মতৎপরতার কথা 'আমার বোম্বাইপ্রবাস' গ্রন্থে (পৃ. ১৬৮) সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন।

ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ

বোম্বাইতে ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরংগ যে সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু ছিলেন তা তাঁর গৃহে রবীন্দ্রনাথকে মাস কয়েকের জন্য রাখা থেকেই প্রমাণিত হয়! আন্না ছাড়াও দুর্গা ও মানিক নামে আত্মারামের আরও দুই কন্যার উল্লেখ ইন্দিরা দেবীর লেখায় পাওয়া যাচ্ছে। এই পরিবারের সংগে বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা ইন্দিরা দেবীও বলেছেন। বোম্বাইতে অনেক সময় সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি-পত্র ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরংগের ঠিকানাতেও আসত। ১৮৬৭-তে ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরংগ প্রমুখদের প্রচেষ্টায় বোম্বাইতে 'প্রার্থনা সমাজ' স্থাপিত হয়। 'মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে সমাজের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন পরে বামন আবাজী মোদক সেই পদে ছিলেন।'[২২] এঁদের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় ছিল। রমাবাই রাণাডের কথা ইন্দিরা দেবী বিশেষ ভাবে 'শ্রুতি ও স্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন।

জাষ্টিশ নারায়ণ গণেশ চন্দবারকর, চিন্তামণ নারয়ণভটও আপ্পা সাহেব বারদ

জাস্টিস নারায়ণ গণেশ চন্দবারকর-এর প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে এঁর চিন্তাধারার সংগে সত্যেন্দ্রনাথের মিল ছিল। জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী আচারগুলির সংস্কার সাধনের জন্য প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকেই ইনি যথাযথ বাণী অন্বেষণ করেছেন। পুণা প্রার্থনাসমাজের অধিনায়ক ছিলেন ডাক্তার ভাণ্ডারকর। এঁর সংগেও সত্যেন্দ্রনাথের সখ্য ছিল। পুণা প্রার্থনা সমাজেও সত্যেন্দ্রনাথের মারাঠী ভাষায় বক্তৃতা আলোড়ন এনেছিল।

সাতারা প্রার্থনাসমাজে চিন্তামণ নারায়ণ ভট্ সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু স্থানীয় ছিলেন। সোলাপুরে আপ্পা সাহেব বারদ'এর বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য তিনি 'আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে (পৃ. ১৩৯) যেমন প্রশস্তি করেছেন, তেমনি আপ্পা সাহেব বারদের সংগে তাঁর সৌহার্দ্যের কথাও সেখানে উল্লেখ করেছেন।

গোবিন্দ বিঠ্ঠল কড়কড়ে

বোম্বাই প্রবাসে সত্যেন্দ্রনাথের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন পুণা কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক—গোবিন্দ বিঠ্ঠল কড়কড়ে। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম বিলাতে পড়তে গিয়েই এঁর সাক্ষাৎ পান। তখন তিনি Tuckar সাহেবের দয়ায় কেম্ব্রিজে পড়তেন। শেষ জীবনে তাঁর সংগে যোগাযোগের অভাব সত্যেন্দ্রনাথ গভীর ভাবে অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, সরলা দেবী তাঁর খিড়কীর বাড়িতেও গিয়ে থেকেছেন।—'জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্মে খ্রীস্টান, স্বভাবে কিঞ্চিৎ আধাপাগল, হাস্যরসিক, বিপত্নীক এই বন্ধুটি, সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থলের আবাসে প্রায়ই এসে থাকতেন ও পাহাড়ে স্বাস্থ্যকর স্থানে হাওয়া বদল কালে সত্যেন্দ্রনাথের সংগ নিতেন। বাইরে একটু ছেলেমানুষি ভাব থাকলেও তাঁর নির্মল চিত্তের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল।

রাঁচির পরিচিত ও অন্তরঙ্গ সমাজ

রাঁচির নির্জন বাসে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন শান্তিলাভ করেছেন তেমনি শহরের বিভিন্ন জনহিতকর কাজেও তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে দেখা গেছে। সত্যেন্দ্রনাথের শোকসভায় রসায়নাচার্য ডাঃ চুনীলাল বসুর বক্তব্য থেকে তা প্রমাণিত হয়।[২৩]

রাঁচিতে প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসুর পরিবারের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহমধুর সম্পর্ক ছিল। পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রমথনাথ বসুর স্ত্রী কমলাদেবীকে[২৪] সাদরে নিমন্ত্রণ করা হতো। রাঁচিতে প্রমথনাথ বসুর নূতন বাড়ি হওয়ার আগে কয়েকদিন তাঁরা জ্ঞানদানন্দিনীর সংগেই তাঁর ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন।[২৫] তখনও 'শান্তিধাম', 'সত্যধাম' নির্মিত হয় নি। সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থলে ইন্দিরা দেবীরা যে আবহাওয়াতে মানুষ হয়েছেন—অনুরূপ পরিবেশই কমলা বসুর 'স্মৃতিকথায়'ও তাঁর পিতার শেষ জীবনের কর্মস্থল-বরোদার জীবনযাত্রা প্রসংগে চিত্রিত হয়েছে।[২৬] রুচি ও আদর্শের মিলনেই দুই পরিবারের সম্পর্ক নিকটতর হয়েছিল। রাঁচিতে প্রথমনাথ বসুর বসুর কন্যার বিবাহেও অন্যান্য অনুষ্ঠানে এঁরা উপস্থিত থেকেছেন।[২৭] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরি থেকে—এই পরিবারের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহের নিদর্শন আরও বিশেষ ভাবে জানা যায়—"কমলাদের ওখানে গেলুম—আজ প্রশান্তর ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা হল—মেঝদাদা বেদীতে বসলেন।" (৯ই নবেম্বর ১৯০৮, ২৩ কার্তিক ১৩১৫)।[২৮]

রাঁচিতে নারীসমাজের কল্যাণমূলক কাজেও জ্ঞানদানন্দিনীর ও কমলা বসুর অবদানের কথা রাঁচির অভিজ্ঞ মহল থেকে শোনা গেছে। রাঁচিতে মেয়েদের স্কুলে স্থাপনে কমলা বসু এগিয়ে এসেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রাঁচি নারীসমিতির প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। পূর্ণিমায় আনন্দ সম্মেলনে যেমন সদস্যাদের সুরুচি ও শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি দরিদ্র বিধবাদের জন্য সেবামূলক কাজেও তাঁরা তৎপর ছিলেন।[২৯] এসব কাজে জ্ঞানদানন্দিনী সব সময়েই সত্যেন্দ্রনাথের কাছে প্রেরণা পেয়েছেন। রাঁচিতে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মহেন্দ্র দত্ত এঁদের প্রায় নিজের লোকের মতো হয়ে উঠেছিলেন। মোরাবাদী পাহাড়ের রাস্তা ও গৃহনির্মাণে ইনিই দেখাশোনা করেছেন। (দ্র. জীবনকথা, রাঁচি পর্ব)। তাঁর গাড়িতে করে প্রায়ই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথকে ক্লাবে নিয়ে যেতেন। (দ্র. শিল্পী-সত্তা অধ্যায়ে আবৃত্তি) ক্লাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও আর একটি প্রধান আকর্ষণের জিনিস ছিল বিলিয়ার্ড খেলা।[৩০] ক্লাবে মহেন্দ্র দত্তের সংগে বিলিয়ার্ড খেলার কথাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন।

ক্লাবের যোগসূত্রে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের

পরিচয় ঘটে। অভিজাত শ্রেণীর উদ্ধবচন্দ্র রায় ক্লাবের সর্বাংগীণ বিকাশের জন্য তৎপর ছিলেন। ইনি মধ্যে মধ্যে এঁদের বাড়িতেও আসতেন। সংগীত-আবৃত্তিতে উকিল—৺দেবেন্দ্রবিজয় বসুর পুত্র—জিতেন্দ্রনাথ বসুরও অনুরাগ ছিল। ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সত্যেন্দ্রনাথের আবৃত্তির পরেই এঁকেও আবৃত্তি করতে দেখা যায়। ক্লাবের উন্নতির জন্যে উকিল বসন্ত চট্টোপাধ্যায় সর্বদা চেষ্টিত ছিলেন। ইনিও মাঝে মাঝে এঁদের ক্লাবে নিয়ে যেতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরিতে একে অনেক সময় 'ছোট বসন্তবাবু' বলা হয়েছে। রাঁচির অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সংগে যোগাযোগ করে জানা গেছে 'বড় বসন্তবাবু' ছিলেন 'বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়'। তিনিও এডভোকেট ছিলেন। তবে ছোট বসন্তবাবুর সংগেই এঁদের আনাগোনা বেশি ছিল। রাঁচি ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসাহী সদস্য উকিল জয়কালী দত্তের পরামর্শ এঁরা সময় গ্রহণ করতেন। তিনি কিছুদিন রাঁচি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদেও ছিলেন। তিনিও আপন জনের মতো সর্বদাই মোরাবাদীতে আসতেন। মোরাবাদীতে মাঘোৎসবে এঁকেই বেদীর আসন গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।[৩১] রাঁচির নামকরা ডাক্তার নরেশচন্দ্র মিত্র এঁদের প্রায় পারিবারিক চিকিৎসকের মতোই ছিলেন। ডাক্তার যতীন্দ্রলাল বসু ও লেডি ডাক্তারের সংগেও এঁরা সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন।

নিধুবাবুর পৌত্র নিবারণ গুপ্তের সংগেও এঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। এঁর স্ত্রীর নিকট জ্ঞানদানন্দিনীর বিজয়ার আশীর্বাদী পাঠানোতে উভয় পরিবারের প্রীতির সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়।[৩২] রাঁচিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সংগে যোগাযোগ করে জানা গেছে, নিবারণ গুপ্ত তৎকালীন একজন নামকরা কনট্রাক্টর ছিলেন। সাবজজ রামলাল দত্ত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আশু বাগচী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীকে এঁদের গৃহে আসতেও দেখা যায়। মিস্টার ইস্‌মায়েল্‌-এর গৃহে সত্যেন্দ্রনাথকেও যেতে দেখা যায়।[৩৩]

এছাড়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হামিদ, ডেপুটি কালেক্টর মন্মথ সেন, রেঃ এ. সি. চাটার্জি, সরকারী উকিল পাঁচকড়ি দে, কালীপদ ঘোষ, ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার জগদীশ বাবু (রায়) মুন্সেফ আশু পাল, সিংভূমের জমিদার গংগারাম সিং, কৃষ্ণনাথ দত্ত প্রমুখদের সংগে সত্যেন্দ্রনাথের রাঁচি বাসের প্রথম দিকেই পরিচিত হওয়ার সম্ভাব্য নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে।[৩৪]

রাঁচির গৌরব—প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ শরৎচন্দ্র রায়ের কন্যা মীরা রায়ের শৈশব স্মৃতিতে এখনও এঁদের বাড়ির বারান্দায়—তাঁর পিতার ছবি আঁকা অবস্থায় সাদা পোষাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপূর্ব চেহারা উজ্জ্বল হয়ে আছে।[৩৫] এই সূত্রে স্বভাবতই সত্যেন্দ্রনাথের সংগেও শরৎচন্দ্র রায়ের পরিচয় থাকার কথা মনে জাগে, কারণ শ্রীযুক্তা মীরা রায়ের বর্ণিত শৈশব স্মৃতির অনেক আগে থেকেই শরৎচন্দ্র রায় রাঁচিতেই অবস্থান করে এসেছেন।

রাঁচির পরিজনদের মধ্যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুকুমার হালদারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। দ্র: গদ্যরীতি অধ্যায় : ঢাকা রিভিয়্যু পত্রিকার সমালোচনা)। ছ'বছর বয়সে সুকুমার হালদার—পিতা রাখালদাস হালদারের সংগে রাচিতে এসেছিলেন।[৩৬] সত্যেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থায় বিলাত গিয়ে রাখালদাস দাস হালদারের কাছে অনেক প্রেরণা ও সাহায্য পেয়েছেন। তিনি তখন লণ্ডন য়ুনিভারসিটিতে কিছুদিনের বাংলা ও সংস্কৃত পড়াতেন। যদিও সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত পেঁছিানোর দু'মাস পরেই রাখলদাস হালদার স্বদেশে ফিরে আসেন তবুও ঠিক প্রয়োজনের সময় তাঁর বিলাতে অবস্থানে, সত্যেন্দ্রনাথ যেমন মানসিক বল পেয়েছেন, পেয়েছেন, তেমনি মহর্ষি'ও অনেক নিশ্চিত ছিলেন।[৩৭]

বিভিন্নজনের সংগে সাক্ষাৎকার, ১৯০৮-এ লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরি ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় অনুসন্ধানের দ্বারা রাঁচিতে সত্যেন্দ্রনাথের সংস্কৃতি সম্পন্ন বান্ধবসমাজের একটি সুস্পষ্ট চিত্র আহরণ করা যায়। পরবর্তীকালে রাঁচিতে আরও নতুন নতুন বন্ধু সমাগম হয়েছে—এঁদের অনেকের সংগেই শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব অটুট ছিল।

উপসংহার

সংক্ষিপ্ত পরিসরে এতক্ষণ কলকাতা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সি ও রাঁচিতে সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু সংসর্গের যেটুকু পরিচয় দেওয়া গেল—তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়—তাঁর বন্ধুরা ছিলেন, তৎকালীন এক একটি জ্যোতিষ্ক, আর সত্যেন্দ্রনাথের সংগে তাঁরা এক মহাকর্ষে যুক্ত।

তাঁর কাছে এসে এঁরা আনন্দ পেতেন, কর্মে উদ্দীপনা পেতেন। আবার সত্যেন্দ্রনাথও এঁদের সংগলাভের জন্য উৎসুক থাকতেন।

তাঁর অমায়িক ব্যবহার, ধনী নির্ধন, ছোট বড় সকলকেই কাছে টানতো।

এঁদের বক্তব্য থেকে—ভারতীয় আদর্শের অনুসারী, প্রশান্ত, বিনয়ী, বিপদে নির্ভীক, ধর্মপ্রাণ সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়।

১. ইংগবঙ্গ সমাজে আমরা অল্পে অল্পে গ্রস্ত হলুম...আমরা কাশিয়াবাগান থেকে যে ২৬নং বালিগঞ্জে সার্কুলার রোডে উঠে এসেছিলুম—সেটা যদু মল্লিকের সম্পত্তি ছিল—পরে ৩নং সানি পার্কে আমাদের নিজের বাড়ি হল। ৬নং সানি পার্কে আশু চৌধুরী বাড়ি করলেন, ১৯নং স্টোর রোডের উপর তৈরি পুরানো বাড়ি মেজমামা কিনলেন। কে. জি. গুপ্ত ৬নং স্টোর রোডে বাড়ি করলেন, ইন্দিরার বিয়ে হলে প্রথম ১৪নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে রইল, পরে ব্রাইট স্ট্রীটে নিজের বাড়িতে গেল।'

দ্র. জীবনের ঝরাপাতা : সরলা দেবী। পৃ. ১৭৫-১৭৬।

২. পিতৃস্মৃতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৯।

* তারকা চিহ্নিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় দলের সিভিলিয়ান। বিলাত যাওয়া নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ এঁদের প্রেরণা দিয়েছেন।

৩. শ্রুতি ও স্মৃতি—পাণ্ডুলিপি—পৃ. ৪৭।

৪. ঐ পৃ. ৪২।

৫. দ্রষ্টব্য : দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭২, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : বিহারীলাল গুপ্ত ও স্নেহলতা সেন।

৬. বিগত ১০. ৯. ৭৭-এ শান্তিনিকেতনে জয়শ্রী সেন-এর স্বামী শ্রীকুল-প্রসাদ সেন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—'একটি দিনের কথা মনে আছে। ১৯ নম্বর স্টোর রোডে আমার মা স্নেহলতা সেন-এর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলুম। প্লেটে খাবার দেওয়া হয়েছিলো...। আমি মা আমার দিদি, ছোটবোন রাঁচিতেও গিয়েছিলুম। আমরা নীচে থাকতুম। ভোর বেলায় ঘণ্টা শুনে কুসুমতলায় প্রার্থনায় যোগ দিতুম...।'

৭. শ্রুতি ও স্মৃতি—পৃ. ৪৫।

৮. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসী বাঙালী'তে (প্রবাসী ১৩১১ কার্তিক, ৪র্থ ভাগ ৭ম সংখ্যা পৃ. ৩৭৯) জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে সত্যেন্দ্রনাথের 'পিতৃব্যপুত্র' বলেছেন। কিন্তু ঠাকুর গোষ্ঠীর বংশ-লতিকা অনুসারে ও মহর্ষি'র আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট ৩৯ : পৃ. ৩৫১ থেকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দেবেন্দ্রনাথের 'জ্ঞাতিভ্রাতা' ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের 'জ্ঞাতিপিতৃব্য' ছিলেন বলে জানা যায়। সেই অনুসারে জ্ঞানেন্দ্রমোহন সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞাতিকাকা ছিলেন। ১লা মে ১৮৬২র পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে 'uncle' বলেই উল্লেখ করেছেন।

৯. আমার বাল্যকথা সত্যেন্দ্রনাথ 'কমলা' বলে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে তাঁর এই নাম প্রচলিত হয়। দ্র. পৃ. ৮৮।

১০. Gyanendra who as you will know is alwaya a laughing stock and has a little curiosity.—M. G.'s letter to S. N. Tagore 18th Oct. 1864. University Hall Gordon Square:

১১. গণেন্দ্রনাথকে লিখিত মনোমোহন ঘোষ-এর ১৮ই আগস্ট, ১৮৬২'র পত্রে সত্যেন্দ্রনাথেরা যে বিশেষভাবে তাঁরই তত্ত্বাবধানে আছেন এ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ আছে।

১২. He (Gyanendra) seem greatly disturbed at the thought of his having had to sign an indemnity to Alexander Heature & Co on your account. He is···afraid that he will have 'to fork out' the money from his own pocket. It appears you drew a certain cheque for £6, 8s and forgot to make some provision for it as for the carriage of your luggage'. M. G's letter to S. N. Tagore. 18th Oct. 1864. London. Gordorn Square.

১৩. দ্র: জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা—পুরাতনী—পৃ. ৩৮।

১৪. 'মেজো জ্যোঠামশায় অদ্ভুত লোক। তিনি কিছুতেই মানলেন না। তিনি বললেন, আমি ওই আমার ঘরেই থাকব, আমি কোথাও যাব না।···নাটোর হুকুম দিলেন ছ-সাত জন দিন রাত ওঁর ঘরের সামনে

পাহারা দেবে। তেমন তেমন দেখলে যেমন করে হোক মেজো জ্যাঠামশায়কে পাঁজকোলা করে বাইরে আনবে।'—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরোয়া, পৃ. ৬৬ (রাণী চন্দ অনুলিখিত)।

১৫. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩২৯-এর কার্যবিবরণী।

১৬. 'সতু, তুমিই ঠিক করেছ'—ইন্দিরা দেবী : শ্রুতি ও স্মৃতি।

১৭. আমার বোম্বাইপ্রবাস—পৃ. ২৬৩।

১৮. ঐ ঐ।

১৯. বোম্বাই চিত্র—পৃ. ৬২।

২০. আমার বোম্বাইপ্রবাস—পৃ. ২৫৯।

২১. ঐ পৃ. ২৫৮।

২২. আমার বোম্বাইপ্রবাস—পৃ. ২৫৫।

২৩. রাঁচিতে প্রায়ই আমি তাহাকে দেখিতে যাইতাম। রাঁচিতে গত দশ বছরের মধ্যে যে সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে—তাহার সকলেরই তিনি নেতৃস্বরূপ ছিলেন'। ডাঃ চুনীলাল বসুর ভাষণ—৩রা চৈত্র ১৩২৯, ১৭ই মার্চ ১৯২৩—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

২৪. 'আমার মা কমলা দেবী ছিলেন ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যা'—মধু বসু : আমার জীবন পৃ. ৩ (রমেশ-চন্দ্র দত্তের ২০নং বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে এঁদের বিবাহসভাতেই সন্ধ্যা-সংগীত রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা লাভ করেন।) দ্র. *Pramathnath Bose*—Jogesh Ch. Bagal.

২৫. আমাদের বাড়ী তখনও সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি বলে মা প্রথমে গিয়ে উঠেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী যে বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন সেই বাড়ীতে। আমার জীবন : মধু বসু। পৃ. ১৭। 'আজ সকালে 'পি. এন. বোস' সপরিবারে তাঁর নিজের নূতন বাড়ীতে উঠে গেলেন।'—১লা এপ্রিল ১৯০৮ জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের ডায়েরিতে প্রাপ্ত।

২৬. রমেশচন্দ্র: মণি বাগচি পৃ. ১৮৮।

২৭. এখানে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে আমার সেজদির সঙ্গে ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবাহ সম্পন্ন হয়। শুনেছি তাঁর বিয়েতে বিবিয়ানী গান

করেছিলেন এবং একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন যেটি সেজদি আজও সযত্নে রেখে দিয়েছেন।—আমার জীবন : পৃ. ১৭।

২৮. প্রমথনাথ বসুর কন্যা সুষমা সেন (M. P. ছিলেন)। এঁর পুত্রের জন্ম দিন ছিল। যোগেশচন্দ্র বাগলের ইংরেজি গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য জানা যায়—'Pramatha nath's first daughter Sushama was married on the 15th August 1904 to Dr. Prasanta Kumar Sen, the eminent Cambridge Scholer and Barrister. p. 125. *Pramathanath Bose* : Jogesh Ch. Bagal.

২৯. 'মিসেস পি. এন. বোস-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'বালিকা শিক্ষা ভবনের' কাজ আমরা এখনও চালিয়ে আসছি। মিসেস পি. এন. বোস এর সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাছাড়া আমার দুই খুড়শাশুড়ী, সরলতা দেবী, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী (ছোট খুড়) ও পদ্মিনী দেবী হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী (সেজ খুড় শাশুড়ী) নারী সমিতির সভ্যা ছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী এই দুজনকেও খুবই ভালবাসতেন। 'পূর্ণিমা সম্মেলন' এক একট পূর্ণিমায় এক একজনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো, তখন ভাল খাবার তৈরী করার জন্য সকলের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা দিতো।'—রাঁচিতে নারী সমিতির প্রাক্তন সম্পাদিকা ও বর্তমান সদস্যা—প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী সরযূ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিগত ৭. ৫. ৭৮-এ এক সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত।

৩০. ছোটনাগপুর মহারাজকুমারের দানে লব্ধ (পালামৌর অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার মিস্টার রেইনীর কাছ থেকে ক্রীত) এই বিলিয়ার্ড টেবিলটি এখনও রাঁচির হাজারিবাগ জেলরোড জংসনে—'দি ইউনিয়ন ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরীর' হলঘরে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার সেনের সৌজন্যে ১৯৭৮এ আমাদের তা দেখার সুযোগ হয়েছে। ক্লাবের নাম ও স্থান পরিবর্তন, ইউনিয়ন ক্লাব ও পাবলিক লাইব্রেরীর পৃথক্ বাড়ি, উভয়ের সহাবস্থানও অবশেষে সংযুক্তির ইতিহাসে এই বিলিয়ার্ড টেবিলটিও জড়িত।—

দ্র. হীরকজয়ন্তী স্মরণী'—দি ইউনিয়ন ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরী'। অপিচ সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত—'কাকুর মুখে শোনা কথা' পরিবেশন করেছেন, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র—ক্লাবের প্রবীণ সম্পাদক শ্রীপ্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৩১. 'কুসুমতলার সব উপরকার ধাপে কেবলমাত্র জয়কালী বাবু বসলেন—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : 'রাঁচিতে মাঘোৎসব' : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : মাঘ ১৮৪৬ শক।

৩২. ভাণ্ডার থেকে একশিশি সিন্দুর—তারপর আলতা কাপড় প্রভৃতি মেঝ বৌঠান সংগে দিয়েছিলেন—এই সমস্ত একটা ঝুড়িতে করে নিবারণ বাবুর স্ত্রীকে মেঝ বৌঠানের নামে 'বিজয়ার আশীর্বাদী' বলে দেওয়া হল।—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরিতে প্রাপ্ত, ৭ই অক্টোবর, ১৯০৮, রাঁচি।

৩৩. ইস্মায়েল গৃহে—২৩শে এপ্রিল, ১৯০৮।

৩৪. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরিতে প্রাপ্ত।

৩৫. বিগত ৬. ৫. ৭৮-এ রাঁচি চার্চ রোডে ৺শরৎচন্দ্র রায়ের ভবনে মীরা-রায়ের সংগে এক সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত।

৩৬. *The Diamond Jubilee Brochure* : Union Club & Library, Ranchi : Foreword by Sukumar Haldar :

৩৭. ১৮৫২, ২রা জুলাই রাখালদাস হালদারের পিতৃভবনেই মহর্ষি জগদ্দল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি'র (আত্মজীবনী-পরি : ৫৪) সত্যেন্দ্রনাথের সাহায্য সহায়তা বিলয়ে বিলাতে থাকার সময়েই ইনি পত্রযোগে মহর্ষিকে আশ্বস্ত করেছিলেন, ১৮৬২র ১৬ই মার্চ রাখালদাস হালদারকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রে এর উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মসমাজ রাখালদাস হালদার 'অনেক বিষয়ে অত্যগ্রসর ছিলেন'। (মহর্ষি'র আত্মজীবনী-পরি : ৫৪)। পরবর্তী কালে তাঁর পুত্র সুকুমার হালদারের সংগে মহর্ষি'র সেজ মেয়ে শরতকুমারী দেবীর কন্যা সুপ্রভা দেবীর বিবাহ হওয়ায় ইনি মহর্ষি পরিবারের কুটুম্বসমাজভুক্ত হন।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

জন্ম পত্রিকা

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত। পাণ্ডুলিপি নং 364

(বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তলিখিত খাতার হুবহু প্রতিলিপি)

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১৭৬৪ শক ২০ জ্যৈষ্ঠ

১২৪৯ সাল ২০ জ্যৈষ্ঠ

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ জুন

ঠিকুজি

১৭৬৪।১।১৯।৪৪।৫২।১৫ ইং রাত্রি ১১।১৭।৩০

কোষ্ঠী

<table>
<tr><td>বু ৬</td><td>র শু
ম</td><td></td><td></td><td>লং
চ ২৫</td></tr>
<tr><td colspan="2">কে ৭</td><td></td><td colspan="2">রা ২১
বৃ ২১</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>শ ২০</td></tr>
</table>

অসিত অষ্টমী, পূর্বভাদ্রপদ, কুম্ভরাশি

রাহুর দশা—২।৩।২৬ ভোগ্য

ঠিকুজির চক্র—

বু ৬ শু ৭	ম ৫ র ৮		চ ২৫
কে ৭			লং রা ২১ বৃ ২১
			শ ২০

কোষ্ঠী ও ঠিকুজীতে সময়ের অনৈক্য

পরিশিষ্ট ২

সার্ভিস রিপোর্ট

১। সিভিল সার্ভিসভুক্ত : লণ্ডন · ৩০শে জুলাই ১৮৬৪

২। নির্দিষ্ট পদ ছাড়া উপস্থিতি : বোম্বাই : ১২ই ডিসেম্বর ১৮৬৪

৩। অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট : আমেদাবাদ . ২৭শে এপ্রিল ১৮৬৫

৪। [অস্থায়ী] অ্যাসিস্ট্যান্ট জজ ও সেসন্স জজ : অসুখে ছুটি—আমেদাবাদ : ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ ; ২৮শে অক্টোবর ১৮৬৬ থেকে ৭ই এপ্রিল ১৮৬৭

৫। [অস্থায়ী] অ্যাসিস্ট্যান্ট জজ ও সেসন্স জজ : অসুখে ছুটি—আমেদাবাদ : ৪ঠা জুলাই ১৮৬৭ ; ১৬ই অক্টোবর ১৮৬৭ থেকে ১৫ই জুন ১৮৬৮

৬। সেকেণ্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট : আহমদনগর : ২৪শে ডিসেম্বর ১৮৬৭

৭। [অস্থায়ী] অ্যাসিস্ট্যান্ট জজ ও সেসন্স জজ : আহমদনগর : ২৬শে জুন ১৮৬৮

৮। ধারওয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট জজ ও সেসন্স জজ এর পদে মনোনীত : আহমদনগরেই ঐ পদে অবস্থান . ১৯শে অক্টোবর ১৮৬৮

৯। অ্যাসিস্ট্যান্ট জজ ও সেসন্স জজ : সাতারা : ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯

১০। [স্থায়ী] সেকেণ্ডগ্রেড অ্যাসিস্ট্যান্ট জজ ও সেসন্স জজ : ধুলিয়া : ৭ই এপ্রিল ১৮৬৯

১১। [অস্থায়ী] ফার্স্ট গ্রেড অ্যাসিস্ট্যান্ট জজ ও সেসন্স জজ : ধুলিয়া : ৮ই মার্চ ১৮৭০

১২। [অস্থায়ী] অ্যাসিস্ট্যান্ট জজ ও সেসন্স জজ : পুণা : ২৮শে মার্চ ১৮৭১

১৩। [অস্থায়ী] জয়েন্ট জজ ও সেসন্স জজ · থানা : ২৮শে জুন ১৮৭২

১৪। [অস্থায়ী] ছোট আদালতের জজ : আহমদনগর : ২২শে মার্চ ১৮৭৩

১৫। প্রোটেম ফার্স্ট গ্রেড অ্যাসিস্টান্ট জজ ও সেসন্স জজ : আহমদনগর : ৫ই মে ১৮৭৩

১৬। [অস্থায়ী] সিনিয়র অ্যাসিস্টান্ট জজ ও সেসন্স জজ : কালাদ্গি : ৩০শে জুন ১৮৭৩

১৭। [স্থায়ী] ফার্স্ট গ্রেড অ্যাসিস্টান্ট জজ ও সেসন জজ-এর পদে মনোনীত ও সিনিয়র অ্যাসিস্টেন্ট জজ ও সেসন্স জজের কাজে অস্থায়ী নিযুক্ত : কালাদ্গি : ১৫ জুন ১৮৭৫

১৮। শিকারপুরের ডিস্ট্রিক্ট সেসন্স জজ [অস্থায়ী] : [হেড কোয়ার্টার] হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) : ৩০শে আগস্ট ১৮৭৫

১৯। [অস্থায়ী] ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ : আমেদাবাদ : ১৯ এপ্রিল ১৮৭৬
প্রিভিলেজ লিভ : ২৩শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২২শে মার্চ ১৮৭৮
'সাবসিডিয়ারি লিভ'—১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৮
ফর্লো—২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ থেকে ১০ই মে ১৮৮০

২০। [অস্থায়ী] ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ : সুরাট : ১১ই মে ১৮৮০

২১। জজ ও সেসন্স জজ : শিকারপুর : ২৭শে নভেম্বর ১৮৮০

২২। সেকেণ্ডগ্রেড জজ ও সেসন্স জজ (অস্থায়ী ফার্স্টগ্রেড জজের কাজও করেছেন) : সুরাট : ৩রা মে ১৮৮১

২৩। সেকেণ্ড গ্রেড ও সেসন্স জজ : কানাড়া : ২৯শে মে ১৮৮১
বিশেষ ছুটি ১৫ই নভেম্বর থেকে ২৬শে ডিসেম্বর ১৮৮১
[অস্থায়ী] ফার্স্ট গ্রেড জজ ও সেসন্স জজ : কানাড়া : ১২ই মে ১৮৮২
ব্যক্তিগত কারণে ছুটি ৮ই জানুয়ারী থেকে ৪ঠা মার্চ ১৮৮৩
[অস্থায়ী] ফার্স্ট গ্রেড জজ : কানাড়া : ৫ই মার্চ ১৮৮৩
কনফারম্ড্ ফার্স্ট গ্রেড জজ ও সেসন্স : কানাড়া : ২৮শে আগস্ট ১৮৮৩

২৪। ফার্স্ট গ্রেড জজ ও সেসন্স জজ : সোলাপুর-বিজাপুর : ১৮ই জানুয়ারী ১৮৮৪

২৫। হোলকার মহারাজার গোচারণের দাবির সালিসী কার্যে নিয়োগ : ২৬শে নভেম্বর ১৮৮৫ থেকে ৮ই জানুয়ারী ১৮৮৬

'প্রিভিলেজ লিভ' ৯ই জানুয়ারী থেকে ১৮ই মার্চ ১৮৮৬

২৬। [অস্থায়ী] ডিস্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন্স জজ : নাসিক : ২৯শে মার্চ ১৮৮৬

২৭। ফার্স্ট গ্রেড জজ ও সেসন্স জজ : সোলাপুর-বিজাপুর : ৭ই অক্টোবর ১৮৮৬

প্রিভিলেজ লিভ : ১০ই নভে-২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৭, ৩ সেপ্টেম্বর ১০ নভেম্বর ১৮৮৯

বিশেষ ছুটি : ২২শে আগস্ট থেকে ২৬শে ডিসেম্বর ১৮৯০

ঐ-পদে : সোলাপুর-বিজাপুর : ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৯০

ফর্লো (দ্বিতীয় বার) : সিমলা : ২রা এপ্রিল ১৮৯৩ থেকে ১৫ই মার্চ ১৮৯৪

২৮। [অস্থায়ী] ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ : সাতারা : ১৬ই মার্চ ১৮৯৪

২৯। ফার্স্ট গ্রেড জজ ও সেসন্স জজ : সাতরা : ২০শে এপ্রিল ১৮৯৬

পরিশিষ্ট ৩

পরলোকবাসী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীদ্বারকানাথ গোবিন্দ বৈদ্য

(১৪ই জানুয়ারীর সুবোধ পত্রিকা হইতে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

সম্পদ বিষসম তোমাবিহীনে জীবন মৃত্যু সমান।
বিপদসম্পদ তব পদলাভে, মৃত্যু সে অমৃতসোপান ॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গত সোমবারে দেহান্ত হইয়াছে। বোম্বাই এলাকার সহিত, বিশেষতঃ হেথাকার প্রার্থনাসমাজের আন্দোলনের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের নিকট সম্বন্ধ ছিল। আমরা আজ তাঁহারা চরিত্রগত স্থূল-স্থূল বিষয় জানিবার জন্য প্রযত্ন করিব।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম হিন্দু আই-সি-এস। তাঁহার পূর্বে কোনও হিন্দু গৃহস্থই এই যশ প্রাপ্ত হয় নাই। ইঁহার নিয়োগ বোম্বাই এলাকায় হয় এবং চাকরীর সমস্ত কাল এই এলাকাতেই তিনি অতিবাহিত করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বড়ই শান্ত-প্রকৃতি সরলচিত্ত ও উদারচরিত্রের লোক ছিলেন। চাকরীর উপলক্ষে তিনি যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই শীলতার দ্বারা, সরলতার দ্বারা লোকদিগকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন তিনি সরকারের চাকরী খুব ভাল রকমই করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে বলে, সরকার, তিনি প্রথম হিন্দু পরে সিভিলিয়ান—এই দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহার সরলতা, তাঁহার শীলতা, তাঁহার ন্যায়প্রীতি একেবারে আমলে আনেন নাই; তাঁহাকে হাইকোর্টের জজিয়তি পদে মনোনীত করেন নাই। কালা-গোরার মধ্যে এই পার্থক্য বুদ্ধি ভাল না লাগায় তিনি ১৮৯৭ অব্দে পেনসান্ লইয়াছিলেন, আমরা এইরূপ শুনিয়াছি।

সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের ব্রাহ্মসমাজকে ছাড়িয়া বোম্বাই এলাকায় আসিলেন; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজকে বিস্মৃত হন নাই। শুধু তাহাই নহে, চাকরীর উপলক্ষে তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেইখানেই ব্রাহ্মসমাজ থাকিলে,

সেই ব্রাহ্মসমাজের সহিত এক প্রাণ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতেন। বিশেষত সাতারায় থাকিতে তিনি ব্রাহ্মধর্মের যে প্রভূত সেবা করিয়াছিলেন একথা স্বীকার করিতেই হইবে। একে তো ব্রাহ্মধর্মে তাঁহার প্রখর নিষ্ঠা, তাহাতে আবার সীতারাম পন্ত জহবরে ও রাওজী রামচন্দ্র কালের ন্যায় সহকারী পাইয়া তিনি ঐ সমাজকে উত্তম অবস্থায় আনিয়াছিলেন। সাতারার সমাজ একটা বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল; শহরের বিদ্বান ও সুবুদ্ধি লোকদিগের দৃষ্টি প্রার্থনাসমাজের উপর পড়িতে লাগিল। ঐ সমাজের ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য শ্রোতৃবৃন্দের ভীড় হইতে লাগিল। এবং সবশুদ্ধ ধরিতে গেলে, সাতারার সমাজ লোকজাগৃতির কাজ সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথই এই সমস্তের মূল। ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না।

বাংগালাভাষার কতকগুলি উত্তম গান, মূলের ধরণ বজায় রাখিয়া তিনি মারাঠীভাষায় রচনা করিবার জন্য জহবরেকে সাহায্য করেন। তৎ-প্রযুক্ত কতকগুলি বাংগালা গান—'সোডী মহিবরী শান্তিচে বারি' (বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত 'দেহজ্ঞান দিব্যজ্ঞান' প্রভৃতি গানের সহিত অনেকেই বেশ পরিচিত আছেন। সত্যেন্দ্রনাথ এই এলাকা ছাড়িয়া যাইবার পরে, চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না;—ইহা আমাদের মহারাষ্ট্রীয় পেন্‌সন গ্রহীতাদের মনে রাখা উচিত। ১৯০৮ অব্দ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক আত্মচরিত লিখিয়াছেন—এইরূপ মহারাষ্ট্রীয় লোকেরা বাহিরে বাহিরে শুনিয়াছিল। যাহাদের বাংগলাভাষায় জ্ঞান অল্পবিস্তর ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই গ্রন্থের সহিত পরিচয়লাভ ত করিয়াছিলেনই। ১৯০৮ অব্দে স্বকীয় কন্যা ইন্দিরা দেবীর সাহায্যে সত্যেন্দ্রনাথ আপন পিতৃদেবের আত্মচরিত ইংরেজি ভাষায় ছাপাইয়া ইংরেজী-অভিজ্ঞ সমস্ত লোককে ঋণী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই আত্মচরিত সম্বন্ধে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ এইরূপ বলিয়াছেন যে—The autobiography containing no stirring adventures or sensational incidents of any kind. Its value consists in its being a record of the spiritual struggle of a noble soul... the struggle of a soul striving to rise form empty idolatrous ceremonial to the true worship of the one living God.

স্বকীয় পিতৃদেব সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁর নিজের সম্বন্ধে কিরূপ খাটে তাহা আমরা দেখাইতেছি। আপাততঃ এইটুকু বলা আবশ্যক যে, তিনি শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সেবক ছিলেন। সুরাটের চিরস্মরণীয় রাষ্ট্রীয় সভার সময় যে একেশ্বরী ধর্মপরিষদের অধিবেশন হয়, তিনি তাহার অধ্যক্ষতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নামক পত্রের তিনি শেষ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ লেখাই মাতৃভাষায় লিখিত। ঐসব লেখার দ্বারা তাঁহার স্মৃতি ত স্থায়ী হইবেই, কিন্তু বাংলা ও মহারাষ্ট্র এই দুই প্রদেশে যতদিন ভক্তিমার্গের লোক আছে ততদিন তাঁহার স্মৃতি স্থায়ী না হইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার রচিত স্বয়ং-স্ফূর্ত পদাবলীর দ্বারা এই মহৎকার্য্য সাধিত হইবে, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। মহর্ষির আত্মচরিতের মধ্যে যে পরিমাণে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের বৃত্তান্ত আছে সেই পরিমাণেই সত্যেন্দ্রনাথের পদাবলীর মধ্যেও এক ভক্ত অন্তঃকরণের আন্দোলন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত চরিতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, আমাদের প্রদেশে এইরূপ লোক বড় বেশী নাই। দেবেন্দ্রনাথ একজন তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী-লোক ছিলেন, এখানকার লোক এইরূপ বুঝিয়া থাকে; এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের একটা সুব্যবস্থিত আকার দিয়াছিলেন এই কথাই জানে। কিন্তু তিনি যে এক Struggling Soul ছিলেন, অন্তঃকরণের ব্যাকুলতা তাঁহাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত দিত না এবং এই ব্যাকুলতা তাঁহার উপদেশ ও দ্বারাই ব্যক্ত হইত—এই কথা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ সত্য, তাহা অপেক্ষা, অন্তঃকরণের ব্যাকুলতা বিচার করিতে গেলে সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তাহা আরও অধিক পরিমাণে সত্য। তাঁহার রচিত পদাবলীই তাঁহার সাক্ষী।

তিনি কতকগুলি সুন্দর পদাবলী রচনা করিয়াছেন, শুধু এই কথা বলিলে তাঁহার সমস্ত আধ্যাত্মিক জীবন যেন ঢাকা পড়িয়া যায়। কিন্তু যে কেহ তাঁহার পদাবলীর মধ্যে তাঁহার আন্তরিক জীবনের প্রবাহ দেখিবার জন্য প্রযত্ন করিবে সেই সত্যেন্দ্রনাথের পদাবলীর শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া থাকিতে পারিবে না। আমাদের পুরাতন সংগীতের মধ্যে তাঁহার কতকগুলি পদাবলী গৃহীত হইয়াছে। 'হে করুণাময় দীনসখা' ইহা তাঁহারই একটি গান। 'পাওরে জগপতি জগবন্দন' তাঁহার এই গান আমাদের নিকট পরিচিত। 'দয়াঘন তুজবিন কো

হিতকারী' (দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী) ইহাও তাঁহার একটি রচনা। তথাপি তাঁহার শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধনের সাক্ষী—তাঁহার অনেক সুন্দর পদাবলীর সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মূলেই পরিচয় তাই। তাঁহার সম্বন্ধে বিচারালোচনা করিবার সময়ে এই একটা বিশেষ কথা আমাদের মনে উপস্থিত হয় যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কার্য-কলাপ যখন বঙ্গদেশে প্রভূত পরিমাণে চলিতেছিল, সেই সময় সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই-প্রদেশে থাকিয়াই মহর্ষির আধ্যাত্মিক জীবনের স্পৃহণীয় পরিণাম স্বকীয় জীবনে প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং মহর্ষির আধ্যাত্মিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সত্যেন্দ্রনাথই হইয়াছিলেন। তদনুসারে, মহারাষ্ট্রীয় সাধুদিগের বাণী তাঁহার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করা প্রযুক্ত তাঁহাদিগের চিন্তার ছায়া তাঁহার অনেক পদাবলীর মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকিবে। সত্যেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার সারাংশ এইরূপ ছিল যে: হে দেব, তুমি আমার সর্বস্ব হও। অনেক পদাবলীর মধ্যে, বিভিন্নরূপে, মর্মস্পর্শী উক্তির দ্বারা তিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে, তুমি বিনা সর্ব সম্পদ ব্যর্থ, এবং তোমাকে লাভ করিলে ঘোর বিপদও সম্পদ তুল্য হয়। আর একটি গানে তিনি বলিতেছেন,—

'হে দেব, আমি তোমাকে আর কি দিব? যাহা কিছু সকলই তোমারই, আমাদের কি আছে? তোমার প্রেমে হৃদয় বিকশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেখানে তুমিই দেব বিরাজমান!' আর এক জায়গায়, তিনি ভক্তের ভাবে বলিয়াছেন যে: হে দেব, এখন কেবল বিষয় সুখে আমার মনের তৃপ্তি কি করিয়া হইবে? তোমার চরণামৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আমার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—এখন ধনজনমানের কি প্রয়োজন? 'পরমেশ্বর পাদ কমল-মধু' পান করিবার জন্য এখন অতি তীব্র ইচ্ছা হইয়াছে; এবং উহা সঞ্চয় করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে 'না চাহি অপর কিছু' কারণ একবার মধু সঞ্চয় হইলে পর, যেরূপ মধুকর মধুপানের দ্বারা আপন তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না, সেইরূপ হে দেব, আমার দশা হইয়াছে। তোমার চরণের আশ্রয় আমি লাভ করিয়াছি, সে সুখ আমি উপভোগ করিয়াছি, এখন আমি তোমার চরণ কিছুতেই ছাড়িব না, এখন আমার কোন বাসনা নাই। এই প্রকার উক্তির পর তিনি অনেক সময় স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে:

তোমা বিনা চাহিনা চাহিনা কিছু আর।
সম্পদ বিষ সম তোমারে ছাড়িয়ে ॥

তাঁহার অনেক পদাবলী তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার যে সাক্ষ্য দেয়, তাহা ঐ সকল পদাবলী দেখিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। এই প্রকারে শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ম-ধর্মের সেবা করিতে করিতে এই বৃদ্ধ সেবক স্বকীয় ইহলোক যাত্রা সমাপন করিয়াছেন এবং স্বকীয় আদর্শ-চরিত পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত পদাবলী ও তাঁহার লেখার দ্বারা তিনি যে দেখাইয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিবার স্ফূর্তি নব্য বংশীয়দিগের মধ্যে যেন বৃদ্ধি পায় এবং এই মহতী ভক্তির উন্নত পথে যে সকল আত্মা অবস্থিত করিতেছেন, তাঁহারা যেন সন্তোষ শান্তি লাভ করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

তত্ত্ববোধিনী ; ফাল্গুন, ১৮৪৪ শক। ২০ কল্প, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ২৮৬-২৮৮।

শোকনৈবেদ্য

[illegible]ন্দ্রনাথের উদ্দেশে স্বর্ণকুমারী দেবী কর্তৃক [illegible] সঙ্কলিত
সাহিত্যস্রোতঃ প্রথম ভাগে উদ্ধৃত।

১

হে অরূপ, মুক্ত আত্মা, নমি যুক্ত করে ;
স্তম্ভিত শোকাশ্রু, তব গুণ-কীর্তি স্মরে !
অন্ধকার বঙ্গভূমি আলোকি উদিলে তুমি
পরমার্থ প্রয়োজন সাধিবার তরে !

২

শুভ্র সৌম্য, দিব্যমূর্তি, অহো কি সুন্দর
বিধাতার মূর্তিমান আশীর্বাদ বর।
এমন মহান মতি সরল সত্যের জ্যোতি !
উদয় শিখরে যেন নব বিভাকর।

৩

জনমি দেবাত্মা গৃহে হে কুলপাবন !
কর্মেতে করিলে ধন্য ধর্মের ভবন
রচিয়া উৎসব দৃশ্য মোহিলে নিখিল বিশ্ব
বেদমন্ত্রে মুখরিত ব্রহ্মনিকেতন।

৪

কিন্তু হেথা নারীগণ উপাসিকা বেশে
কেননা গায়ত্রী ছন্দে বন্দে পরমেশে ?
ভারতললনা হায় অন্ধকূপে মৃতপ্রায়
বজ্রসম তব হৃদে এ বাণী প্রবেশে।

৫

বেদনামথিত মন্ত্র শুদ্ধ সত্য শ্লোকে
উচ্চারি জাগালে দেব মোহসুপ্ত লোক
পুণ্যরণে হয়ে ব্রতী একা তুমি মহারথী
বাজালে বিজয়ডংকা কল্যাণসাধক !

৬

মূর্খ করে আর্তনাদ, দৈব গায় জয় ?
দলে দলে এল শিষ্য বীর সহৃদয় ।
বন্দিনী হইল মুক্ত হৃদয় আশ্বাসযুক্ত
মরমে পরমশক্তি সত্য-ভক্তিময় !

৭

জীবনের কাজ তব হলো সমাপন
সাধনে সাধিলে সিদ্ধি ব্রত উদ্‌যাপন ।
আজি মোরা কাঁদি ঘিরে তুমি ত চাওনা ফিরে
কোন শূন্য পূর্ণতরে করিছ গমন ?

৮

যাও তবে পুণ্যলোকে, যাও মহাপ্রাণ
সুকৃতি তোমারে যেথা করিছে আহ্বান !
জন্মান্তরে যেন ভাই আবার তোমারে পাই
বিধাতার কাছে যাচি এই বরদান ।

পরিশিষ্ট ৫

প্রয়াণ

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর দুই দিন পরে ১৯২৩এর ১১ই জানুয়ারীতে কবিতাটি প্রিয়ম্বদা দেবী কর্তৃক লিখিত ও ইন্দিরা দেবীর স্বহস্ত লিখিত 'আমার খাতা'য় পৃ. ১১৩-তে প্রাপ্ত।

পুণ্যবান পুণ্যলোকে করেছ প্রয়াণ
যুগে যুগে মূর্তি ধরে
ভক্ত সাধু ধরা পরে
আইসে মুকতি দিতে সন্তাপিত প্রাণ
অটল বিশ্বাস ভরে
সত্য ধর্ম দৃঢ় করে
ধরেছিলে, ন্যায় পথে চির শক্তিমান্
স্নেহ ক্ষমা সর্বলোকে
তোমার বিয়োগ শোকে
তাই আজি কাঁদিতেছে জগত পরাণ
ভালবাসা অকাতরে
বিলায়েছ ঘরে ঘরে
ছিল না তোমার হৃদে আত্মপর জ্ঞান
সব ছিল আপনার
তুমি ছিলে সবাকার
পদগর্ব পদতলে ধূলির সমান
উদার মহান চিত্ত
সুন্দরে সুন্দর নিত্য
নীচতা তোমার কাছে নাহি পেত স্থান
আনন্দে আনন্দ ধামে
চলে গেছ মুক্ত কামে
চিরতরে রাখি কীর্তি, পুরুষ মহান্

পরিশিষ্ট ৬

শ্রদ্ধা নিবেদন ৯।১।১৯২৩

১৯২৩ সালের ৯ই জানুয়ারীতে যে মহান পুরুষ লোকান্তরে যাত্রা করেছেন—তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে এক 'শ্রদ্ধা-নিবেদন' রচিত হয়েছে। কবিতাটি ইন্দিরা দেবীর স্বহস্ত লিখিত 'আমার খাতা'য়, শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। কবিতার ভাবে ও তারিখে মনে হয় খুব সম্ভবত পিতৃস্মৃতিতে ইন্দিরা দেবীই কবিতাটি লিখেছিলেন।

১

ওহে মহাপ্রাণ
অন্ধকারে একা তুমি করিলে প্রয়াণ
কেহ নাহি গেল সাথে
আলো ধরিল না হাতে
ভূমি তলে গেল ফেলি কাষ্ঠের সমান

২

ওহে দেবোপম।
নিতান্ত আত্মীয় তুমি ছিলে যে গো মম
ঘুচিবে কি সেই প্রীতি
মুছিবে কি সেই স্মৃতি
জ্বলিবে না পর-পারে ধ্রুব তারা সম?

৩

ওহে মুক্তকায়।
সে মধুর স্নেহ আর কে দিবে আমায়
পার যদি সংগোপনে
সঞ্চিত রাখিও মনে
পরলোকে সে চিহ্নে চিনিব তোমায়।

৪

ওহে আত্মা অমর।
জানি এই পারে সকলি নশ্বর
শুধু এই ভিক্ষা চাই
পুনঃ যেন দেখা পাই
লোকান্তরে[১] কভু, যুগ যুগান্তর।

'লো' বর্ণটি জীর্ণ।

পরিশিষ্ট ৭

GUNGA DIN

Rudyard Kipling : Barrack-Room-Ballad. pp. 24-26

You may talk o'gin and beer
When you're quartered safe out' ere,
An' you're sent to penny fights an' Aldershot it
But when it comes to slaughter
You will do your work on water,
An you' ll lick the bloomin' boots of' im that's got it

Now in Injia's Sunny clime
Where I used to spend my time
A Servin' of 'Er Majesty the Queen
Of all them black-faced crew
The finest man I knew
Was our regimental *bhisti*, Gunga Din.
He was Din ! Din ! Din

You limpin' lump o' brick-dust, Gunga Din !
'Hı : Slippery hitherto :
Water get it : *panee lao* ' !
'You squidgy—nosed old idol, Gunga Din'

The uniform 'e wore
Was nothin' much before.
An rather less than 'arf o' that be' ind.

For a piece o' twisty rag
An' a goat-skin water bag
Was all the field epuipmen 'e could find
When the sweatin' troop-train lay
In a sidin' through the day,
Where the' eat would make your bloomin' eyebrows
Crawl,
We shouted 'Harry By :
Till our throats were bricky-dry,
Then we wopped' im' cause 'e
Couldn't serve us all.
It was 'Din : Din : Din :

You' eathen, where the mischief 'ave you been ?
'You put some *juldee* in it
'Or I' ll marrow you this minute
If you don't fill up my helmet Gunga Din :

'E would not an' carry one
Till the longest day was done ;
An' 'e didn't seem to know the use o' fear
If we charged or broke or cut,
You could bet your bloomin' nut
'E'd be waitin' fifty paces right flank rear.

With 'is mussick on 'is back
'E would skip with our attack
An' watch us till the bugles made 'Retire',
An' for all 'is dirty 'ide

'E was white, clear white, in-side
When 'e went to tend the
wounded under fire :
It was 'Din : Din : Din

With the bullets kickin'
dust-spots on the green.
When the cartridges ran out,
You could hear the front-file shout,
'Hi ! ammuuition-mules an' Gunga Din !'

I sha'n't forgit the night
When I dropped be' ind the fight
With a bullet where my belt-plate should' a' been.
I was chokin' mad with thirst,
An' the man that spied me first
Was our good old grinnin', gruntin' Gunga Din.
'E Lifted up my 'ead,
An' he plugged me where I bled,
An' 'e guv me 'arf-a-pint o' water green.
It was crawlin' and it stunk
But of all the drinks I've drunk,
I' am gratefullest to one from Gunga Din,
It was Din ! Din ! Din !

'Ere's a beggar with a bullet through 'is spleen
'E's chawin' up the ground,
'An' e's kicking all around-:
'For Gawd's sake git the water, Gunga Din !'

‘E carried me away
To where a *dooli* lay
An’ a bullet come an’ drilled the beggar clean.

‘E put me safe inside,
An’ just before ‘e died,
‘I’ ope you liked your drink’, Sez Gunga Din.

So I’ll meet ‘im later on
At the place where he is gone—
where its alway double drill and no canteen ;
‘F’ll be squattin’ on the coals
Givin’ drink to poor damned souls,
An’ I’ll get a swing in hell from Gunga Din !
Yes Din ! Din ! Din

You lazarushian-leather Gunga Din
Though I’ve belted you and flayed you,
By the livin’ Gawd that made you
You’re a better man than I am
Gunga Din.

পরিশিষ্ট ৮ক

কতিপয় অনুবাদ

নববর্ষ

Tennyson-এর Ring out the old, Ring in the new কবিতার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের করা অনুবাদ

১

পুরাতন বর্ষ শেষ আইল নবীন
স্মৃতিলীন হল হায় পুরানো সেদিন !
ছিলে যে সাথের সাথী, বন্ধু হে বিদায়
নবীন অতিথি এস, স্বাগত তোমায় !

২

গেছে কত ব্যথা ক্লেশ, অতৃপ্ত বাসনা
সুখ আশা গেছে ভেংগে অসিদ্ধ সাধনা
নববর্ষে ধর আজি উদ্যম নূতন
নবোৎসাহে গড় পুন নূতন জীবন

৩

ঘুচুক অভাব দৈন্য, দুঃখ পাপভার
অবিশ্বাস, ভ্রান্তিপাপ, সংশয় আঁধার ;
নিবে যাক্ শোকানল চিরদিন তরে
কালের ইন্ধনে যাহা জ্বলে ঘরে ঘরে !

৪

খর্ব হোক্ বৃথা গর্ব মান অভিমান
জাতিকুল ভেদাভেদ বিচ্ছেদ-নিদান

বাঁধুক জগতজনে মৈত্রের বন্ধন
একপ্রাণ রাজা প্রজা, সধন নির্ধন ?

৫

আলস্য প্রমাদ লোভ, যাক্ এ জঞ্জাল
ক্ষমা দয়া ধৃতি হৃদি থাক চিরকাল
অনাচার অত্যাচার হোক নিবারিত
হউক সত্যের জয়, মিথ্যা পরাজিত,

৬

আধিব্যাধি অমংগল যাক দূরে যাক্
স্বাস্থ্য কান্তি মকরন্দে জীবন জুড়াক
যুদ্ধ বিগ্রহের হোক, হোক অবসান
উড়ুক ধরণীমাঝে শান্তির নিশান।

৭

দুষ্কর্ম বিষয় তৃষ্ণা যাক থেমে যাক
বিবেক বৈরাগ্য দুই থাক কাছে থাক
শক্তি অপরাজিত, দেবভক্তি সাথে
পথের সম্বল চির থাক্ সাথে সাথে।

৮

গিয়াছে কতই বাত্যা বুকে বজ্রহানি
সমুখে কি আছে দেব কিছুই না জানি ;
সুখ দুখ যাই দেও, সুধা বা গরল
মানি লব, ইচ্ছা তব হউক সফল।

‘ভারতী’ বৈশাখ ১৩৮১ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিশিষ্ট ৮খ

শিশু

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর স্বহস্তলিখিত 'আমার খাতা'য় পৃ. ২১-এ কবিতাটি উদ্ধৃত হয়েছে। কবিতাটির নীচে 'দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর' লেখা। দু জায়গায় সামান্য পাঠভেদ আছে। 'মনীব' স্থলে 'আমার খাতা'য় আছে 'মনিব', আর 'শিশু তুমি' স্থলে 'খুকু মণি।' খুব সম্ভবত কোন পৌত্রীকে নিয়ে লিখেছিলেন। এটি Cosmo Monkhouse রচিত 'To a New born Child' কবিতাটির ভাবানুবাদ। সত্যেন্দ্রনাথের চার খণ্ড সংকলনে 'To a New born child কবিতাটি স্থান পেয়েছে। p. 462 Tukaram, Eng. Poems—ইত্যাদি সংকলনে সযত্নে টাইপ করে রেখে গেছেন।

শিশু তুমি! সাধু হয়ে জন্মেছ ধরায়,
যে দেখে তোমারে সেই তব গুণ গায়।

সোনা, মাটি তোমা কাছে সকলি সমান,
স্তুতি নিন্দা তুল্য, তথা মান অপমান।
যত পায় তত চায় সংসারী যে জন
অল্পেতেই তুষ্ট, তুমি যোগীর মতন।
সহস্র সাধনা করে আমরা না পাই
স্বভাবে সে সব গুণ আছে তব ঠাঁই।

ওই কচি মুখখানি আহা কি সুন্দর।
কত বল ধরে খুকু, তোমার ক্রন্দন,
আমাদের কান্না শুধু অরণ্যে রোদন।

আধো আধো কথা তোর সুধা ঢালে প্রাণে,
আমরা কতই বকি, কেবা তারে মানে ?
আমরা খাটিয়া মরি,—বেচারা গরীব,
তোমারি সেবায় রত,—তুমিই মনীব

'ভারতী' জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

পরিশিষ্ট ৯

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে (পারিবারিক খাতায়)
সত্যেন্দ্রনাথের রচনা ও অন্যান্যদের উত্তর

ছেলেবেলার কথা

(১) আমার ছেলেবেলার কথা[১] কিছু কিছু মনে পড়ে। প্রথমে হাতে খড়ির পর গুরুমশায়ের কাছে লেখা শেখা—আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীর দালানে ছেলেমেয়ে সকলে একত্র হইতে—আর গুরুমশায় বেত্রহস্তে সম্মুখে আসীন—বেত কখন কারো পিঠে পড়ত না মনে হয় না, কিন্তু তাঁর সেই রুক্ষ-মেজাজ চোকরাঙানী ভৈরব মূর্তি দেখে ভয়ে সবাই জড়সড় হয়ে থাকত। ছোটকর্তার বাড়ীর দুই জমক ভাই নিতাই গৌর—আর মেয়েদের মধ্যে ক্ষমাদিদিকে এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। আমাদের লেখবার দুইটি পাঠ ছিল—এক 'সেবক শ্রী' আর 'আজ্ঞাকারী শ্রী' প্রণামা বহবো ইত্যাদি—দুটি উলট পালট করিয়া রোজ শ্রীরামপুরের কাগজে লেখা হইত।

তারপর ভবানীবাবুর কাছে পাঠারম্ভ। তিনি গোলার উপর লিখিত অক্ষরে ক খ শিখাইতেন। তেতালা বাড়ীতে তিনি পড়াতে আসতেন। মনে আছে অনেক সময় দিনে নিদ্রাভঙ্গের পর পাঠারম্ভ হইত।

কিন্তু আমাদের প্রধান মাস্টার—যাঁর শিক্ষায় আমার চরিত্র অনেকটা গঠিত হয়ে ছিল—যে শিক্ষার ফল হয়ত আজো উপভোগ করা যাচ্ছে তিনি হচ্ছেন Sir—ঈশ্বর নন্দীকে আমরা Sir বলিয়া জানিতাম। তিনি একজন বিদ্বান বিচক্ষণ শিক্ষক ছিলেন। তাঁর কাছে আমরা ইংরাজী History—Composition এই সব শিখিতাম। আমাদের একটা debating club ছিল তাতে সপ্তাহের মধ্যে একদিন বক্তৃতাদি হইত। Nepolian Bonaparte, Julius Ceaser, Alexander এই সব Heroদের নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাইত। ওবাড়ীর মেজদাদা বড়দাদা আমি এই সব বক্তা আর দেঁতো কেদার দত্ত প্রভৃতি বাইরের লোকও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকত। আমাদের বাদানুবাদের পর Sir সব মিটমাট করিয়া পক্ষপাতশূন্য হয়ে গম্ভীর ভাবে ঈষৎ তোতলা

ভাষায় কেমন সহজে সব মিটমাট করে দিতেন আমার বেশ মনে পড়ে। Sir এর সাহায্যে আমি একটা Essay লিখেছিলুম Heroism of Ancient India, তাতে ভীমার্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ রঘুর দিগ্বিজয় এই সব বীরত্ব কাহিনী বিবৃত হয়েছিল—কেশববাবুদের একটা সভা ছিল—সেখানে পঠিত হয়। সেই সভায় বিদ্যাসাগর একটা বক্তৃতা দেন, এই বলে আরম্ভ করেন—"বৎস, আমি দাঁড়ালেই সব অন্ধকার দেখি।"

কেশববাবুর কথায় মনে হল—প্রথম কখন আমাদের বাড়ীতে তাঁর প্রবেশ-লাভ হল। হঠাৎ একদিন আমার নিকট এসে উপস্থিত। গুরুর মন্ত্র নেওয়া সম্বন্ধে তাঁর মনে···তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়েছে—গুরুর মন্ত্র নেওয়া উচিত কি না? আমি তাঁকে বাবামশায়ের কাছে নিয়ে গেলুম। অনেক কথাবার্তার পর না নেয়াই স্থির করলেন। সেই অবধি তাঁর আমার বাড়ী যাওয়া আমার সূত্রপাত। ক্রমে বাবামশায়ের বিলক্ষণ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। কিছু পরেই আমার নূতন গান উঠল, আর ব্রাহ্মসমাজে বাবামশায়ের বক্তৃতা যার থেকে 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান'। সেই গান ও বক্তৃতায় সমাজে যেন নবজীবনের সঞ্চার হল। সেইরকম উৎসাহ ও অনুরাগ—এখন আর দেখা যায় না। প্রতি সপ্তাহে যা বলা হত আমি তাই নোট করে লিখে নিতুম—বাবামশায় তাই দেখে সংশোধন করে দিলে পর সপ্তাহে আবার পড়া হত। প্রায় প্রতি সপ্তাহে নূতন নূতন গান থাকত—বিষ্ণুর গান থাকত। সেরকম সুর ও ভাষায় গান সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হত। ববামশায় এখনো বলেন—ঐ গান যা তাঁর ব্রহ্ম-সংগীতের মধ্যে মনে গাঁথা আছে।

তখনকার কালে ১১ই মাঘে খুব ধুমধাম হইত। একবার মনে আছে প্রায় ১০/১২টা বোটে করে আমরা একদল যাত্রী পলতার বাগানে গিয়া আহারাদি করিলাম। জগন্মোহন গাংগুলী ছিলেন। তিনি রন্ধন কার্যে খুব মজবুত—তিনি মাছের ঝোল রাঁধিলেন—সে চমৎকার ব্যাপার। হরদেব চাটুয্যে তাঁর নৃত্যগীত···হাসি এখনো সঠিক (মনে) পড়ে। বেটাছেলের (মুখে) কড়ি সর্বলোকে কয় এই গানটা খুব উৎসাহের সংগে গাওয়া হয়। যাত্রীদের মধ্যে বেণীবাবু ছিলেন। তিনি আবার ছিলেন কোষাধ্যক্ষ, বাবামশায়ের উপর তাঁর অচলা ভক্তি ছিল—আর বাবামশায় তাঁকে খুব বিশ্বাস করতেন আর তাঁর প্রতি খুব অনুগ্রহ ছিল। বেণীবাবু হিম সইতে পারতেন না—একটু হিম লাগলেই

তাঁর অসুখ করত। বোটের মধ্যে তাঁকে নিয়ে নবীনবাবুর যে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলেছিল তা আর কহতব্য নয়। নবীনবাবু বাবামশায়ের মজলিসে বিদূষক— আর বাগেশ্বর পণ্ডিত আমার ত্রিবেদী ঠাকুর—

ত্রিবেদী সরল ! নির্বুদ্ধিই বুদ্ধি তার
সরলতা বক্রতার নির্দয়ের দণ্ড।

[দ্রঃ নির্দ্দয়ের দণ্ড রাজা ও রাণী, রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৪৫ (১৯৭১)]

এর মধ্যে আমার ২১ বৎসর সঠিক পার হয়ে গেল, যেদিন প্রথম এখান থেকে বোম্বাই যাত্রা করি সে ত সেদিন মনে হয়। সেকালে বাড়ী-ভিতরে মেয়েরা পিঞ্জরাবদ্ধ—জ্ঞেনীকে আমার সংগে বোম্বাই নিয়ে যাওয়া এক বিষম সমস্যা। বাবামশায়কে বল্লুম যখন বাইরে বেরতেই হচ্ছে তখন সামনে নিয়ে নেমে একেবায়ে গাড়ীতে উঠে যাওয়া ত সহজ। তিনি তাতে সম্মত হলেন না— বল্লেন—'আমাদের যে চিরন্তন প্রথায় অন্যথাচরণ কিরূপে হয়'। শেষে পাল্‌কী থেকে তাঁকে গাড়ীতে চড়ান গেল—সেখান থেকে ষ্টীমার, তাঁর পক্ষে সবই নতুন—মাংস পর্যন্ত খাওয়া অভ্যাস নেই—আমি ষ্টীমারে তাঁকে দুধ রুটি হাতে করে খাইয়ে দিতুম। তারপ বোম্বাই গিয়া একেবারে এক পারসী পরিবার মধ্যে গিয়া পড়া। তাঁকে যে কত করে গড়ে পিটে নিতে হয়েছে তা আর কি বলব ? সে কাল আর এ কাল ? এই কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে তাতে আশা হয় আমাদের অনড় অচল সমাজও কালক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে। বিরজীতলাও Oct 7. 1889

(২) আমাদের পরিবারের মধ্যে এই অল্প কালে যে এত পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে তার একটা কারণ আছে। আমাদের এক বিষয়ে খুব সুবিধা ছোটর উপর বড়র অত্যাচার একাধিপত্য দেখা যায় না। আমরা যে যা সংকল্প করেছি যে রকম ভাবে জীবনযাপন, চরিত্রগঠনের চেষ্টা করেছি তাতে বাবামশায় কোন বাধা দেন নি। তিনি আমাদের·· মনের—উদ্যমের উপর খড়্গহস্ত হলে হয়ত অন্যরকম ভাব দাঁড়াত। আমাদের সকল কার্য্য যে তাঁর অমতে, তা বলা যায় না—হয়ত কতক তাঁর মতের সংগে, মধ্যে মধ্যে কতক বা তার অপ্রিয় ও

হতে পারে—কিন্তু আমাদের জীবন পথে তিনি কঠোর ভাবে কোন বিঘ্ন বাধা উপস্থিত করেন নি। মনোমোহনের সঙ্গে পরামর্শ করে ইংলণ্ড যাওয়া স্থির করে যখন বাবামশায়ের কাছে প্রস্তাব করলুম তখন তাঁর যে তাতে খুব মত ছিল তা নয়—তবুও আমার প্রবল ইচ্ছা দেখে তাতে বাধা দিলেন না। আবার এই সময় একটা ঘটনা আমার বিলাত যাবার বিঘ্নকারী হয়ে উঠেছিল। আর একটু হলেই সব উল্টে যেত। সে ঘটনা এই—আমি ও মনোমোহন মিলে একদিন কোম্পানীর বাগানে বেড়াতে যাই। আমাদের বোট পার হবার সময় একটা ধাক্কায় উল্টিয়ে যায়—আমরা জলমগ্ন হই। আমি সাঁতার জানতুম। কোনরকম করে বোধ হয় ভেসে রইলুম—মনোমোহন সাঁতার জানেন না তাঁর সমূহ শংকট উপস্থিত—যা হোক কোন রকম করে ত রক্ষা পাওয়া গেল। আমরা কাকেও কিছু না বলে আমাদের গম্য স্থানে গিয়ে কাপড় চোপড় শুকিয়ে কোন কিছু হয় নাই এই রকম ভাবে বাড়ী ফিরে এলুম। কিন্তু হা…ভবিতব্যতে! কে একজন গুপ্তচর আমাদের দুর্দশার কথা আগেই বাবামশায়ের কানে গিয়ে লাগায়—তিনি আমাদের উপর মহা বিরক্ত। এখানেই যদি আমরা আপনায় আপনাকে সামলাতে না পরিলাম ত ঐ অসহায় দূর দেশে কোন প্রাণে পাঠাইতে পারেন। বোধ করি সত্য সত্যই তাঁর ভাবনা হয়েছিল আর আমার বিলেত যাওয়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। যা হোক কোন রকমে প্রথম ধাক্কাটা উতরে গেল। আমাদের মধ্যে ইংরাজী ধরণধারণ যদি কারো ভাল লাগে বাবামশায় সেটা অপ্রিয় হলেও কোন কিছু উচ্চবাচ্য করেন না। স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি আমার ছেলেবেলা থেকে অনুরাগ—তার জন্য কত করেছি—বাবামশায় হয়ত (একেক) সময় (ভাল) লাগেনি। কিন্তু কখনও প্রকাশ্যরূপে তিনি এবিষয়ে আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। নিতান্ত বাড়াবাড়ী দেখলে হয়ত উপাসনার দালানে বক্তৃতা স্থলে মনের ঝাল ঝাড়তেন কিন্তু আর কিছু নয়। যেমন গর্জন তেমন বর্ষণ নয়। বাবামশায় কথায় আমাদের মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ ভয় পাইতেন—আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া আহার করিতে বিরত হইতেন—কিছুদিনের মধ্যে আবার যেমন তেমনি, এখন ত আর কোন গোল নাই। মেয়েদের বাইরে বেরনো—পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা এত সহজ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করেছে। এর প্রধান কারণ বাবামশায় উদার ভাবে আমাদের সকলকে স্বাধীন স্বৈরগতিতে চলতে দিয়েছেন—কাল স্রোতের

প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ান নি নিজের ভাবের সঙ্গে অমিল হলেও আমাদের প্রত্যেকের সুগঠিত পথে কণ্টক স্থাপন করেন নি।

Birji Talao শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Oct. 8/89

(৩) একটা নৌকা আমাদের কাছ দিয়ে গেল—তারা ভাবতে লাগল নেবে কি না নেবে—আমরা এদিকে হাবুডুবু খাচ্ছি। তারা বিচার করে সঙ্গে না নেওয়াই সাব্যস্ত করলে—নইলে তাদের সময় নষ্ট হয়। ডাঙ্গিট আর একজন সদয় মাঝি আমাদের তার নৌকায় উঠিয়ে নিলে তাই রক্ষা—কি অল্পসূত্রের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করছে।

বড়দাদার ছেলেবেলায় কবিতার এক স্থলে বাবামশায়ের কথা বর্ণিত আছে তা যতদূর মনে পড়ে এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শুভ্র মূর্তি কান্তিমান শুভ্রবেশ পরিধান
উন্নত শরীর সুগঠন
বেষ্টিত স্বজনগণে ধবল প্রস্তরাসনে
বসিলেন ব্রহ্মর্ষি তখন[৪]
সংসার দুর্দিনে ঝড় অসামান্য ঘোর
দিবারাত তাঁহার উপরে করে জোর
অস্থির আশ্রিত গাছপালা সমুদয়[৫]
অচল অটল তবু একই ভাবে রয়।

8th October. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
1889

সামাজিক

বিবাহের[৬] কোন নিয়ম ভাল—মেয়েপুরুষের পরস্পর ভালবেসে পছন্দ করে বিয়ে করা কিম্বা মা বাপের ঘটক···উদ্বাহ শৃঙ্খল ধারণ করা। ইংলণ্ড ও আমেরিকায়···বিবাহের পক্ষপাতী। যে পুরুষ বিবাহ করতে চায় সে তার প্রণয়িনীর সাধ্য সাধনা···আরম্ভ করে। তার সম্মতি পেলে তার মা বাপের কাছে বিবাহের প্রস্তাব। ফ্রান্সের প্রথা কতকটা আমাদের দেশানুযায়ী—বাপ

মায়ের সম্মতিতে মেয়েদের বিবাহ। বিবাহার্থী পুরুষ প্রথম পিতার কাছে আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করে—কন্যার ইচ্ছা থাক বা না থাক পিতার মতে মত দেওয়াই নিয়ম। আমাদের দেশের ত কথাই নাই। সচরাচর যে বয়সে বিবাহ হয় তখন ত মেয়ের মতামত দেবার বয়সই নয়—জ্ঞান জন্মে না। ফ্রান্সে শুনতে পাই অবিবাহিত কুমারী যেমন কড়াক্কড় নিয়মে বদ্ধ—বিবাহের পর তেমনি সামাজিক শৃংখল সমস্ত ভাঙিগয়া যায়, বিবাহিতা স্ত্রীর অনেক lovers আসিয়া জোটে। স্বামী বেচারার বিষম শংকট—প্রায়ই স্ত্রীর প্রণয়ীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে duel দম্পতীর বিবাদ-ভঞ্জন হয়। আমাদের দেশে বিবাহের ওরূপ কুফল দৃষ্টি গোচর হয় না। তার এক কারণ স্বতন্ত্রতার অভাব আর এক এই, অল্প বয়সে বিবাহের দরুণ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এক রকম মিল দাঁড়িয়ে যায়। তখনি জিজ্ঞাস্য এই, এই দুই প্রথার মধ্যে কোনটা প্রার্থনীয়? আমার মতে 'কোর্টসীপ' বিবাহ। বিবাহ কি না—স্ত্রী পুরুষের মধ্যে চিরজীবনের বন্ধন—সেটা পরের হাতে দিয়ে কি কোন মতে তৃপ্ত থাকা যায়? পুরুষের যদি কোন জিনিস বাছিয়া লইবার থাকে সে তার মনোমত স্ত্রী। স্ত্রীর যদি কোন জিনিস বরণ করিবার থাকে সে তার মনোমত পতি। এতে বিবাহের পর যদি কোন অমিল অসুখের কারণ উপস্থিত হয় তাহলে আপনাকেই দোষ দেওয়া যায়—বাপ মার ঘাড়ে দোষ চাপাবার যো থাকে না—এই এক মহৎ লাভ। আমাদের দেশে courtship বিবাহের ক্ষেত্র কি সংকীর্ণ এই আক্ষেপের বিষয় জাতিভেদ প্রথা এইরূপ বিবাহের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।

আমাদের সামাজিক প্রথা মধ্যে একান্নবর্তী[৭] পরিবারের নিয়ম হিতকর কিনা আর প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া…এক পরিবারের মধ্যে বাস করা যেমন সুখজনক পরস্পর বিরোধী Element এর একত্রীকরণ তেমনি অসুখের কারণ। অনেক লোক এক বাড়ীতে একান্নবর্তী প্রণালী অনুসারে থাকিতে গেলেই বিবাদ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা—এই ত সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যায়—পুরুষেরা যদিও সদ্ভাবে মিলিয়ামিশিয়া থাকিতে চায় মেয়েরা আবার তাহার ভিতর কলহ সঞ্চারের মূল…আমাদের যেমন শাস্ত্রে আছে—উদ্যোগং পুরুষ লক্ষণং তাগুণং স্ত্রীলক্ষণং।

আর এক কথা এই প্রণালীতে আলস্য প্রশ্রয় পায়—স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়। যে ভাইটী কষ্টে সৃষ্টে উপার্জ্জন করে ঘরে টাকা আনছে তার উপর হয়ত পাঁচজন

নিষ্কর্মা অলস ভ্রাতার উপজীবিকা নির্ভর—তাদের কাজে কোন প্রবৃত্তি থাকে না। কর্মিষ্ট সেই ভাইটীর স্কন্ধে নিষ্কর্মা অলস drone কুল চাপিয়া থাকে। স্বাধীনতার ভাব ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়! ভালমন্দ দু দিক ভাবিয়া দেখিলে আমার বোধ হয়, এ প্রথা অত্যন্ত অনিষ্টকারী—যত শীঘ্র উঠিয়া হায় ততই ভাল। তোমাকে ত বুদ্ধিমানের মত দেখছি হে, তুমি কি বল?

8th Octber/1819 শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নৃত্যপ্রিয়তা[৮]

অনেক জাতিই নৃত্যপ্রিয় কিন্তু আমার মধ্যে নৃত্যপ্রিয়তা দেখা যায় না Poetry of motion—গতিকাব্যের স্বাদগ্রহণে আমরা অক্ষম। কতকগুলি স্ত্রীলোকের উপরেই আমরা নাচের ভার দিয়া নিরস্ত থাকি। ফরাসিস—জর্মন—ইটালীয়ান—হুংগেরিয়ান এই সকল জাতির এক একটা national dance আছে। কিন্তু আমাদের তাহা কোথায়? কোথায় আমাদের নৃত্য-স্পৃহা? নাচের বাদ্য শুনিলে আমরা কি ইউরোপীয়দের ন্যায় নৃত্যলোলুপ হইয়া অধীর হইয়া পড়ি? ইহার কারণ কি?

স্বভাব যাদৃশো যস্য ন···কদাচন।

আমরা স্বভাবতই আলস্যপরবশ—শুইয়া থাকিতে পারিলে বসিতে চাই না, বসিতে পাইলে দাঁড়াতে আর প্রবৃত্তি হয় না···গাড়ীতে ঠ্যাসান দিয়া হাওয়া খাওয়া অপেক্ষা পদব্রজে গমন করা আমাদের অতীব কষ্টকর। সুতরা গতির Poetry-র মর্ম গ্রহণে আমরা অসমর্থ। আমার কথা দূরে থাক্ যারা আমাদের আমোদের জন্য নৃত্য করে তাহারাও সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ।* পদচালনা অপেক্ষা হস্ত মুখ ভংগীকেই তাহারা নৃত্যের পরাকাষ্ঠা মনে করে। হা বিধাতঃ এ দেশের কি দশা করিলে—নাচেও সুখ নেই।

15th Octber/1889 শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

* তারকাচিহ্নিত পংক্তিতে অন্যের হস্তাক্ষরে সামান্য পাঠভেদ আছে—আমাদের কথা দূরে থাক্ এ সকল নৃত্যবিলাসিনী আমাদের আমোদের জন্য নৃত্য করে তাহারাও নৃত্যরহস্যে অনভিজ্ঞ।

আলস্য[৯]

আমার Theory এটা শুধু নাচের বিষয় কেন—আমাদের national সকল দোষের মূল হচ্ছে আলস্য—আমাদের দেশের লোকের ৸৶০ মিথ্যা কথার মূল হচ্ছে ঐ, শুধু মিথ্যা বলা কেন—Three fourths of ours lies are the result of either intellectual or physical laziness I don't think Bentham is right when he says it is easier to tell the truth than to lie—for imagination is more difficult to exercise than memory. But the contrary is the case here.

T. Palit

চুম্বন[১০]

চুম্বন রহস্য কে বলিবে ? অধরে অধর মিশাইয়া একটী নিঃশব্দ শব্দ উচ্চারণ—ইহার অর্থ কি ? একটা জাতি আছে যাহারা চুম্বনের মর্যাদা অবগত নহে। জাপানী জাতি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। এইরূপ শুনিয়াছি জাপানী জননী শিশুকে বুকে লইয়া আদরে চুম্বন করে না। যার এরূপ উদাসীন ভাব আমাদের সহজে বোধগম্য হয় না। যখন আমরা শিশুর মৃদু দেহখানি বক্ষে ধারণ করি—তার ছোট ছোট হাত দুটি আমাদের গলদেশে—তার তুলে তুলে গাল আমাদের গালে অনুভব করি—যখন তার হাসি হাসি মুখ—ঢল ঢল আঁখি দুটি সম্মুখে দেখি তখন তায় চুমো না খাইয়া থাকিতে পারি না। চুমায় চুমায় তাকে ডুবিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। এ আমাদের স্বাভাবিক—হৃদয়োচ্ছ্বাস। কিন্তু জাপানীদের অপত্য স্নেহ যদিও আমাদের সংগে সমান, তারা চুম্বনে এমন উদাসীন কেন ? কি এক শান্তিশীল শীতলতা বংশ পরম্পরা প্রবাহিতা হইয়া তাদের এমনি ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছে যে জননীরও এই স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

October. 16/1889 শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চুম্বন[১১] প্রথা কি কেবল আর্য্যজাতীয়দের মধ্যেই বদ্ধ নহে ? সেমেটিক মংগোলীয় প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যে কি চুম্বন প্রচলিত আছে ? আমরা মনেই করিতে পারি না হৃদয়ের মধ্যে স্নেহ প্রেমের উদ্রেক হইলে অধরের প্রতি

অধরের আকর্ষণ না হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু উহা কি কতকটা স্বাভাবিক এবং কতকটা প্রথাগত নহে? জন্তুদের মধ্যে ত চুম্বন নাই—আঘ্রাণ, লেহন, গাত্রঘর্ষণ আছে। বানরী কি করিয়া আপন শাবকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করে কেহ বলিতে পারেন?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তার উকুন বাছিবার ভান করিয়া—S. T.

১. ছেলেবেলার কথা—প্রথম ধাপের রচনা-পারিবারিক খাতা : পৃ. ৮৫-৮৮, ৭ই অক্টোবর, ১৮৮৯।
২. ঐ —দ্বিতীয় ধাপের রচনা-ঐ : পৃ. ৮৮-৮৯, ৮ই অক্টোবর, ১৮৮৯।
৩. ঐ —তৃতীয় ধাপের রচনা-ঐ : পৃ. ৮৯-৯০. অক্টোবর, ১৮৮৯।
দ্র: 'আমার বাল্যকথা'য় সামান্য পাঠভেদ—
৪. বসিয়া ব্রহ্মর্ষি তপোধন।
৫. গাছপালা অতিশয় পৃ. ১০১। আমার বাল্যকথা; বৈতানিক প্রকাশনী।
৬. সামাজিক : বিবাহ প্রসংগ : পারিবারিক খাতা, পৃ. ৯০-৯১।
৭. সামাজিক : একান্নবর্তী পরিবার : পারিবারিক খাতা : পৃ. ৯১।
৮. নৃত্যপ্রিয়তা—পারিবারিক খাতা : পৃ. ১০৭।
৯. আলস্য : পারিবারিক খাতা : পৃ. ১০৭-১০৮ (তারক পালিতের লিখিত)।
১০. চুম্বন : পারিবারিক খাতা : পৃ. ১০৯।
১১. রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাস্যোদ্দীপক উত্তর—পারিবারিক খাতা পৃ. ১১০।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী

১. কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস : সাধুগদ্যে রচিত কাহিনী : ১৭৭৯ শক পৌষ, বিবিধার্থ : সংগ্রহ [১৮৫৭ খ্রী.]

২. উনত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের ভাষণ : ১৭৮০ শক ফাল্গুন তত্ত্ব-বোধিনী [১৮৫৯ খ্রী.]

৩. সিংহল উপদ্বীপে ভ্রমণ বৃত্তান্ত : দিনলিপি : ১৭৮১ শক পৌষ, তত্ত্ব-বোধিনী [১৮৫৯ খ্রী.]

৪. একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের ভাষণ : ১৭৮২ শক ফাল্গুন তত্ত্ব-বোধিনী [১৮৬১ খ্রী]

৫. ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস গ্রন্থের উপক্রমণিকা : ১৭৮৩ শক ৭ই চৈত্র, প্রথম প্রকাশিত। [১৮৬২ খ্রী.]

৬. জীবনের জয়-কীর্ত্তন : লংফেলোর 'Psalm of Life-এর অনুবাদ : ১৭৮৯ শক বৈশাখ তত্ত্ব-বোধিনী [১৮৬৭ খ্রী.]

৭. সুশীলা বীরসিংহ (এই নাটকের শেষে 'জীবনের জয়কীর্ত্তন' অনুবাদটি 'মনুষ্য-জীবন' নামে মুদ্রিত) : নাট্যানুবাদ : সংবৎ ১৯২৪ (২রা মার্চ, ১৮৬৮ খ্রী)

৮. একমেবাদ্বিতীয়ম্—(দ্বা-চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা) ১১ই মাঘ, ১৭৯৩ শক : পুস্তিকাকারে মুদ্রিত : ১৭৯৩ শক। জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত (১৮৭২ খ্রী.)

৯. আদি ব্রাহ্মসমাজে ১৭৯৩ শকের ফাল্গুন মাসে প্রদত্ত ভাষণ : পুস্তিকাকারে প্রকাশিত : কলিকাতা, বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিংকর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত। ১৭৯৪ শক (১৮৭৩ খ্রী.)

১০. কড়ুয়া কণবী, গুজরাটে নামকরণ ভারতবর্ষীয় ইংরাজ, বোম্বাই রায়াৎ : সাধুগদ্যে লিখিত বোম্বাই অঞ্চলের আলোচনা : প্রথম প্রকাশ ১২৮৪ বংগাব্দের ভাদ্র থেকে ১২৮৫ অগ্রহায়ণ সাংখ্য ভারতী (১৮৭৭ খ্রী-১৮৭৮ খ্রী.)

১১. তুকারাম : জীবনী ও অভঙ্গের অনুবাদ : প্রথম প্রকাশ—১২৮৫ সালের বৈশাখ থেকে আষাঢ়. ভারতী (১৮৭৮ খ্রী.)

১২. বোম্বাইয়ের গানবাজনা, বোম্বাই সহর ইত্যাদি : বোম্বাই প্রসঙ্গে সরস আলোচনা : প্রথম প্রকাশ—১২৯২ আষাঢ় থেকে ফাল্গুন সংখ্যা 'বালক' পত্রিকা। (১৮৮৫ খ্রী. জুলাই থেকে ১৮৮৬ খ্রী. মার্চ)

১৩. বোম্বাই চিত্র : তুকারাম সহ বোম্বাই কাহিনীগুলির গ্রন্থাকারে প্রকাশ : ১২৯৫ সাল (২২শে মে ১৮৮৯ খ্রী.)

১৪. ছেলেবেলার কথা : শৈশব ও যৌবনস্মৃতি পারিবারিক খাতার পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত

ঐ প্রথম ধাপের লেখা : পাণ্ডুলিপি-পৃ. ৮৫, ৮৬ ৮৭, ৮৮।

ঐ দ্বিতীয় ধাপের লেখা : পাণ্ডুলিপি-পৃ. ৮৮, ৮৯।

ঐ তৃতীয় ধাপের লেখা : ঐ পৃ. ৮৯. ৯০।

১৫. বিবাহ ও একান্নবর্তী পরিবার— : সামাজিক : ঐ -পৃ. ৯০ ৯১।

১৬. নৃত্যপ্রিয়তা (তৎসহ তারক পালিতের মন্তব্য) : ঐ -পৃ. ১০৭, ১০৮।

১৭. চুম্বনরহস্য : স্নেহের অভিব্যক্তিতে জাপান ও এদেশের তুলনামূলক আলোচনা। (ভাষাপ্রায় চলিতধর্মী) : ঐ -পৃ. ১০৯

তৎসহ (রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য) : ঐ -পৃ. ১১০।

১৮. মেঘদূত : পদ্যানুবাদ : প্রথম প্রকাশ 'ভারতী ও বালক' ১২৯৮ বঙ্গাব্দ আষাঢ় পৃ. ১৭৩-১৭৭। শ্রাবণ পৃ. ২১০-২১৭ (পূর্বমেঘ)। ভাদ্র পৃ. ২২৩-২৭১ (উত্তরমেঘ)।

মেঘদূত : গ্রন্থাকারে প্রকাশিত : ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, ৩০ নবেম্বর, ১৮৯১ খ্রী.

১৯. অষ্টষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের ·· : ভাষণ : ১৯১৯ শক ফাল্গুন, তত্ত্ববোধিনী (১৮৯৮ খ্রী.)

২০. ভারতবর্ষীয় ধর্মবিকাশ : ঐ : ১৮২১ শক বৈশাখ, তত্ত্ববোধিনী (১৮৯৯)

২১. বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা : ১৮২১ শক পৌষ, তত্ত্ববোধিনী ১৮৯৯ খ্রী.)

২২. বৌদ্ধধর্ম (পুস্তিকা) ১৩০৭ সালের ১০ই ভাদ্র বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে বিশেষ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা। ১৯০০ খ্রী.।

২৩. বৌদ্ধধর্ম : গ্রন্থাকারে প্রকাশিত : ১ম সং ১৩০৮ সাল (২৭শে ডিসেম্বর ১৯০১)।

২৪. হাতেমতাই : এডুইন আরণল্ডের অনুদিত কবিতা : ১৩০৯, আষাঢ়, বঙ্গদর্শন নব পর্যায়ে প্রকাশিত (১৯০২)।

২৫. ইব্রাহিম ও অগ্নিউপাসক : সাদীর কবিতার অনুসরণে রচিত। ১৮২৪ শক পৌষ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে নামছাড়া প্রথম প্রকাশিত (১৯০২)।

২৬. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : পদ্যানুবাদ ও গদ্যে লিখিত উপক্রমণিকা : ১ম সংস্করণ ৪ পৌষ, ১৩১১ (১৭ জানুয়ারী, ১৯০৫)।

২৭. ওঁ নমস্তে সতে তে নমোনমঃ সত্যস্বরূপ : ব্রাহ্মস্তোত্রর বাংলা ছন্দানুবাদ : ১৮২৭ শক মাঘ, তত্ত্ববোধিনী (১৯০৬ খ্রী.)।

২৮. পরকালতত্ত্ব : আদি ব্রাহ্মসমাজে বুধবারের উপাসনায় আচার্যের ভাষণ : ১৮২৮ শক, বৈশাখ, তত্ত্ববোধিনী (১৯০৬)।

২৯. ব্রহ্মপূজা : ঐ ভাষণ : ১৮২৮ শক, জ্যৈষ্ঠ, তত্ত্ববোধিনী (১৯০৬)।

৩০. দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগৎ : আদিব্রাহ্মসমাজে আচার্যের ভাষণ : ১৮২৮ শক আষাঢ় তত্ত্ববোধিনী (১৯০৬)।

৩১. আত্মশক্তি : ঐ ভাষণ ১৮২৮ শক শ্রাবণ ঐ।

৩২. আত্মশক্তি : আদিব্রাহ্মসমাজে আচার্যের ভাষণ : ১৮২৮ শক ভাদ্র, তত্ত্ব-বোধিনী, ১৯০৬ খ্রী.।

৩৩. বৌদ্ধধর্মের মত ও বিশ্বাস : তৎপ্রণীত 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ অনুসরণে প্রদত্ত ভাষণ : ১৮২৮ শক, আশ্বিন ঐ।

৩৪. বৌদ্ধধর্মের মত ও বিশ্বাস : ঐ : ১৮২৮ শক, কার্ত্তিক, ঐ।

৩৫. জীবন—শারীরিক আধ্যাত্মিক : ঐ ভাষণ : ১৮২৮।

৩৬. গীতাতত্ত্ব : তৎপ্রণীত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসরণে প্রদত্ত ভাষণ : ১৮২৮ শক, অগ্রহায়ণ।

৩৭. গীতাতত্ত্ব : ঐ : ১৮২৮ শক, পৌষ।

৩৮. ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ : ঐ, ভাষণ : ১৮২৮ শক, পৌষ।

৩৯. জীবনের আদর্শ : ঐ, ভাষণ : ১৮২৮ শক, চৈত্র ১৯০৭ খ্রী.)

৪০. ধনলালসা : ঐ, ভাষণ : ১৮২৮ শক, চৈত্র ঐ ১৯০৭ খ্রী.)।

৪১. ঈশ্বরের উপাসনা : ঐ, ভাষণ : ১৮২৯ শক, বৈশাখ,।

৪২. অদৃশ্যম্ গ্রাহ্যং : ঐ ভাষণ : ১৮২৯ শক, আষাঢ়।

৪৩. শাস্ত্রালোচনা : ঐ, ভাষণ : ১৮২৯ শক, ঐ।

৪৪. নবরত্নমালা : অনূদিত কাব্য সংকলন গ্রন্থ : ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (২০শে জুলাই ১৯০৭ খ্রী.)।

৪৫. অপৌত্তলিক উপাসনা : আদি ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের ভাষণ : ১৮২৯ শক, শ্রাবণ, তত্ত্ববোধিনী (১৯০৭ খ্রী.)।

৪৬. ব্রাহ্মধর্মবীজ : ঐ : ১৮২৯ শক, ভাদ্র।

৪৭. গৃহে ব্রহ্মপূজা : ঐ : ১৮২৯ শক, ভাদ্র।

৪৮. অপৌত্তলিক উপাসনা : ঐ : ১৮২৯ শক, আশ্বিন।

৪৯. ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থ স্যাৎ : ঐ : ১৮২৯ শক, কার্তিক।

৫০. সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম : ঐ : ১৮১৯ শক, কার্তিক।

৫১. ধর্মজীবন : আদি ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের ভাষণ : ১৮২৯ শক কার্তিক, তত্ত্ববোধিনী, (১৯০৭ খ্রী.)।

৫২. অদৃশ্যম্ গ্রাহ্যং : ঐ : ১৮২৯ শক, অগ্রহায়ণ।

৫৩. শ্রেয় ও প্রেয় : ঐ : ১৮২৯ শক।

৫৪. ঈশ্বর প্রেম : ঐ : ১৮২৯ শক, পৌষ।

৫৫. বেদ উপনিষদ ও ব্রাহ্মধর্ম।

৫৬. আমাদের ধর্মের আদর্শ : ঐ : চৈত্র, (১৯০৮ খ্রী.)

৫৭. ভারতবর্ষীয় ইংরাজ : বোম্বাইচিত্র গ্রন্থ থেকে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত : ১৩২১ বঙ্গাব্দ, (১৫ই মার্চ ১৯০৮ খ্রী.)

৫৮. যোগতত্ত্ব : আদি ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের ভাষণ : ১৮৩০ শক, বৈশাখ, তত্ত্ববোধিনী।

৫৯. দুঃখরহস্য : ঐ : ১৮৩০ শক, জ্যৈষ্ঠ।

৬০. শিশু (কবিতা) : ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ, ভারতী।

৬১. ইন্দ্রিয়গণের বিবাদভঞ্জন : আদি ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের ভাষণ : ১৮৩০ শক, আষাঢ়, তত্ত্ববোধিনী।

৬২. ধনিয়া সুত্ত : মহীতীরবাসী গোপাল ক ধনিয়া ও বুদ্ধদেবের কথোপকথনের বঙ্গানুবাদ : ঐ শ্রাবণ।

৬৩. উপনিষদে আত্মজ্ঞান : আচার্যের ভাষণ : ঐ মাঘ (১৯০৯ খ্রী.)।

৬৪. মহর্ষি'র জন্মতিথি : ৩রা জ্যৈষ্ঠ মহর্ষি'র জন্মতিথি উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ : ১৮৩১ শক, আষাঢ়।

৬৫. মৃত্যুভয়-মৃত্যুঞ্জয় : আচার্যের ভাষণ : ১৮৩১ শক, ভাদ্র, সপ্তদশ কল্প, তৃতীয় ভাগ, ৭৯৩ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী।

৬৬. অন্তর্দুনের স্তব : নবরত্নমালা থেকে পুনর্মুদ্রিত : ১৮৩১ শক পৌষ তত্ত্ববোধিনী।

৬৭. রাঁচিযাত্রার পূর্বে বিদায়ী ভাষণ : আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত : ১৮৩২ শক. বৈশাখ, তত্ত্ববোধিনী (১৯২০ খ্রী.)।

৬৮. নববর্ষ : টেনিসনের Ring out the Old কবিতার অনুবাদ : ১৩১৮ বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকা (১৯১১ খ্রী.)।

৬৯. আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস : বোম্বাই চিত্র থেকে কিছু উপকরণ দিয়ে নতুন ভাবে বোম্বাইপ্রসঙ্গের আলোচনা : ভারতী থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়ে গ্রন্থাকারে মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়—১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে।

৭০. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২য় সংস্করণ) : পদ্যানুবাদ ও গদ্যে উপক্রমণিকা : ইন্দিরা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত-১৯২৩ এপ্রিল বালিগঞ্জ, নববর্ষ ১৩৩০।

৭১. বৌদ্ধধর্ম ২য় সংস্করণ : গদ্যগ্রন্থ : ১৩৩০ সাল, প্রকাশক প্রমথ চৌধুরীর লিখিত মুখপত্রের তারিখ ১।৬।২৩।

৭২. নববর্ষ : বর্ষবরণের ভাষণ : ১৯৬৪ শক জ্যৈষ্ঠ, তত্ত্ববোধিনী (১৯২৪ খ্রী.)।

৭৩. নবরত্নমালা (২য় সংস্করণ) : প্রিয়ম্বদা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩১, বঙ্গাব্দ ৪ঠা মাঘ, ইং ১৯২৫ জানুয়ারী।

৭৪. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাবে : তত্ত্ববোধিনী। মাঘ, ১৮৬৪ শক, ইং ১৯২৫।

৭৫. আমার বাল্যকথা : নববর্ষের সংস্করণ, বৈতানিক প্রকাশনী ১৯৬৭ খ্রী.।

English Writings

1. An Address on the Occasion of the Inaugural Ceremony of the Brahma Mandir Hyderabed, Sind : Pamphlet : Sunday 19th Sept., 1875. Received Reader-Printer copy from India Office Library and Records. London.
2. Sermons of Maharshi Debendranath Tagore : Translated from *Brahmo Dharmer Vyakhyan* by Debendranath Tagore ; first published in *Tattwa bodhini*, Phalgun Saka 1804. (1833 A.D.).
3. Raja Rammohan Roy : (Pamphlet) An address delivered at the City College Hall Calcutta : 27th Sept., 1889.
4. Autobiographicai Notes and Reminiscences : August 1897 (The pamphlet is nowhere available. It is only referred to and its quotations are given in (1) articles of Jnanendramohan Das-*Europe Prabasi Bengali* (*Prabasi*, Kartik, 1311 B. S. and (2) his book-*Banger Bahire-Bangali* part III, p. 235).
5. Sermons of Maharshi Debendranath Tagore : Published in *Tattwabohini* March, Saka 1821 to Chaitra Saka 1895 (1900-1904 A. D.)
   (Republished possibly after correction by S. N. Tagore as is found manuscript no. 381 preserved in Rabindra Bhavan, Santiniketan.
6. The God of the Upanishads : Translation from Rabindranath's *Aupanishad Brahma* by S. N. Tagore as guessed by Prabhatkumar Mukhopadhyaya, *vide Rabindra-Jibani*, Part IV, p. 314 : *Tattwabodhini* Poush, Saka 1823 to Magh. Saka 1824 (1924-1203 A. D.)

7. Presidential Address : Theistic conference, Surat : 1907 A.D.
8. Autobiograraphy of Maharshi Debendranath Tagore : Translation of the Autobiography of Debendranath Tagore in Bengali in Collaboration with Indira Devi : First edition Published by S. K. Lahiri, Calcutta in 1909. Second edition Published by Macmillan & Co London, in 1914.
9. Prayers in English from the Book of *Vyakhyan* : Published in different issues of *Tattwabodhini*, during the Sakas 1880, 81 etc.

গুজরাটী উপদেশমালা

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

'সুবোধ' পত্রিকার সম্পাদক, দ্বারকাগোবিন্দ বৈদ্য রচিত, মারাঠী 'প্রার্থনা-সমাজাচা-ইতিহাস' গ্রন্থে মুদ্রিত, পৃ. ৩০৩

মূর্তিপূজানী জরূর শী ছে? ঈশ্বরনী জ্ঞানশক্তিনো প্রকাশ শুঁ আ জগতমা নথী? সূর্য রোজ পূর্ব দিশাথী উঠীতে তেনো মহিমা গাঁতা গাঁতা নিয়মিত কালে পশ্চিমদিশিমা অস্ত থায়েছে; চন্দ্রমা পোতানা রশ্মিথী; জগতনে রঞ্জন করেছে, ত্যারে তেনুঁ সৌন্দর্যপ্রকাশ পামেছে। দূর জোওয়ানী জরূর নথী। আপনা শরীরনী রচনা উপরথী বিচার করিয়ে তো তেমাঁ কেত্তয়ুঁ আশ্চর্য কৌশল্য জোওআমাঁ আওয়েছে? সুন্দর কঠিন এক ভাগনো বীজা ভাগ সাথে কেওয় আশ্চর্যকারক সংবংধ! অপণা নেত্রনো রচনা জোইয়ে তো তেমাঁ কেওয়ুঁ বিচিত্র কৌশল্য মালুম পড়েছে! তেনা উপর অজওয়ালুঁ পড়েছে, তেনী সাথে জগতনী ছবী তে উপর প্রকট থ্যায়েছে, অনে আপন, রূপ দেখাডেছে; চক্ষু জে কোমল পদার্থ তেনে কোঈ রীতে হরকত না পোঁচে তেনে ওয়াস্তে ঢাঁকওয়ানে পাঁপণ তথা কেশপংক্তি তেনা উপর রাখেলী ছে, জ্যারে আপণ নিদ্রা করিয়ে ত্যারে তে (ঢাঁকমাঁ) তেম উপর আওয়ীনে রক্ষণ করেছে। তে নিদ্রানী অসহায় অবস্থামাঁ তে ঈশ্বরজ আপণুঁ রক্ষণ করেছে অনে পছী আপণে জাগ্রত থয়িনে জ্যারে তেনা প্রসাদনুঁ স্মরণ করিয়েছিয়ে, জেনী কৃপাথী আপণা শীরনে বধুঁ আপ্যুঁ, তেনা সারে হাথ জোড়ীনে কৃতজ্ঞতা-পূর্বক নমস্কার করিয়ে ত্যারেজ তেনী খরী উপাসনা থায়ছে। এওয়ী রীতে জগতনী প্রত্যেক ঘটনামাঁ ঈশ্বরনী জ্ঞানশক্তি অনে মংগলভাব প্রত্যক্ষ জোওয়ামাঁ আওয়েছে। এওয়া ঈশ্বরনা স্মরণনে ওয়াস্তে মূর্তীনী শী জরূর ছে? জ্যাঁ জ্যাঁ নজর করিয়ে ত্যাঁ তেনা হস্তক্ষর জোওয়ামাঁ আওয়েছে।

গুজরাটি শব্দের বংগার্থ—শুঁ=কি, 'ঈশ্বরনী'='আ'=এই, জগতমা=জগতে, নথী=নয়, উঠীনে=জেগে, থী=দ্বারা, পোতানা=নিজের,

ত্যারে = তখন, তেনুঁ = তাঁর। পামেছে = পায়, তেনো = তাহার। অজওয়ালুঁ = আলো। তেমাঁ = তারমধ্যে। কেওয়ু = কিরকম সংবংধং = সম্বন্ধ। ভাগনো = অংশ, বীজা = আর একটি ভাগ, আপণা = আমাদের, শরীরনী = শরীরের, হরকত = ক্ষতি, অসুবিধা, ঢাকওয়ানে = ঢাকার জন্য, পাঁপণ = পল্লব, জরুর = প্রয়োজন। মুর্তীনী = মূর্তির। জোওয়ামাঁ আওয়েছে = দেখা যায়।

জাতীয় গ্রন্থাগারের গুজরাটী বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ, শ্রীখুশালদাস জাসানীর সৌজন্যে বংগার্থ ও সেণ্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীর অ্যাসিস্‌টেণ্ট এডিটর এস. বি. যোশীর নির্দেশে জাতীয় গ্রন্থাগারে মারাঠী বিভাগে অনুসন্ধানে প্রাসংগিক গ্রন্থটি প্রাপ্ত।

পরিশিষ্ট ১২

জয়শ্রী সেন (ঠাকুর) কে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্র

রঙিন পোস্টকার্ড

জয়ুরানী

তোমার জন্মদিনের উপলক্ষে ২ পাউণ্ড পাঠাচ্ছি। তোমার যা ভাল লাগে কিনে নিয়ো। আমার শরীর তত ভাল নেই। পরে বড় চিঠি লিখব। তুমি কেমন আছো লিখো।

দাদামশাই—

To		Bristol
Miss Jaya Tagore		at Parklands
Duncan House	REDIRECTED TO	Woolacombe
Bristol		N. Devon
		945 A. M. 3rd Sept

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা, সত্যেন্দ্রনাথের পৌত্রী জয়শ্রী ঠাকুর (জয়া) ; ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭) তারিখে কুমুদনাথ সেন ও স্নেহলতা সেন-এর পুত্র কুলপ্রসাদ সেন-এর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ব্রিস্টলের কাছে ক্লিফটনে 'ডানকান-হাউস'-এ জয়শ্রী সেন পড়তে গিয়েছিলেন ; ঐ সময় এই চিঠিখানি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন। ১৯০৮ খ্রী. জয়শ্রী সেন-এর জন্ম। সুতরাং এই পত্রটি যখন তিনি পেয়েছেন সে সময় তিনি বারো বছরের কিশোরী।

পৌত্রীর প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহের পরিচয় পত্রটিতে সুস্পষ্ট। 'ডানকান হাউস' স্কুল থেকে ছুটির সময় হেড মিস্ট্রেস মিস্ উইল্সনের সঙ্গে প্রায়ই তিনি বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যেতেন। সেজন্যই এই পত্রটি 'ডানকান-হাউস' এর ঠিকানা কেটে দিয়ে Woolacombe-এর ঠিকানায় redirected করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয়কুমার দত্ত : ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় : ১ম ভাগ, ২য় সং, ১৮৮৮।

অখিলচন্দ্র পালিত : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ) : ৭৩নং মাণিকতলা স্ট্রীটে এলম্ প্রেস যন্ত্রে শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত, ১৯০৮ খ্রী.।

(স্বর্গীয় সাধু) অঘোরনাথ প্রণীত। : শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব : প্রকাশক : শ্রীরাম সর্বস্ব ভট্টাচার্য, তদনুগ বন্ধু কর্তৃক সম্পাদিত। (তদনুগ বন্ধু : উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা, ১৮০৪ শক। শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঐ ১৮০৭ শক। ঐ-তৃতীয় সংস্করণ : ১৮২৫ শক।

ঐ : শাক্যমুনি চরিত ও পরিশিষ্ট : ১৮০৫ শক। শাক্যমুনি চরিত ও পরিশিষ্ট দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় সংস্করণ ১৮২৬ শক।

অঘোরনাথ ভট্টাচার্য : শ্লোকমালা, ১ম সং, খড়দহ, ১৩২৯।

অজিতকুমার চক্রবর্তী : ব্রহ্মবিদ্যালয়।

(ডা:) অন্নদাচরণ খাস্তগীর : শরীররক্ষণ, ১৮৮২ খ্রী.।

ঐ : আয়ুর্বর্দ্ধন, প্রথম ভাগ, নব সং, ১৮৮২ খ্রী.।

অবনীন্দ্রনাথ : আপন কথা : সিগনেট প্রেস, ২য় সং, বৈশাখ, ১৩৭০।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাণী চন্দ : ঘরোয়া, বিশ্বভারতী, ভূমিকার তারিখ, জন্মাষ্টমী, ১৮৪৮।

অবনীন্দ্র ঠাকুর, রাণী চন্দ : জোড়াসাঁকোর ধারে, বিশ্বভারতী, ১৩৫১। পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৩৫৪।

অশ্রু কোলে : রাজনারায়ণ বসু—জীবন ও সাহিত্য, জিজ্ঞাসা।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি.। দ্বিতীয় সং ১৩৭৫।

অসিত হালদার : রবিতীর্থে। কলিকাতা, পাইওনীয়ার বুক কোং, ১৩৬৫।

আকসির হেদায়েৎ : নীতিমালা, (উর্দু) (বাংলাগদ্যে অনূদিত), আখ্যাপত্র ছিন্ন থাকায় প্রকাশকাল ও অনুবাদকের নাম জানা যায় নি।

(ডঃ) আশা দাস : বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ক্যালকাটা বুক হাউস।

ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী : পুরাতনী, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোয়িয়েটেড্ পাবলিসিং কোং, ১৮৭৯ শকাব্দ।

ঐ : রবীন্দ্রস্মৃতি : বিশ্বভারতী, ১৯৬২। প্রথমপ্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭।

ঈশানচন্দ্র বসু : নীতি কবিতাবলী, ১৮০২ শক।

ঐ : শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৯০২ খ্রী.।

(শ্রীমৎ) উদ্ভটাচার্য প্রণীত : কাব্যালংকার সারসংগ্রহ Ed. by Narayan Dass Banhatti, Published by V. S. Paranjpye First Ed., 1925.

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : সংগীত কোষ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ১৩০৬ সাল।

কানাই সামন্ত : রবীন্দ্র প্রতিভা, ১৩৬৮ সাল।

কালিদাস রায় : বংগসাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড ১ম সং, প্র: রামপ্রসাদ মিত্র, বৈশাখ, ১৩৫৬। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। (মহারাজা) কালীকৃষ্ণ বাহাদুরেণ বিরচিত, নীতি সংকলন, ১৭৫৩ শকাব্দ, ১৮৩১ খ্রী.।

কালীচন্দ্র লাহিড়ী : কবিতানন্দ লহরী, পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের উদ্যোগে রচিত।

কাশীনাথ পাণ্ডুরংগপরব সম্পাদিত : সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ 5th Ed., 1911, Bombay published by Tukaram Jayaji. 6th Ed., 1929 Bomby, Published by Pandurang Gawaji.

কিশোরীচাঁদ মিত্র : দ্বারকানাথ ঠাকুর। অনুবাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। সম্পাদনা কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, সম্বোধি পাবলিকেশানস, ১৩৬৯।

কিশোরীমোহন সেন : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ) : ২১নং বৈঠকখানা রোড়। পোষ্ট ডিস্প্যাচ প্রেসে মুদ্রিত। ১২৯১।

কুমারনাথ সুধাকর (মুখোপাধ্যায়) : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : প্র: গুরুনন্দন ও গোপালদাস মুখোপাধ্যায়, আনন্দআশ্রম, বর্ধমান। ১৪শ-সং।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : পুরাতন প্রসংগ (বিপিনবিহারী গুপ্ত অনুলিখিত) : ভূমিকার তারিখ ৬ই শ্রাবণ, ১৩২০।

ঐ : কুমারসম্ভব (গদ্যানুবাদ) : সন ১২৮২ সাল।

কৃষ্ণকুমার মিত্র : বুদ্ধদেব চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষেপ বিবরণ। পটলডাঙ্গা, ৪৫নং বেনেটোলা লেন, সাম্যযন্ত্রে মুদ্রিত। ২য় সং, ১২৯৪ সাল।

ঐ : বুদ্ধদেব চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : চতুর্থ সংস্করণ, ১৩০৬।

ঐ : আত্মচরিত, লেখকের কনিষ্ঠা কন্যা বাসন্তী চক্রবর্তী অনুলিখিত। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৩৭।

কৃষ্ণবিহারী সেন : অশোক চরিত, কৃষ্ণ হাউস, ৩য় সং, ১৯১০।

কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস, বি. এল : মেঘদূত (বঙ্গ কবিতানুবাদ), ৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, সাম্যযন্ত্রে মুদ্রিত ১৮৯৯ সাল।

ক্ষিতিনাথ ঘোষ : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ), প্রথম প্রকাশ—১৯২৯। রাজ সংস্করণ-১৩৫৯ : ১৯৫২। কমলা বুক ডিপো, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট।

ক্ষেত্র গুপ্ত : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ৩য় সং, ১৩৭৩। গ্রন্থনিলয়।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র : আমাদের দেশ তিব্বতে।

গিরিশ-রচনাবলী ২য় খণ্ড : ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ ১৯৭১।

৺গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত : ছন্দোমঞ্জরী (শ্রীমদ্‌গঙ্গাদাস বিরচিত) : পুত্র শ্রীরামপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত, ১৯৭৪।

গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন সম্পাদিত : সুনীতিসার, দাসগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং কলিকাতা।

(উপাধ্যায়) গৌরগোবিন্দ রায় : বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গ, নববিধান পাবলিকেশন কমিটি। সম্পাদকের নিবেদনের তারিখ—১৯শে নভেম্বর ১৯৫৮।

(উপাধ্যায়) গৌরগোবিন্দ রায় : আচার্য কেশবচন্দ্র, শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৯৩৮ খ্রী. ১৮৬০ শক।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার : কবিতামৃত কূপ ; স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮২৬।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য : নীতিরত্ন, (আখ্যাপত্র ছিন্ন)।

চন্দ্রমোহন তর্করত্ন ভট্টাচার্য সংকলিত : উদ্ভট চন্দ্রিকা, প্রথম ভাগ : কলিকাতা, ১৯৮০ খ্রী.। ঐ ২য় সংস্করণ, ১৮৯৯। ঐ দ্বিতীয় ভাগ : ১ম সং, ১৮৯৫। কলিকাতা গুরু প্রেস মুদ্রিত।

চরক সংহিতা, ১ম ভাগ শ্রীসতীশচন্দ্র সেনশর্মা সংকলিত ও অনুদিত। ৫ই পৌষ, ১৩১১ সাল।

চারুচন্দ্র বসু : ধম্মপদ (অনুবাদ), ১৯০৪।

চার্লস্ ফ্রীয়ার অ্যাণ্ডরুজ : বড়দাদা ; অনুবাদ প্রণতি মুখোপাধ্যায়। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, ১৩৭৮।

চিত্তরঞ্জন পাণ্ডা : ঠাকুর বাড়ী, ইণ্ডিয়ানা, কলিকাতা-১২।

চিত্রিতা দেবী : উপনিষদ পঞ্চক, স্নাতকোত্তর গবেষণা বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

চিরশ্রী বিশী : রবীন্দ্র গদ্যভাষার বিবর্তন (১৮৮৭ খ্রী. হইতে ১৯০০ খ্রী.)। (টাইপ করা গবেষণা গ্রন্থ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী)।

চুনীলাল বসু : শরীর স্বাস্থ্যবিধান, ১৯১৩।

জগদীশ্বর গুপ্ত : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ), বাগেরহাট, আষাঢ়, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।

(স্বামী) জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত : শ্রীমদ্ভাগবগীতা (স্বামী) জগদানন্দ সম্পাদিত উদ্বোধন কার্যালয়, নবম সং, কার্তিক, ১৩৭১।

জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যারত্ন : চাণক্য শ্লোক, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সংকলিত) : কাব্যসংগ্রহ, ১৮৮৮ খ্রী.।

জেম্স্ লঙ্ কর্তৃক সংগৃহীত (পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সহায়তায়) : প্রবাদ মালা, ১৮৭২ খ্রী.।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন সম্পাদিত : চাণক্য শ্লোক, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী : ১৯৩১ খ্রী.।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : পুরুবিক্রম : ১৮৭৫ খ্রী.।

ঐ : সরোজিনী : ১৮৭৯ খ্রী.।

ঐ : প্রবন্ধ মঞ্জুরী : ১৩১২ সাল।

ঐ : গ্রন্থাবলী : বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ : কিঞ্চিৎ জলযোগ, বিশ্বভারতী।

তারাকান্ত কাব্যতীর্থ অনুদিত : পঞ্চতন্ত্র ১ম সংস্করণ, ১৩১২ সাল। ১৯০৫ খ্রী.।

তারাকুমার : চাণক্য, ১১৯, ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড, সংবৎ ১৯৪৫।

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় : সাধু তুকারামের জীবনচরিত : আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩০৩ সাল।

দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত : বাঙ্গালীর গান, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো মেশিন প্রেসে শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১২।

দে ব্রাদার্স কর্তৃক অনুদিত : শ্রীমদ্ভাগবদগীতা : ১৩০৮ বাং।

দেবকুমার রায়চৌধুরী : দ্বিজেন্দ্রলাল।

দেবীপদ ভট্টাচার্য : উপন্যাসের কথা, সুপ্রকাশ প্রা. লি. ১৯৬১।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, ৪র্থ সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬২।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। প্রথম প্রকাশ ২৬শে বৈশাখ, ১২৭১। পুনর্মুদ্রণ ১১ই মাঘ, ১৩৬০।

(মহর্ষি) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচারিত : একেশ্বরবাদ সম্মত অনুষ্ঠান পদ্ধতি। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বৈশাখ, ১৮০৯ শক । ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮৮

দেবেন্দ্রবিজয় বসু : শ্রীমদ্ভগবদগীতা (পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা), কলিকাতা। ১৩২০ সাল।

দ্বারকাগোবিন্দ বৈদ্য : প্রার্থনা-সমাজ-চা-ইতিহাস (মারাঠী গ্রন্থ) জাতীয় গ্রন্থাগারে শ্রী এস্. বি. যোশী কথিত ইংরেজি সংক্ষিপ্তসার।

ঐ : সংসার ও ধর্মসাধনা, সম্পাদক বি. বি. কেশকর।

দ্বারাকানাথ চট্টোপাধ্যায় : ঘরের মানুষ গগনেন্দ্রনাথ, টেগোর রিসার্চ ইন-স্টিটিউট, ১৯৬৭।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ : নীতিসার (গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা), ১২৮৪ বঙ্গাব্দ।

ঐ : সুবুদ্ধি ব্যবহার (লর্ড বেকনের এ্যাডভান্সমেণ্ট অব লার্নিং অবলম্বনে) ১২৬৭ বঙ্গাব্দ।

দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ), ২য় সং, আশ্বিন, ১৩৩৮ সাল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ), ১৮৬০ খ্রী.।

ঐ : গীতাপাঠ, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা, ১৯৭৩।

ঐ : কাব্যমালা, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, শান্তিনিকেতনে প্রেসে জগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত, ১৩২৭।

ঐ : প্রবন্ধমালা, প্রকাশক দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন প্রেসে জগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত, ১৩৭২।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : নানাচিন্তা, শান্তিনিকেতন প্রেসে জগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত। প্রথম সংস্করণ, ১৩২৭।

ঐ : পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম : আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৩০৫।

নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত : বিশ্বকোষ, ৮ম ভাগ।

নগেন্দ্রনাথ সোম : মধুস্মৃতি, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। ২য় সংস্করণ ১৩৬১।

নবীনচন্দ্র সেন : আমার জীবন ১ম ভাগ, সান্যাল এণ্ড কোং, ১৩১৪।

ঐ : গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড. হিতবাদী সং, শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার. ১৩১১।

ঐ : ৪র্থ ভাগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

ঐ : অমিতাভ, ১৮৯৫ খ্রী.।

নরেন্দ্র দেব : মেঘদূত (সচিত্র পদ্যানুবাদ), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৪৮।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : বাণী বারকরী, প্র: আভা গঙ্গোপাধ্যায়, আষাঢ়, ১৩৮৩।

নীলমণি বিদ্যালংকার ভট্টাচার্য সংকলিত : উদ্ভট কবিতা কৌমুদী, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, সন ১২৯৭।

নীলমণি শর্ম (হালদার) সংগৃহীত : কবিতা রত্নাকর, ২য় সং, J. C. M. কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদসহ, March 1930, Serampore. তৃতীয় বার মুদ্রিত, ১২৭৯।

পঞ্চানন শিরোরত্ন সংগৃহীত : নীতি-শতকম্, জি, পি, রায় অ্যাণ্ড কোং, ১২৯৫।

পল্লব সেনগুপ্ত : ডিরোজিও : কবি ও প্রাবন্ধিক, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৬৯ খ্রী.।

পশুপতি শাসমল : স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য (গবেষণা-মালা গ্রন্থ) বিশ্বভারতী প্রকাশিত।

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য : মেঘদূত পরিচয় : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২য় পরিবর্ধিত সং, ১৩৭৬।

পাঁচকড়ি ঘোষ : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ) : খিদিরপুর, ১৩২৫।

পূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উদ্ভট-সাগর : উদ্ভট সমুদ্র : ভদ্রকালী, ১৩২৯। উদ্ভট সাগর (সংস্কৃত) : চতুর্থাবৃত্তি, ১৮৫১ শক। সংকলিত : ঐ (নাগরী) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবাহ : ১৮৩৯ শকাব্দ। উদ্ভট শ্লোকমালা-১ম সং : ১৯০৪। ২য় সং : প্র: শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ১২৪৪ বঙ্গাব্দ, ১৯৩৭ খ্রী.। চাণক্য শ্লোক-১ম সং : ১৯২৪। ২য় সং : ১৯২৫।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ) : ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৩৭।

প্রফুল্লকুমার দাস : রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা গ্রন্থমালা, ১ম খণ্ড : সুরংগমা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৯। (১৯৭২)।

প্রফুল্লকুমার সরকার : জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীগৌরাংগ প্রেস প্রা: লি:, কালকাতা-৯। তৃতীয় সং, শ্রাবণ, ১৩৬৭।

প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বুদ্ধবাণী (কাব্যানুবাদ—লাইট অব এশিয়ার অষ্টম অধ্যায় অবলম্বনে) : ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, বিশ্বভারতী।

ঐ : রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী : জিজ্ঞাসা। প্রথম সং. পৌষ, ১৩৬৯।

ঐ : শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী, ১ম খণ্ড : বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লি:, কলিকাতা-৬, ২৭ জুলাই, ১৯৬২।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনকথা। (রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থ-মালা) : ভাদ্র ১৩৬৬ : ১৮৮১ শকাব্দ। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ : ১৯৫৯ সালে প্রদত্ত লীলা বক্তৃতা মালা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঐ : গীতবিতান-কালানুক্রমিক সূচী, ১ম খণ্ড : বোলপুর, শান্তিনিকেতন, উদয়ন প্রেস, পরিবর্ধিত ২য় সং, ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০।

প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধ সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) : বিশ্বভারতী, ১৯৬১।

ঐ : রবীন্দ্রনাথ (শ্রীরণজিৎকুমার সেন সম্পাদিত) : বার্তিক প্রকাশন, কলিকাতা, ভূমিকার সাল ১৯৪২।

ঐ : আত্মকথা : দি বুক এমপোরিয়াম লি:। ১৩৫৩।

প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রবিচিত্রা। কলিকাতা ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৩৬১।
বাংলার লেখক : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়-১৩৫৭।
প্রসাদদাস মল্লিক সম্পাদিত : আয়ুর্বেদসম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা : বড় বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্যসমাজপ্রদত্ত পুরস্কারপ্রাপ্ত কতিপয় নিবন্ধ। ১২৮৩ বঙ্গাব্দ।
প্রাণনাথ পণ্ডিত : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ) : কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিংকর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত। বঙ্গাব্দ-১২৭৯।
প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কৃষ্ণচরিত্র সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
ঐ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সাহিত্য পরিষদ প্রকাশন।
বরদাচরণ মিত্র M. A. C. S. : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ), প্রঃ এস. কে. লাহিড়ী, ৫৪ কলেজ স্ট্রীট, মুদ্রণ বেচুলাল গুপ্ত, এলেম প্রেস, ২৯ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা। ১২৯৯।
বল্লভদেব : সুভাষিতবলিঃ। Ed. Peter Peterson B. A. of Balliol College, Bombay. 1886 A. D.
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। শিশির পাবলিশিং হাউস।
বাণী রায় : মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা।
বাগেশ্বর বিদ্যালংকার অনূদিত : বৈরাগ্যশতক, শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং। কলিকাতা। ১৭৮৭ শক।
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা।
বিপিনচন্দ্র পাল : নবযুগের বাংলা, যুগযাত্রী প্রকাশক লিঃ। বৈশাখ ১৩৬২।
বিশ্বনাথ কবিরাজ : সাহিত্যদর্পণ: বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা, ডঃ বিমলকান্ত মুখোপাধ্যায়, পুস্তকশ্রী।
বিশ্বনাথ মিত্র : দ্রব্যগুণদর্পণ। (নারায়ণ কবিরাজ রচিত সংস্কৃত 'রাজবল্লভ' নামক গ্রন্থের অনুসরণে) : প্রঃ অক্ষয়কুমার রায় এণ্ড কোং, কলিঃ ১২৯৭।
বিষ্ণু শর্মা : হিতোপদেশ, (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংকলিত) ৪র্থ সং, ১৮৮৫। হিতোপদেশ। (তারাকুমার কবিরত্নেন) : সংবৎ ১২৪৫। ১৮৮৮ খ্রী.। জে. এন. ব্যানার্জি এণ্ড সন্স।

ঐ : পঞ্চতন্ত্র। (পণ্ডিত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ অনূদিত) : ১ম সং, ১৩১২ সাল।

বুদ্ধদেব বসু : কালিদাসের মেঘদূত ; এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। আশ্বিন, ১৩৬৪। সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭।

ব্রজগোপাল নিয়োগী : মহাপরিনির্বাণ সূত্র (অনুবাদ) ১৯০১।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৬৭নং, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ঐ ৩য় খণ্ড : ঐ।

ঐ : পরিষৎ-পরিচয় (১৩০০-১৩৫৬)।

ভুবনচাঁদ দত্ত : বোধিচাণক্যং। ১৮৮৮।

মণি বাগচী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

মণি বাগচী : রমেশচন্দ্র দত্ত ; জিজ্ঞাসা, ১৩৬২।

মদনমোহন কুমার : বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ইতিহাস-১ম পর্ব, ১৩০০-১৩০১।

মদনমোহন ঘোষ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩০৬।

মধু বসু : আমার জীবন, বাক্‌সাহিত্য, কলিকাতা ; বৈশাখ, ১৩৭৪।

মন্মথনাথ ঘোষ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

মল্লিনাথ : মেঘদূত (কাব্যানুবাদ) : অশোক পুস্তকালয়।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী : গীতাধ্যান-১ম খণ্ড।

মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা কৃষ্ণার্জুন সংবাদ। ১৩০২ সাল।

মহেন্দ্রনাথ রায় : বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত। খানাকুল কৃষ্ণনগর। ১২৯২।

মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : মেঘদূত কৌমুদী : ছাত্র পুস্তকালয় ১ম সং-১৩৪৫।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের : চতুর্দশপদী কবিতাবলী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট।

মাতঙ্গীচরণ গোস্বামী সংকলিত : উদ্ভট শ্লোকমালা। কলিকাতা, ১৮১৪ শক।

মৈত্রেয়ী দেবী : মংপুতে রবীন্দ্রনাথ।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী : গীতাবোধ। অনুবাদক-শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডি, এম, লাইব্রেরী। ২য় সং, ১৯৬০।

যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ)। প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

যোগীন্দ্রনাথ বসু : মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত ; সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী, বঙ্গাব্দ ১৩০০।

ঐ : তুকারামচরিত : ১৩০৮ সাল।

যোগীন্দ্রনাথ বসু : কবিতাপ্রসঙ্গ, তৃতীয় ভাগ : ১৩২৮ সাল।

যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার : মেঘদূত (মন্দাক্রান্তা ছন্দে অনূদিত) অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত : ১৩২৮ সাল। জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ৮এ, কলেজ রো, দোলপূর্ণিমা, ১৩৭৫ সন।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বঙ্গের মহিলা কবি। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং ১৩৬০।

যোগেশচন্দ্র বাগল : হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত।

ঐ : মুক্তির সন্ধানে ভারত, অশোক পুস্তকালয়, তৃতীয় সং, ১৩৬৭।

ঐ : বেথুন সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৭।

যোহন হেবরলিন সমাহৃত : কাব্য সংগ্রহ ; চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। শ্রীরামপুর, ১৮৪৭।

রঘুনাথ সুকুল : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ) : এন্. ব্যানার্জি এণ্ড সন্স, ১১৯ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড। প্রথম প্রকাশ ১৮৯৭ খ্রী.।

রঙ্গলাল : রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী : ১১৫। ৪নং গ্রে স্ট্রীট, বসুমতী ইলেকট্রিক মেসিন যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৩১৮ সাল।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পিতৃস্মৃতি। জিজ্ঞাসা, ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ সাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : (অখণ্ড) গীতবিতান, ১৩৭১।

ঐ : প্রাচীন সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪১।

ঐ : জীবনস্মৃতি। প্রথম প্রকাশ : ১৩১৯। পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ, ১৩৮৫ সাল।

ঐ : চিঠিপত্র, ১ম, ৫ম ও ৮ম খণ্ড ; বিশ্বভারতী।

ঐ : পথের সঞ্চয় ; ঐ, ১৩৫৪ সং।

ঐ : ছেলেবেলা ; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭।

ঐ : রাজা ও রানী ; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ১৯৭১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছন্দ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ৩য় সং, ১ম খণ্ড, জানুয়ারী, ১৯৭৬ : মাঘ ১৩৮২।

ঐ : য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি।

ঐ : রূপান্তর। (পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত) বিশ্বভারতী, ১৩৭২ ; ১৯৬৫।

ঐ : কথা-রবীন্দ্ররচনাবলী, ৭ম খণ্ড : বিশ্বভারতী।

ঐ : য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র : ঐ, ১৯৬১।

রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি, ২য় খণ্ড : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, মাঘ, ১৩৫৯ সাল।

রমেশ রচনাবলী, ২য় খণ্ড (ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত) : ইউনাইটেড্ পাবলিশার্স। ১৯৭৫।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ) : সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী, ১৪৮, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট। ২৫শে কার্তিক, ১২৮৯ সাল।

রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত। ৩য় সং, (রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্রী কুমুদিনী মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত মূল পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত) ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, ১৩৫৯।

ঐ : সেকাল আর এ কাল। প্রথম পরিষৎ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৫৮, বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৮৭৪ খ্রী. প্রথম প্রকাশিত।

ঐ : হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত। সম্পাদক-দেবীপদ ভট্টাচার্য। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৬৩।

রাধেশচন্দ্র শেঠ বি. এল. : গীতা কৌমুদী অনুবাদ ; সন ১৩০৩ সাল।

(ডঃ) রামদাস সেন : বুদ্ধদেব তাঁহার জীবনী ও ধর্মনীতি : পুত্র মণিময় সেনের উদ্যোগে হরলাল রায় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮৯১।

(পণ্ডিত) রামপদ ভট্টাচার্য : চাণক্য শ্লোক : রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২ ক্যানিং স্ট্রীট।

(পণ্ডিত শ্রী) রাম শাস্ত্রী সম্পাদিত বৃদ্ধ চাণক্যঃ : নটবর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৩২ বাং।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : চরিতকথা। কলিকাতা, দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং। ১৩৬৫।

রাণী ঘোষ (পাল্লিত) : সেক্সপীয়রের বাংলা অনুবাদ সমূহের বিশ্লেষণাত্মক বিচার ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

লালমোহন গুহ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ : মেঘদূত (সাধু গদ্যে অনূদিত); কলিকাতা, ৪ঠা ভাদ্র, ১২৫৭ সাল।

(জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ) শংকরাচার্য : মণিরত্নমালা। (সুরেন্দ্রমোহন মজুমদার কর্তৃক অনূদিত) : সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৩২ সাল।

শম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায় : চাণক্যনীতি চয়ন : নূতন সং, ১৩২৬।

(রায়শ্রী) শরৎচন্দ্র দাস অনূদিত : মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা। : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৩১৯।

(শ্রী) শরবিন্দু অনূদিত : চিদানন্দা ভগবদ্গীতা : হিতৈষী প্রেস, বরিশাল, ১৩০৪।

শশধর রায় অনূদিত : উপনিষদ গ্রন্থাবলী ; ১৩১২ সাল।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের একদিক : প্রাপ্তিস্থান শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ১৩৫১। স্বপ্রকাশিত।

(ডঃ) শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটী সম্পাদিত : নবীন রচনাবলী, ২য় খণ্ড : দত্তচৌধুরী এ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ-১৩৮৩।

শার্ঙ্গধর পদ্ধতি Edited by Peter Peterson, Bombay, 1888.

শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : নিউ এজ্‌ সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬২।

ঐ : আত্মচরিত : দিলীপকুমার দত্ত। সিগনেট প্রেস। ১৩৫৯

(ডঃ) শিশিরকুমার মিত্র (বন্ধুকর্তৃক বাংলায় অনূদিত) : রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১লা বৈশাখ, ১৩৭৬।

শৈবলিনী দেবী : গীতাকাব্য : পুরুলিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৩৫৫।

শ্যামাচরণ কবিরত্নেন : নীতিপাঠম্‌ (নাগরী); ২৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, ১৮৯৪ খ্রী.।

শ্রীনাথ গুপ্ত : নীতিরত্নাকর (গদ্যে), ২২নং আমহার্স্ট স্ট্রীট, ১২৭৫ বাং।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : বুদ্ধদেব অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবনচরিত ও উপদেশ ১৩১১ সাল।

সতীশচন্দ্র মিত্র : ধর্মপদ (পদ্যানুবাদ) : The Student Library. ১৯০৫ খ্রী.।

সতীশচন্দ্র রায়, এম. এ : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ) ; ১৭নং মদন মিত্র লেন বেংগল প্রেস রমনীমোহন দে দ্বারা মুদ্রিত।

সতীশচন্দ্র সেন : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ) ; সাথীপ্রেস. ২১।১ পটুয়াটোলা লেন, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ১৩১৪ বংগাব্দ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত : ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস (শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য মহাশয় কর্তৃক ১৭৮১।৮২ শকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত দশ উপদেশ) : কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত। চতুর্থ বার, ১৮৩৮ শক।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বোম্বাই চিত্র ; কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বৈশাখ, ১২৯৫ সাল।

ঐ : সুশীলা-বীরসিংহ নাটক : সম্বৎ ১৯২৪। ২রা মার্চ, ১৮৬৮।

ঐ : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ) : ২নং গোয়াবাগান স্ট্রীট ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রীতারিণীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৯৮ সাল।

ঐ : নবরত্নমালা ; ১ম সং ১৩১৪। আদি ব্রাহ্মসমাজে যন্ত্রে মুদ্রিত। ২য় সং- ১৯২৫। প্রিয়ম্বদা দেবী সম্পাদিত।

ঐ : শ্রীমদ্ভগবতদগীতা (পদ্যানুবাদ) ; ১ম সং, ১৩১১ সাল। ২য় সং, ইন্দিরা দেবী প্রকাশিত, বালিগঞ্জ, নববর্ষ, ১৩৩০।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম : ১ম সং, ১নং মজুমদার লাইব্রেরী, ৪৮নং গ্রে স্টীট, রাখাল চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। প্রকাশ : ১৩০৮ সাল। ২য় সং, উইকলি নোট্‌স্‌ প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্‌, ৩নং হেস্টিং স্ট্রীটে সারদা দাস দ্বারা মুদ্রিত। ১৩৩০ সাল।

ঐ : আমার বাল্যকথা : নব সংস্করণ, বৈতানিক প্রকাশনী। সোমেন্দ্রনাথ বসু প্রকাশিত, সাল ১৯৬৭ খ্রী.।

ঐ : আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস : ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯১৫ সাল।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : কুহু ও কেকা ; আর. এইচ. শ্রীমান অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩২৯।

সরলা দেবী : শতগান : তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩০ সাল।

সরলা দেবীচৌধুরাণী : জীবনের ঝরাপাতা : জিজ্ঞাসা সংস্করণ, অপিচ প্রথম 'রূপা' সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৮২।

সীতানাথ তত্ত্বভূষণ অনূদিত : উপনিষদ ১ম ও ২য় খণ্ড ; ৫ম সং, ১৯৩৬ খ্রী.।

সুকুমার সেন : পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রবিকাশ ; লীলা স্মৃতি বক্তৃতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

ঐ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্য সভা, প্রথম মুদ্রণ ১৩৫০, ২য় সং ১৩৫৬, ৩য় সং ১৩৬২।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রসংগ ; ভূমিকার তারিখ-১লা আষাঢ়, ১৩১৯।

সুধীরচন্দ্র কর ও সাধনা কর : শান্তিনিকেতন প্রসংগ।

সুধীর গুপ্ত : পূর্বমেঘ (অনুবাদ)।

সুবোধ সেনগুপ্ত প্রধানসম্পাদক অঞ্জলি বসু সম্পাদক : সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত।

সুরেন্দ্রমোহন বসু : ভারত গৌরব ; ভূমিকার তারিখ-দশঘরা, হুগলী ১২২৩ সাল।

সুশীল রায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : জিজ্ঞাসা, ১৩৭০, এপ্রিল, ১৯৬৩।

সোমেন বসু : বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী, ১৯৫৬।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : যাত্রী, ১ম খণ্ড, অভিযান পাবলিশিং হাউস লিঃ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৭।

ঐ : রবীন্দ্রনাথের গান।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী : পায়োনিয়র বুক কোং, ১৩৬৪।

স্বর্ণকুমারী দেবী সংকলিত : সাহিত্যস্রোত, ১ম ভাগ (স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশে—"শোক নৈবেদ্য" কবিতা মুদ্রিত) : বিধান লাইব্রেরী, ঢাকা, সন ১৩৩৮ সাল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : মেঘদূত ব্যাখ্যা (হরপ্রসাদ রচনাবলী-দ্বিতীয় সম্ভার-এ পুনর্মুদ্রিত) : কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী, ১৩০৯ বংগাব্দ। সম্পাদক—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক-অনিলকুমার কাঞ্জিলাল, ১৩৬৬ বংগাব্দ।

ঐ : বৌদ্ধধর্ম : পূর্বাশা লিমিটেড, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ। ১৩৫৫ বাং।

হরিপদ ভট্টাচার্য : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ) : রামনারায়ণ স্মৃতিমন্দির, হরিনাভি, ২৪ পরগণা, ১৪ই অগ্রহায়ণ. ১৩৩২ সাল।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : মেঘদূত (পদ্যানুবাদ) : জিজ্ঞাসা, ১৩৭১ বংগাব্দ, ১৯৬৪ খ্রী।

ঐ : ঠাকুর বাড়ীর কথা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৬।

হীরালাল মুখোপাধ্যায় : নীতিরত্নহার, ১ম ভাগ : ১৯২৭।

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, ক্যানিং লাইব্রেরী, ১২৯২ সাল।

হেমলতা দেবী : দুনিয়ার দেনা : শান্তিনিকেতন প্রেস, বীরভূম, ১৩২৭। (সংকলন) : ব্রহ্মসংগীত : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত। একাদশ সং, মাঘ, ১৩৫৬। ত্রয়োদশ সং, প্রঃ পুলিনবিহারী সেন, মাঘ, ১৩৭২। ব্রাহ্মধর্ম (তাৎপর্য সহিত ১ম ও ২য় খণ্ড) : ৭ম সং, ১৯০৭ খ্রী। ১৮২৯ শক। ১০ম সং ১৯৭৫।

সমালোচনা সংগ্রহ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত। ষষ্ঠ সং ১৯৬০।

হেমলতা দেবী : স্মৃতিকথা : বৈতানিক, রবীন্দ্রপ্রসংগ-গ্রন্থমালা।

স্মারক গ্রন্থ

রবীন্দ্রশতায়ন : বেথুন বিদ্যায়তন স্মারক গ্রন্থ : কবির চোখে : লীলা মজুমদার

স্মরণী পত্রিকা : দ্বাবিংশ বিহাররাজ্য বংগভাষী সম্মেলনের স্মারক পত্র, রাঁচি।

রবীন্দ্রস্মারক : সম্পাদক-সমীরচন্দ্র দত্ত। ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ, রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত। ৫ই চৈত্র, ১৩৬৭।

'ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী'—জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ : ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন। ১৩ই পৌষ, ১৩৮০ : ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন : গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত।

পুস্তিকা

ইন্দিরা দেবী (শ্রীনাথ ঠাকুরের কন্যা) : আমার খাতা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'উপহার' : আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১১ই মাঘ, ১৮০৯ শক।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত' (ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর অধিবেশনে 'আলবার্ট হল' এ পঠিত। : কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৩০৬ সাল।

সংগীতভারতী শ্রীবাণী দেবী : 'জয় ভারতের জয়' (সত্যেন্দ্রনাথের 'জয় ভারতের জয়' কোরাস অবলম্বনে স্বর সংবাদ)। রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালায় রক্ষিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশ-প্রথম কার্যপ্রণালী। : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ-তত্ত্ববোধিনী, মাঘ, ১৮২৩ শক।

ঐ : 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' : আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত। শ্রাবণ, ১৩০৮ সাল।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (দ্বাচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা) : ১১ই মাঘ, ১৭৯৩ শক।

ঐ : আদি ব্রাহ্মসমাজে ১৭৯৩ শকের ফাল্গুন মাসে প্রদত্ত ভাষণ : বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিংকর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত। ১৭৯৪ শক।

ঐ : 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' : ১৩১৪ সাল (১৫ই মার্চ, ১৯০৮)।

ঐ : 'বৌদ্ধধর্ম' (বংগীয় সাহিত্যপরিষদে ১৩০৭ সালের বিশেষ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা) : বংগীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত। শ্রীবিহারীলাল রায় দ্বারা মুদ্রিত।

ভাষণ

(রায়) জলধর সেন : বংগীয় সাহিত্যপরিষদে সত্যেন্দ্রনাথের শোকসভায় সভাপতির ভাষণ। ৩রা চৈত্র, ১৩২৯ বাং। ১৭ই মার্চ, ১৯২৩। বংগীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যবিরণী, ১৩২৯।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ : সত্যেন্দ্রনাথের বিলাত গমনের পূর্বরাত্রিতে

প্রদত্ত : তত্ত্ববোধিনী, আশ্বিন, ১৮৪৬ শক। (সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ক্ষিতীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত।)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমাদের সংগীত (সংগীত সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবের ভাষণ) : সবুজপত্র, ভাদ্র, ১৩২৮।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের ভাষণ। তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন, ১৭৮২ শক।

ঐ : অষ্টসপ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের ভাষণ : ঐ, ঐ, ১৮১৯ শক।

ঐ : বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা : ঐ, পৌষ, ১৮২১ শক।

ঐ : মহারাণী ভারতেশ্বরীর তিরোভাব উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা, ১৩০৭।

ঐ : 'পরকালতত্ত্ব'। (বুধবারের উপাসনায় প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ) : তত্ত্ববোধিনী, বৈশাখ, ১৮২৮ শক।

ঐ : ব্রহ্মপূজা : ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৮২৮ শক।

ঐ : মহর্ষিদেবের জন্মোৎসবের ভাষণ : ঐ, আষাঢ়।

ঐ : 'দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগৎ' : ঐ।

ঐ : 'আত্মশক্তি' : ঐ শ্রাবণ, ঐ।

ঐ : জীবন : শারীরিক আধ্যাত্মিক : ঐ, কার্তিক, ঐ।

ঐ জীবনের আদর্শ' : ঐ, চৈত্র, ঐ।

ঐ : ধনলালসা : ঐ।

ঐ : শাস্ত্রালোচনা : ঐ, আষাঢ়, ১৮২৯ শক।

ঐ : অপৌত্তলিক উপাসনা (আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে আচার্যের উপদেশ) : ঐ শ্রাবণ, ঐ।

ঐ : অদৃশ্যমগ্রাহ্যং (আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে আচার্যের উপদেশ) : ঐ অগ্রহায়ণ।

ঐ : মহর্ষির জন্মতিথি : ঐ আষাঢ়, ১৮৩১ শক।

ঐ : মৃত্যুভয় মৃত্যুঞ্জয় : ঐ ভাদ্র, ঐ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাঁচি যাত্রার পূর্বে' আদি ব্রাহ্মসমাজে ভাষণ তত্ত্ববোধিনী, বৈশাখ, ১৮৩২ শক।

ঐ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতি সভায় ভাষণ 'স্মৃতিপূজা' (৯ই শ্রাবণ, ১৩২০) : সাহিত্যপত্রিকা, ভাদ্র, ১৩২০ ।

ঐ : নববর্ষ ; তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ, ১৮৪৬ শক ।

ঐ : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাবে : ঐ মাঘ, ১৮৪৬ শক । (সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) ।

প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন

বিভিন্ন সাময়িক পত্রের সূত্র ।

অমিতাভ গুপ্ত : দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমাধি : দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৬৪ ।

অমিতাভ চৌধুরী : অপ্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ : শারদীয়া হিমাদ্রি, ১৩৮৫ ।

ঐ : জ্যোতিরিন্দ্র রহস্য : কলকাতা পত্রিকা, আগস্ট ১৯৭৭ । পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ।

সুপ্রিয় ঠাকুর : ৩১।৮।৭৭ এ লিখিত প্রতিবাদ পত্র ঐ পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ।

ইন্দিরা দেবী : ৺জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৮ ।

ঐ : সত্যেন্দ্রস্মৃতি : বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫২ ।

ঐ : মারহাট্টী পানসুপারি : ভারতী, বৈশাখ, ১৩০৬ ।

ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : বোম্বাই ভ্রমণ : পূর্ণিমা পত্রিকা, ৩য় ভাগ, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড সংখ্যা শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩০২ ।

কিরণশশী দে-র প্রশ্ন ও পুলিনবিহারী সেন-এর উত্তর : 'তুমি বিনা কে কভু সংকট নিবারে' সংগীত প্রসংগে : আনন্দবাজার পত্রিকা, শুক্রবার, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৬৭ ।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন স্টুয়ার্ট মিল ও স্ত্রী স্বাধীনতা : পুণ্য পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩০৫ ।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জন স্টুয়ার্ট মিল ও স্ত্রী স্বাধীনতা বাংলায় সেক্সপীয়র চর্চা : বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭১ ।

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য : নবরত্নমালায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা : প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৬৫

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : ব্যায়াম : বালক পত্রিকা, বৈশাখ, ১২৯২ ।

ঐ : আশ্চর্য পলায়ন : ঐ, বৈশাখ-আষাঢ়, ১২৯২।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : য়ুরোপ প্রবাসী বাঙালী : প্রবাসী, কার্তিক ১৩১১।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি : ঐ, মাঘ, ১৩১৮।

দ্বারকাগোবিন্দ বৈদ্য : পরলোকবাসী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : (জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর অনূদিত) তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন, ১৮৪৪ শক।

পুলিনবিহারী সেন : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলায় স্ত্রী স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ : ইন্দিরা দেবী সংকলিত 'পুরাতনী' গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত। অপিচ, 'প্রবাসীর পত্র,' শারদীয়া দেশ, ১৩৬৩ সালে প্রকাশিত।

প্রবোধচন্দ্র সেন : রবীন্দ্রচিন্তায় ভারতবর্ষ : ১৩৭৪, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা।

প্রিয়নাথ শাস্ত্রী : রাঁচির গিরিগৃহে ব্রহ্মোৎসব : তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ, ১৮৩২ শক।

বিনয় ঘোষ : বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা ও ভারতবোধ ; দেশ সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৪।

বিহারীলাল গুপ্ত ও স্নেহলতা সেন : রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ; ঐ ঐ ১৩৭১।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ : বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫২।

মধুসূদন চক্রবর্তী : জাতীয়মন্ত্র বন্দেমাতরমের শতবর্ষ : আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ই আগস্ট, ১৯৭৬।

মহীপত্ রাম রূপরাম্ : আমেদাবাদ প্রার্থনা সমাজের বিবরণ : তত্ত্ববোধিনী, বৈশাখ, ১৮০০ শক।

রাজ্যেশ্বর মিত্র : বাংলা সংগীত ও ভারতচিন্তা : দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৪।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় : হিন্দুমেলা ও ভারতচিন্তা : ঐ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বোম্বাই চিত্র' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রণের পূর্বে বোম্বাই প্রসঙ্গে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী। : ভারতী, ১২৮৪-১২৮৫ বঙ্গাব্দ, বালক, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।

ঐ : কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস : বিবিধার্থ সংগ্রহ, পৌষ, ১৭৭৯ শকাব্দ।

ঐ : বোম্বাই রায়ৎ : ভারতী, চৈত্র, ১২৮৪ বাং।

ঐ : ঐ : ঐ বৈশাখ, ১২৮৫ বাং।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বোম্বাই রায়ৎ, দ্বিতীয়ভাগ : ভারতী, শ্রাবণ, ১২৮৫।

ঐ : ঐ : তৃতীয় ভাগ : ঐ আশ্বিন, ঐ।

ঐ : মেঘদূতের অনুবাদ (পূর্বমেঘ) : 'ভারতী ও বালক,' আষাঢ়-শ্রাবণ, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।

ঐ : ঐ : (উত্তর মেঘ) : 'ভারতী ও বালক', ভাদ্র, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।

'ইংলণ্ড হইতে কলিকাতা নিবাসী একজন ব্রাহ্মের পত্র' (সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ লিখিত) : ব্রাইটনপুরী, বেজ'স পল্লী : তত্ত্ববোধিনী, আশ্বিন, ১৭৮৪ শক।

সলিল ঘোষ : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর বোম্বাই প্রবাস। (উক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত Copy of the News item form Native 'Opinion' 2nd April 1871. এই গবেষণায়' আংশিক উল্লিখিত)। : বোম্বাই বিচিত্রা, জানুয়ারী, ১৯৭৫।

সংজ্ঞা দেবী : স্মৃতিকথা : শারদীয় সংগঠন, আশ্বিন, ১৩৭৩।

সুকুমার সেন : নাটকে ভারতচিন্তা : দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৪।

সুভাষ চৌধুরী সংকলিত : প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর পত্রগুচ্ছ : ঐ ঐ, ১৩৮৭।

সৌদামিনী দেবী : পিতৃস্মৃতি : 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে মুদ্রিত। বৈতানিক, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ গ্রন্থমালা।

অপিচ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৭০।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : সত্যেন্দ্রনাথের শোকপ্রশস্তি : ভারতী, মাঘ, ১৩২৯।

স্বর্ণকুমারী দেবী : আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার : প্রদীপ, ভাদ্র, ১৩০৬। ('পুরাতনী' গ্রন্থ ও প্রবাসীর পত্রে উদ্ধৃত)।

নিম্নে প্রদত্ত তালিকায় লেখকের নাম নেই।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচার : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র, ১৮০৩ শক।

বোম্বাই পরিদর্শন : নবজীবন পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, ১২৯৫-৯৬। সম্পাদক— অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

বর্তমান হিন্দুসমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ ? তত্ত্ববোধিনী, বৈশাখ, ১৭৯৯ শক।

নির্বাণ (প্রবন্ধ) : তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ, ১৮০০ শক।

টাকায় কেনা নাম, বিড়লা মিউজিয়াম : পরিচয় পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩৮২।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দান : তত্ত্ববোধিনী, অগ্রহায়ণ, ১৮৪৯ শক।

ব্রাহ্ম সম্মেলন, ৯ই মাঘ, বৃহস্পতিবার : ঐ, ফাল্গুন, ১৮০৭ শক।

পুণা প্রার্থনা সমাজের বিবরণ : ঐ, আষাঢ়, ১৭৯৪ শক।

শান্তিনিকেতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন। : ঐ, পৌষ, ১৮১২ শক।

রাঁচিতে মাঘোৎসব (জ্ঞানদানন্দিনীর বর্ণনা অনুসারে) ঐ, মাঘ, ১৮৪৬ শক।

সত্যেন্দ্রনাথের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ : ঐ, কার্তিক, ১৮৯৪ শক।

সেতারায় মাঘোৎসব : ঐ, বৈশাখ, ১৮১৭ শক।

সত্যেন্দ্রনাথের শোকপ্রশস্তি : ঐ, মাঘ, ১৮৪৪ শক।

ঐ : ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩২৯।

ঐ : মাসিক বসুমতী, পৌষ, ১৩২৯।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ : ডায়মণ্ড হারবার হিতৈষী পত্রিকা, ২৭, জুন, ১৯৩৩।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে সত্যেন্দ্রনাথের শোকসভার বিবরণী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যবিবরণী, ১৩২৯।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কার্যবিবনী—১৩০১ থেকে ১৩১২ সাল পর্যন্ত পৃথক্ পৃথক্ কার্যবিবরণী।

চিকিৎসা সম্মিলনী, মাসিক পত্রিকা, ৩য় খণ্ড, ১২৯৩ সাল। সম্পাদক—ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীর ও কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন। ভারতী, বৈশাখ, ১২৮৭। ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা, ১৬ই চৈত্র, ১৮০৪ শক।

শান্তিনিকেতন পত্রিকা। ১৩২৬-১৩৩২ সাল।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৯।

রহস্য সন্দর্ভ পত্রিকা, চতুর্থ পর্ব, (৪৭ খণ্ড)।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৬।

চিঠিপত্র

কেশবচন্দ্র সেন : মহর্ষিকে লিখিত : ৩১শে বৈশাখ, ১৭৮৩ শক : তত্ত্ববোধিনী, শ্রাবণ, ১৭৮৩ শক।

(লোকমান্য) তিলক : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত : বোম্বাই, ২০শে অক্টোবর, ১৯১৭ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক তিলকের 'গীতারহস্যের' বঙ্গানুবাদের শর্তাবলী প্রসঙ্গে লিখিত। তত্ত্ববোধিনী, আষাঢ়, ১৮৪৯ শক।

ঐ : পুণা, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯১৭ : ঐ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত : বিশ্বভারতী পত্রিকা, দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৯।

ঐ : স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখিত : 'সাহিত্যস্রোত' গ্রন্থে মুদ্রিত।

(রায়) যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত। ১৩ই শ্রাবণ, ১৩০৭-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের ছাপানো আমন্ত্রণলিপি। ৯ই শ্রাবণ, ১৩০৭ : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ইন্দিরা দেবীকে লিখিত : ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩, ছিন্নপত্রাবলী।

ঐ : ঐ : ২রা বৈশাখ, ১৩২৯ : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।

ঐ : প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত : ১৮৮৩ সাল, ৮নং পত্র চিঠি পত্র, ৮ম খণ্ড।

ঐ : ঐ : ১৮৮৪ সাল, ২৫নং পত্র চিঠিপত্র, ৮ম খণ্ড।

ঐ : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত : ২৬শে পৌষ, ১৩২৮।

ঐ : প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত : শিলাইদহ, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ : চিঠিপত্র, ৮ম খণ্ড।

ঐ : প্রিয়ম্বদা দেবীকে লিখিত : ২৫শে ফাল্গুন, ১৩১৮ : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।

ঐ : প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত : ১৬ই জুন, ১৮৯৪ : চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড।

ঐ : মৃণালিনী দেবীকে লিখিত : শিলাইদহ, ১৮৯২ : ঐ, ১ম খণ্ড।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত : বহরমপুর, ১২ই আগস্ট ১৮৯৭ : রবীন্দ্রভারতী, প্রদর্শশালা।

ঐ : গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত : 38, Kensington Park Garden,

London, 26th Dec. 1862. : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন। (এই পত্রটির ইন্দিরা দেবী কৃত ইংরেজি অনুবাদ ক্যালকাটা রিভিউ, অক্টোবর, ১৯২৪-এ প্রকাশিত)

ঐ : ঐ : Harmondsworth. ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৩. রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন তত্ত্বোধিনী, শ্রাবণ, ১৮৪৫ শকে মুদ্রিত।

ঐ : ঐ : Harmondsworth. ১৭ই মে, ১৮৬৩ : ঐ।

ঐ : ঐ : Paris, 'Hotel du Louvre', 10th August or 18th August. 1863. : ঐ।

ঐ : ঐ : আমেদাবাদ, ১লা মে ১৮৬৫ : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন। তত্ত্ববোধিনী, আশ্বিন, ১৮৪৫ শক, ২১ কল্প, প্রথম ভাগ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত : ভিলা বাইকুলা, ৩১ মার্চ ১৮৬৭ : Tagore Family Correspondence, Vol. IV, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

ঐ : ঐ : আহম্মদনগর, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৬৯ : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।

ঐ : ঐ : Satara, 7 march 1867 : ঐ।

ঐ : জয়শ্রী ঠাকুর (সেন) কে লিখিত : রঙিন পোস্টকার্ড, (তারিখ অনুল্লিখিত) : শ্রীজয়শ্রী সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ঐ জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত : ১৬ই নভেম্বর, ১৮৬৩ খ্রী. : পুরাতনী' গ্রন্থে মুদ্রিত, প্রবাসীর পত্রে উদ্ধৃত।

ঐ : ঐ : ১১ই জানুয়ারী, ১৮৬৪ : ঐ।

ঐ : ঐ : ২রা জুলাই, ১৮৬৪ খ্রী. : ঐ।

ঐ : ঐ : ৩১শে মে, ১৮৬৬ খ্রী. ঐ।

ঐ : ঐ : ১লা জুন, ১৮৬৮ হোপহল হোটেল, বোম্বাই : 'পুরাতনী' (১৪নং পত্র)।

ঐ : ঐ : ১লা জুন, ১৮৬৯ বলে মুদ্রিত। হোপহল হোটেল, বোম্বাই। (প্রকৃতপক্ষে চিঠিটি লেখা হয়েছিল ৩১শে মে, ১৮৬৮, তারিখ দেয়া হয়েছিল ১লা জুন, ১৮৬৮। কালির দাগ পড়ায় ১৮৬৮-ই ১৮৬৯ বলে মনে হয়েছে। ঐ (১২৬নং পত্র)

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত : পুরাতনীতে মুদ্রিত ১১নং,

১২নং, ১৩নং, ১৪নং, ২০নং, ২৪নং ২৮নং, ৩৩নং, ৩৬নং, ৩৭নং, ৩৯নং, ৪৪নং, ৪৬নং, ৪৮নং, ৫৪নং, ৫৭নং, ৬০নং, ৬৪নং, ৬৭নং, ৭৫নং, ৭৬নং, ৭৮নং, ৮২নং, ৯০নং, ৯৬নং, ৯৯নং, ১০৪নং, ১০৫নং, ১১৫নং, ১১৯নং, ১২৫নং। : 'পুরাতনী'।

ঐ : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত : পোস্টমার্ক-৩০শে জানুয়ারী, ১৮৬৯ খ্রী. : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।

ঐ : ঐ : আরব সাগর থেকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র। (চিঠির উপরের অংশ ছিন্ন) : রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালা। 'সেবক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর' থেকে মনে হয় চিঠিটি মহর্ষিকে লিখিত।

ঐ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত : শুক্রবার রাঁচি (চিঠিতে সাল তারিখ নেই। সম্ভবত ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় পত্রটি লেখা হয়েছিল)। : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।

ঐ : ঐ : শান্তিনিকেতন, ২১শে চৈত্র : প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪৬।

ঐ : বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত : 'বিলাতযাত্রার পুরাতনী' শিরোনামে তত্ত্ববোধিনী, অগ্রহায়ণ, ১৮৪৯ শকে মুদ্রিত।

ঐ : হেমলতা ঠাকুরকে লিখিত : শান্তিধাম রবিবার ২১এ··· : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালা।

স্বর্ণকুমারী দেবী : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত : (সত্যেন্দ্রনাথের আশী বৎসরে পদার্পণে শুভকামনা) : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।

হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত : তারিখ পাওয়া যায় নি : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, হিতেন্দ্রনাথে ফাইলে রক্ষিত।

ঐ : ঐ : ১৬।৭.১৪ ঐ

ঐ : সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত : : ঐ

স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দ, সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন রাঁচি : (জ্যোতিরিন্দ্র সেবাধাম প্রসঙ্গে গবেষকের নিকট লিখিত) : রাঁচি

পাণ্ডুলিপি

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : শ্রুতি ও স্মৃতি : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।

ঐ : আমার খাতা : ঐ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : ডায়েরি, ১৯০৮-এ লিখিত : ঐ।

দলপত্ রাম : গুজরাটি ভাষায় সত্যেন্দ্রনাথের প্রশস্তিসূচক কবিতা, ইংরেজি অনুবাদ : টি. পি. ভাট, বোম্বাইয়ের সিদ্ধার্থ কলেজের গুজরাটি ভাষার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। : শ্রীভাট্ মূল কবিতা অনুবাদসহ শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করেন। বর্তমানে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

পূর্ণিমা ঠাকুর : ইন্দিরা স্মৃতি : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।

প্রতিভা দেবী : প্রতিভার বাক্স, সত্যপ্রসাদকে লিখিত প্রতিভা দেবীকে কবিতায় চিঠি, ১৯শে কার্তিক মঙ্গলবার, সন ১২৯১ সাল। : রবীন্দ্রভারতী ফাইলে রক্ষিত।

প্রিয়ম্বদা দেবীর ডায়েরি : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তলিখিত পারিবারিক ঠিকুজিচক্রের খাতা। রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, পাণ্ডুলিপি নং ৩৬৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মালতী পুঁথি (রক্ষয়িত্রী মালতী সেনের নামানুসারে) : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের ও আত্মীয় বন্ধুদের রচনা সম্বলিত : পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক : ঐ।

সুপ্রিয় ঠাকুর প্রমুখের অংশগ্রহণে : সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনী (বিশ্বভারতী বেতার অনুষ্ঠান, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৭৫) : (অনাথ দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

Letters in English

Banerjee, S. N. Reply to Rabindranath : 126, Bow Bazar Street, 1. 10. 1917 Rabindra-Bhavan. Santiniketan, (S. N. Banerjee's file).

Dutta, Madhusudan To Vidyasagar : 15th September, 1864. Verseilles, France, Rue-des-Chantiers. Quoted in 'Madhu-smriti' by Nagendranath Some.

Ghose, Monomohan To Ganendranath Tagore : Galle Seaview

Hotel, 31st March, 1862 Rabindra-Bhavan, Santiniketan, Published in Calcutta Review, October, 1924.

Do : Do 9, Notting Hill Terrace, Bay Water, London, W. 17th May, 1862. Do

Do : Do : 9, Notting Hill Terrace, London, W. 18th August, 1862. Rabindra Bhavan, Santiniketan.

Do : Do : Harmondsworth Vicarage, Middlesex 2nd December, 1862 Do.

Do : Do : 7 Regency Square, Brighton. 28th December, 1862 Do.

Do : Do : Harmondsworth, Middlesex. 19th January, 1863. Do (Tagore Family Correspondence, Vol. IV.)

Do : Do : Harmondsworth, Middlesex, 9th February, 1863 Do

Do : Do : London. 26th Nov. 1863. Rabindra Bhavan, Santiniketan.

Do : To Satyendranath Tagore, University Hall, Gordon Square, London, 18th October, 1864. Do (Tagore Family Correspondence, Vol. IV)

Lawrence, W. Private Secretary to the Vicerory. Do. 30th Jan. 1901. Report of Bangiya Sahitya Parishad, 1901.

Max Muller, F. : To Maharshi Debendranth 7, Norham Gardens. '*Maharshir Patrabali*' Edited by Priyanath Sastri.

Tagore, Satyendranatha. (As President, Bangiya Sahitya Parishad) To Hon'ble Mr. H. W. C. Curnduff, Offtg. Secretary to the Government of Bengal. : 10th April, 1905. 11th Annual Report of the Parishad, Appendix-A.

Tagore, Satyendranath To Dwijendranath Tagore : Madras, On Board the 'Colombo'. 27th March, 1832 Rabindra Bhavan, Santiniketan. Calcutta Review, September, 1924.

Tagore, Satyendranath : To Maharaja Bahadur of Jherria-An Appeal : 24th August, 1908 : Rabindra-Bharati Museum.

Do : To Max Muller : Ahmedabad, Guzrat, May 13, 1865 : '*The Life and Letters of Max Muller*'. Vol. II, Edited by Georgine Max Muller.

Do : To Rakhaldas Halder : 16th March, 1862 Krishnanagar : Rabindra Bharati Museum *Tattwabodhini*, Bhadra, 1849 Saka.

Do : 19th March 1862 Calcutta. : Do

Do : 1st May, 1862. On Board the 'Pera'. : Rabindra Bharati Museum.

Do : Possibly to Rakhaldas Halder : 9th May, 1862. 9 Notting Hill Terrace. : Do

Do : To Ganendranath Tagore : 26th May, 1861. Krishnangar. : Rabindra Bhavan, Santiniketan. Calcutta Review, September, 1924.

Do : 29th May, 1861. Krishnanagar. : Do

Do : 31st May, 1861. Krishnanagar. : Do

Do : 10th June, 1862. London. : Rabindra Bhavan, Santiniketan. Calcutta Review, September, 1924.

Do : Montpelius, Worthing, Sussex. 25th Aug. 1862. : Rabindra Bhavan, Santiniketan, Calcutta Review, October, 1924.

Tagore, Satyendranath : To Ganendranath Tagore : Worthing, Sussex. 2nd September, 1862 : Rabindra Bhavan, Santiniketan, Calcutta Review, October, 1924.

Do : Villa Byculla, Bombay. 5th Jan. 1865. : Rabindra Bhavan. Santiniketan. *Tattwabodhini*, Bhadra, 1845 Saka.

Do : Villa Byculla, Bombay, 13th Feb. 1865. : Do

Do : Villa Byculla, 5th April, 1869. Rabindra Bhavan, Santiniketan. *Tattwabodhini*, Bhadra, 1845 Saka.

Do : Ahmedabad, 28th July, 1865. : Rabindra Bhavan, Santiniketan. *Tattwabodhini*, Aswin, 1845 Saka.

Do : Ahmedabad, 14th April, 1866. : Do.

Do : Camp Dhollera, 27th May 1866.

Do : Ahmedabam, 14th April, 1867. : Rabindra Bhavan, Santiniketan. *Tattwabodhini*, Aswin, 1846 Saka.

Do : Ahmedabad, 11th May, 1867. Do.

Do : Ahmedabad, 2nd June, 1867 : Do.

Do : Ahmedabad, 4th Septmber, 1867. : Do.

Do : Hope Hall Hotel Bombay, 1st June, 1868. : Rabindra Bhavan. Santiniketan.

Do : Ahmednagar, 28th June, 1868. Do

Tagore, Satyendranath : To Ganendranath Tagore : Ahmednagar 30th July, 1868 : Rabindra Bhavana, Santiniketan.

Do : Ahmednagar, 30th August, 1868 : Do.

Do : Satara, 7th February, 1869.

Records

Regarding Bombay : Bombay Gazetteer.

Regarding Satyendranath : History of Services of the Gazetted Officers.

Satyendranath Tagore's Service Report in Bombay Presidency. : Department of Archives, Maharashtra State, Bombay Archives.

Pamphlet

Basu, Rajnarayan : Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal. Printed in Appendix of '*Hindu Melar Itibritta*' by Jogesh Chandra Bagal.

Tagore, Maharshi Debendranath : The Offering of Srimat Maharshi Debendranath Tagore. English translation and Preface : M. Chatterjee. W. Newman & Co. Ltd. 4, Dalhousie Square, Calcutta: 1889.

Tagore, Satyendranath : Autobiographical Notes and Reminiscences. Mentioned and Quoted in a Bengalee Article মহুরোপ প্রবাসী বাঙালী by Jnanendra Mohan Das, *Prabasi*, Kartick, 1311 B. S. and in his book—'বঙ্গের বাহিরে বাঙালি'।

An Explanatony Statement of the case of the Indian Civil Service : India (Series). National Library, Calcutta.

Souvenier

The Diamond Jubilee Brochure, Union Club & Library, Ranchi.

Centenary Volume, Presidency College, Calcutta, 1955.

Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal, (from 1784-1883).

Manuscripts

Satyendranath Tagore : *Tukaram* : The Sudra Poet of Maharashtra. Preface : Ballygunj, 1901. Type Script contributed by Satyendranath Tagore to Imperial Library : at present preserved in National Library, Calcutta.

Do : Compiled Works in four volumes. subjects : Vedic Religion and Literature ; Sir Schools of Philosophy ; Buddhism ; *Puranas* ; *Gita* ; Different Sects of Hinduism ; Sanskrit Literature ; Marathi Ballads and Poems, *Tukaram* ; English Drama and Literature. Rabindra Bhavan, Santiniketan.

Journals and Newspapers

Amrita Bazar : 12th June, 1897 : Bengal Provincial Conference : Session at Natore. : Reporters' News.

Do : May 2, 1959 : Fascinating Story of Birla House.

(The) Bengalee : Wednesday, January 10, 1923. Satyendranath's Obituary.

Hindoo Patriot. 15th January, 1866 : Reply to M. Ghose's Article on Civil Service Examination. : Hodgson Pratt.

Literary Miscellany : 1972 : *Troduttore Traditore* : Prof. Taraknath Sen.

Modern Review : February, 1923 : Satyendranath's Obituary. :

Tattwabodhini : Magha, 1921 Saka to Magha, 1822 Saka, Bhadra to Agrahayana, 1830 Saka and in other issues also. Sermons of Maharshi Debendranath Tagore. : Translated by Satyendranath Tagore.

Do : Magha, 1830 Saka : Prayers from the Book of Vyakhyan. : Do.

Do : Pous 1823 to Magha 1824 Saka. : The God of the Upanishads. (Translation of Rabindranath Tagore's Aupanishad Brahma) : Satyendranath Tagore. (As guessed by Prabhatkumar Mukhopadhyaya, Vide *Rabindra-Jibani*, Part IV).

Addresses by Satyendranath Tagore

An Address read by Babu Satyendranath Tagore, C. S. on the occasion of the inaugural ceremony of the Brahma Mandir at Hyderabad, Sind ; On Sunday, the 19th September, 1875. : Reader Printer copy received from India Office Library and Records, London.

Presidential Address, Bengal Provincial Conference, Nattore. Amrita Bazar Patrika, 11th June, 1897.

Presidential Address The Theistic Conference 1907. Surat. : Rabindra Bhavan, Santiniketan.

Address delivered at the City College Hall, Calcutta, on the 53rd Anniversary of the death of Rammohan Roy : 27th September, 1889. : National Library, Calcutta.

Books in English

Abbot, Justin E. The Poet Saints of Maharashtra. No. 7. Tukaram Translation from Mahipati *Bhaktalilamrita* (Ch. 25-40) 1930.

Arnold Edwin : The Song Celestial or *Bhagabad Gita* : Editions Du Sud Paris, 1968.

Do : Light of Asia : Jaico Publishing House. Bombay, Cal., (1949) 1st pub. 1879.

Do : With Sa'di in the Garden or the Book of Love. Trubner & Co., Ludgate Hill, London. Second Edition, 1888.

Aurobindo, Sri : The Essays on the Gita : Arya Publishing House, Calcutta, Fifth Edition, 1949.

Do : The Message of the Gita : Edited by Anilbaran Ray,

George Allen & Unwin Ltd. London. First Published in 1938.

Ball, Allan R. : Modern Politics and Government : Macmillan, Students edition.

Bagal, Jogesh Ch. : Pramatha Nath Bose : Centenary Committee.

Banerjee, A. C. Indian Constitutional Document vol, II. Centenary Committee. A. Mukherjee & Co. Calcutta.

Banerjee, Surendranath : A Nation in Making : Humphrey Milford. Oxford University Press, 1925.

Bhartrihari Begandet, Bishop p. : Three Satacas or Centuries of Verses···The Life or Legend of Gandama. First Published in Rangoon in 1858. Popular Edition, 1914.

Boas, Frederick S. : Shakespeare and His Predecessors.

Carpenter, J. Estlin : Buddhism & Christianity : A Contrast and A Parallel.

Carpenter, Mary : The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy.

Circassieune, UNE : The Romance of a Harem. (Translated by Clarence Forestier Walker.)

Cowper, William : The Diverting History of John Glipin.

David, Dr. M. D. : History of Bombay (1661-1708) : University of Bombay, 1973.

Douglas, James : A Book of Bombay : 1883 A. D.

Furrell, James W. : The Tagore Family A Memoir : Thacker Spink & Co. 2nd Edition : 1892.

Haig, Lt. Colonel Wolseley edited : The Cambridge History of India, Vol. III. (Turks and Afghans) : 1958. S. Chand & Co. Delhi.

Hunter, W. W. : The Annals of Rural Bengal, Republication Date-New Ed. 30th May, 1965.

Keith A. B. : A History of Sanskrit Literature. Oxford University Press. First Ed. 1920.

Kincaid, Dennis : Grand Rebel : London, Collins, 1937.

Kosambi, D. D. and Gokhole V. V. ed. *Subhāsitaratnakoṣa* : 1957. Harvard University Press.

Kipling, Rudyard : Barrack Room Ballads.

Kripalani, Krishna : Dwarakanath Tagore—A Forgotten Pioneer, A life. National Book Trust, India, New Delhi, 1980.

Lee, Sydney ed. : Dictionary of National Biography, Vols. II, III, IX, XVII, XIX.

Leonard, G. S. : The History of Brahmo Samaj (1830-1878 A. D.) First Published in Calcutta, March, 1879. Reprinted and Republished by Kshitindranath Tagore,

Longfellow's : Poetical Works : Collins, London and Glasgow.

Mackenzie Alexander : History of the Relations of the Government with the Hill Tribes of the North East Frontier of Bengal.

Mackinon, Major W. C. : Flowers from the Bustan : Revised Edition, H. R. Allen & Sons, London.

Macivor, R. M. and Page, Charles H. : Society : An Introductory Analysis ; Macmillan & Co. London, 1961

Mahajan, Vidyadhar and Savitri : Constitutional History of India : S. Chand & Co. Delhi. 7th Ed. 1967.

Majumdar, R.C. : History of the Freedom Movement of India, Vol. III. : Firma K. L. Mukhopadhyaya, 1963.

Majumdar, R. C. and others : An Advanced History of India : Macmillan, 980 (reprinted)

Max Muller, Friedrich Edited : The Sacred Books of the East. Vol. VIII, XI. '*Tevigga Sutta*' : Oxford, at the Charendon Press, Second Edition, 1908.

Do : The First Book of the *Hitopadeśa*. : Weymouth, Sept. 1864.

Max Muller, Georgina Edited : The Life and Letters of the Right Honourable Friedrich Max Muller, Vol. II. : Longmans Green & Co. London, New York, Bombay, 1902.

Maxey, Chester C. : Political Philosophies : Macmillan Co., New York, 1950.

Mill, John Stuart : The Subjection of Women : Published in one Volume with his Liberty and Representative Government. The World Classics, Oxford University Press. 1912.

Mitra, Rajendralal : Sanskrit Buddhist Literature of Nepal. : Sanskrit Pustak Bhandar, 38 Bidhan Sarani, Introduction by Alok Roy.

Do : The *Lalita Vistāra* : Bibliotheca Indica Series. Published by Asiatic Society of Bengal, 1877.

Do : Do (with English Notes and Translation) : Bibliotheca Indica Series, No. 455, 1881.

Munshi, Ziauddin Gulam Moheuddin (Revised by Rochfort Davies) : Bustan (Sadi) : 1882.

Penzer, N. M. : The Harem. : George S. Harrap & Co. Ltd. 1936.

Radhakrishnan, S. The Bhagavadgita : George Allen & Unwin Ltd., London. 5th Impression : 19:8.

Ranking, George S. A. : The Benefits of Kindness by Sheikh Sa' di of Shiraz Bustan, Book II. : Parker & Son. Oxford, 1906.

Rhys Davids, Mrs. M. A., D. Litt. : Gotama The Man : Luzoc & Co. 46, Great Russell Street, London W. C. 1928.

Rhys Davids, T. W. : A Sketch The Life and Teaching of Goutama, The Buddha. : London, Society for Promoting Christian Knowledge. New Revised Edition, 1894.

Do : Dialogues of the Buddha :

Do : The Question of King Milinda, Sacred Books of the East, Vol. XXXV, Edited by F. Max Muller.

Do : Buddhism-Its History and Literature. : G. P. Putnom's Sons, New York & London. 1st Published in 1806. New Edition, 1926.

Sanyal, Ram Gopal : Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India, Vol. II : 1895.

(Sarma, Vishnu) : *Hitopadesa* or Salutary Instruction, in the Original Sanskrit) : Serampore, 1804.

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি

অ

আ

ধ

ন

প

ফ

ব

য

ল

স

হ

A

B

C

গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্রিকা, ইত্যাদি

ক

খ

গ

ফ

ব

ভ

ম

T

W

অশুদ্ধি সংশোধন

বৃহৎ গ্রন্থে কিছু কিছু অশুদ্ধি থেকে যেতেই পারে। অনবধান জনিত এই সব ত্রুটীর জন্য পাঠকদের ক্ষমা প্রার্থনা করি।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩		হালিডে	হ্যালিডে
„		জেম্‌স্‌ ফ্রেডারিক	ফ্রেডারিকজেমস্‌
২৬		কার্পেটার	কার্পেন্টার
„		য়ামমোহন	রামমোহন
২৭		মহর্ষির আত্মজীবন	আত্মজীবনী
৬১	২য়	নিয়ষ্ট	নিয়েষ্ট
৬৭	শেষ ৩ছত্র আগে	যে প্রভৃত রয়েছে	যে প্রভূত অবদান রয়েছে
৭৫	১	সজ্ঞাদেবী	সংজ্ঞাদেবী
৬৮	ব্রহ্মা সম্মিলন	ব্রাহ্ম সম্মিলন	
৯২	শেষ	মহর্ষির আত্মাজীবনী	আত্মজীবনী
১১৩	৩য় ছত্র	দ্বিতিয়ত	দ্বিতীয়ত
১৩৩	৮	ম্যাক্সমূলোরের	ম্যাক্সমূলারের
১৩৭	২		১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৮৭৫
১৪৭		পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৪	১৪৭
১৬০	১৬	গ্রহন	গ্রহণ
২১৯	১৫	পারাবন	পারবেন
২২৪	৭	আক্রমণ	আমন্ত্রণ
২৪৩	২২	ডিরোজিবও	ডিরোজিওরও
২৬৪		Dr. Dr. Avid	Dr. D. Avid
২৬৫	১৪-১৫	সুতরাং ২বার হয়েছে	সুতরাং

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০৭	১৪	পূর্ণ বিশেষণ	পূর্ণ বিশ্লেষণ
৩১৫	৬	অথর্ব-বোপনিষদ	অথর্বোপনিষদ
৩৪৯			
৩৫০	৬	নাতি বচন	নীতিবচন
৩৮৯	৩২নং শ্লোকের পাশে	দংকলিত	সংকলিত
৩৮৯	শীলা ভট্টায়িকা		শীলা ভট্টারিকা
৪০৬		সিম্বেলিন-এর আলোক	আলোকে
৪১২	২	ভিক্তি	ভিত্তি
৪১৬	২	গীত	গীতা
৪৩৬		T. W. Rhys Davlcs,	T. N. Rhys Davids
৪৩৮	পৃষ্ঠাসংখ্যা	৩৩৮	৪৩৮
৪৩৮		Rhysa	Rhys
৪৪১	৭	বুদ্ধদের রচিত	বুদ্ধদেব চরিত
৪৫০		রাজানারায়ণ বসু	রাজনারায়ণ বসু
৪৫১		যজ্ঞেশ্বর	যজ্ঞেশ্বর
৪৫৪		পরিষদেয় শোকসভা	পরিষদের
৪৫৬		ভারভী	ভারতী
৪৫৭		বরীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ
৪৫৮	৭	সাহিত্য সাহিত্যের	সাহিত্যের
৪৬০	১	কালী বাহানুর	বাহাদুর
৪৬৩	টীকা	দত্যেন্দ্রনাথ	সত্যেন্দ্রনাথ
৪৬৫		'শংকর ও শাক্য মুনি র	এর পর : হবে
৪৬৬		মস্তফী	মুস্তফী
৪৬৭		নগেন্দ্রনাথ শুপ্ত	গুপ্ত
৪৬৮	২য় অনুচ্ছেদের শেষের আগের ছত্র	রকলের	সকলের

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬৮	শেষ অনুচ্ছেদে আগের ছত্র	পাওয়া।	দাঁড়ি হবে না
৪৮১	শেষ অনুচ্ছেদে ২য় ছত্র	পঠককে	পাঠককে
৫০১	১৩	তারা উত্তরে	তার উত্তরে
৫২৮		জগদানন্দিনী	জ্ঞানদানন্দিনী
৫৩০	৮নং টীকা	মোজো জ্যাঠাইমা	মেজো
৫৩৪	১	(ডাক্তার) পূর্ণিমা:	(ডাক্তার) সুহৃৎ চৌধুরী
৫৪০	২য় অনুচ্ছেদে ৪র্থ ছত্র	ইন্দিরা বলেছে	বলেছেন
৫৪৩		রযজ্ঞান্গিগন	সঙ্গিনী
৫৫৬	৩য় অনুচ্ছেদে ৩য় ছত্র	থেকে যেতেই	থেকে যেতেন
৫৫৮	৩য় অনুচ্ছেদে	শ্যামা নাপারয়ে	নাপারায়
৫৫৯	৬	সঙ্গে সঙ্গেই	সঙ্গে
৫৭৫	৫	মনমোহন	মনোমোহন
৫৭৯	১	জাস্টিশ	জাস্টিস
৫৮২	২য় অনুচ্ছেদে শেষ ছত্র	'পেয়েছেন,' ২বার আছে	পেয়েছেন
৫৮৪	৯নং টীকা	আমার বাল্য কথা	'আমার বাল্য কথা'য়
৫৮৬	১৯নং টীকা	উৎসাহ দেখা নিতো	দেখা দিতো